মোহমুদ্গর

(প্রথম ভাগ)

রায়-বাহাদুর শ্রীযুক্ত কালীচরণ সেন,

ধর্ম্মভূষণ, বি-এল্ প্রণীত 'বৈদ্য'

ও

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ সেন,

বিদ্যাবাগীশ, এম্-এ প্রণীত 'বৈদ্যপ্রতিবোধনী'র সমালোচনা

বৈদ্যব্রাহ্মণ-সমিতির ভূতপূর্ব্ব সহকারী-সভাপতি এবং

বর্ত্তমান সম্পাদক, শ্রীরামপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও

কলেজের প্রধান সংস্কৃতাধ্যাপক

শ্রীহরিপদ সেন দেবশর্ম্মা, শাস্ত্রী, এম্-এ

কর্ত্তৃক প্রণীত

প্রাপ্তিস্থান

এক বৎসরের জন্য নূতন ঠিকানা—

(১) শ্রীহরিপদ শাস্ত্রী, ৫৪এ, গোয়ালটুলী রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা

(২) কবিরাজ শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশারদ, কল্পতরুপ্রাসাদ,

চিত্তরঞ্জন এভিনিউ নর্থ, বিডন ষ্ট্রীট পোঃ, কলিকাতা।

সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

[মূল্য দুই টাকা মাত্র

শ্রীনরেন্দ্রনাথ সেনশর্ম্মা কর্ত্তৃক
৮২ নং শম্ভুনাথ পণ্ডিত ষ্ট্রীট্, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।
প্রিণ্টার—শ্রীরসিকলাল পান।

প্রথম সংস্করণ—পৌষ, ১৩৫০ বঙ্গাব্দ

গোবর্দ্ধন প্রেস,
১২ গৌরমোহন মুখার্জ্জী ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

ওঁ

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু জাতিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥

যে বরাভয়করা জগন্মাতা সহস্রভুজা জাতিজননীর রূপ ধারণ
করিয়া তাঁহার প্রীতিস্নিগ্ধ অঙ্কে সাধু-অসাধু নির্ব্বিশেষে
সকল সন্তানকেই সস্নেহে ধারণ করিয়াছেন, যিনি
দ্বিভুজা জননীরূপে জীবনে মরণে আমাদের একমাত্র
আশ্রয়-স্থল, যিনি হৃদয়ে সরস্বতী, গেহে লক্ষ্মী,
নিত্যকালে মহাকালী, যে মহামায়ার কোটিচন্দ্র-
বিনিন্দী আস্যের হাস্যরেখা এই গ্রন্থপ্রণয়নে
প্রতি মূহূর্ত্তে প্রেরণা দিয়াছে, তাঁহারই
অমল-কমল-চরণযুগলে ভক্তিভরে
ইহাকে অর্পণ করিলাম।

মা, আমার কামনা যেন পূর্ণ হয়!

নিবেদন

এই পুস্তক খানি গৌহাটীর উকিল রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত কালীচরণ সেন* ধর্ম্মভূষণ, বি-এল মহাশয়ের লিখিত (দ্বিতীয় সংস্করণ) 'বৈদ্য' পুস্তকের সমালোচনার উদ্দেশ্যে লেখা হইতেছিল। কিন্তু গ্রন্থ শেষ হইবার পূর্ব্বেই অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র নাথ সেন, এম্-এ বিদ্যাবাগীশ মহাশয় কালীবাবুর পক্ষ সমর্থন করিয়া 'বৈদ্যপ্রতিবোধনী' নাম্নী এক-খানি পুস্তিকা প্রকাশ করায় দুই খানি পুস্তকেরই একত্র সমালোচনা করিলাম।

সত্যেন্দ্রবাবু ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "এই পুস্তকে (?) আমি যে সকল প্রমাণ প্রয়োগ উপস্থিত করিয়াছি, তাহার **কতক কতক** গৌহাটী-প্রবাসী রায়-বাহাদুর কালীচরণ সেন ধর্ম্মভূষণ মহাশয় তাঁহার 'বৈদ্য' পুস্তকে ইতঃপূর্ব্বেই উপস্থাপিত করিয়াছেন। তবে, **তাঁহার প্রমাণাদির সহিত** আমি কিছু কিছু নূতন প্রমাণ যোগ করিয়াছি।" (বৈদ্য-প্রতি—পৃঃ ।/০) বৈদ্যকে অম্বষ্ঠ প্রতিপাদন করিবার জন্য এবং অম্বষ্ঠকে বৈশ্যবর্ণীয় প্রতিপাদন করিবার জন্য উকিল-বাবু ও অধ্যাপক মহাশয় যে যে বিচিত্র উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই যাজন-ব্রাহ্মণ শ্যামাচরণের প্রণীত 'জাতিতত্ত্ব' নামক পুস্তকের† অনুকরণে। এইরূপে জাতিতত্ত্ব, বৈদ্য ও বৈদ্যপ্রতিবোধনীকে তিন অভেদাত্মা মহাপুরুষের অক্ষয় কীর্ত্তি-পরম্পরা বলা যাইতে পারে!

---

* শ্রীযুক্ত কালীবাবু কোথাও আমার নামান্তে 'শর্ম্মা' ব্যবহার করেন নাই, আমিও তাঁহার নামান্তে 'গুপ্ত' ব্যবহার করিলাম না।

† এই পুস্তকে তিন বৎসর পূর্ব্বে বৈদ্যসম্প্রদায়কে চণ্ডালসদৃশ অস্পৃশ্য বর্ণসঙ্কর বলিয়া গালি দেওয়া হইয়াছিল। ইহা প্রথমে বসুমতী পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হয়। তাহার প্রতিবাদে জ্ঞানাঞ্জন-গ্রন্থাবলী প্রথম শলাকা ও দ্বিতীয় শলাকা বাহির হইলে পণ্ডিত শ্যামাচরণ প্রমুখ যাজন-পণ্ডিতদের জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হইয়াছিল।

কালীবাবু ও সত্যেন্দ্রবাবুর প্রতি আমার কোন বিদ্বেষ নাই। তাঁহারা আমাদের আপন জন। আপন জন ভ্রম করিলে বন্ধুর কর্ত্তব্য তাহা দেখাইয়া দেওয়া। সংসারের কেহই নির্ভুল নহে। কোন না কোন বিষয়ে অতি বড় পণ্ডিতেরও ভুল হইতে পারে। রন্ধ্র পাইয়া ইন্দ্রিয়ের মোহ ও অভিমানের মোহ মিথ্যার আবরণে পণ্ডিতের বুদ্ধিকে সমাচ্ছন্ন করে। আমাদের বন্ধু-দুইটী ভুল করিয়াছেন। ভুল করা পাপ নহে, কিন্তু তথাপি একজনের ভুলে দশ জনে কষ্ট পায়। এজন্য আমাদের সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। শুনিয়াছি, কালীবাবু ও সত্যেন্দ্রবাবু বৈদ্যব্রাহ্মণ-সমিতির প্রতিপক্ষ যাজন-ব্রাহ্মণদিগের সহিত সহযোগিতা করিয়া স্বজাতির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছেন, ইহা অতীব নিন্দনীয়।* ইহা সত্য হইলে প্রত্যেক বৈদ্যসন্তানের মস্তক দুঃখে, ক্ষোভে ও লজ্জায় অবনত হইবে।

কালীবাবু ধর্ম্মনিষ্ঠ বলিয়া বিদিত। সত্যেন্দ্র বাবুও লিখিয়াছেন, "**আমি নিজে এখন যে মত পোষণ করিতেছি, পর মুহূর্ত্তে শাস্ত্রে তাহার বিপরীত দেখিলে তৎক্ষণাৎ আমার পূর্ব্ব মত পরিবর্ত্তন করিব**" (পৃঃ ৩১ ৩২)। আমরা আশা করি যে, আমাদের উভয় বন্ধুই শাস্ত্র আপনাদের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া নিজ নিজ আচরণে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইবেন এবং অনতিবিলম্বে বৈদ্যব্রাহ্মণ-সমিতির আজীবন সভ্যরূপে এই শুভ আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করিয়া কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবেন।

এই গ্রন্থের প্রণয়নে ও মুদ্রণে ছয়মাস কাল কঠোর পরিশ্রম করিতে

---

* সম্প্রতি ভট্টপল্লীর পঞ্চানন প্রমুখ কোন কোন যাজন-পণ্ডিত কালিয়ায় বৈদ্য-সমাজের বিরুদ্ধে এক আন্দোলন করিতেছেন। আমরা শুনিয়াছি, সেখানে এক সভা হইবে, এবং শ্রীযুক্ত কালীচরণ সেন, বাচস্পতি মহাশয় ও সত্যেন্দ্র বাবু তাহাতে যোগদান করিবেন। তত্রত্য ব্রাহ্মণসভা এই মর্ম্মে আমাদিগকে পত্র দিয়াছেন। অধঃপতনের সীমা নাই!

হইয়াছে। কিন্তু প্রতিমুহূর্ত্তে মাতৃচরণে অঞ্জলিদানের ভূমানন্দে ইহাকে ক্লেশকর বলিয়া গণনা করি নাই। গ্রন্থ মুদ্রিত করিতে প্রায় ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা ব্যয় হইয়াছে। তন্মধ্যে কাশীবাসী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশশর্ম্মা মহাশয় ও ভাগলপুর প্রবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র গুপ্তশর্ম্মা বিদ্যাভূষণ কবিরাজ মহাশয় আমাকে যেরূপ অযাচিত অর্থ সাহায্য করিয়াছেন তাহা বিস্মৃত হইবার নহে। এক দিকে যেমন বহু ব্যক্তিকে এবং বহু শাখা-সমিতির সম্পাদক ও সভাপতি মহাশয়কে বারংবার পত্র দিয়াও কোন উত্তর পাই নাই, বহু শাখা সমিতি ২।৩ বৎসর পূর্ব্বে আমার নিকট ৫৲। ১০৲। ১৫৲ টাকার পুস্তক লইয়াছেন, কিন্তু অদ্যাপি এক কপর্দ্দকও প্রত্যর্পণ করেন নাই, পত্র লিখিলে উত্তর দেন না, এ সময়ে প্রাপ্য টাকা পাইলে উপকার করিলেন জানিয়া কৃতজ্ঞ থাকিব, এ ভাবে পত্র দিয়াও উত্তর পাই নাই, অন্য দিকে তেমনই মাতৃপূজা-ব্যাকুল ভক্তবৃন্দের অযাচিত সাহায্য আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে। নবাবপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র দাশশর্ম্মা মহাশয় ও বৈদ্যরত্ন মহাশয়ের ভ্রাতা পণ্ডিত সুধীন্দ্রনাথ সেন শর্ম্মা মহাশয় আমাকে উপাদানসংগ্রহে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। বাহির হইতে যে অর্থ সাহায্য পাইয়াছি তদ্বিনিময়ে সাহায্যকারীদিগকে অর্দ্ধমূল্যে পুস্তক দিবার বন্দোবস্ত করিয়া কিয়ৎ পরিমাণে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার অবসর পাইয়াছি। বস্তুতঃ তাঁহারা অগ্রিম সাহায্য দ্বারা উৎসাহিত না করিলে এই বহুব্যয়-সাধ্য কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারিত না। মুদ্রাযন্ত্রে ও অন্যত্র এখনও ৩৫০৲ তিনশত পঞ্চাশ টাকা ঋণ রহিয়াছে। আশা করি সমর্থ বৈদ্যসন্তান মাত্রই বৈদ্যব্রাহ্মণ-সমিতির জয়যাত্রাকল্পে প্রচারিত এই পুস্তকের এক এক খণ্ড ক্রয় পূর্ব্বক গ্রন্থকারকে ঋণমুক্ত ও উৎসাহিত করিবেন ইতি।

অস্থায়ী ঠিকানা—
৫৪।এ গোয়ালটুলী রোড্‌
ভবানীপুর, কলিকাতা।

গ্রন্থকার

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

বিষয়		পৃষ্ঠাঙ্ক
মধ্যযুগ—বাঙ্গালার ঘোর দুর্দ্দিন	...	১
সুদিনের আশা	...	৩
হিন্দুস্থানের জাগরণ	...	৫
বৈদ্যব্রাহ্মণ-সমিতির পরিচয়		৫
বৈদ্যব্রাহ্মণ-সমিতির উদ্দেশ্য	...	৭
ব্রাহ্মণাচার গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা	...	৮
সমিতি নিখিল বৈদ্যব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষিত		৮
সমিতির উচ্ছেদে অগ্রসর কালীচরণ সেন	...	৯
কালীবাবুর গর্হিত আচরণ	...	১০
কালীবাবুর কীর্ত্তি	...	১১
বৈদ্যব্রাহ্মণ-সমিতির কর্ত্তব্য	...	১২
'বৈদ্য' পুস্তকের সারমর্ম্ম	...	১৪
মোহমুদ্গরের সার মর্ম্ম	..	১৫
সমালোচনায় অসাধুতা	...	১৫
সমালোচনায় শঠতা	...	১৯
স্বজাতির ঘোর অমর্য্যাদা	...	৩১
বৈদ্য বৈশ্যবর্ণ নহে	...	৪১

[কুলপঞ্জিকার সাক্ষ্য, কুলাচার্য্যদিগের সাক্ষ্য এবং শব্দকল্পদ্রুম ও চন্দ্রপ্রভা সম্বন্ধে কালীবাবু ও সত্যেন্দ্রবাবুর সকল কথাই মিথ্যা পৃঃ ৪১-৪৮, ৫০-৬৮ ; ১৫০-১৫৩ দ্রষ্টব্য]।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বৈদ্য মুখ্য ব্রাহ্মণ

(১) শ্রুতির প্রমাণ (বৈদ্য বা ভিষক্ বলিলে ব্রাহ্মণকেই বুঝায়) ... ২৩—২৪

(২) আয়ুর্ব্বেদের প্রমাণ (বৈদ্য বা ভিষক্ বলিলে ব্রাহ্মণকেই বুঝায়) ২৫-২৯

(৩) অভিধানের প্রমাণ (বৈদ্য বলিলে অব্রাহ্মণকে বুঝায় না) · ৩০-৩১

(৪) কুলপঞ্জিকা ও কুলাচার্য্যের প্রমাণ (বৈদ্য ব্রাহ্মণবর্ণ) · ৩১-৪৮

(৫) শব্দকল্পদ্রুমের প্রমাণ (কালীবাবুর কথা মিথ্যা) ··· ৪৮-৫০

(৬) মহামহোপাধ্যায় ভরতমল্লিকের প্রমাণ .. ৫০-৬৮

(কালীবাবু ও সত্যেন্দ্রবাবুর কথা মিথ্যা)

(৭) রাঢ়ে বৈদ্যই বৈদ্যের বৈদিক গুরু ৭৩

(কালীবাবু ও সত্যেন্দ্রবাবু এ সংবাদ রাখেন না)

(৮) রাঢ়ে প্রায় সর্ব্বত্র জননাশৌচ দশ দিন ৭৫

(কালীবাবু ও সত্যেন্দ্রবাবু এ সংবাদ রাখেন না)

(৯) উর্দ্ধপুণ্ড্রধারণের প্রমাণ

(কালীবাবু ও সত্যেন্দ্রবাবুর কথা মিথ্যা) ৭৭

(১০) অধ্যাপনার প্রমাণ

(কালীবাবু ও সত্যেন্দ্রবাবুর কথা মিথ্যা) ... ৮২

(১১) প্রাচীন বৈদ্যদিগের ব্রাহ্মণ-পরিচয় ... ৮৪-৯৯ ; ১০৭-১০৯

(কালীবাবু ও সত্যেন্দ্রবাবুর কথা মিথ্যা)

(১২) প্রাচীন বৈদ্যদিগের নামান্তে শর্ম্মন্‌শব্দ ব্যবহার ৯২-৯৯

(কালীবাবু ও সত্যেন্দ্রবাবুর কথা মিথ্যা)

(১৩) সেন রাজগণের ব্রাহ্মণত্ব (কালীবাবু ও সত্যেন্দ্রবাবুর কথা মিথ্যা) ... ৯৯—১০৬

(১৪) প্রতিগ্রহাধিকার
(কালীবাবু ও সত্যেন্দ্রবাবুর কথা মিথ্যা) ১০৯ ; ৮১

(১৫) পাঁড়ে, মিশ্র চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি উপাধি ; (কালীবাবু ও সত্যেন্দ্রবাবুর কথা মিথ্যা) ... ১১০

(১৬) বৈদ্যের যাজনবৃত্তিও ব্রাহ্মণত্বের প্রমাণ (চিকিৎসা সংক্রান্ত নানাবিধ যাজন কার্য্য বৈদ্যকে করিতে হয়) ১১৪

(১৭) চাতুর্ব্বর্ণ্যের গুরুবৃত্তি ... ১১৫ ; ৯০-৯২

(১৮) গোস্বামী, ঠাকুর প্রভৃতি উপাধি .. ১১৫
(এ সম্বন্ধে কালীবাবু ও সত্যেন্দ্রবাবুর কথা মিথ্যা)

(১৯) নিজস্ব গোত্রের প্রমাণ
(কালীবাবু ও সত্যেন্দ্র বাবুর কথা মিথ্যা) ১১৭

(২০) ব্রাহ্মণদিগের সহিত প্রাচীন বৈদ্যদিগের বৈবাহিক সম্বন্ধ (কালীবাবু ও সত্যেন্দ্রবাবুর কথা মিথ্যা) ... ১২১

(২১) বৈদ্যগণ অদ্যাপি যাজন-ব্রাহ্মণদের সহিত অধিষ্ঠানে পান-সুপারী ও যজ্ঞোপবীত পাইয়া থাকেন।

(২২) প্রাচীন বৈদ্যদিগের ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রসিদ্ধি।

(২৩) প্রাচীন বৈদ্যদিগের স্মার্ত্তত্ব—(অব্রাহ্মণের স্মৃতি-গ্রন্থ রচনা অসম্ভব)।

(২৪) রঘুনন্দন ও গণেশকর্তৃক পাতিত্য ঘোষণা।

(২৫) মহামহোপাধ্যায় সার্ব্বভৌম, বাচস্পতি প্রভৃতি উপাধি ব্রাহ্মণত্বেরই প্রমাণ।

(২৬) টোলরক্ষা ও সংস্কৃত শাস্ত্রের অধ্যাপনা।

(২৭) বাঙ্গালার বাহিরে বৈদ্য বলিলে ব্রাহ্মণকেই বুঝায় (অতএব ভারতবর্ষের সামাজিকবর্গের সাক্ষ্য অনুসারে বৈদ্য ব্রাহ্মণ)

(২৮) সামাজিকবর্গের সাক্ষাতে 'ভবতি ভিক্ষাং দেহি' প্রভৃতি ব্রাহ্মণবৎ ব্যবহার, কেশান্তপর্য্যন্ত উচ্চ দণ্ড, কার্পাস উপবীত ও কৃষ্ণসার মৃগের উত্তরীয় চর্ম্ম—ব্রাহ্মণত্বই সূচিত করে। ৭১—৭৫

(২৯) বঙ্গের বাহিরে সেনশর্ম্মা (গয়ায়), দাশশর্ম্মা (উৎকলে), দত্তশর্ম্মা (পাঞ্জাবে). গুপ্তশর্ম্মা (গয়ায়), নন্দীশর্ম্মা (উৎকলে) অদ্যাপি বিদ্যমান। গুজরাটেও ব্রাহ্মণদের এইরূপ কৌলিক পদবী আছে।

(৩০) বৈশ্যোচিত কৃষি, বাণিজ্য, গোপালন—কিছুই বৈদ্যের নাই, কিন্তু ব্রাহ্মণোচিত শাস্ত্রালোচনা, অধ্যাপনা, উপাধি, গুরুবৃত্তি প্রভৃতি সবই আছে।

(৩১) দুর্জ্জয়ের "বৈদ্যাশ্চ দ্বিবিধাঃ প্রোক্তাঃ সারস্বতাশ্চ সৈন্ধবাঃ" এই উক্তি বৈদ্যগণের ব্রাহ্মণত্বে প্রমাণ। পশ্চিমপ্রদেশীয় বৈদ্যগণের মধ্যেও এই দুই ভেদ দৃষ্ট হয়।

(৩২) ব্রাহ্মণদিগের উপরে সমাজপতিত্ব, ব্রাহ্মণের দণ্ডদাতৃত্ব, ব্রাহ্মণের পুরস্কারে-তিরস্কারে প্রভুত্ব।

(৩৩) বৈদ্যের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের আধিক্য।

(৩৪) অন্তরের সাক্ষ্য—নির্ম্মল চরিত্র, সরলতা, তেজস্বিতা, অহীন-কর্ম্মতা ব্রাহ্মণত্বের প্রমাণ।

(৩৫) বৈদ্যের সামাজিক প্রতিষ্ঠা, গুরু-পুরোহিতের ঠিক নিম্নেই অবস্থান (ব্রহ্মা মূর্দ্ধাভিষিক্তশ্চ ইত্যাদি গাল বাক্যেও ক্ষত্রিয়ের ও বৈশ্যের উপরে বৈদ্যের আসন দেখা যায়)।

তৃতীয় অধ্যায়

বৈদ্য (ব্রাহ্মণবৈশ্যা-প্রভব) অম্বষ্ঠ নহে

(১) অম্বষ্ঠ ও বৈদ্য একার্থক পর্য্যায়শব্দ নহে।

(২) ভারতের শ্রেষ্ঠ আয়ুর্ব্বেদবিৎ সম্প্রদায় অম্বষ্ঠ হইতে পারে না।

(৩) বাঙ্গালার বাহিরে ভারতের কুত্রাপি আয়ুর্ব্বেদবিৎ অম্বষ্ঠ নাই, সুতরাং হিন্দু সমাজের সন্নিবেশ অনুসারে বাঙ্গালায় কিরূপে থাকে ?

(৪) বাঙ্গালার বৈদ্যগণ আপনাদিগকে 'অম্বষ্ঠ' বলিয়া জানে না। 'বৈদ্য'ই তাহাদের চিরন্তন সম্প্রদায়গত নাম।

(৫) কোন প্রাচীন বৈদ্যকুলপঞ্জিকায় বৈদ্যকে অম্বষ্ঠ বলা হয় নাই। এ সম্বন্ধে কালীবাবু ও সত্যেন্দ্রবাবুর সকল কথাই মিথ্যা, পৃঃ ৪১-৪৮ ও ৫০-৭০ ; ১৫০-১৫৩ ; ৫৭।

(৬) বঙ্গের জনসাধারণ বৈদ্যকে অম্বষ্ঠ বলিয়া জানে না।

(৭) প্রাচীন বা আধুনিক দলিলপত্রে ও আইন আদালতে কোথাও অম্বষ্ঠ নাম নাই।

(৮) কোন বৈদ্য-কুলপঞ্জিকার নাম অম্বষ্ঠ-কুলপঞ্জিকা নহে।

(৯) বাঙ্গালার রাজা ও রাজজাতির নাম অম্বষ্ঠ হইলে ঐ নামটী কেহই ভুলিত না এবং তাহারা বৈদ্যনামেই পরিচিত হইত না।

(১০) মেনহাজ ও নুলো প্রভৃতির প্রমাণ। প্রাচীনেরা প্রায় সর্ব্বত্র বৈদ্যই বলিয়াছেন, পারত পক্ষে অম্বষ্ঠ বলেন নাই।

১১। অম্বষ্ঠশব্দ বাঙ্গালা ভাষায় বা সাহিত্যে নাই বৈদ্যপাড়া, বৈদ্যবাটী, বৈদ্যপুর, বেজগাঁ, বেজগাতি প্রভৃতির ন্যায় অম্বষ্ঠ শব্দের সাহচর্য্যে কোন স্থানের নাম উল্লিখিত হয় না।

১২। নিন্দিত চিকিৎসাবৃত্তিক অম্বষ্ঠ ও শ্লাঘনীয় চরিত্র বৈদ্য এক নহে।

১৩। গোলাপ শাস্ত্রী প্রভৃতি নিরপেক্ষ লোকও বলেন, বঙ্গীয় বৈদ্য ব্রাহ্মণ-বৈশ্যা-প্রভব অম্বষ্ঠ নহে।

১৪। বৈদ্যের অসাধারণ গোত্র বিদ্যমান আছে। সত্য বটে গোত্র-সংখ্যা প্রায় অসংখ্য। তথাপি প্রচলিত ধনঞ্জয় কারিকায় যাজন ব্রাহ্মণ-দের ৪২টী গোত্র পাওয়া যায়, কিন্তু বৈদ্যদিগের গোত্রসংখ্যা ৫০ পঞ্চাশ! বৈদ্য অম্বষ্ঠ হইলে তাহারও ঐ ৪২টী মাত্র গোত্রই থাকিত।

১৫। ব্রহ্মা মূর্দ্ধাভিষিক্তশ্চ বৈদ্যঃ ক্ষত্রবিশাবপি।
অমী পঞ্চ দ্বিজা এষাং যথাপূর্ব্বঞ্চ গৌরবম্॥

এই শ্লোক প্রামাণিক নহে। ইহা নির্মূল। 'পঞ্চ দ্বিজ' মনুবিরুদ্ধ, কারণ 'ষট্ সুতাঃ দ্বিজধর্ম্মিণঃ'। বৈদ্য ও অম্বষ্ঠ এক পর্য্যায়ের শব্দ নহে। বৈদ্য শব্দের অর্থ অম্বষ্ঠ নহে। সুতরাং এই শ্লোকের অর্থ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের নিতান্তই অরুচিকর। ইহা সেই বঙ্গীয় ব্রাহ্মণেরই রচিত, যাহারা বৈদ্য ও অম্বষ্ঠকে অভিন্ন জ্ঞান করিতে চায়। সত্যেন্দ্রবাবুর উদ্‌ভট শ্লোকের 'ব্রাহ্মণ্যামভবৎ বরাহমিহিরঃ' ইত্যাদি প্রমাণ নিতান্তই উদ্‌ভট, কারণ উহাতে বিভিন্ন শতাব্দীর ও বিভিন্ন জাতির লোকদিগকে কোন এক ব্রাহ্মণের পুত্র বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে! উহা দ্বারা বৈদ্য-গণ অম্বষ্ঠ প্রমাণ হয় না। যে পশ্চিমের বৈদ্যদিগকে অম্বষ্ঠ বলা হইয়াছে, তাহারা ব্রাহ্মণ বলিয়াই পরিচিত, অম্বষ্ঠ বলিয়া নহে! বৈদ্য এই জাতি নামও তথায় নাই!

চতুর্থ অধ্যায়

অম্বষ্ঠজননী ও অম্বষ্ঠের ব্রাহ্মণবর্ণত্ব

অম্বষ্ঠজননীর ও অম্বষ্ঠের ব্রাহ্মণত্ব স্বাভাবিক ... ১০৮—১৮০
এতৎ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ ... ১৮০

(১) পতি-পত্নীর গোত্রে-বর্ণে পিণ্ডে-অশৌচে একত্ব ১৮১

(২) পত্নী ও দাসীর প্রভেদ ... ১৮২—১৯০

(৩) অম্বষ্ঠজননীর পত্নীত্বই ব্রাহ্মণত্বের প্রমাণ ঐ

(৪) 'ন সবর্ণাৎ প্রহীয়তে' ... ১৯০ ও ১৯৮

(৫) বিবাহই দ্বিজ কন্যার উপনয়ন। ইহাতে সে স্বামীর অনুরূপ দ্বিজত্ব পায় ... ১৯২

(৬) অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণের ঔরস পুত্র ... ১৯৪

(৭) ঔরস-পুত্র, ঔরস-পুত্রের জননী ও জনক গোত্রে ও বর্ণে পৃথক্ হয় না ... ১৯৫

(৮) 'তাস্বপত্যং সমং ভবেৎ' ... ২০০

(৯) 'বৈশ্যায়ামপি চৈব হি' ... ২০২

(১০) 'বিপ্রবৎ বিপ্রবিন্নাসু' ... ২০৪

(১১) 'অনিন্দ্যেষু বিবাহেষু' ... ২০৯

(১২) 'আনুলোম্যেন সম্ভূতাঃ' ... ২১৩

(১৩) 'তাননন্তরনাম্নস্তু' ... ২২৪,২২৮

(১৪) অনুলোমাসু মাতৃবর্ণাঃ .. ২৩৪

(১৫) গৌতমের প্রমাণ ... ২৩৭

(১৬) বৌধায়নের প্রমাণ ... ২৩৯

(১৭) কৌটিল্যের বচন ... ২৪২

(১৮) সত্যসঙ্কল্পের কথা . ২৪৩

(১৯) এই প্রসঙ্গে কালীবাবু ও সত্যেন্দ্রবাবুর অপরাধ ২৫২

(২০) কৌটিল্যের বচন আলোচনা ... ২৫৭

পঞ্চম অধ্যায়

মর্দ্দনম্ গুণবর্দ্ধনম্

(১) মর্দ্দন	...	২৬১
(২) মর্দ্দন	...	১—২৬১
(৩) মর্দ্দন	...	৩—২৬৬
(৪) মর্দ্দন	...	৪—২৬১
(৫) মর্দ্দন	...	২৭৩
(৬) মর্দ্দন	...	২৮৫
(৭) মর্দ্দন	...	২৮৯
(৮) মর্দ্দন	...	২৯০
(৯) মর্দ্দন	...	২৯১
(১০) মর্দ্দন	...	২৯৩
(১১) মর্দ্দন	...	২৯৮
(১২) মর্দ্দন	...	৩০০
(১৩) মর্দ্দন	...	৩০৬
(১৪) মর্দ্দন	...	৩১০
(১৫) মর্দ্দন	...	৩১২

মোহবজ্র

বৈদ্যপ্রতিবোধনীর পরিচয়	...	৩২৭
বস্তু-সংক্ষেপ	...	৩২৭
সত্যেন্দ্রবাবুর ব্যবহার	...	৩২৮
বৈদ্য* ও বৈদ্যপ্রতিবোধনী†	...	৩৩১

প্রতিবোধনীর নূতন কথা

(১) অম্বষ্ঠ অংশতঃ ব্রাহ্মণ অংশতঃ বৈশ্য।	...	৩৩১

(২) কৌটিল্যের রায়! ... ৩৩২
(৩) বিবাহ ব্যাপারেরই উচ্ছেদ হয়! ... ৩৩৩
(৪) ক্ষাত্রির কথা! ... ৩৩৫
(৫) নাটকের কথা! ... ৩৩৬
(৬) অম্বষ্ঠের ব্যুৎপত্তি! ... ৩৩৮
(৭) ভৃগুসংহিতা! ... ৩৪১
(৮) অভিধানের প্রমাণ! ... ৩৪২
(৯) বর্ণসঙ্করের ব্যাখ্যা! ... ৩৪৭
(১০) যেনাস্য পিতরো যাতাঃ! ... ৩৪৮

পরিশিষ্ট

(১) প্রক্ষিপ্ত বাক্যে আস্থাই আস্তিকতা! ... ৩৪৯
(২) যাজন-ব্রাহ্মণদের অশাস্ত্রীয় ব্যবহার কি সপ্রমাণ করে? ৩৫০
(৩) যাজন-ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যব্রাহ্মণের মধ্যে কে কাহার নমস্য? ৩৫১
(৪) বৈদ্য হইতে সাধারণ ব্রাহ্মণদিগের উৎপত্তি ৩৫২
এবং অন্যান্য নানা বিষয়।

* কাশী হইতে বৈদ্যসম্প্রদায়কে গালি দিয়া জাতিতত্ত্ব নামক যে পুস্তক বাহির হয়, তাহা পাঠ করিয়া কালীবাবু যে অভিমত প্রকাশ করেন, তাহাতে তাঁহার শেষ কথা এই ছিল—"আমি একজন বৈদ্য হইয়া যখন এভাবে লিখিতেছি, তখন চারিদিক হইতে আক্রান্ত হইব, তাহা নিশ্চিত।" চারিদিক হইতে গালি খাইবেন, ইহা কালী-বাবুর জানা ছিল। কিন্তু তাহার জন্য সমিতি দায়ী নহে। সমিতির প্রকাশিত পুস্তকে কিছুমাত্র কটু কথা ছিল না। তবে সখা বৈদ্য ও সখী বৈদ্য প্রতিবোধনী বৈদ্যব্রাহ্মণ-সমিতিকে এত গালাগালি করিয়াছেন কি জন্য?

† বৈদ্য প্রতিবোধনীর প্রচ্ছদপটে প্রবোধনীর অনুকরণে 'সত্যে নাস্তি ভয়ং ক্বচিৎ' লেখা আছে। সত্যেন্দ্রনাথ কোন কিছুতেই 'পেছ-পা' নহেন, ইহা বুঝানই বোধ হয় ঐরূপ লেখার অভিপ্রায়!

বৈদ্য ও বৈদ্য-প্রতিবোধনীর বিশ্লেষণ

১। গুরু-শিষ্যের ভাষার তুলনা

বৈদ্যব্রাহ্মণ-সমিতি হইতে প্রকাশিত 'বৈদ্যপ্রবোধনী' সকলেই পাঠ করিয়া থাকিবেন। তাহাতে কাহারও প্রতি কিছুমাত্র আক্রমণ নাই। ভদ্র সামাজিকবর্গকে কোন গুরুতর বিষয়ে কিছু নিবেদন করিতে হইলে ভাষা যেমন বিনীত ও গাম্ভীর্য্যপূর্ণ হওয়া উচিত সেইরূপ ভাষাই সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু তাহার সমালোচনা করিতে গিয়া **কালীবাবু** কিরূপ লিখিয়াছেন দেখুন—

(১) "**নব পর্য্যায়ের শর্ম্মাগণের** ধারণা তাঁহারা **গালি দিয়াই** কেল্লা ফতে করিবেন এবং **মিথ্যাকে সত্য বলিয়া** বৈদ্যগণকে প্রতারিত করিতে পারিবেন"—নিবেদন, পৃঃ ৩।

(২) "এবার আর অপব্যাখ্যা নহে, **ধোঁকা দিয়া মিথ্যাকে সত্য প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস**"—নিবেদন পৃঃ ২৭, বৈদ্য পৃঃ ১০৮।

(৩) "তাঁহারা (বৈদ্যব্রাহ্মণেরা) শতসহস্র বৎসরের পদ্ধতি পরিবর্ত্তন করিতে দ্বিধাবোধ করিতেছেন না। **শাস্ত্রবাক্যের কদর্থ করিয়া** 'বৈদ্যব্রাহ্মণগণ **বামন কবিরাজ সাজিতেছেন**।"—(বৈদ্য, পৃঃ ১৪৩)

(৪) "আমি তাহাই (মহামহোপাধ্যায় ভরত মল্লিকের মত) সমর্থন করিতেছি। **মিথ্যা হুজুগে আত্মবিসর্জ্জন করি নাই**।"—বৈদ্য, পৃঃ ১৪৩

(৫) "ভাগ্যে **সরস্বতী ও শাস্ত্রীর যুগ** আসিয়াছে, তাই রক্ষা'—নিবেদন, পৃঃ ১২

সত্যেন্দ্রবাবু বলিয়াছেন,—

(১—৪) বৈদ্যব্রাহ্মণ সমিতির কর্ম্মকর্ত্তারা '**ময়ূরপুচ্ছ** পরিধান'

করে, 'ভ্রমক্রমেও গায়ত্রী উচ্চারণ করেন না', 'অধিকাংশই সংস্কৃত জ্ঞান শূন্য', তাহারা 'সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যাপনার (আলোচনার) অনুপযুক্ত'। সারাদিন সারা বৎসর অন্য চিন্তা করিয়া অবসর মত ২।৫ মিনিটের জন্য নভেল পড়ার ন্যায় শাস্ত্রালোচনা' করে, 'শাস্ত্র বিচারে কপটতা' করে (বৈদ্যপ্রতি পৃঃ ৮৫, ৫৩, ভূমিকা ৷৷৵৹ ইত্যাদি)।

(৫) অভিসম্পাত করিতেও প্রবৃত্তি হইয়াছে (ঐ পৃঃ ৭৪)!

সত্যেন্দ্রবাবু ও কালীবাবুর ধারণা, তাঁহারাই সত্যবাদী এবং শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্মজ্ঞ এবং বৈদ্যব্রাহ্মণ সমিতির পণ্ডিতগণ অধার্ম্মিক, নাস্তিক, উচ্ছৃঙ্খল, অসংস্কৃতজ্ঞ, হুজুগপ্রিয় এবং সত্যাপলাপী।

(৬) কালীবাবু বৈদ্যব্রাহ্মণ কথাটাকেই বরদাস্ত করিতে পারেন না। তিনি লিখিয়াছেন, "'বৈদ্যব্রাহ্মণ' কথাটা আমার নিকট অসম্বদ্ধ বলিয়া বোধ হয়, কারণ যে বৈদ্য সে ব্রাহ্মণ হইতে পারে না, যে ব্রাহ্মণ সেও বৈদ্য হইতে পারে না" (বৈদ্য পৃঃ ১৪১ 'সত্যের অপলাপ')

(৭) 'বহু স্থলেই নাস্তিক ও উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তিগণই আস্তিক ও আনুষ্ঠানিক ব্যক্তিগণ অপেক্ষা এই সম্বন্ধে অধিক অগ্রসর" —বৈদ্য-প্রতি ৵৹।

(৮) "আপনারা এইরূপ অশাস্ত্রীয় তর্কের সাহায্যে মিথ্যাকে সত্য প্রমাণ করিতে যাইয়া সামাজিক অশান্তি উৎপাদন করিবেন না"—(বৈঃ প্রতি ০ পৃঃ ৮৭)।

(৯) "বলা বাহুল্য, এই মতাবলম্বী সম্প্রদায়ের অধিকাংশই সংস্কৃত-জ্ঞানশূন্য"—ঐ, পৃঃ ৪৯।

(১০) "মল্লিনাথের ভাষায় বলিতে হয়, ইত্যহো মূলোচ্ছেদী পাণ্ডিত্যপ্রকর্ষঃ—পৃঃ ৩১

(১১) "শাস্ত্রবিচারে এরূপ **অজ্ঞতা** বা **কপটতা** প্রশংসনীয় নহে'।—পৃঃ ৭৩। "গুরু অপেক্ষা শিষ্যের তেজ অধিক" ইত্যাদি।

এই নমুনাগুলি দিবার প্রয়োজন কি?

আমরা অনেককে বলিতে শুনিয়াছি যে, কালীবাবু ও সত্যেন্দ্রবাবুর পুস্তকের ভাষা বড় সংযত ও শান্ত, তাহাতে নাকি কোন কটু-কাটব্য নাই এবং কুত্রাপি অভদ্রতা প্রকাশ পায় নাই, আর বৈদ্যব্রাহ্মণ-সমিতির ভাষা নাকি একেবারেই অশ্রাব্য! একথার মূলে যে কোন সত্য নাই, তাহা নমুনা হইতেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন। বস্তুতঃ এ ক্ষেত্রেও কালীবাবু ও সত্যেন্দ্রবাবু যে দোষে দোষী, তাহাই বৈদ্যব্রাহ্মণ-সমিতির স্কন্ধে চাপাইয়া তাঁহারা খালাস পাইয়াছেন! বৈদ্যব্রাহ্মণদিগের কপাল-গুণে সকলই সহ্য করিতে হইবে! সমিতির পরিচালিত মাসিক পত্রিকা বৈদ্যহিতৈষিণীতে কালীবাবুর বৈদ্যপুস্তকের সমালোচনা বাহির হইয়াছিল। এই সমালোচনা অধ্যাপকপ্রবর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেনশর্ম্মা, এম্-এ মহোদয়ের লেখনীনিঃসৃত। এই সারগর্ভ ও সুশৃঙ্খলাপূর্ণ সমালোচনা ধারাবাহিকভাবে বহু কাল যাবৎ প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু কোন স্থানেই শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও যুক্তি ব্যতীত গালি বা বাজে কথা একটীও নাই! সত্যেন্দ্রবাবুর গ্রন্থভূমিকায় বৈদ্যব্রাহ্মণ-সমিতির কর্তৃপক্ষকে উদ্দেশ করিয়া অনেক অবাচ্যবাদের অবতারণা করা হইয়াছে। বৈদ্য-ব্রাহ্মণসমিতির 'বড়কর্ত্তারা' কচুরি খান ইত্যাদি লেখা হইয়াছে! শাস্ত্রীয় বিচার-বিতর্ক এখন প্রকাশ্যে কচুরি ও অপ্রকাশ্যে কচুতে নামিয়াছে! এইরূপেই কি বৈদ্য-বৈশ্যেরা শাস্ত্রার্থের সুমীমাংসা করিবেন? কালীবাবু **'বৈদ্যপরিশিষ্ট'** নামক আর একখানি ১৩০ পৃষ্ঠার পুস্তক

বাহির করিয়াছেন। তাহারও দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইল! এই সকল জাতিদ্রোহকর কার্য্যে বিচলিত হইয়া যদি কেহ কালীবাবু ও সত্যেন্দ্র-বাবুকে আক্রমণ করিয়া কিছু বলে, সে জন্য সমিতির প্রতি তাঁহাদের আক্রোশ হয় কেন? তাঁহারা ত জানেন যে, তাঁহারা—'চারি দিক হইতে আক্রান্ত হইবেন'। বস্তুতঃ সমিতির প্রতি ইঁহাদের আক্রোশ নিতান্তই পরিতাপের বিষয়।

পাঠক দেখিলেন কালীবাবু ও সত্যেন্দ্রবাবু সমিতিকে অন্যায়ভাবে আক্রমণ করিলেও আমরা কোথাও তাঁহাদিগকে কোন রূঢ় কথা বলি নাই। ঐরূপ বলাই আমাদের পক্ষে অসাধ্য। কালীবাবু ও সত্যেন্দ্র-বাবু যেখানে যে পরিমাণ দোষ করিয়াছেন, আমরা তাহা দেখাইয়াই নিরস্ত হইয়াছি। এক্ষণে তাঁহাদের বিবেকই তাঁহাদিগকে দণ্ডদান করিবে। আমরা কেবল এই চাই যে, অনুতাপে দগ্ধ হইয়া তাঁহারা নির্দ্দোষ হউন এবং সমিতির সভ্য হইয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত করুন!

মৌলিক ভ্রম

কালীবাবু ও সত্যেন্দ্রবাবু কল্লূকের ন্যায় কতকগুলি মারাত্মক ও মজ্জাগত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই বৈদ্যপ্রবোধনীর বিপক্ষে দাঁড়াইয়াছেন। সেই ধারণাগুলি এই—

১। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য অশ্ব-গর্দ্দভাদিবৎ পৃথক জাতীয় জীব!

২। ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়কন্যা বা বৈশ্যকন্যা বিবাহ ধর্ম্মার্থ নহে!

৩। অম্বষ্ঠ পিতৃবর্ণ নহে, মাতামহবর্ণ বা বৈশ্য!!

৪। বঙ্গীয় বৈদ্য সম্প্রদায় অম্বষ্ঠজাতি হইতে অভিন্ন!

৫। চিকিৎসা কেবলমাত্র বৈশ্যবর্ণীয় অম্বষ্ঠেরই বৃত্তি!

৬। ব্রাহ্মণের চিকিৎসাবৃত্তি কোন শাস্ত্রে নাই!

৭। চিকিৎসক ব্রাহ্মণ অতি হেয়! ব্রাহ্মণের পক্ষে চিকিৎসা নিষিদ্ধ!

৮। চিকিৎসাবৃত্তিক বৈদ্যের পক্ষে অব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেওয়াই গৌরবের বিষয়! অম্বষ্ঠ বৈশ্য না হইলে চিকিৎসাগত নিন্দা হইতে আত্মরক্ষা হয় না!

৯। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা চিরকাল নামান্তে 'গুপ্ত' শব্দ ব্যবহার করিতেন ও ১৫ দিন অশৌচ পালন করিতেন, অর্থাৎ বৈশ্যাচারই বৈদ্যদিগের চিরাচরিত সদাচার!

১০। শাস্ত্র মর্ম্ম কেবল তাঁহারাই জানেন!

[বৈদ্যকুলাচার্য্যগণ বৈদ্যকে অম্বষ্ঠ বলিয়া গিয়াছেন! বৈশ্যাচারেই অম্বষ্ঠের ধর্ম্মরক্ষা, সুখশান্তি ও যাজন-ব্রাহ্মণের ভালবাসা লাভ হয়! বৈশ্যাচারে শ্রাদ্ধ করিলে শ্রাদ্ধের সময় পাওয়া যায়, পিতৃ পুরুষকে অধিক সম্মান দেখান হয়, এবং নানা ঝঞ্ঝাট হইতেও আত্মরক্ষা হয়!]

মজ্জাগত ভয়

কালীবাবুর ও সত্যেন্দ্রবাবুর কতকগুলি মজ্জাগত ভয় আছে—

১। 'আমরা ব্রাহ্মণ হইলে ক্ষতি ভিন্ন লাভ নাই।' বৈদ্য /০ ; ৵০ বৈদ্য-প্রতি ৭৮—৮৯।

২। 'ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিলে আমরা (বঙ্গীয় বৈদ্যগণ) একেবারে অপাংক্তেয় হইয়া পড়িব ' (বৈদ্য-প্রতি ০ পৃঃ ৭৮)

৩। "কালস্রোতে যদি বা অনতিবিলম্বেই শিথিল ব্রাহ্মণের মধ্যে বৈদ্যান্ন চলিয়া যাইত, এই নূতন আন্দোলনে ঐ শিথিল সম্প্রদায়ও সতর্ক হইয়া চলিতে আরম্ভ করিবেন।" (ঐ)

৪। "শাস্ত্রানুবর্ত্তী ব্রাহ্মণ শাস্ত্রের দোহাই পাইয়া এবং বৈদ্যের বা বৈশ্যের (কারণ বৈদ্য =বৈশ্য!) অন্নগ্রহণ করিতে সম্মত হইতে

পারেন, কিন্তু চিকিৎসাজীবী ব্রাহ্মণের অন্ন কখনই গ্রহণ করিবেন না!" (বৈদ্যপ্রতি পৃঃ ৭৮)

৫। ব্রাহ্মণাচার গ্রহণ করিলে ব্রাহ্মণের প্রতি অবিনয় দেখান হইবে। "অবিনয়ে তাঁহারা হয়ত বিরুদ্ধতা অবলম্বন করিতে পারেন" এবং তাহাতে আমাদের বেণরাজার ন্যায় দুর্দ্দশা হইতে পারে! "বেণো বিনষ্টোঽবিনয়াৎ..." (বৈদ্যপ্রতি, পৃঃ ৮৮)

৬। "আপনি (বৈদ্যব্রাহ্মণ) যখনই কোন সমিতিতে যাইয়া নিজেকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত করিবেন তখনই এক ব্যক্তি তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী বন্ধুকে কানে কানে (?) ফিস্ ফিস্ করিয়া কি যেন বলিবেন। পর মুহূর্ত্তেই তাঁহারা আপনার দিকে একটু তাকাইবেন, তাহাতে আপনার অন্তর দগ্ধ হইয়া যাইবে। তখন মনে হইবে, এ দেশ ত্যাগ করিতে না পারিলে আর শান্তি নাই।" (বৈদ্যপ্রতি, পৃঃ ৮২)

৭। "এ কালের ব্রাহ্মণগণ অল্পশাস্ত্রজ্ঞ ইত্যাদি কারণে অবজ্ঞার পাত্র হইতে পারে না। শাস্ত্র বলেন—"তেষাং নিন্দা ন কর্ত্তব্যা যুগরূপা হি তে মতাঃ" বৈদ্যপ্রতি, পৃঃ ৮৯।

৮। ব্যাঘ্রের সন্তান যেরূপ ব্যাঘ্রই হইয়া থাকে, ব্রাহ্মণের সন্তান সেইরূপ ব্রাহ্মণই হইবে, শূদ্রের সন্তান শূদ্রই হইবে" (বৈদ্যপ্রতি পৃঃ ৮৪)

ইহা জাতিতত্ত্ব লেখক শ্যামাচরণের উক্তির প্রতিধ্বনি।

৯। "জলে বাস করিয়া কুমীরের সঙ্গে বিবাদ আর হিন্দুসমাজে বাস করিয়া ব্রাহ্মণের সঙ্গে বিবাদ সমান কথা" (বৈদ্য প্রতি, পৃঃ ৯০)

১০। "ব্রাহ্মণগণের সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, তদ্বিষয়ে আমাদের যত্নবান্ থাকিতে হইবে" (বৈদ্যপ্রতি, পৃঃ ৮৭)

১১। "তাঁহারা (কায়স্থেরা) ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী করিতেছেন বলিয়া আমরা তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া যদি ব্রাহ্মণত্বের দাবী করি, তবে তাহা অপেক্ষা লজ্জার বিষয় আর নাই" (ঐ, পৃঃ ৮৭)

১২। "একাদশাহে অশৌচ অবস্থায় শ্রাদ্ধ করিলে তাহা পণ্ড হইবে।" অশৌচ অবস্থায় শ্রাদ্ধ করিলে তাহা পণ্ড হয় বটে, কিন্তু দশাহে অশৌচান্ত করিলেও একাদশাহে অশৌচাবস্থার বিভীষিকা বড় সহজ নহে!

১৩। "যদি বলেন যে, কোনও কোনও জাতি ত উন্নত হইয়া গেল। আমরা চুপ করিয়া বসিয়া থাকিব কেন? কই দেখান ত কোন্ জাতিটা উন্নতি লাভ করিয়াছে।" (পৃঃ ৮৩) অর্থাৎ কেহই সংস্কার দ্বারা উন্নতি লাভ করিতে পারিবে না, অতএব সংস্কারের প্রয়োজন নাই!

কালীবাবুর ও সত্যেন্দ্রবাবুর স্ববিরোধ ও শাস্ত্রবিরোধ

(১) অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণের 'ঔরস' পুত্র × তথাপি পিতৃবর্ণ নহে। (বৈদ্য, পৃঃ ৫৯ ; বৈদ্যপ্রতি পৃঃ ৪৫)।

(২) অম্বষ্ঠ মন্ত্রসংস্কৃতা পত্নীতে জাত × তথাপি অব্রাহ্মণ! (বৈদ্যপ্রতি, পৃঃ ১২ ও ১৭)।

(৩) অম্বষ্ঠের জননী মন্ত্রসংস্কৃতা ব্রাহ্মণপত্নী (বৈদ্যপ্রতি, ১২-১৩)। × তথাপি বৈশ্যা! (বৈদ্যপ্রতি, ১২-১৩)

(৪) অম্বষ্ঠের জননী ব্রাহ্মণের মন্ত্র-সংস্কৃতা পত্নী (বৈদ্য, পৃষ্ঠা ৭৮)। × কিন্তু ধর্ম্মপত্নী নহে! (বৈদ্য, পৃঃ ৭৮)

(৫) অম্বষ্ঠ নিজস্ব গোত্রধারী (নিজস্ব গোত্র অব্রাহ্মণের হয় না।) × তথাপি অব্রাহ্মণ! (বৈদ্য, পৃঃ ৫৯)

(৬) অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণপিতার গোত্র ও দায়হারী (বৈদ্য, ৫৯, ৮১—৮২)। × তথাপি বৈশ্য!

(৭) মন্ত্রসংস্কৃতা দ্বিজকন্যা পতির সহিত ধর্ম্মাচরণে অধিকারিণী। × তথাপি কামপত্নী (বৈদ্য, পৃঃ ৭৮)!

(৮) অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ পিতার **গোত্র** × তথাপি বৈশ্য!
ও দায়হর ঔরস পুত্র
(মনু ৯।১৫৯)।

(৯) "১৪০০ খৃঃ কুল গ্রন্থকার দুর্জ্জয়দাশ, ১৬৫৩ খৃঃ কুল গ্রন্থকার কণ্ঠহার……বৈদ্যজাতিকে অম্বষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিয়া আসিতেছেন"—(বৈদ্যপ্রতি, পৃঃ ৩) "১৬৫৩ খৃঃ……কণ্ঠহার বৈদ্যগণের অম্বষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়াছেন।" (বৈদ্যপ্রতি, পৃঃ ৩৮)	এই সমস্ত কথাগুলিই মিথ্যা!

"কণ্ঠহার সম্বন্ধীয় ঐ কথা ফলতঃ যথার্থই বটে" (ক্রোড়পত্র)। × মিথ্যা কথা (মোহমুদ্গর পৃঃ ১৫১ - ১৫৩)

(১০) কালীবাবু পূর্ব্বে বলিয়াছেন, অম্বষ্ঠজননী ধর্ম্মপত্নী নহে। × তথাপি পতির সহিত ধর্ম্মাচরণে অধিকারিণী! (বৈদ্য, ৭৮)

(১১) 'ব্রাহ্মণঃ স্যাৎ অসংশয়ম্' (মহা)—মূলে **'ব্রাহ্মণ'** আছে, অর্থাৎ, অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ। × কালীবাবু ও সত্যেন্দ্রবাবু ব্যাখ্যায় ব্রাহ্মণ = অব্রাহ্মণ = বৈশ্য! (বৈদ্য পৃঃ ৮০, বৈদ্যপ্রতি পৃঃ ১১৭)

(১২) মূলে 'ন সবর্ণাৎ প্রহীয়তে' অর্থাৎ অম্বষ্ঠ সবর্ণ হইতে হীন হয় না। × ব্যাখ্যায় 'না' = হাঁ'; সুতরাং অর্থ হইল, 'সবর্ণ হইতে হীন হয়'! (বৈদ্য পৃঃ ৭৭ ও বৈদ্য প্রতি ১৮

(১৩) মূলে 'সমম্' অর্থাৎ অম্বষ্ঠ পিতৃসম। × কিন্তু ব্যাখ্যায় 'সমম্' = 'ভিন্নম্'! (বৈদ্য পৃঃ ২১; বৈদ্যপ্রতি, ৭৯)

(১৪) মূলে 'আনুলোম্য' × ব্যাখ্যায় হইল 'সাবর্ণ্য'! (বৈদ্য, পৃঃ ৭১; বৈদ্যপ্রতি, ৪)

(১৫) মূলে 'বিপ্রবৎ' অর্থাৎ অম্বষ্ঠ বিপ্রবৎ কার্য্য করিবে। × ব্যাখ্যায় হইল 'বৈশ্যবৎ' (বৈদ্য, পৃঃ ৭৪; বৈদ্যপ্রতি, ২০)

(১৬) সত্যেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন, 'দুর্জ্জয় দাশ' পৃঃ ৩, ৩৮, ৬৯ এবং 'রামকান্ত দাশ' পৃঃ ৩৮।

× কিন্তু বৈদ্যব্রাহ্মণগণ ঐরূপ লিখিলে সত্যেন্দ্র-গুরু বলেন 'দাস' হওয়াই উচিত, দাশ কি জন্য? "স স্থানে 'শ বসাইয়াছেন।" (বৈদ্য পরিশিষ্ট পৃঃ ।৴০ *

১৭। "শীলবান্ গুণবান্ বিপ্রস্ত্রিজাতিঃ শাস্ত্রপারগঃ।
প্রাণিভি গুরুবৎ পূজ্যঃ প্রাণাচার্য্যঃ সহি স্মৃতঃ॥"

(বৈদ্যপ্রতি, পৃঃ ২৫)

কালীবাবুকে চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে 'দৈবকীনন্দন দাশ' এস্থলে দাশ নামৈকদেশ নহে, উহা উপাধি। শূদ্রের উপাধি হইলে উহা 'দাস' হইতে পারিত, কিন্তু অশূদ্রের (দ্বিজ-শ্রেষ্ঠের) উপাধি হওয়াতে উহা 'দানীয় বিপ্র' বাচক 'দাশ' হইবে। এই 'দৈবকীনন্দন' মৌদ্গল্য গোত্রীয় বৈদ্য, চন্দ্রপ্রভা পৃষ্ঠা, ২৫৮।

চন্দ্রপ্রভায় আছে,—মৌদগল্য গোত্রে যো বীজী চায়ুদাস উদাহৃতঃ। স হি দাসকুলে শ্রেষ্ঠো বৈদ্যগোষ্ঠীপ্রতিষ্ঠিতঃ॥ এই মৌদ্গল্য গোত্রে সকলের নামান্তেই 'দাস', যথা— 'তস্যৈব নরদাসস্য পুত্রঃ সঙ্কেতদাসকঃ। 'সঙ্কেতদাসতনয়ো নাম্নোদয়নদাসকঃ' "অথোদয়নদাসস্য তনয়ৌ দ্বৌ বভূবতুঃ। গোপালদাসঃ প্রথমো বিশ্বম্ভর ইতোঽনুজঃ॥ গোপালদাসাৎ জজ্ঞাতে তনয়ৌ বিনয়ান্বিতৌ। উল্লাসদাস প্রথমো রবিদাস স্তুতোঽনুজঃ॥" এই মৌদ্গল্যগোত্রীয় 'দাস' উপাধি যে যথার্থই 'দাশ' এবং ভ্রমক্রমে চন্দ্রপ্রভায় 'দাস' লেখা হইয়াছে, তাহা অন্য দেশের সাক্ষ্য হইতেও জানা যায়। উড়িষ্যার মৌদগল্য গোত্রীয় দাশশর্ম্মারা 'দাশ'ই লেখে 'দাস' লেখে না। ব্যাকরণ ও অভিধান অনুসারে 'দাস' শূদ্রোপাধি। তবে দৈবকীনন্দন যে মৌদগল্যগোত্রীয় বৈদ্য তাহা ত 'দাশ' উপাধি হইতেই জানা যাইতেছে। অতঃপর চন্দ্রপ্রভায় মৌদগল্য গোত্রে যখন তাঁহার উল্লেখ দেখিতেছি, তখন ত আর কোন সন্দেহই থাকে না। সুতরাং পরিশিষ্টে কালীবাবু যে আমাকে আক্রমণ করিয়া আমার কথা 'মিথ্যা' লিখিয়াছেন, তাহা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সত্যপ্রিয়তার ফলেই!

বৈদ্যসম্বন্ধে চরকের অন্যান্য উক্তির সহিত ইহাও আছে। সত্যেন্দ্র-বাবু বলেন, ইহারা চিকিৎসক ব্রাহ্মণ বটে, কিন্তু চিকিৎসাবৃত্তিক নহেন! (বৈদ্যপ্রতি, পৃঃ ৫২)

আমরা বলিতে পারি কি?—

অধ্যাপক ব্রাহ্মণ 'অধ্যাপক' বটে× কিন্তু 'অধ্যাপনাবৃত্তিক' নহে!

ঋষিরা কি বলেন নাই যে, চিকিৎসাবিক্রয় অতীব নিন্দনীয় হইলেও লোকহিতার্থ চিকিৎসাবৃত্তি পুণ্যতমা এবং অধ্যাপনাবিক্রয় নিন্দনীয় হইলেও অধ্যাপনা সাক্ষাৎ ব্রহ্মসত্র তুল্য! বৃত্তি এক বস্তু এবং তাহার বিক্রয় আর এক বস্তু। ইহা না বুঝিয়া প্রতিবাদে অগ্রসর হওয়া কেন? যে অধ্যাপক সেই অধ্যাপনাবৃত্তিক, সে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ; কিন্তু অধ্যাপনা-বিক্রয়ী ভৃতকব্রাহ্মণ অপাংক্তেয়। বৃত্তি=স্বভাবজ কর্ম্ম। ব্রাহ্মণের স্বভাবজ কর্ম্মে লোভের কোন অবকাশ নাই। উহা সলোভ হইলেই নিন্দিত ব্যবসায়ে পরিণত হয়। চরকে সদ্‌বৈদ্যপক্ষেও **দক্ষিণারূপে অর্থ-গ্রহণে** নিন্দা নাই, বরং যে ব্যক্তি চিকিৎসককে অর্থ দিব প্রতিজ্ঞা করিয়া না দেয়, তাহার রোগ ভাল হয় না ইত্যাদি বলা হইয়াছে! মহারাজ পরীক্ষিতের নিকটে বৈদ্য কাশ্যপ **ধনপ্রাপ্তির অভিলাষেই** যাইতেছিলেন। প্রচুর দক্ষিণা পাইবেন, ইহাই তাঁহার আশা ছিল, ইহাকে 'বিক্রয়' বলা যায় না। রাজবাড়ীর শ্রাদ্ধে দরিদ্রগৃহ অপেক্ষা অধিক 'বিদায়' ইহা কোন্ ব্রাহ্মণের অজ্ঞাত? ইহতে দোষও নাই। কারণ বৃত্তিশাঠ্য যেমন ধনীর পক্ষে প্রশংসনীয় নহে, তেমনই ধর্ম্মবুদ্ধিতে প্রতিগ্রহ ব্রাহ্মণের পক্ষে নির্লোভ জীবিকা নির্ব্বাহেরই উপায়। ধন ব্যতীত সংসার চলে না, ইহা কি সত্যেন্দ্রবাবু জানেন না? কিন্তু ধনার্জ্জন মাত্রেই কি সত্যানৃত-লক্ষণ 'ব্যবসা'? কালীবাবুর সমর্থন করিতে গিয়াই সত্যেন্দ্রবাবু বিপন্ন হইয়াছেন। কালীবাবু বলেন—

"ব্রাহ্মণের চিকিৎসাবৃত্তি কোনও শাস্ত্রে উক্ত হয় নাই" (বৈদ্য, পৃঃ/০)	×	মিথ্যা কথা। "ব্রাহ্মণগণই ঐ শাস্ত্রের অধ্যয়ন-অধ্যাপনা করিতেন," ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছেন। "ব্রাহ্মণগণ-কর্তৃক চিকিৎসাব্যবসায় পরিত্যক্ত হইল" (বৈদ্য, ২৮-২৯) প্রথমে বলিয়াছেন, 'অধ্যয়ন-অধ্যাপনা' — পরে বলিলেন 'ব্যবসায়' ! ত্যাগের কথা মিথ্যা !
১৮। বৈশ্বানরগোত্রীয় রাঘব-সেনের কথা প্রবোধনী বলিয়াছে।	×	ধন্বন্তরি-গোত্রীয় রাঘব সেনের কথা তুলিয়া সমালোচনার ঘনঘটা কি জন্য ? (বৈদ্য পৃঃ ১০৫ ও বৈদ্যপ্রতি পৃঃ ২৬—২৭)
১৯। 'অনন্তর স্থলে সঙ্কীর্ণতা-দোষের অল্পতা' (বৈদ্যপ্রতি,পৃঃ ৩০। অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় গো-অশ্ব-গর্দ্দভবৎ পৃথক্ জাতীয় জ্ঞান করিয়া গো+অশ্ব অল্প সঙ্কীর্ণ এবং গো+গর্দ্দভ অধিক সঙ্কীর্ণ, ইহা কেমন কথা ? তোমার সঙ্কীর্ণতা = cross breed, গবাশ্বে তাহার অল্পতা এবং গো-গর্দ্দভে তাহার আধিক্য কি হিসাবে ?	×	"বোধায়ন ও কৌটিল্য অনন্তর সন্তানকে পিতার সবর্ণই বলিয়াছেন"—ঐ পৃঃ ৩০ কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তোমার মতে গো+অশ্ব = গো, কিরূপে হয় ?
২০। 'অনন্তর সন্তানের ভাগ্যের হ্রাস-বৃদ্ধি' (ঐ, পৃঃ ৩০)	×	"মূর্দ্ধাভিষিক্তের ব্রাহ্মণত্ব খ্যাপন প্রশংসা মাত্র…তাহার সংস্কার…ক্ষত্রিয়ের ন্যায় হইবে।" (ঐ,পৃঃ ১৪)

২১। মূর্দ্ধাভিষিক্তের পক্ষে × বর্ণনির্ণয় হইলে তবে ক্রিয়া শাস্ত্রীয় মতদ্বৈধ থাকিলেও" (ঐ, পৃঃ ১৪)

কলাপ! তাহাতে মতদ্বৈধ! আর মতদ্বৈধই বা কোথায়? সত্যেন্দ্র বাবুর ও কালীবাবুর ত এক মত! এবং তাহা শাস্ত্রকথিত ব্রাহ্মণত্ব অপেক্ষা বলবৎ! কোন শাস্ত্রমতে মূর্দ্ধাভিষিক্ত ব্রাহ্মণ, কোন শাস্ত্র-মতে ক্ষত্রিয়, এরূপ হইলে সত্যেন্দ্র বাবুর ও কালীবাবুর আদালতে তাহার ব্রাহ্মণত্বের দাবীই বা মঞ্জুর হয় না কেন? অম্বষ্ঠেরও কি ব্রাহ্মণত্বের সপক্ষে প্রমাণের অভাব আছে? তবে উহারও ব্রাহ্মণত্বের দাবী না-মঞ্জুর হয় কেন? এ ক্ষেত্রেও 'মতদ্বৈধ' আছে, এটুকু স্বীকার করিতেও এত কষ্ট কেন? 'ত্রিষু বর্ণেষু পত্নীষু ব্রাহ্মণাৎ ব্রাহ্মণো ভবেৎ' ইত্যাদি স্থলে অম্বষ্ঠ পক্ষে ব্রাহ্মণ=বৈশ্য কেন হয়? 'তাস্ব-পত্যং সমং ভবেৎ' এস্থলেও অম্বষ্ঠ অব্রাহ্মণ হয় কিরূপে? 'ন সবর্ণাৎ প্রহীয়তে' বলিলেও অম্বষ্ঠ অব্রাহ্মণ হয় কিরূপে? সত্যেন্দ্রবাবু ও কালীবাবুর মতে অম্বষ্ঠের পক্ষে শাস্ত্রীয় মতদ্বৈধই নাই! অর্থাৎ সকল শাস্ত্র এক বাক্যে বলিতেছে যে অম্বষ্ঠ বৈশ্যবর্ণ! 'পুষ্করিণী অপ-হরণ' ইহাকেই বলে!

২১। "যেনাস্য পিতরো যাতাঃ যেন যাতাঃ পিতামহাঃ।
তেন যায়াৎ **সতাং মার্গম্**
তেন গচ্ছন্ ন রিষ্যতে ॥"
—মনু,

× ইহা উদ্ধার করিয়া কালীবাবু ও সত্যেন্দ্রবাবু শাস্ত্রের দোহাই দিতে কসুর করেন নাই! কিন্তু ইহার অনুবাদে দুই জনেই চমৎকার শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন। সত্যেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন—"সদসৎ সংশয়স্থলে পিতৃপিতামহাদি পূর্ব্বপুরুষ কর্তৃক আচরিত পন্থাই অনুসরণীয়"—বৈশ্যপ্রতি, পৃঃ ৯৮।

দ্রষ্টব্য—অনুবাদে **শাস্ত্র বা ধর্ম্মের কোন কথাই নাই**। শাস্ত্র বলিতেছে, ব্রাহ্মণ দশ দিন অশৌচ পালন করিবে, কিন্তু পিতা-পিতামহাদি ১৫ দিন করিয়া আসিতে থাকিলে, ঐ বৈশ্যাচরই তদ্বংশীয় ব্রাহ্মণের অনুসরণীয়!

কালীবাবু বলেন, "শাস্ত্রের বহুবিধ অর্থ সম্ভব হইলে পিতৃপিতামহগণের অনুষ্ঠিত আচার অনুষ্ঠান করিবে। তাহা করিলে অধর্ম্ম করা হইবে না, অর্থাৎ পাপভাগী হইতে হইবে না। ইহার মধ্যে কোন যদি নাই। পিতা পিতামহ যে পথে চলিয়াছেন, তাহাই সৎ পথ।"

ব্যাখ্যা—মনে করুন, কোন শাস্ত্রবাক্যের বহুবিধ অর্থ হইল। কিন্তু পিতাপিতামহাদি যে পথে চলিয়াছেন, তাহা যদি ঐ বহুবিধ অর্থের মধ্যে কোন অর্থের দ্বারাই সমর্থিত না হয়, পরন্তু (ব্রাহ্মণের মদ্যপান ও পঞ্চাদশাহ অশৌচ পালনের মত) এক অসম্ভব আচার হয়, তাহা হইলেও পিতাপিতামহাদির অনুসৃত পথ বলিয়া তাহাই সৎপথ বা ধর্ম্ম পথ হইবে, এবং তাহা করিলেও অধর্ম্ম করা হইবে না !!

২৩। বৈদ্যগণের বৈদিক আচার্য্যত্ব আবহমানকাল হইতে প্রসিদ্ধ। এই আচার্য্যত্ব অব্রাহ্মণের পক্ষে অসম্ভব। অব্রাহ্মণে 'আচার্য্য' নাম ব্যবহার করিতেও পারেন না। বিশ্বপ্রকাশ কোষ রচয়িতা বৈদ্য মহেশ্বরাচার্য্য সুবিদিত। কবিরাজ বিশ্বনাথের পিতারও আচার্য্য উপাধি ছিল। আধুনিক কালেও গীতার ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া ভট্টপল্লীর পণ্ডিতগণ স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন সেনশর্ম্মা স্মৃতিশাস্ত্রীকে 'গীতাচার্য্য' উপাধি দিয়াছেন। × তথাপি বৈশ্য !

২৪। শ্রুতি বৈদ্যকে ব্রাহ্মণ বলে। × তথাপি বৈশ্য !

২৫ আয়ুর্ব্বেদ বৈদ্যকে ব্রাহ্মণ বলে। × তথাপি বৈশ্য !

২৬। অভিধানের বৈদ্যলক্ষণ বৈদ্যকে ব্রাহ্মণ বলে। × তথাপি বৈশ্য!

২৭। ভোজরাজ, ভীষ্ম, পরীক্ষিৎ প্রভৃতির চিকিৎসার জন্য সমাগত বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণ বলিয়া বর্ণিত। বৈদ্য কোথাও অব্রাহ্মণরূপে বর্ণিত নাই। × তথাপি বৈশ্য!

২৮। বৈদ্যকুলাচার্য্যগণ বা বৈদ্যকুল-পঞ্জিকাগুলি বৈদ্যকে জন্মতঃ বৈশ্যবর্ণ বলে নাই, ব্রাহ্মণই বলিয়াছে। × তথাপি বৈশ্য!

২৯। শব্দকল্পদ্রুম বৈদ্যকে বৈশ্য বলে নাই। × তথাপি বৈশ্য!

৩০। মহামহোপাধ্যায় ভরতমল্লিক বৈদ্যকে ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন। × তথাপি বৈশ্য!

৩১। দশাহ জননাশৌচ ব্রাহ্মণ-ত্বেরই প্রমাণ। × তথাপি বৈশ্য!

৩২। বৈদ্যগণের বৈদ্যব্রাহ্মণ বা বদ্দি-বামুন প্রসিদ্ধি রহিয়াছে। × তথাপি বৈশ্য!

৩৩। গোস্বামী, ঠাকুর প্রভৃতি উপাধি বৈদ্যদিগের মধ্যে শ্রীচৈতন্য-দেবের পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত। × তথাপি বৈশ্য!

৩৪। ব্রাহ্মণদিগের সহিত প্রাচীন বৈদ্যদিগের বিবাহ। × তথাপি বৈশ্য!

৩৫। বহরমপুর সহরে ব্রাহ্মণ বাটীতেও শ্রাদ্ধাদি সভায় আবহমান কাল ব্রাহ্মণের ন্যায় গৌরব প্রাপ্ত হইতেন, ইহা মাত্র চৌদ্দ বৎসর বন্ধ করা হইয়াছে।	× তথাপি বৈশ্য!
৩৬। বৈদ্যগণ জিয়াগঞ্জ, শ্রীখণ্ড প্রভৃতি স্থানে অদ্যাপি সভায় যজ্ঞোপবীত প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।	× তথাপি বৈশ্য!
৩৭। বৈদ্য গ্রন্থকারদিগের অসাধারণ সংস্কৃত শাস্ত্র চর্চ্চা।	× তথাপি বৈশ্য!
৩৮। বৈদ্যগণের অধ্যাপনা, টোল-রক্ষা এবং ব্রাহ্মণ শিষ্যগণকে অধ্যাপনা।	× তথাপি বৈশ্য!
৩৯। ব্রাহ্মণকে আয়ুর্ব্বেদ অধ্যাপনা অব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ। অথচ বৈদ্য সমগ্র ভারতের আয়ুর্ব্বেদ গুরু।	× তথাপি বৈশ্য!
৪০। বৈদ্যই বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিজাত সম্প্রদায় (হাম্‌বৈদ্যের গল্পও ইহাতে সাক্ষ্য দেয়)।	× তথাপি বৈশ্য!
৪১। স্মৃতিশাস্ত্র রচনা (বল্লালের দানসাগর ও বোপদেবের শ্রাদ্ধকাণ্ডদীপিকা ইত্যাদি) এবং তাহাদের প্রামাণ্য স্বীকার।	× তথাপি বৈশ্য!
৪২। বৈদ্যের জন্য 'ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব' রচনা।	× তথাপি বৈশ

৪৩। প্রাচীন সাহিত্যে বৈদ্যের উর্দ্ধপুণ্ড্র ব্রাহ্মণত্বের প্রমাণ। × তথাপি বৈশ্য!

৪৪। অধ্যাপনা ব্রাহ্মণত্বের প্রমাণ; কারণ ইহাও অব্রাহ্মণের হাতে কুত্রাপি নাই। যে দেশে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য মাত্রেই শূদ্র এবং অধ্যয়নেও অনধিকারী, সে দেশে অধ্যাপনা ব্রাহ্মণত্বেরই প্রমাণ। × তথাপি বৈশ্য!

৪৫। কোন কোন প্রাচীন বৈদ্যের ব্রাহ্মণ পরিচয় (যথা, বোপদেব, জয়দেব, মহেশ্বরাচার্য্য, শ্রীকৃষ্ণধর শর্ম্মা, পীতাম্বর গুপ্ত শর্ম্মা, রঘুনাথ, সেন রাঘবশর্ম্মা, মুরারি গুপ্ত, কৃষ্ণদাস, বিশ্বনাথ কবিরাজের পিতা, রামপ্রসাদ, ইত্যাদি) ব্রাহ্মণত্বের প্রমাণ। × তথাপি বৈশ্য।

৪৬। প্রাচীন বৈদ্যগণ নামান্তে শর্ম্মন্ ব্যবহার করিতেন। × তথাপি বৈশ্য!

৪৭। বৈদ্য সম্প্রদায়ের সেন রাজগণ ব্রাহ্মণ ছিলেন। × তথাপি বৈশ্য!

৪৮। প্রাচীন বৈদ্যগণ প্রতিগ্রহ করিতেন, আধুনিক কালেও মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত × তথাপি বৈশ্য!

গণনাথ সরস্বতী বৈদ্যাবতংস
মহাশয় মহামহোপাধ্যায়
কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ ও
৺মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত
তর্কালঙ্কার প্রভৃতির সহিত
একযোগে প্রতিগ্রহ করিয়াছেন। দ্বারবঙ্গের রাজগৃহে
ভারতবর্ষীয় নিখিল ব্রাহ্মণসমাজের সহিত একযোগে
প্রতিগ্রহ করিয়াছেন।* মহাপণ্ডিত শ্রীযুক্ত গণেশ ফৌজদার মহাশয় এইরূপ প্রতিগ্রহ
করিতেন। গীতাচার্য্য মহাশয়ের মাতামহের কথা এবং
মহামহোপাধ্যায় ভরতমল্লিক
ও নন্দরাম বিশারদের কথা
গ্রন্থমধ্যে বলিয়াছি।

বৈদ্যেরা এখনও অনেক স্থলে ব্রাহ্মণের বাড়ীতে যজ্ঞোপবীত পান-সুপারী পাইয়া থাকেন। কিছুকাল পূর্ব্বে এই আচার প্রায় সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল। বৈদ্যেরা বহুস্থলে অব্রাহ্মণের বাড়ীতে ব্রাহ্মণবৎ এখনও ভোজন-দক্ষিণা প্রাপ্ত হন।

৪৯। প্রাচীন বৈদ্যগণের মিশ্র, চক্রবর্ত্তী × তথাপি বৈশ্য!
প্রভৃতি উপাধি ছিল।

* তদুপলক্ষে নিমন্ত্রণ পত্র—চট্টলরবি পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ সেনশর্ম্ম কবিরত্ন মহাশয়ের প্রণীত 'বঙ্গীয় বৈদ্যজাতি' নামক পুস্তকে দ্রষ্টব্য (পৃঃ ৯৫)।

৫০। বর্ত্তমান বৈদ্যগণের মধ্যে প্রাচীন কাল হইতে অদ্যাপি পাঁড়ে উপাধি প্রচলিত রহিয়াছে। × তথাপি বৈশ্য!

৫১। চিকিৎসা উপলক্ষে নানাবিধ যাজন-কর্ম্ম চিরকাল করিতে হইত। × তথাপি বৈশ্য!

৫২। আয়ুর্ব্বেদের আচার্য্যরূপে, বৈদিক আচার্য্যরূপে এবং মন্ত্রদাতা গুরু-রূপে নানাবিধ যাজন করিতে হয়! × তথাপি বৈশ্য!

৫৩। গণেশ কর্ত্তৃক বৈশ্যত্বে পাতিত্য ঘোষণা। × তথাপি বৈশ্য!

৫৪। মহামহোপাধ্যায়, বাচস্পতি, শিরোমণি প্রভৃতি উপাধি ধারণ। × তথাপি বৈশ্য!

৫৫। বাঙ্গালার বাহিরে 'বৈদ্য' বলিলে ব্রাহ্মণকেই বুঝায় বাঙ্গালার বৈদ্য পশ্চিমের বৈদ্য হইতে অভিন্ন। × তথাপি বৈশ্য!

৫৬। 'ভবতি ভিক্ষাং দেহি', বিল্ব-দণ্ড,কার্পাস যজ্ঞসূত্র প্রভৃতি ব্রাহ্মণ-বৎ ব্যবহার। × তথাপি বৈশ্য!

৫৭। বঙ্গের বাহিরে সেনশর্ম্মা, দত্তশর্ম্মা, দাশশর্ম্মা, গুপ্তশর্ম্মা ব্রাহ্মণ রহিয়াছে এবং তাহাদের মধ্যে বৈদ্যদিগের গোত্র রহিয়াছে। × তথাপি বৈশ্য!

৫৮। বৈদ্যের বৈশ্যোচিত কৃষি, গোপালন, বাণিজ্য, কিছুই নাই। × তথাপি বৈশ্য!

৫৯। চিকিৎসা করিয়াও অর্থ লওয়া নাই; পোষাক-পরিচ্ছদ, শাস্ত্রচর্চ্চা শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণবৎ।	× তথাপি বৈশ্য!
৬০। দুর্জ্জয়ের "বৈদ্যাশ্চ দ্বিবিধাঃ প্রোক্তাঃ সারস্বতাশ্চ সৈন্ধবাঃ" বৈদ্যের সারস্বত ব্রাহ্মণত্ব সপ্রমাণ করে।	× তথাপি বৈশ্য!
৬১। বৈদ্যগণ চিরকালাগত সমাজ-পতি, ব্রাহ্মণ সমাজের শাসক, কৌলীন্যদাতা ও কৌলীন্যহর্ত্তা।	× তথাপি বৈশ্য!
৬২। বৈদ্যের মধ্যে জন-শিক্ষা সর্ব্বা-পেক্ষা অধিক প্রচলিত।	× তথাপি বৈশ্য!
৬৩। বৈদ্য চরিত্রে সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত, অহীনকর্ম্মা, স্বজনপ্রতিপালক, সরল ও তেজস্বী।	× তথাপি বৈশ্য!
৬৪। সকল দেশেই যাজন-সম্প্রদায় ও বৈদ্যসম্প্রদায় এক ব্রাহ্মণবর্ণেরই অন্তর্গত। কিন্তু এ দেশের বৈদ্য-সম্প্রদায় যাজন সম্প্রদায়ের বহুপূর্ব্বে বাঙ্গালায় আসিয়া বসবাস করিয়া-ছিলেন। তখন তাঁহারা নিজেদের যাজন নিজেরাই করিতেন। পর-বর্ত্তীকালে আগত যাজনিক সম্প্রদায় তাঁহাদের নিকটে 'বৈদেশিক'। এই দুইটী সমাজ বঙ্গে এই জন্যই	× তথাপি বিরোধীদের কথাতেই বৈদেশিরা বৈশ্য!

পৃথক। এই বৈদেশিক যাজ্ঞিকগণ উত্তরকালে বৈদ্যসম্প্রদায়কে অম্বষ্ঠ মনে করিয়াছিল। কিন্তু ভারতের কুত্রাপি বৈদ্যগণ অম্বষ্ঠ বলিয়া প্রসিদ্ধ না থাকায় তাহাদের অনুমান মিথ্যা বলা যাইতে পারে। পরবর্ত্তীকালে আগত বিরোধী বৈদেশিক দল কখনও কোনও দেশে কাহারও প্রতি সুবিচার করে নাই, করা সম্ভবও নহে।

মিথ্যার ফোয়ারা !

কালীবাবু ও সত্যেন্দ্রবাবু নিদারুণ মোহগ্রস্ত হইয়া যে সকল ভ্রান্ত ধারণা হৃদয়ে পোষণ করিয়া আপনাদের জাতীয় স্বরূপ অস্বীকার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা দেখাইয়াছি। এই সকল ভ্রান্ত ধারণা তাঁহাদের সুচিরার্জ্জিত বিদ্যা ও বিবেচনা-বুদ্ধিকে ব্যর্থ করিয়াছে। তাঁহাদের পুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠা হইতে শেষ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত সকল কথাই মিথ্যা। একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা নিম্নে এ কথার যথার্থতা প্রমাণ করিতেছি।

কালীবাবুর বিশ্বাস এই যে, **অম্বষ্ঠ বৈশ্যবর্ণ। এই ভুল বিশ্বাস হইতে কতগুলি ভুলের** উৎপত্তি হইয়াছে, দেখুন—

(১) অম্বষ্ঠজননী পতির ধর্ম্মপত্নী নহেন !

(২) অম্বষ্ঠজননী ধর্ম্মপত্নীর কার্য্যে অধিকারিণী হইলেও ধর্ম্মপত্নী নহে !

(৩) বিবাহে গোত্র পরিবর্ত্তন হয়, কিন্তু বর্ণ পরিবর্ত্তন হয় না !

(৪) অম্বষ্ঠজননী ব্রাহ্মণ-ব্রহ্মচারীর নমস্যা হইলেও বৈশ্যা, অর্থাৎ বৈশ্য ব্রাহ্মণের প্রণম্য !

(৫) অম্বষ্ঠজননী কামপত্নী !*

(৬) কামপত্নীর পুত্র ঔরস পুত্র !

(৭) অম্বষ্ঠ ঔরস পুত্র হইয়াও বৈশ্যবর্ণ !

(৮) (সত্যেন্দ্রবাবুর মতে) অম্বষ্ঠ সঙ্কর ও বৈশ্যবর্ণ !

(৯) সুতরাং 'ত্রিষু বর্ণেষু পত্নীষু ব্রাহ্মণাৎ **ব্রাহ্মণো** ভবেৎ' ইত্যাদি মহাভারতের বাক্যে অম্বষ্ঠকে স্পষ্ট বাক্যে 'ব্রাহ্মণ' বলিলেও ঐ 'ব্রাহ্মণ' শব্দের অর্থ উভয়ের মতেই **'বৈশ্য'** ! (কাল.বাবু, পৃঃ ৭৯, ৮৩; সত্যেন্দ্রবাবু, পৃঃ ১৬—১৭)।

---

* বারিধিপ্রমুখ যাজনব্রাহ্মণদিগের মতে বৈশ্যকন্যা ব্রাহ্মণের ধর্ম্মপত্নী হইতে পারে না। আভিজাত্যগর্ব্বী ধর্ম্মভূষণ মহাশয় এই ধর্ম্মগ্লানিকর অর্থ স্বীকার করিয়া স্বজাতির মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। কালীবাবু বলিয়াছেন, "সবর্ণা স্ত্রী ভিন্ন অপর অসবর্ণা স্ত্রী কামপত্নী বলিয়া ব্যাস ২।১০ শ্লোকে স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিয়াছেন" (পৃঃ ৭৮)। ইহা নিতান্ত মিথ্যা কথা। ব্যাস ঐরূপ কোন কথাই বলেন নাই। ব্যাস বলিয়াছেন, "উঢ়ায়াং হি সবর্ণায়ান্ অন্যাম্ বা কামমুদ্বহেৎ", কিন্তু 'কামম্' শব্দ আছে বলিয়া যে সংস্কৃতানভিজ্ঞ অসবর্ণা ভার্য্যাকে 'কামপত্নী' মনে করে, তাহার কথার প্রতিবাদ করিতেও প্রবৃত্তি হয় না। "কামম্ আমরণাৎ তিষ্ঠেৎ কন্যা ঋতুমতী সতী" অর্থ কি 'কন্যা কামবশতঃ আমরণ ঋতুমতী থাকিবে'? পুনশ্চ বলিয়াছেন, "ভগবান্ মনুও অসবর্ণা স্ত্রীকে কামস্ত্রী বলিয়াছেন।" ইহাও মিথ্যা কথা। মনু ইহা বলেন নাই। বারিধির ন্যায় ভ্রান্ত টীকা-কারেরা কেহ কেহ বলিয়াছে। আজ তাহাদেরই অনুসরণ করিয়া ধর্ম্মভূষণ মহাশয় ধর্ম্ম রক্ষা করিতে চাহেন! মনু বলিয়াছেন, "কামতস্তু প্রবৃত্তানাং ইমাঃ স্যুঃ ক্রমশো বরাঃ" এই 'ইমাঃ'র মধ্যে ব্রাহ্মণের চারিটী ভার্য্যাই আছে। আমরা গ্রন্থ মধ্যে (পৃঃ ২৮০—১৯০) শাস্ত্রান্তর হইতেও দেখাইয়াছি যে, শূদ্রাই কামস্ত্রী, অপর ভার্য্যা ধর্ম্মপত্নী। ব্রাহ্মণ কন্যার ধর্ম্মপত্নীত্ব ত সকলেরই স্বীকৃত, তবে 'কামতঃ' শব্দ হইতে ঐ 'চারি ভার্য্যা'ই কামপত্নী হয় কিরূপে? (প্রথম শলাকা ও দ্বিতীয় শলাকা দ্রষ্টব্য)।

(১০) "উঢ়ায়াং হি সবর্ণায়াম্ অন্যাম্ বা কামমুদ্বহেৎ।
তস্যামুৎপাদিতঃ পুত্রঃ ন সবর্ণাৎ প্রহীয়তে॥"—২।১০

এই ব্যাস বচনে মাতৃ-সম্বন্ধে 'সবর্ণা' ও 'অসবর্ণা' শব্দ ব্যবহার করিয়া "অম্বষ্ঠ সবর্ণার পুত্র হইতে বর্ণে হীন হয় না' বলা হইলেও, ইঁহাদের মতে বর্ণে হীন হয়! (কালী—৭৭, সত্যেন্দ্র—১৮)

(১১) 'তিস্রো ভার্য্যা ব্রাহ্মণস্য তাস্বপত্যং সমম্ ভবেৎ' এ স্থলে ব্রাহ্মণের ত্রিবর্ণীয়া পত্নীর পুত্র 'ব্রাহ্মণ' বলা হইলেও **'সমম্'** অর্থ **'ভিন্নম্'** বলিয়াছেন! (কা—৭৯; স—২১)

(১২) 'সবর্ণানন্তরাসু সবর্ণাঃ' এই বৌধায়ন বাক্যে সবর্ণার মতই অনন্তরার গর্ভজাত পুত্রকেও **'সবর্ণ'** বলা হইলেও, বাবুদের মতে অনন্তরা-পুত্র **'অসবর্ণ'**!

কালীবাবু ও সত্যেন্দ্রবাবু শাস্ত্রের উপরে এইরূপে পদে পদে শস্ত্রাঘাত করিয়া অম্বষ্ঠকে বৈশ্যবর্ণ সাব্যস্ত করিয়াছেন! তাঁহারা মনে করেন, 'অনুলোমাসু মাতৃবর্ণাঃ' এই বিষ্ণু-বাক্যের মর্য্যাদা রক্ষার ভার বিধাতা তাঁহাদেরই হাতে দিয়াছেন, এবং তাঁহারা যে ভাবে উহা ব্যাখ্যা করেন তাহাই ঠিক। কিন্তু অম্বষ্ঠকে বৈশ্যবর্ণ বলিতে হইলে ১২টী ডিগ্‌বাজী খাইতে হয়, সেদিকে লক্ষ্য নাই। সঙ্গে সঙ্গে মূর্দ্ধাভিষিক্ত **ক্ষত্রিয়বর্ণ** হয়, সেদিকেও লক্ষ্য নাই! আরও লক্ষ্য নাই যে,—

(১) গৌতম-বাক্যও মারা যায়! [কারণ ইঁহার মতে অনন্তরা-পুত্র **সবর্ণ**]

(২) বৌধায়ন বাক্যও মারা যায় [কারণ ইঁহার মতেও অনন্তরা-পুত্র **সবর্ণ**]

(৩) উভয় স্থলেই পিতার **'সবর্ণ'** অর্থে বলিতে হয়, পিতার **অসবর্ণ**!

(৪) **'আনুলোম্য'** (মনু ১০।৫) শব্দের অর্থ করিতে হয়, **'সাবর্ণ্য'** !

(৫) যাজ্ঞবল্ক্যের 'অনিন্দ্যবিবাহ' বলিতে কেবল **সবর্ণ বিবাহ-কেই** বুঝিতে হয় !

(৬) বৈধ বিবাহের শাস্ত্রাদেশই অবৈধ গণ্য হয় ।

(৭) ঋষিদের অনুলোমজ সন্তানের সবর্ণত্বের হেতু হয় 'সত্যসংকল্প' ও 'তপঃপ্রভাব' !

এবং শাস্ত্রাদেশ হইয়া দাঁড়ায় এইরূপ জঘন্য উক্তি—

(১) 'মাতামহস্য দোষেণ রাক্ষসোঽভূৎ দশাননঃ'। (বৈদ্যপ্রতি, পৃঃ ৩০)*

(২) 'ব্রাহ্মণ্যামভবদ্ বরাহমিহিরো জ্যোতির্বিদামগ্রণীঃ॥ (বৈদ্যপ্রতি পৃঃ ৪৫)

(৩) অনুলোমজ ঔরস পুত্রের দৃষ্টান্ত হয়, ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু, বিদুর (বৈদ্য, পৃঃ ৫৪৬) !

বন্ধুদ্বয় এই সকল কথা লিখিতে লজ্জা বোধ করেন নাই ! এইগুলিই আর্য্যসমাজের অনুলোম বিবাহের চিত্র ! রাক্ষসীর সহিত ব্রাহ্মণের কোন্ বেদ অনুসারে বিবাহ হয় ? কলিযুগের শবরস্বামী কোন্ বেদ অনুসারে চারি বর্ণের কন্যাকে বিবাহ করেন ? বিভিন্ন শতাব্দীর ও বিভিন্ন জাতির শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ কিরূপে শবরস্বামীর পুত্র হইল ?

কালীবাবু ও সত্যেন্দ্রবাবুর আর একটী অকাট্য শাস্ত্র প্রমাণ "ব্রহ্মা মূর্দ্ধাভিষিক্তশ্চ—" ! কিন্তু এই নির্ম্মূল প্রমাণও যে বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্বেরই প্রমাণ, তাহাও বুঝিবার ক্ষমতা নাই !

---

* পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এরূপ কথা হিড়িম্বানন্দন ঘটোৎকচের মুখেই শোভা পায়, কারণ আর্য্য শাস্ত্রানুসারে তাহার জনকজননীর মধ্যে পতি-পত্নী-সম্বন্ধ ছিল না ।

শাস্ত্রে ব্রাহ্মণের বিবাহিতা স্ত্রীতে উৎপাদিত পুত্র দ্বিবিধ বলা হইয়াছে, ঔরস ও শৌদ্র। শূদ্রা গর্ভজাত পুত্রেরা শৌদ্র ; ইহারা পিতৃবর্ণ হয় না বলিয়াই ইহাদের পৃথক নাম দিয়া ঔরস পুত্র হইতে পার্থক্য দেখান হইয়াছে। অপর তিন বর্ণের পুত্রই ঔরস পুত্র, অর্থাৎ পিতৃপিণ্ড-দাতা দায়হর ও গোত্রহর। মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও অম্বষ্ঠ পিতৃবর্ণ না হইলে, তাহাদেরও যথাক্রমে 'ক্ষাত্র' ও 'বৈশ্য' নাম দেওয়া হইত।

একটী ভ্রান্ত সংস্কার হইতে কত অসংখ্য ভ্রান্তির উৎপত্তি হয়! একটী ভ্রমকে হৃদয়ে পোষণ করিলে কত মিথ্যা কথা বলিতে হয়! কিন্তু শাস্ত্রের কথা যাক্। কালীবাবু ও সত্যেন্দ্রবাবু বৈদ্যসমাজের ব্যবহার সম্বন্ধে যে কি ভয়ানক মিথ্যা কথা প্রচার করিতেছেন তাহা দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। বৈদ্যসম্প্রদায় বৈশ্যবর্ণ, এই মূল ভ্রান্তিই ইহাদের সকল কথার মধ্যে লুক্কায়িত রহিয়াছে। নিম্নে ইহার কিছু পরিচয় প্রদত্ত হইল—

শাস্ত্র, লোকাচার ও ইতিহাসের সত্য কথা।	কালীবাবু ও সত্যেন্দ্রবাবুর মিথ্যা কথা।
১। মহামহোপাধ্যায়, বাচস্পতি, শিরোমণি, সার্ব্বভৌম প্রভৃতি বৈদ্যদিগের ব্রাহ্মণত্বসূচক বিদ্যাগত উপাধিতে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের কোন দাবী নাই। সমগ্র উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে এইরূপ উপাধিধারী একজন ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য দেখা যাইবে না।	...এইরূপ উপাধি বৈশ্যেরও থাকিতে পারে! সুতরাং এই সকল উপাধি হইতে বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব সপ্রমাণ হয় না!

২ ব্রাহ্মণত্বসূচক গুরুবৃত্তি অব্রাহ্মণের থাকিতে পারে না। অথচ এই বৃত্তি বৈদ্যদিগের মধ্যে আবহমানকাল প্রচলিত।	...বৈশ্যেরও গুরুবৃত্তি থাকিতে পারে! সুতরাং গুরুবৃত্তি দ্বারা বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব সপ্রমাণ হইল না!
৩। বেদাভ্যাস এখন এ দেশে নাই। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য শাস্ত্রাধ্যয়ন ত্যাগ করিয়াছে বলিলেই হয়। এরূপ অবস্থায় সাধারণ সংস্কৃত অধ্যাপনা ও সংস্কৃত গ্রন্থকর্ত্তৃত্বও ব্রাহ্মণত্বের সূচক হইয়াছে। ইহা অব্রাহ্মণের দেখা যায় না। সুতরাং টোল-রক্ষা, অধ্যাপনা ও সংস্কৃতগ্রন্থ-রচনা ব্রাহ্মণেত্বরই প্রমাণ।	...বৈশ্যেরও অধ্যাপনা ও গ্রন্থকর্ত্তৃত্ব থাকিতে পারে, সুতরাং বৈদ্য ব্রাহ্মণ হইল না!
৪। আয়ুর্ব্বেদের স্বামিত্ব ও অধ্যাপনা বঙ্গেতর ভারতের কুত্রাপি অব্রাহ্মণের হাতে নাই।	.. বঙ্গে থাকিতে পারে!
৫। গোস্বামী, ঠাকুর প্রভৃতি উপাধি ব্রাহ্মণত্বের পরিচায়ক। এগুলি কুত্রাপি অব্রাহ্মণের নাই।	...বৈশ্যেরও থাকিতে পারে! [ঢাকা-নিবাসী কোন কায়স্থ পরিবার আধুনিককালে 'গোস্বামী' উপাধি ব্যবহার করিতেছেন, ইহাই এইরূপ বলিবার হেতু!]
৬। পাঁড়ে, মিশ্র, চক্রবর্ত্তী এই তিনটী উপাধি ব্রাহ্মণত্বের প্রমাণ, ইহা অব্রাহ্মণের ব্যবহার্য্য হইতে পারে না।	...বৈশ্যেরও পাঁড়ে, মিশ্র, চক্রবর্ত্তী উপাধি থাকিতে পারে! অতএব এই প্রমাণে বৈদ্য ব্রাহ্মণ নহে!

৭। 'বৈদ্যব্রাহ্মণ' প্রসিদ্ধি ব্রাহ্মণত্বের প্রমাণ।	...বৈশ্যেরও ঐরূপ প্রসিদ্ধি থাকিতে পারে!
৮। নিজস্ব গোত্র কেবল ব্রাহ্মণেরই থাকে। অতএব কুলজিতে লিখিত এবং ইহাদের স্বীকৃত বৈদ্যের নিজস্ব গোত্র শাস্ত্রানুসারেই ব্রাহ্মণত্বের প্রমাণ।	...বৈশ্যেরও নিজস্ব গোত্র থাকিতে পারে!
৯। স্মার্ত্তত্ব ব্রাহ্মণেরই সম্ভব। অব্রাহ্মণের স্মৃতি গ্রন্থ-রচনা উন্মত্ত-কল্পনা। [বল্লালের দানসাগর প্রমাণ-স্বরূপে রঘুনন্দন ব্যবহার করিয়াছেন*] ইহাও বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্বে প্রমাণ।	.. বৈশ্যও স্মৃতিগ্রন্থ রচনা করিতে পারে।
১০। আচার্য্যের কার্য্য অব্রাহ্মণে করিতেই পারে না! বৈদ্যগণ চিরকাল বৈদিক গুরুর কার্য্য করিয়া পুত্রাদিকে গায়ত্রী দান করেন।	.বৈশ্যও আচার্য্যত্ব করিতে পারে। বৈশ্য কর্ণে গায়ত্রী দান করিতে পারে!

* (১) "অত্র সাক্ষাচ্ছূদ্রদত্তধৃততণ্ডুলাদ্যনুপযোগীতি দানসাগরঃ"—শুদ্ধিতত্ত্ব (রঘুনন্দন)।

(২) "উপকরণং ধান্যাদি নিয়মস্থায় উপবাসাদিব্রতশীলায় ইতি দানসাগরঃ"—শুদ্ধিতত্ত্ব (রঘুনন্দন)।

দানসাগরে ৭০টী অধ্যায় আছে। ১৩৭১টী দানের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। দাতব্য বস্তুর সংস্কার, দানযোগ্য পাত্র কে, দানের সময় কি ইত্যাদি আলোচনা হইয়াছে। "নিখিল ভূপচক্রতিলক—শ্রীবল্লালসেনাদেবেন পূর্ণে শশিনবদশমিতে শকাব্দে দানসাগরো রচিতঃ" শকাব্দ ১০১৯ অর্থাৎ ১০৯৭ খৃষ্টাব্দে দানসাগর রচিত হয়।

১১। দশাহ জননাশৌচ বহু স্থলে ব্রাহ্মণত্বের সাক্ষ্য দিতেছে। [বঙ্গে দশাহ অশৌচ কেবল ব্রাহ্মণেরই হয়]	...দশাহ্ জননাশৌচ বৈশ্যেরও থাকিতে পারে !
১২। বঙ্গেতর নিখিল ভারতে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক মুখ্য ব্রাহ্মণ।	...বঙ্গের কপালগুণে ব্যতিক্রম ; এখানে বৈশ্যও চিকিৎসক হইতে পারে !
১৩। উর্দ্ধপুণ্ড্র-ধারণ বৈদ্যদিগের প্রাচীন আচার। উর্দ্ধপুণ্ড্র কেবল ব্রাহ্মণই ধারণ করিতে পারে।	...বৈশ্যও পারে !
১৪। প্রাচীন বৈদ্যদিগের নামান্তে শর্ম্মা শব্দ দেখা যায়।	...তাঁহারা বৈদ্য নহেন !
১৫। 'বৈদ্য' বোপদেব, 'কবিরাজ' জয়দেব, 'কবিরাজ' বিশ্বনাথ, আচার্য্য অভিনব গুপ্ত প্রভৃতি ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকৃত।	...তাঁহারা বৈদ্য নহেন !
১৬। প্রাচীন বৈদ্যদিগের ব্রহ্মত্রারূপে ভূমি প্রতিগ্রহ দেখা যায়।	...উহা 'চাকরান' জমি !
১৭। বৈদ্যেরা ব্রাহ্মণ-বাড়ীতেও অধিষ্ঠানে যজ্ঞোপবীত, পান-সুপারী প্রাপ্ত হন। *	...উহার কোন মানে নাই !

* বহরমপুরে ১৪শ বৎসর পূর্ব্বেও বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণদের বাড়ীতে যজ্ঞোপবীত বরণ পাইতেন। বহরমপুরস্থ ব্রাহ্মণসভার স্থায়ী কার্য্যাধ্যক্ষ বলিয়াছিলেন—"শাস্ত্রীয় হউক,

১৮। বাঙ্গালার বাহিরে দাশ-শর্ম্মা, দত্ত-শর্ম্মা, সেন শর্ম্মারা ব্রাহ্মণ। ...বাঙ্গালায় বৈশ্য!

১৯। ভবতি ভিক্ষাং দেহি' ব্রাহ্মণেই বলে, কেশান্ত পর্য্যন্ত উচ্চ বিল্ব দণ্ড ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারীই ব্যবহার করে, কার্পাস সূত্র ব্রাহ্মণের জন্যই ইত্যাদি। ...বৈশ্যেরও ঐরূপ হয়!

২০। গণেশ শাসনে পাতিত্য ঘোষণাই বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রমাণ করিতেছে! ...ঐ শাসন মিথ্যা!

২১। ভরতমল্লিক বৈদ্যকে ব্রাহ্মণবর্ণ বলিয়াছেন। ...ভরতমল্লিক বৈদ্যকে বৈশ্যবর্ণ বলিয়াছেন!

ভ্রান্তির রাজ্যে অসত্যের আশ্রয় ব্যতীত এক মুহূর্ত্তও বাস করা যায় না, তাই গুরু-শিষ্য সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মিথ্যা কথাগুলিরও প্রচার করিতেছেন—

২২। সমস্ত কুলজীগ্রন্থ বৈদ্যকে অম্বষ্ঠ বলিয়াছে!

২৩! বৈদ্যগণ চিরকাল গুপ্ত-উপাধি ব্যবহার করিতেছেন!

২৪। বৈদ্যগণ চিরকাল পনের দিন অশৌচ পালন করিতেছেন!

২৫। বৈদিক প্রমাণ, যাহাতে বৈদ্যকে 'বিপ্র' বলা হইয়াছে, অম্বষ্ঠ বা বৈশ্য বলা হয় নাই, তাহা বৈদ্যব্রাহ্মণদের মনগড়া!

আর অশাস্ত্রীয় হউক, এ প্রথা এখানে চলিয়া আসিতেছে।" সভাপতি কুমার দেবেন্দ্রনাথ রায় ঐ কথা সমর্থন করিয়া বলেন যে, তাঁহার বাটীতে তিনি কার্য্য উপলক্ষে বৈদ্যগণকে যজ্ঞোপবীত দিয়া আনিতেছেন। যাহা হউক, বহু তর্কবিতর্কের পর ব্রাহ্মণেরা স্থির করেন যে তাঁহারা বহরমপুর সহরে ঐ প্রথা বন্ধ করিবেন। কিন্তু মফঃস্বলে ও শ্রীখণ্ড, সাতশৈকা প্রভৃতি স্থানে ঐ প্রথা অদ্যাপি প্রচলিত আছে।

২। আয়ুর্ব্বেদ ও অভিধানের প্রমাণ, যাহা বৈদ্যকে 'বিপ্র' বলিয়াছে, অম্বষ্ঠ বলে নাই, তাহাও মনগড়া!

৩। নিখিল উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতবর্ষের সাক্ষ্য, যাহা দ্বারা সপ্রমাণ হয় যে পূর্ব্ব ভারতের বৈদ্যও মুখ্য ব্রাহ্মণ, অম্বষ্ঠ নহে, তাহাও মিথ্যা সাক্ষ্য!

পাঠক দেখিলেন, 'অম্বষ্ঠ বৈশ্যবর্ণ' এই মূল ধারণা ভুল হওয়ায় ইহা হইতে যে অসংখ্য Corollary টানা হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটীই ভুল হইয়াছে। 'অম্বষ্ঠ বৈশ্যবর্ণ' এবং 'বৈদ্য অম্বষ্ঠ' এই দুইটী ধারণা আমাদের ভ্রাতৃদ্বয়ের যে কি সর্ব্বনাশ করিয়াছে, তাহা ভাবিতেও অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠে। এই দুই আত্মঘাতী ব্যক্তি কোন্ সাহসে পুস্তক লিখিলেন এবং মুদ্রিত করিলেন? যাঁহারা পদে পদে সত্যস্বরূপ ভগবানের অবমাননা করিতেছেন তাহারা কিরূপে দর্পভরে বৈদ্যব্রাহ্মণ-সমিতিকে শাপ বজ্রের ভয় দেখান? শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস বাচস্পতি মহাশয় সত্যেন্দ্রবাবুর পুস্তক পাঠ করিয়া "পরম আনন্দ অনুভব" করিয়াছেন! সুতরাং উহা নিশ্চিতই তাঁহার মনের মতন হইয়াছে, প্রকাশ্যে শিখা-তিলক ধারণ না করা ও কচুরি-ভক্ষণ তাঁহার অসহ্য, কিন্তু অপ্রকাশ্যে শিখী-তিলকীর পক্ষেও কচু—কচুরী বোধ হয় নিন্দনীয় নহে? বাচস্পতি মহাশয় লিখিয়াছেন 'জলে বাস করিয়া কুমীরের সঙ্গে বিবাদ আর হিন্দু সমাজে বাস করিয়া ব্রাহ্মণের সঙ্গে বিবাদ সমান কথা।" ইহা ভীরুর কথা। ভীরুগণ এই বলিয়াই অন্যের পদাঘাত সহ্য করে। শ্রীযুক্ত বাচস্পতি মহাশয়ের কথা হইতে বুঝিতেছি যে তিনি ধর্ম্মভীরু নহেন, ধর্ম্মধ্বজি-ভীরু! ব্রাহ্মণ কি বলিবে তাহা তিনি ভাবেন না, ব্রাহ্মণব্রুব পোকা মাকড়ের ভয়েই তিনি অজ্ঞান! বাচস্পতি মহাশয় বলিয়াছেন, 'সব কথা বলিবার অবসর আসিলে বলিব'! এই অবসর কতবার আসিল ও গেল, বাচস্পতি মহাশয় তাহা দেখিলেন না। আজ শেষ অবসর ত্যাগ করিলে

ইহজীবনে আর তাহাকে পাইবেন কি? তিনি স্বীকার করিয়াছেন, "ইহার (বৈদ্যপ্রতিবোধনীর) অনেক বিষয়েই আমার **ঐকমত্য** আছে', "সমস্ত গ্রন্থে তিনি (সত্যেন্দ্রবাবু) বৈদ্যের **ব্রাহ্মণত্বাদি পরমত যাহা খণ্ডন** করিয়াছে (?) তাহা **সুলিখিত** এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।" এবং "সম্ভাবিত **বহু সংশয়ের মীমাংসা** এই গ্রন্থে আছে। প্রকৃত জিজ্ঞাসু ব্যক্তি এই গ্রন্থে **প্রচুর লাভবান্** হইবেন সন্দেহ নাই।" আমরা করজোড়ে জিজ্ঞাসা করি, তবে দেবতার **সকল কথা** বলিবার আর বাকী রহিল কি?

বন্ধুদিগের উদ্যম।

স্বজাতির মঙ্গলকামনায় কালীবাবু ও সত্যেন্দ্রবাবু কি কি পুস্তক লিখিয়াছেন, দেখুন—

১। 'বৈদ্য' প্রথম সংস্করণ, পৃঃ ৮০,

২। নিবেদন ... পৃঃ ৪৭

৩। 'বৈদ্য', দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃঃ ১৪৩

৪। বৈদ্য-পরিশিষ্ট দ্বিতীয় সংস্করণ, ১°০ পৃষ্ঠা।

৫। হিতবাদী, বসুমতী, মুর্শিদাবাদ-হৈতৈষী, ত্রিশূল প্রভৃতিতে নানা প্রবন্ধ।

সত্যেন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন—

৫। বৈদ্য-প্রতিবোধনী ... পৃঃ ৯৮

ঐ ক্রোড়পত্র ... পৃঃ ৪ (পুস্তক বাহির হইবার ৫।৭ দিন পরে বাহির হয় ও ডাকযোগে আমার নিকটে প্রেরিত হয়)।

ইহাদের পূর্ব্বে যাজন-ব্রাহ্মণেরা ৩ খানি পুস্তক বাহির করে—

১। নোয়াখালির প্রশ্নোত্তর (পৃষ্ঠা ৪)

২। জাতিতত্ত্ব ... ১৩৫ পৃঃ

৩। জাতিতত্ত্বের পরিশিষ্ট প্রায় পৃষ্ঠা ৫০।

৪। বসুমতীতে ধারাবাহিক প্রবন্ধ। অন্যান্য পত্রিকাতেও নানা প্রবন্ধ বাহির হয় যথা, চট্টগ্রামের জ্যোতিঃ, কাল্‌নার বার্ত্তাবহ না হিতৈষী, ইত্যাদি।

এই সকল পুস্তক ও প্রবন্ধ একত্র করিলে সহস্র পৃষ্ঠারও অধিক হইয়া যায়। ইহাদের এক মাত্র উদ্দেশ্য বৈদ্যব্রাহ্মণসমিতিকে আক্রমণ করা এবং সমিতি কর্ত্তৃক প্রকাশিত প্রবোধনীর ভুল ধরা! বিরুদ্ধ পক্ষ আমাদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য যেরূপ শ্রম-স্বীকার ও অর্থব্যয় করিয়াছেন, তাহার সহিত তুলনা করিলে বৈদ্যব্রাহ্মণসমিতি কিছুই করেন নাই!

এক্ষণে বাঙ্গালার যাজক সম্প্রদায় ও বৈদ্যসম্প্রদায়ের মধ্যে আচারাদিগত কিরূপ সাম্য, এবং অন্যান্য জাতির আচার ব্যবহার হইতে এই দুই সম্প্রদায়ের আচারগত কি অসাম্য এবং সেই অসাম্যই বা কতদূর একরূপ তাহা আলোচনা করিলেই বুঝা যাইবে যে, বৈদ্যসম্প্রদায় কোন অব্রাহ্মণ জাতি হইতেই পারে না, উহা যাজক সম্প্রদায়ের ন্যায় **ব্রাহ্মণ-বর্ণান্তর্গত একটী সম্প্রদায়**। যাজক ব্রাহ্মণদিগের সমস্ত বৃত্তিই বৈদ্য-সম্প্রদায়ে আছে, অধিকন্তু চিকিৎসাবৃত্তি। ইহা শ্রেষ্ঠতারই নিদর্শন, হীনতার নহে, কারণ চিকিৎসা পুণ্যতম বৃত্তি এবং উহাতে সকল ব্রাহ্মণের অধিকার ছিল না, শ্রেষ্ঠদিগেরই ছিল। যাজক সম্প্রদায়ে ও অন্যান্য অব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ে আচারগত যে পার্থক্য, বৈদ্য সম্প্রদায়ের সহিতও তাহাদের সেই পার্থক্য। বৈদ্যগণ যে যে বিশিষ্ট গৌরবকর বৃত্তি বা অধিকারে প্রতিষ্ঠিত, ব্রাহ্মণেতর কোন সমাজে সে বৃত্তি বা সে অধিকার নাই। এইরূপ ব্রাহ্মণবৃত্তি ও ব্রাহ্মণাধিকারের সাম্যসূচক একটী তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল—

যাজকব্রাহ্মণ, বৈদ্যব্রাহ্মণ ও অন্যান্য জাতির তুলনা।

যাজক-সম্প্রদায়	বৈদ্যসম্প্রদায়	অন্য অব্রাহ্মণ জাতি
১। যাজন-ব্রাহ্মণদিগের ন্যায়...	বৈদ্যগণও উপনয়নকালে আচার্য্যত্ব করেন...	অন্যে করে না।
২। যাজন-ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় ..	বৈদ্যগণের মহামহোপাধ্যায়াদি উপাধি ধারণে অধিকার আছে...	অন্যের এই অধিকার নাই।
৩। যাজন-ব্রাহ্মণদিগের ন্যায়...	বৈদ্যগণের গুরুবৃত্তি চৈতন্যদেবের পূর্ব্ব হইতে দেখা যায় ...	অন্যের নাই।
৪। যাজন-ব্রাহ্মণদিগের ন্যায়...	বৈদ্যগণের সংস্কৃত অধ্যাপনা, টোল-রক্ষা ও গ্রন্থরচনা আছে ...	অন্যের নাই।
নিখিল উত্তর, দক্ষিণ ও... পশ্চিম ভারতে ব্রাহ্মণই আয়ুর্ব্বেদ অধ্যাপনা ও চিকিৎসা করেন।	বৈদ্যগণও তাহাই করেন। [বাঙ্গালায় বৈদ্যব্রাহ্মণ রাজজাতি চিকিৎসাশাস্ত্র নিজ হাতেই রাখিয়াছিল, অন্য সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণকেও দেয় নাই।]	
৬। যাজন-ব্রাহ্মণদিগের ন্যায়...	বৈদ্যগণের পাঁড়ে, মিশ্র ও চক্রবর্ত্তী উপাধি দৃষ্ট হয়......	অন্যের নাই।
৭। যাজন-ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় ..	বৈদ্যগণের 'ব্রাহ্মণ' প্রসিদ্ধি আছে··· / ...	অন্যের নাই।
৮। যাজন ব্রাহ্মণদিগের ন্যায়...	বৈদ্যগণের নিজস্ব গোত্র রহিয়াছে ...	অন্যের নাই।

৯। যাজন-ব্রাহ্মণদিগের ন্যায়...	বৈদ্যগণ স্মৃতিগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন ; [এবং তাহা ব্রাহ্মণ সমাজে আদৃত হইয়াছে।]...অন্যের এ অধিকার নাই।
১০ শঙ্করাচার্য্য-মাধবাচার্য্য প্রভৃতি ব্রাহ্মণের ন্যায়	বিশ্বপ্রকাশকোষ-রচয়িতা মহেশ্বরাচার্য্য, আচার্য্য অভিনব গুপ্ত প্রভৃতি বৈদ্য আচার্য্য ছিলেন ... অন্যের এরূপ নাম হয় না।
১১। যাজন-ব্রাহ্মণদিগের ন্যায়...	বৈদ্যদিগের নামান্তে শর্ম্মা ব্যবহার পাওয়া যায়।...অন্যের নাই।
১২। যাজন-ব্রাহ্মণের ন্যায় প্রাচীন বৈদ্যগণও 'বিপ্র' ও 'দ্বিজ' বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।	..অন্যে দেয় নাই।
১৩। যাজন-ব্রাহ্মণের ন্যায় বৈদ্যগণ ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিতেন।	..অব্রাহ্মণের এ অধিকার নাই।
১৪। যাজন-ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় বৈদ্যগণ ব্রহ্মত্রাভূমি প্রতিগ্রহ করিতেন।	..অব্রাহ্মণের এ অধিকার নাই।
১৫। ব্রাহ্মণ-গৃহেও যাজন-ব্রাহ্মণগণের ন্যায় বৈদ্যগণ যজ্ঞোপবীত পান-সুপারী পাইয়া থাকেন।	...অন্যে পায় না।
১৬। যাজন-ব্রাহ্মণের ন্যায় বৈদ্যগণেরও 'ভবতি ভিক্ষাং দেহি', দণ্ডের কেশান্ত পর্য্যন্ত উচ্চতা ও কার্পাসসূত্রের যজ্ঞসূত্র দৃষ্ট হয়।	...অন্যের দৃষ্ট হয় না।

১৭। যাজন-ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় বৈদ্যদিগের মধ্যে পণ্ডিত সভা-কবি বহু।	...অন্যের মধ্যে নাই।
১৮। যাজন-ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় বৈদ্যদিগেরও জননাশৌচ অনেক স্থলে ১০ দিন।	...অন্যের মধ্যে নাই।
১৯। বৈদিক ব্রাহ্মণদিগের সহিত বৈদ্যদিগের গোত্র পদবী-বেদশাখা প্রভৃতিতে ঐক্য আছে।	...অন্যের নাই।
২০। যাজন-ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় বৈদ্যদিগের সামাজিক প্রতিষ্ঠা, নেতৃত্ব ও শালগ্রাম-পূজা প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ সদাচার দেখা যায়।	...অন্যের নাই।
২১। যাজন-ব্রাহ্মণদের ন্যায় বৈদ্যদিগেরও দ্বিজ, বিপ্র, দ্বিজাগ্রণী, ব্রহ্মবাদী, বিশ্বৈকবন্দ্য, শ্রুতিনিয়মগুরু প্রভৃতি বিশেষণ দেখা যায়।	...অন্যের দেখা যায় না।

বৈদ্য কিছুতেই বৈশ্যবর্ণ নহে।

বৈদ্য বৈশ্যবর্ণ নহে—কারণ বৈশ্য চিকিৎসায় অনধিকারী।

অপিচ বৈদ্য ব্রাহ্মণ না হইয়া বৈশ্য হইলে—

(১) বঙ্গের সার্ব্বজনীন বিশ্বাস ও ঐরূপ হইত!

(২) অম্বষ্ঠত্ব-বিশ্বাসীরাও "সত্যে বৈদ্যাঃ **পিতুস্তুল্যাঃ**, ত্রেতায়াঞ্চ তথৈব চ" এইরূপ বলিতেন না!

(৩) স্বহস্তে কৃষি, পশুপালন, বাণিজ্য নিন্দনীয় বোধ করিতেন না!

(৪) ব্রাহ্মণদিগকেও বিনামূল্যে চিকিৎসা করিতেন না। কোন বৈশ্য যেমন বিনামূল্যে চাউল, ডাইল, তৈল, ঘৃতের বাণিজ্য করে না, বৈদ্যও তদ্রূপ মূল্য না লইয়া কাহারও চিকিৎসায় হস্তক্ষেপ করিত না!

(৫) মহামহোপাধ্যায়, শিরোমণি প্রভৃতি উপাধি ব্যবহার করিতে পারিত না!

(৬) পাঁড়ে, ঠাকুর, গোস্বামী, আচার্য্য, মিশ্র, চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি উপাধি বা পদবী থাকিত না!

(৭) গুরুবৃত্তি থাকিত না, গোপালন (গরু-বৃত্তি) থাকিত!

(৮) ঘরে ঘরে টোলে ছাত্র থাকিত না, গোয়ালে গরু, ছাগল, ভেড়ার হাট বসিত!

(৯) ঘরে ঘরে সংস্কৃত গ্রন্থ ও টীকা লেখার এত আদর হইত না।

(১০) আচার্য্যত্ব সম্ভব হইত না!

(১১) প্রতিগ্রহ দেখা যাইত না!

(১২) জননাশৌচ কোনও স্থানেই দশ দিন হইত না!

(১৩) সমাজ-নেতৃত্ব, ব্রাহ্মণদিগের উপর প্রভুত্ব, কৌলীন্যদান ও অপহরণ সম্ভব হইত না! অনাচারী ব্রাহ্মণকে নির্ব্বাসন করা সম্ভব হইত না!

(১৪) ব্রাহ্মণ-সর্ব্বস্ব গ্রন্থের ‘ব্রাহ্মণ-সর্ব্বস্ব’ নাম হইত না ‘বৈশ্য-সর্ব্বস্ব’ নাম হইত!

(১৫) উর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ ও অন্যান্য দ্বিজাচার দেখা যাইত না!

(১৬) সভাপণ্ডিত হওয়া সম্ভব হইত না!

(১৭) ৫০।৬০ বৎসর বা তাহারও পূর্ব্বে নামান্তে ‘গুপ্ত’ শব্দ একান্ত দুর্ল্লভ হইত না। পশ্চিমের বৈশ্যগণ যেমন চিরকাল ‘গুপ্ত’; বাঙ্গালার বৈদ্যগণও তদ্রূপ চিরকাল ‘গুপ্ত’ হইত!

(১৮) ব্রাহ্মণের বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হইয়া অন্যান্য ব্রাহ্মণদিগের সহিত চিরকাল যজ্ঞোপবীত-পান-সুপারী পাইতেন না!*

(১৯) 'বদ্দিবামুন' বলিয়া প্রসিদ্ধি থাকিত না।

(২০) ব্রাহ্মণোচিত বেশ-ভূষা, আচার-ব্যবহার, ধর্ম্মনিষ্ঠা ও আর্য্য সদাচার হইত না, এবং যাজন-ব্রাহ্মণদের সহিত এই বিস্ময়কর প্রতিদ্বন্দ্বিতাও থাকিত না!

(২১) সেন-রাজগণকে অন্যদেশের লোকেরাও ব্রাহ্মণ বলিত না।

(২২) ব্রহ্মবাদী, দ্বিজ, দ্বিজবর, অগ্রজগণাগ্রণী, বিপ্র প্রভৃতি বিশেষণ ব্যবহার সম্ভব হইত না।

(২৩) বল্লালরচিত দানসাগর ও বোপদেব রচিত পদার্থাদর্শ ও শ্রাদ্ধকাণ্ডদীপিকার প্রামাণ্য ব্রাহ্মণ-সমাজে স্বীকৃত হইত না!

(২৪) শান্তিপুর অঞ্চলে ব্রাহ্মণকন্যাকে 'বেজকন্যা' বলিত না!

(২৫) কেশান্তপ্রমাণ বিল্বদণ্ড, কৃষ্ণসারচর্ম্মের উত্তরীয়, 'ভবতি ভিক্ষাং দেহি' বাক্য ইত্যাদি ব্রাহ্মণ্য-লিঙ্গগুলি ব্যবহার হইত না।

বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্বে সাহিত্যের প্রমাণ

শাস্ত্রীয় বচনে, সাহিত্যে ও সমাজে 'বৈদ্য' বা 'ভিষক্ শব্দ হইতে ব্রাহ্মণকেই বুঝা যায়। নিম্নে কতকগুলি উদাহরণ দিলাম। যে দুই এক স্থলে 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া উল্লেখ নাই, সে স্থলে বৈশ্য বলিয়াও উল্লেখ নাই।

ঋগ্বেদ—(১) '**বিপ্রঃ** স উচ্যতে **ভিষক্**' ইত্যাদি, (পৃঃ ২৩)

(২) 'যস্মৈ কৃণোতি **ব্রাহ্মণঃ**' ইত্যাদি, (পৃঃ ২৪)।

আয়ুর্ব্বেদ—(৩) 'তস্মাৎ **বৈদ্য দ্বিজঃ** স্মৃতঃ'

(৪) 'গুরুবৎ ভাবয়েৎ রোগী **বৈদ্যং**'—(পৃঃ ১৮)

স্মৃতি—(৫) 'দৃষ্ট্বা জ্যোতির্বিকান্ **বৈদ্যান্**' (যাজ্ঞবল্ক্য, ১৩অ)

(৬) 'ঋত্বিক্ পুরোহিতাচার্য্যৈ র্মাতুলাতিথিসংশ্রিতৈঃ।
বালবৃদ্ধাতুরৈ-র্বৈদ্যৈঃ'—মনু ৪।১৭৯

(৭) 'বিপ্রান্তে বৈদ্যতাং যান্তি রোগদুঃখপ্রণাশকাঃ'—
উশনার প্রাচীন বচন।

মহাভারত—(৮) 'দ্বিজেষু বৈদ্যাঃ শ্রেয়াংসঃ'

(৯) 'বৈদ্যান্ বিসর্জ্জয়ামাস পূজয়িত্বা যথার্হতঃ।

রামায়ণ—(১০) 'বৃদ্ধাংশ্চ তাত বৈদ্যাংশ্চ—' অযোধ্যা

(১১) 'বৈদ্যজনাকুলাম্'— অযোধ্যা

শঙ্করাচার্য্য—(১২) 'ভিষগসৌ হরিরেব তনুভৃতঃ'—পৃঃ ১৮

(১৩) 'বৈদ্যো নারায়ণঃ স্বয়ম্'

রামানুজ—(১৪) 'বৈদ্যান্ চিকিৎসাপ্রবীণান্ ব্রাহ্মণান্'— রামায়ণ-টীকা।

(১৫) **সমগ্র পশ্চিম ভারতে**—আয়ুর্ব্বেদস্বামী বৈদ্য'ব্রাহ্মণ'

(১৬) **সমগ্র দক্ষিণ ভারতে**—আয়ুর্ব্বেদস্বামী বৈদ্য'ব্রাহ্মণ'

(১৭) **সমগ্র উত্তর ভারতে**—আয়ুর্ব্বেদস্বামী বৈদ্য'ব্রাহ্মণ'

(১৮) **সমগ্র পূর্ব্বভারতে** বৈদ্য প্রতিষ্ঠায় গৌরবে ও যাজনে ব্রাহ্মণের প্রতিদ্বন্দ্বী। তবে বৈদ্য অব্রাহ্মণ কিরূপে?

(১৯) **আসামে** বেজবড়ুয়া বা বৈদ্য-প্রধানগণ ব্রাহ্মণ

(২০) **উড়িষ্যায়** তদ্দেশীয় বৈদ্যগণ ... ব্রাহ্মণ

(২১) **বিহারে** তদ্দেশীয় বৈদ্যগণ ... ব্রাহ্মণ

(২২) **মিথিলায়** তদ্দেশীয় বৈদ্যগণ ... ব্রাহ্মণ

কেবল উড়িষ্যা-বিহার-আসাম-পরিবেষ্টিত বঙ্গে বৈদ্যের অর্থ বৈশ্য!!

(২৩) **কুলজীগ্রন্থে**—দুর্জ্জয় অম্বষ্ঠের নাম করেন নাই, অথচ বলিয়াছেন—"বৈদ্যাশ্চ দ্বিবিধাঃ প্রোক্তাঃ সারস্বতাশ্চ সৈন্ধবাঃ"—বঙ্গীয় বৈদ্যও পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ ছিল।

(২৪) **পদ্মিনী**— "মহারাজ, আমি **ব্রাহ্মণী** নহি"।

(শোনা কথা)

(২৫) **নুলো**—"শূদ্রকন্যা **ব্রহ্মজায়া** না লাগে অরত্নী"।

(২৬) **চৈতন্যমঙ্গল**—'বৈদ্য ব্রাহ্মণ যত'—ইত্যাদি।

(২৭) **মুকুন্দরাম**—'উর্দ্ধ ফোঁটা করি ভালে—ইত্যাদি।

(২৮) **ঘনরাম**—"ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বৈদ্য—সমাদরে তস্য, বৈসে ক্ষত্র বৈশ্য" [ক্ষত্র-বৈশ্য হইতে বৈদ্যের আসন উচ্চে ; বৈদ্য বৈশ্য নহে, তাহা এইস্থানেই সুপ্রকাশ। বৈদ্য বৈশ্য হইলে এস্থলে বৈশ্য নাম পৃথক্ ব্যবহারই হইত না।]

(২৯) **ভরতমল্লিক**—''তদ্ বৈদ্যঃ বর্ণ উত্তমঃ', 'পিতৃবত্বাৎ দ্বিজঃ', 'সৰ্ব্বেষামেব বর্ণানাং মাননীয়ঃ' ইত্যাদি।

দাস ও দাশ।

উড়িষ্যাদি অঞ্চলে মৌদ্‌গল্যগোত্রীয় পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণ 'দাশ' লেখেন, 'দাস' লেখেন না। 'দাশ' বিপ্রত্ববাচক, 'দাস' শূদ্রত্ববাচক। অনেক বৈদ্য এক সময়ে দাশ ও দাসের পার্থক্য ভুলিয়া দাস লিখিতে আরম্ভ করেন। বৈদ্যব্রাহ্মণ উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় এই পার্থক্য ভালরূপে বুঝাইয়া দিলে 'বড়লোক'দের মধ্যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনই প্রথম 'দাশ' শব্দ ব্যবহার আরম্ভ করেন। তাঁহার দেখাদেখি এখন সকলেই দাশ লেখেন, শূদ্রত্ব বোধক 'দাস' শব্দ কেহই ব্যবহার করেন না। কিন্তু 'দাশ' শব্দ ব্রাহ্মণকেই বুঝায়, অব্রাহ্মণকে বুঝায় না, তাহা তাঁহারা জানেন কি ? 'দাশ শৰ্ম্মা' স্থলে 'দাস গুপ্ত' ব্যবহার যেমন অযৌক্তিক ও অশাস্ত্রীয়, 'দাশগুপ্ত'ও তদ্রূপ। উড়িষ্যার মৌদগল্যগোত্রীয় পণ্ডিতগণ 'দাশ-শৰ্ম্মা' ব্যবহার করেন, 'দাশ-গুপ্ত' ব্যবহার করেন না। বৈদ্যগণ যখন বিপ্র-সন্তান, বণিক্-সন্তান নহেন, তখন তাঁহারা 'দাশ-শৰ্ম্মা' ব্যবহার করিলেই পূর্ব্বপুরুষের পরিচয়টী রক্ষা পায়।

বৈদ্যব্রাহ্মণদিগের উপদেশ শুনিবার ইচ্ছা হইলে, সমস্তটুকুই শুনা উচিত। অর্দ্ধেক শুনিয়া 'দাশ' লিখিব, আর অপর অর্দ্ধেক, 'গুপ্ত' লিখিয়া, হাসিয়া উড়াইব, এমন চেষ্টা নিতান্তই হাস্যজনক। শর্ম্মাটুকু সকল সময়ে ব্যবহার করুন না করুন, 'গুপ্ত' ব্যবহার করা যে আদৌ উচিত নহে, তাহা আবার কোনো দেশবন্ধু না বুঝাইলে কি বড় লোকের সমাজ বুঝিবেন না?

মহামহোপাধ্যায় বৈদ্য পণ্ডিতগণের তালিকা।

১। মহারাজ বল্লালসেন—দানসাগর, অদ্ভুত সাগর

২। বৈদ্য বোপদেব গোস্বামী—মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ, কবিকল্পদ্রুম, শতশ্লোক, ভাগবতটীকা, মুক্তাফল, পদার্থাদর্শ, অশৌচসংগ্রহ, শ্রাদ্ধকাণ্ডদীপিকা, কাব্যকামধেনু, সিদ্ধমন্ত্র প্রকাশ-ইত্যাদি।

৩। কবিরাজ জয়দেব গোস্বামী—গীতগোবিন্দ।

৪। মহেশ্বরাচার্য্য কবীন্দ্র—বিশ্বপ্রকাশ কোষ।

৫। মেদিনীকর—মেদিনীকোষ।

৬। কবিরাজ পুরুষোত্তম দেব—বিশ্বরূপ কোষ, একাক্ষরকোষ, হারাবলী, ত্রিকাণ্ডশেষ।

৭। বিশ্বনাথ কবিরাজ—সাহিত্যদর্পণ।

৮। ত্রিলোচন দাশ—কলাপপঞ্জী।

৯। গঙ্গাদাশ—ছন্দোমঞ্জরী।

১০। মহামহোপাধ্যায় ক্রমদীশ্বর সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ।

১১। দেবেশ্বর গুপ্ত—কবিকল্পলতা।

১২। প্রজাপতিদাশ—পঞ্চস্বরা (জ্যোতিষশাস্ত্র)।

১৩। মহামহোপাধ্যায় বিজয় রক্ষিত—নিদানটীকা।

১৪। মহামহোপাধ্যায় মাধব কর—নিদান

১৫। শিবদাস সেন—চক্রদত্তের টীকা ও চরক টীকা।

১৬। মহামহোপাধ্যায় শ্রীকণ্ঠ দত্ত—নিদান টীকা।

১৭। মহামহোপাধ্যায় চক্রপাণি দত্ত—চক্রদত্ত ও চরকাদির টীকা।

১৮। কবিরাজ মুরারী গুপ্ত- সংস্কৃত চৈতন্যচরিত।

১৯। ভৃগুরাম দাশ—স্বপ্নতত্ত্ব।

২০। মহামহোপাধ্যায় পদ্মনাভ দত্ত—সুপদ্মব্যাকরণ।

২১। কবিকর্ণপুর—চৈতন্যচন্দ্রোদয় প্রভৃতি।

২২। কবিরাজ কৃষ্ণদাস, কবিরাজ রামচন্দ্র, গোবিন্দদাস, চৈতন্য-দাস, প্রভৃতি অসংখ্য বৈষ্ণব পণ্ডিত।

২৩। মহামহোপাধ্যায় অভিরাম কবীন্দ্র।

২৪। মহামহোপাধ্যায় শ্রীপতি দত্ত—কলাপপরিশিষ্ট।

২৫। মহামহোপাধ্যায় ভরত মল্লিক—চন্দ্রপ্রভা, রত্নপ্রভা, ভট্টি টীকা প্রভৃতি।

২৬। আচার্য্য গঙ্গাধর—প্রমাদভঞ্জনী মনু-টীকা, জল্পকল্পতরু-চরকটীকা, বেদান্তভাষ্য, উপনিষদের ভাষ্য, ষড়দর্শনের বহু গ্রন্থের টীকা ইত্যাদি প্রায় এক শত পুস্তক।

২৭। মহামহোপাধ্যায় দ্বারকানাথ।

২৮। পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী—গীতা ব্যাখ্যা, বক্তৃতা ও অন্যান্য নানা পুস্তক।

২৯। মধুসূদন সেনশর্ম্মা অধ্যাপক, সংস্কৃত কলেজ।

৩০। মহামহোপাধ্যায় বিজয়রত্ন সেন।

৩১। কবিরাজ পরেশ সেন।

৩২। মহাপণ্ডিত গণেশ ফৌজদার।

৩৩। পণ্ডিত প্যারীমোহন কবিভূষণ বৈদ্যবর্ণ বিনির্ণয়, বঙ্গালঙ্কার, কুমারসম্ভব কাব্যের বঙ্গানুবাদ।

৩৪। গোপীচন্দ্র সেন বৈদ্য-পুরাবৃত্ত।

৩৫। বেদাচার্য্য উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন—জাতিতত্ত্ববারিধি, বেদ-টীকা মানবের আদি জন্মভূমি ইত্যাদি।

প্রাচীন বঙ্গভূমিতে এইরূপ অসংখ্য বৈদ্যপণ্ডিত সমাজের গৌরব বৃদ্ধি করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে চূড়ামণি, বাচস্পতি, সার্ব্বভৌম প্রভৃতি উপাধি অনেকের ছিল। নিম্নে বৈদ্যকুলজীর দুই এক স্থল হইতে বিদ্বান্ বৈদ্যকুলের বিদ্যাগত উপাধির কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতেছি—

'অভিরামঃ কবীন্দ্রাংসৌ সীতারামাদ্ধি ভূপতেঃ।
মহোপাধ্যায়পদবীং মহৎপূর্ব্বাম্ অবাপ্তবান্॥'
'কর্ণপূরাৎ সুতোজাতঃ রামচন্দ্রঃ **শিরোমণিঃ**।'—(সদ্ বৈদ্য—)
'রাঘবেন্দ্রস্য দাশস্য পুত্রো বিশ্বেশ্বরোঽভবৎ।
বাচস্পতিরিতি খ্যাতো গুণবান্ সচ্চিকিৎসকঃ॥
পুত্রঃ সুদামদাশস্য **শিরোমণি**রিতি শ্রুতঃ।
রূপনারায়ণো জ্যেষ্ঠো যশ্চ**চূড়ামণি**-সংজ্ঞকঃ॥
পরো রত্নেশ্বরো **বাচস্পতি**রন্যস্ত রাঘবঃ।
অন্যো মুরারিগুপ্তোঽভূৎ যঃ **শিরোমণি**-সংজ্ঞকঃ॥'
(চন্দ্রপ্রভা)

'সার্ব্বভৌমো **নরহরিঃ** ভরদ্বাজকুলোদ্ভবঃ।
বিদ্যাধরোঽনন্তসেনো মুরারিগু**প্তবারিধিঃ**॥
দুর্গাদাস সুতো জজ্ঞে **শিরোমণি**রিতি স্মৃতঃ।
চূড়ামণিরিতি খ্যাতো কনিষ্ঠো রঘুনন্দনঃ॥
গোপীকান্ত-**সরস্বত্যাঃ কণ্ঠাভরণম্** অগ্রজঃ।
রতিকান্ত স্তথা গৌরীকান্তশ্চ রামকান্তকঃ॥
জ্যেষ্ঠো হি **কণ্ঠাভরণং** মধ্যমঃ **কবিভারতী**।
কনীয়ান্ **কণ্ঠহারশ্চ** কন্যয়োরুভয়োঃ পতী॥
গঙ্গাধরশ্চ সেনশ্চ গোপীনাথশ্চ সেনকঃ॥—(কণ্ঠহার)

'সার্ব্বভৌমো জগন্নাথঃ কনীয়ান্ রামচন্দ্রকঃ।
বিদিতসকলশাস্ত্রশ্চ ধার্ম্মিকঃ সত্যসন্ধঃ ॥' (যশোরঞ্জিনী)

বৈদ্যব্রাহ্মণ সমিতির ভুতপূর্ব্ব সভাপতি বৈদ্যরত্ন শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সেনশর্ম্মা বিদ্যাভূষণ, এম্-এ মহাশয় লিখিয়াছেন "আমার বৃদ্ধ প্রপিতামহের নাম ছিল রামমোহন **বিদ্যারত্ন**। ইঁহারা চারি ভাই ছিলেন, রামপ্রসাদ **কবিকঙ্কণ**, রামমোহন **বিদ্যারত্ন**. শঙ্কর কবিরাজ **বাচস্পতি** এবং রঘুনন্দন চূড়ামণি। আমার অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহের নাম ছিল রতিরাম **কবিবল্লভ**। ইঁহারা তিন ভাই ছিলেন, **মহামহোপাধ্যায়** অভিরাম কবীন্দ্র, হরিরাম **সার্ব্বভৌম**, এবং রতিরাম **কবিবল্লভ**। অভিরামের পুত্র দুর্গাদাস 'শিরোমণি।' প্রচীন কালে প্রত্যেক বৈদ্যগৃহেই বৃহস্পতিকল্প পণ্ডিতগণকে বিরাজ করিতে দেখা যাইত।

সাধারণ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা বৈদ্যব্রাহ্মণের উৎকর্ষ।

বাঙ্গালার প্রাচীন বৈদ্যগণ বংশ পরিচয় দিতে সগৌরবে বৈদ্য বলিয়াই পরিচয় দিতেন। সাধারণ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা বৈদ্যব্রাহ্মণদের যে শাস্ত্রসম্মত উৎকর্ষ তাহা অদ্যাপি বিদ্যমান আছে, যথা—

	সাধারণ ব্রাহ্মণ		বৈদ্যব্রাহ্মণ
১।	সাধারণ ব্রাহ্মণের বৃত্তি ছয়টী।	×	বৈদ্যের বৃত্তি সাতটী। (ব্রাহ্মণের ৬ বৃত্তি + চিকিৎসা
২।	সাধারণ ব্রাহ্মণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৃত্তি অধ্যাপনা।	×	বৈদ্যের শ্রেষ্ঠবৃত্তি অধ্যাপনা ও চিকিৎসা; [এজন্য বৈদ্য বলিলে বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ ও চিকিৎসক উভয়ই বুঝায়]
৩।	সাধারণ ব্রাহ্মণের চিকিৎসাবৃত্তি নিষিদ্ধ।	×	বৈদ্যের চিকিৎসাবৃত্তি প্রশংসনীয়।

৪। সাধারণ ব্রাহ্মণের পক্ক ঔষধ সকলের অস্পৃশ্য। × বৈদ্যের পক্ক ঔষধ সকলের আকাঙ্ক্ষণীয়।

[বৈদ্যবৃত্তি বর্ণোত্তমের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সম্প্রদায়ের বৃত্তি, এবং এই জন্যই উহা ব্রাহ্মণ বা অব্রাহ্মণ কোন অধম সম্প্রদায় বা জাতির গ্রহণীয় নহে। 'নত্বেব জ্যায়সীং বৃত্তিম্ অভিমন্যেত কর্হিচিৎ' (মনু ১০।৯৫)—এই জন্যই বঙ্গের সাধারণ ব্রাহ্মণগণ কখনও চিকিৎসা করিতেন না।]

৫। সাধারণ ব্রাহ্মণ দ্বিজ। × বৈদ্য ত্রিজ।

৬। সাধারণ ব্রাহ্মণের উপনয়ন একবার। × বৈদ্যের উপনয়ন দুইবার।

৭। সাধারণ ব্রাহ্মণদের বিদ্যাগত উপাধি যথা, মহামহোপাধ্যায়, বাচস্পতি, শিরোমণি ইত্যাদি। × বৈদ্যের এ সকলই আছে, উপরন্তু মহাসম্মানকর 'কবি-রাজ' উপাধি। [এই উপাধি বাঙ্গালায় বৈদ্যেরই নিজস্ব। পশ্চিমে বিশিষ্ট পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণ ও মহাকবিগণ 'কবিরাজ' উপাধি পাইতেন, কিন্তু বঙ্গে প্রত্যেক বৈদ্য-সন্তানই উত্তরাধিকারসূত্রে পূর্ব্বপুরুষদের ঐ উপাধিটী ব্যবহার করেন।]

৮। সাধারণ ব্রাহ্মণ তিন বেদ অধ্যয়ন করেন। × বৈদ্য চারি বেদ অধ্যয়ন করেন, (আয়ুর্ব্বেদ অথর্ব্ববেদেরই অন্তর্ভুক্ত)।

৯। সাধারণ রাঢ়ী ও বারেন্দ্র বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের পাঁড়ে ও ঠাকুর উপাধি নাই। × বৈদ্যের এই দুই উপাধিই বিদ্যমান আছে।

১০। সাধারণ বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের 'মিশ্র' উপাধি নাই।	×	বৈদ্যের আছে।
১১। রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের 'চক্রবর্ত্তী' উপাধি অল্প দিনের।	×	বৈদ্যের চক্রবর্ত্তী উপাধি তদীয় কুলজীতেই দৃষ্ট হয়।
১২। সাধারণ ব্রাহ্মণেরা বৈদ্যদের নিকট হইতে উপাধ্যায় উপাধি ও কৌলীন্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহারা কোন না কোন স্থানের উপাধ্যায়; যথা মুখোপাধ্যায়, 'মুখুটী' গ্রামের, চট্টোপাধ্যায় 'চাটুতি' গ্রামের ইত্যাদি।	×	বৈদ্যরা নিজেদের জন্য কবিরাজ (পণ্ডিতরাজ) উপাধি নিজস্ব করিয়া রাখিয়াছিলেন। ইহা 'উপাধ্যায়' অপেক্ষা অনেক উচ্চ
১৩। সাধারণ ব্রাহ্মণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার, নীচ কর্ম্মে ঘৃণা, স্বজাতি-প্রীতি অপেক্ষাকৃত অল্প;	×	বৈদ্যদিগের মধ্যে এই গুলি এত অধিক যে অন্যের নিকটে আদর্শস্থানীয়।
১৪। শাস্ত্রানুসারে ব্রাহ্মণের প্রত্যহই আয়ুর্ব্বেদ পাঠ করা উচিত।	×	বৈদ্য প্রত্যহ আয়ুর্ব্বেদের অধ্যয়ন, অধ্যাপনা এবং তাহার প্রয়োগ করিয়া থাকেন।
১৫। সাধারণ ব্রাহ্মণ সন্তান স্থানীয় [কারণ বৈদ্য হইতেই সাধারণ ব্রাহ্মণের উৎপত্তি]	×	বৈদ্যব্রাহ্মণ পিতৃস্থানীয়।
১৬। সাধারণ ব্রাহ্মণ বৈদ্যকে গুরুবৎ জ্ঞান করিয়া নমস্কার করিবেন, ইহাই শাস্ত্রাদেশ।	×	বৈদ্য সাধারণ ব্রাহ্মণের গুরুস্থানীয় এবং তিনি অকারণে ব্রাহ্মণকে নমস্কার করিবেন না।

প্রমাণ, যথা—১। ‘গুরুবৎ ভাবয়েৎ রোগী বৈদ্যং তস্য নমস্ক্রিয়াম্।
মুনয়ো যদি গৃহ্ণন্তি তে ধ্রুবং দীর্ঘরোগিণঃ॥”

২। “বৈদ্যো নারায়ণঃ স্বয়ম্”।

৩। “দ্বিজেষু বৈদ্যাঃ শ্রেয়াংসঃ”।

৪। বৈদ্য পুণ্যতম মান বৃত্তিতে স্থিত।

৫। ‘বৈদ্যঃত্রিজঃ’।

৬। মেগাস্থিনিসের সাক্ষ্যানুসারেও বৈদ্য সাধারণ ব্রাহ্মণের নমস্য।

পাঠকবর্গের প্রতি

এই গ্রন্থে রঘুনন্দন-কুল্লূকাদির বিদ্বেষপূর্ণ উক্তি, যাজন-ব্রাহ্মণদের গালিবাক্য এবং সত্যেন্দ্রবাবু ও কালীবাবুর নানারূপ গ্লানিপূর্ণ কথার প্রতিবাদ করিতে হইয়াছে। সমাজ বিপ্লবের সময়ে সামাজিক অবস্থার কথাও বলিতে হইয়াছে। গ্রন্থের ৩৪৪—৩৩৬ পৃষ্ঠা দেখিলেই বুঝিবেন, কদাচার বা শূদ্রাচার প্রকাশ করিয়া কাহারও নিন্দা বা অন্যের বড়াই কর গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য নহে। গ্রন্থ-মুদ্রণ সময়ে কোন কোন অংশ দেখিয়া কেহ কেহ এইরূপ সন্দেহ প্রকাশ করায় এ স্থানে ইহা লিপিবদ্ধ করিতে হইল। রাঢ়-বঙ্গ উভয় সমাজই এক অভিন্ন বস্তু। কে কাহার নিন্দা করিয়া সুখী হইবে? এরূপ সন্দেহ কেহ ভ্রমেও মনে স্থান দিবেন না।

ভ্রম সংশোধন

কয়েকটী প্রধান প্রধান ভ্রম সংশোধিত করিয়া দেওয়া হইল—

পৃঃ ১৲, ১৫ পংক্তিতে ‘মৌলিক-ভ্রম’ স্থলে ‘২। মৌলিক ভ্রম’

পৃঃ ১৴• ১৪ পংক্তিতে ‘মজ্জাগত ভ্রম’ স্থলে ‘৩। মজ্জাগত ভ্রম’

পৃঃ ১৵• ১০ পংক্তিতে ‘কালীবাবুর’ স্থলে ‘৪। কালীবাবুর’

পৃঃ ২/০ ১১ পংক্তিতে 'মিথ্যার' স্থলে '৫। মিথ্যার'

পৃঃ ২।/০ ১৪ পংক্তিতে 'কালীবাবু' স্থলে '৬। কালীবাবু'

পৃঃ ২॥৶০ ২০ পংক্তিতে '৫' স্থলে '৬'।

ঐ ২১ পংক্তিতে 'ঐ' স্থলে '৭। ঐ'

পৃঃ ১১, ১৮ পংক্তিতে 'এবং প্রায় প্রতি গৃহে' স্থলে 'বহু বৈদ্য গৃহে'।

১২ পৃঃ ১ পঙক্তি—'প্রতিবাদেরা' স্থলে 'প্রতিবাদেরও' হইবে।

৩৮ পৃঃ ৬ পঙ্‌ক্তি 'উক্ত মানানাং' স্থলে 'উত্তমানাং' হইবে।

৮০ পৃঃ ২০ পঙ্‌ক্তি—'নবকৃষ্ণ' স্থলে 'রাজকৃষ্ণ' হইবে।

৮০ পৃঃ ২৭ পঙ্‌ক্তি—এ সম্বন্ধে বিপিনমোহন সেন প্রণীত চাঁদরাণী গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

৮১ পৃঃ ৩-৪ পঙ্‌ক্তি—প্রিন্সিপাল বিপিনবিহারী গুপ্ত শর্ম্মা। ইনি প্রসিদ্ধ গণিতাধ্যাপক রায়-বাহাদুর বি-ভি-গুপ্ত। ইনি মুরারি গুপ্তের বংশধর।

৯১ পৃঃ ৩ পঙ্‌ক্তি—বৈদ্য ঈশ্বরপুরী দশনামী সম্প্রদায়ের লোক; অব্রাহ্মণকে দশনামী সম্প্রদায়ভুক্ত করিবার বিধি নাই। ইহাতে প্রমাণ হয়, বৈদ্যগণ চৈতন্যদেবের সময়েও বৈদ্য-শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বলিয়া বিদিত ছিলেন।

৯৩ পৃঃ ৪ পঙ্‌ক্তি—১৮২৫ খৃঃ সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হয়। গীতাচার্য্যের পিতৃমাতুল ৺মধুসূদন রায় ঐ কলেজে টোল বিভাগের জনৈক অধ্যাপক ছিলেন। সরকারী কাগজ-পত্রে তিনি মধুসূদন গুপ্ত শর্ম্মা নামে লিখিত আছেন।

৯৪ পৃঃ ২ পঙ্‌ক্তি—গার্গ্য-গোত্রীয় বৈদ্য কুলজীতে দেখা যায় না, কিন্তু প্রত্যক্ষতঃ আছে। কুলজীতে সকলের কথা থাকে না। কুলজী-লেখক মাত্রেই এ কথা গ্রন্থারম্ভে বলিয়াছেন।

১০৪ পৃষ্ঠা ৬ পঙ্‌ক্তি—'অদ্ভুত সাগর' জ্যোতিষগ্রন্থ। ইহার পরিবর্ত্তে বোপদেবের 'পদার্থাদর্শ' বা 'শ্রাদ্ধকাণ্ড-দীপিকা' পড়িতে হইবে।

১১৪ পৃষ্ঠা ২০ পঙ্‌ক্তি—'চিকিৎসা' স্থলে 'চিকিৎসাবিক্রয়' হইবে।

১১৪ পৃঃ ২২ পঙ্‌ক্তি 'করিতেন না' স্থলে 'করিয়া দরিদ্রভাবে জীবন যাপন করিতেন না' হইবে।

১১৭ পৃঃ ৯ পঙ্‌ক্তি—'বৈশ্য স্থলে 'বৈশ্য' হইবে।

১৭৯ পৃষ্ঠা ১৮-১৯ পঙ্‌ক্তি—(মনু ৩।১৮ ও বিষ্ণু ২৬অ, ১-৪) দ্রষ্টব্য

১৯১ পৃষ্ঠা ১৬ পংক্তি 'শরীরার্দ্ধং' হইতে বুঝা যায় যে ব্রাহ্মণ পুরুষ $=\frac{1}{2}$ এবং তাহার পত্নী $=\frac{1}{2}$, সে ব্রাহ্মণের কন্যাই হউক, আর ক্ষত্রিয়-বৈশ্যের কন্যা হউক, ব্রাহ্মণের অর্দ্ধাঙ্গী, সুতরাং ব্রাহ্মণী।

১৯৪ পৃঃ ২১ পঙ্‌ক্তি—মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও অম্বষ্ঠ পিতৃবর্ণ ঔরস পুত্র না হইলে,'শৌদ্র' পুত্রের ন্যায় তাহাদেরও 'ক্ষাত্র' ও 'বৈশ্য' সংজ্ঞাদ্বারা পৃথক নির্দ্দেশ করা হইত। শূদ্রাপুত্রকে শৌদ্র বলায়, এবং ক্ষত্রিয়াপুত্র ও বৈশ্যাপুত্রের ঐরূপ পৃথক্ সংজ্ঞা না করায়, (By antithesis) তাহারা যে পিতৃবর্ণীয় ঔরস পুত্র তাহা স্পষ্ট জানা যায়।

২১৬ পৃঃ ফুট্ নোটে—'সর্ব্বাসু স্থলে 'সবর্ণাসু' হইবে। পৃঃ ৯৭—পৃঃ ১১২ অত্যন্ত খারাপ ভাবে মুদ্রিত হইয়াছে। পাঠকগণ অন্যান্য ভুল-ভ্রান্তি কৃপাপূর্ব্বক সংশোধন করিয়া লইবেন।

৩৪০ পৃষ্ঠায় অম্বশব্দের যে অর্থগুলি দেওয়া হইয়াছে তাহা V. S. Apteর অভিধান হইতে।

মোহমুদ্গর

মধ্যযুগ—বাঙ্গালার ঘোর দুর্দ্দিন

যে বরেণ্য ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় বৌদ্ধ-অনাচার প্লাবিত বঙ্গে সমুন্নত বৈদিক ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক আমাদের চির উপেক্ষিত জন্মভূমিকে * জ্ঞানে-গুণে, শৌর্য্যে বীর্য্যে, কৃষি-বাণিজ্যে আর্য্যাবর্ত্তে সকলের শীর্ষস্থানীয় করিয়াছিলেন, নিয়তির ক্রূর পরিহাসে তাঁহাদের সমস্ত সাধনা একদিন কোথায় ভাসিয়া গেল! যে দিন বঙ্গজননীর গৌরবোন্নত মস্তক হইতে স্বাধীনতার স্বর্ণমুকুট খসিয়া পড়িল, যে দিন কান্যকুব্জের বিমূঢ় সন্তানগণ বঙ্গজননীর আরাধ্য দেহে ম্লেচ্ছের দাসত্ব-শৃঙ্খল স্বহস্তে পরাইয়া দিল, সেই দিন হইতে আমরা ঘোর অভিশপ্ত জীবন যাপন করিতেছি। মাতৃহত্যার মহাপাতকে জাতীয় চরিত্র মসীময় আকার ধারণ করিল, সমাজদেহ কুৎসিত ক্ষতে বিকৃত হইয়া খসিয়া পড়িতে লাগিল, ধর্ম্মের নামে লাঞ্ছনা ও অপমানের চূড়ান্ত হইল। ব্রাহ্মণ মরিল। দেবমন্দির বিধ্বস্ত হইল। বিগ্রহ চূর্ণ হইল। দেশ লুণ্ঠিত হইল। শাস্ত্র ভস্মীভূত হইল। সদাচার বিলুপ্ত হইল। যাবনিক ভাষা, যাবনিক পরিচ্ছদ, যাবনিক আচার-ব্যবহার, যবনের সহিত কুটুম্বিতা স্পৃহণীয় হইয়া উঠিল! যবন-শোণিত সম্পর্কও ব্রাহ্মণের জাতিপাতের হেতু বলিয়া গণ্য হইল না! ধর্ম্মের নামে অনন্ত অধর্ম্ম দেশকে ছাইয়া ফেলিল। অত্যাচারে ও প্রলোভনে কত হিন্দু স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিল। কদাচারের বন্যায় দেশ ডুবিল। বহু-বিবাহ প্রথা ব্রাহ্মণসমাজকে রসাতলে প্রেরণ করিল। সকল পাপ গোপন

* প্রাচীন কালে বঙ্গদেশ কৈবর্ত্তাধ্যুষিত ছিল। আর্য্যগণ ম্লেচ্ছদেশ বলিয়া এ দেশে বসবাস করিতে চাহিতেন না।

করিয়া কুলীন ব্রাহ্মণ-পুত্রেরাই সমাজের 'মোড়ল' হইল। কথায় কথায় অন্যান্য সমাজের পাতিত্য ঘোষিত হইতে লাগিল। শূদ্রীভূত ব্রাহ্মণ সমাজকে সকলের উপরে রাখিবার প্রয়োজন হওয়ায় অন্যান্য সকল সমাজকেই শূদ্রাচার গ্রহণ করাইয়া শূদ্র সাজাইতে হইল। বঙ্গের অভিজাত-শ্রেষ্ঠ বৈদ্যব্রাহ্মণ সম্প্রদায়কে পতিত করায় ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণকেও সঙ্গে সঙ্গে পতিত করিতে হইল! কেবল পতিত হইল না যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণের নিজের সম্প্রদায়! তাঁহারা জানিতেন যে, বঙ্গে যদি কোন জাতি সত্য সত্যই পতিত হইয়া থাকে, তবে সে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ, কিন্তু পরের চক্ষে ধূলি দিয়া আপনার প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার ইচ্ছায় তাঁহারা নিজের পাতিত্য গোপন করিলেন এবং অন্যের পাতিত্য প্রায়শ্চিত্তার্হও বিবেচনা করিলেন না! একটা ব্রাত্যকে পুনঃ সংস্কৃত করিলে জলমগ্ন ব্যক্তিকে রক্ষা করার পুণ্য হয় (সম্বর্ত্ত-সংহিতা), প্রায়শ্চিত্তের উপায় জানিয়া তদ্বিষয়ে সুপরামর্শ না দিলে সেই পাপেই পাপী হইতে হয় (অঙ্গিরা), এই সকল শাস্ত্রবাক্য বিস্মৃত হইয়া ব্রাত্যীভূত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে শূদ্রের মত শূদ্রাচার পালন করিতে বাধ্য করিলেন! ব্রাত্যীভূত পতিত যজমানের পৌরোহিত্য যে অধিকতর পাতিত্যজনক তাহাও এই সদ্‌ব্রাহ্মণেরা প্রয়োজনবশে বিস্মৃত হইলেন! বাঙ্গালার সমস্ত জাতিকে শূদ্রত্বের গণ্ডীর মধ্যে টানিয়া আনিয়া নিজ নিজ স্থানে আবদ্ধ রাখিবার উদ্দেশ্যে তাহাদের পাতিত্য সম্বন্ধে নানা গল্প-কথা রচনা করিলেন এবং অধিকাংশকেই অশ্লীল কথায় জন্মগত এক একটা মিথ্যা বিবরণ দিয়া দাগিয়া দিলেন! তদবধি ব্রাহ্মণের মুখনিঃসৃত ঐ বেদবাণীকে বিশ্বাস করিয়া বাঙ্গালী আপনাকে হীন জাতি ভাবিয়া আত্মমর্য্যাদা শূন্য হইয়াছে। তদবধি শূদ্রের মত অশৌচ পালন, শূদ্রের মত পূজা ও শ্রাদ্ধ করা, শূদ্রের মত পরিচয় দেওয়া তাহাদের মজ্জাগত হইল! বৈশ্যাচারী বৈদ্য-

ব্রাহ্মণকেও গায়ত্রী না বলা, ওঙ্কার উচ্চারণ করিতে নিষেধ করা, উপবীত ধারণ সম্বন্ধে মিথ্যা উপদেশ দেওয়া, বিগ্রহ স্পর্শ করিতে নিষেধ করা, শ্রাদ্ধে ও ভোগে আমান্ন ব্যবহারের উপদেশ দেওয়া ইত্যাদি নানা অন্যায় কার্য্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের করণীয় হইল, এবং বৈদ্যপণ্ডিতগণেরও করণীয় হইল ঐ সকল কার্য্যের অনুমোদন করা, প্রতিবাদ না করা বা সহ্য করিয়া থাকা। এই সময়ে দ্বিজকন্যারা দ্বিজের গৃহিণী হইয়াও ওঙ্কার ও বেদমন্ত্রে অনধিকারিণী হইল, বিদ্যাভ্যাস করিলে বা লেখনী-স্পর্শ করিলে বিধবা হয়, এই ভয় দেখাইয়া তাহাদিগকে লেখাপড়া ত্যাগ করান হইল। সূত্রধারী মাকড়শাটাকেও মারিলে ব্রহ্মহত্যা হয় এবং প্রায়শ্চিত্ত না করিলে নরকে গমন অনিবার্য্য, এইরূপ বিধান হইতে ব্রাহ্মণের যজ্ঞসূত্রকেই লোকে ব্রহ্মার ন্যায় ভয় করিতে শিখিল। ব্রাহ্মণের দেখাদেখি সকল জাতিরই এমন ধর্ম্ম-জ্ঞান গজাইয়া উঠিয়াছিল যে, গঙ্গায় সন্তান বিসর্জ্জন দেওয়া, সদ্যোবিধবাদিগকে মৃতপতির সহিত দগ্ধ করা, কুষ্ঠীদিগকে বহ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়া মারা, নববধূকে গুরুর উপভোগে সমর্পণ পূর্ব্বক তাহাকে ‘গুরুপ্রসাদী’ করা প্রভৃতি নানা অকথ্য পাপকার্য্য হিন্দুসমাজে পবিত্র ধর্ম্মানুষ্ঠান বলিয়া গণ্য হইতেছিল! কিন্তু ‘ভরার মেয়ে’ বিবাহ করা, অথবা বালিকা-যুবতী-বৃদ্ধা নির্ব্বিশেষে পৌত্রী-দৌহিত্রীর ও পিতামহী-মাতামহীর সমবয়স্কা শতাধিক স্ত্রী-গ্রহণ, শ্মশাননীত মুমূর্ষুর হস্তে কন্যা সম্প্রদান, বিমাতা-ভগিনী-সগোত্রা-সপিণ্ডা-বিবাহ প্রভৃতি ধর্ম্মকার্য্যে তেজীয়ান্ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদেরই একচেটিয়া অধিকার ছিল।

সুদিনের আশা

তাহার পরে কয়েক শতাব্দী অতীত হইয়াছে। ভগবৎ-কৃপায় এই দীর্ঘ তমোময় যুগের অবসানে উষার আলোক বহন করিয়া

বর্ত্তমান যুগের আবির্ভাব হইয়াছে। সারা পৃথিবীতে এখন গণতন্ত্র ও জ্ঞানের প্রভাব বিস্তার লাভ করিতেছে। বিপন্ন হিন্দু-জাতিও যুগদেবতার অনুগ্রহে এক্ষণে আত্মরক্ষার উপায় দেখিতে পাইয়াছে। বাহিরের নিষ্পেষণ ও শোষণকেও বাধা দিবার জন্য জাতীয় সংঘশক্তি জাগিয়া উঠিতেছে। জাতি-বিদ্বেষরূপ যে সুমহান্ অন্তরায় জাতীয় একতার পথে দণ্ডায়মান ছিল, তাহা ধীরে ধীরে সরিয়া যাইতেছে। পৃথিবীর নানা জাতির সহিত সংস্রবে আমাদের বদ্ধমূল কুসংস্কারগুলি শিথিল হইতেছে, রাজদণ্ডের ভয়ে বহু কুপ্রথা বিলুপ্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণসমাজ যে ভাবে পাতিত্য অস্বীকার করিয়াই বাঁচিয়া গিয়াছিল, আজি প্রত্যেক শিক্ষিত জাতি তাহা বুঝিতে পারিয়া আরোপিত হীনতা হইতে আপনাকে উদ্ধার করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। ভারতবাসী এখন বুঝিয়াছে যে, ভগবান্ কাহাকেও অস্পৃশ্য বা দাস করিয়া সৃষ্টি করেন নাই, লোক-ব্যবহার হইতেই ঐরূপ হইয়াছে এবং লোকসমাজ ইচ্ছা করিলেই অস্পৃশ্যকে স্পৃশ্য এবং শূদ্রকে দ্বিজ করিয়া লইতে পারে, যদি তাহারা সদাচার-পরায়ণ হয়। পরাধীন ভারতবর্ষ বিশাল শূদ্রস্থানে পরিণত হইয়া পৃথিবীর জাতিসংঘে দাসের অধিকৃত স্থানে অধোমুখে দণ্ডায়মান ছিল, এখন তাহার ত্রিশ কোটি উদ্বুদ্ধ সন্তান রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক শূদ্রত্বের প্রতিকারার্থ বদ্ধপরিকর। কেহই আর আপনাকে শূদ্র বলিতে চাহিতেছে না, সকলেই ভারতের স্বাধীন মুক্ত সন্তান, বন্ধনমুক্ত আর্য্য, জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত দ্বিজ। এই আত্মজ্ঞানই হিন্দুজাতিকে ঐক্যে ও স্বাধীনতায় প্রতিষ্ঠিত করিবার একমাত্র অমোঘ উপায়। ইহার সাধনায় অগ্রসর হইয়া দাসজনোচিত ঘৃণ্য সামাজিক আচার ব্যবহারের পরিবর্ত্তনে প্রত্যেক জাতি অপর জাতিকে সাহায্য করিতে উন্মুখ। অতঃপর সমগ্র হিন্দুস্থানে কোন জাতিই অন্যকে

দাস-জাতি বলিয়া অবজ্ঞা করিবে না, বরং দ্বিজত্বসাধর্ম্ম্যে সকলেই সকলকে গৌরব দান করিবে।

হিন্দুস্থানের জাগরণ

হিন্দুস্থানের জাগরণ শ্রীভগবানের ঈপ্সিত। তাঁহারই পাঞ্চজন্য নিনাদে নিখিল ভারতের নিদ্রাভঙ্গ হইতেছে। তাঁহারই জীবনদায়িনী বাণী দিকে দিকে জাতীয় সংস্কারের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। বঙ্গের সকল সমাজই আবশ্যক সংস্কারের প্রতি মনোনিবেশ করিয়াছে। শূদ্রত্বের কলঙ্ক তাহাদের অসহ্য হইয়াছে। বিদ্যা ও বিনয় অভিমান-শূন্য ক্ষুদ্রতাকে মাথা পাতিয়া স্বীকার করিতে পারে, কিন্তু পরপদ-লেহিনী শূদ্রতা একেবারেই অসহ্য, উহা জাতীয় আত্মহত্যার তুল্য। সমগ্র হিন্দুস্থান আজ শূদ্রত্ব পরিহার পূর্ব্বক রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক স্বরাজ লাভের দাবী করিতেছে। ইহা সঙ্গত, কারণ ব্রাহ্মণত্ব বা দ্বিজত্ব স্বাধীনতারই নামান্তর এবং স্বাধীনতা ও শূদ্রত্ব কুত্রাপি একত্র অবস্থান করিতে পারে না।

এই যে সামাজিক উন্নতির চেষ্টা, ইহা বিপ্লব নহে, ইহা কালজীর্ণ সমাজের কালোচিত সংস্কার। হিন্দুজাতি আপনার বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া বৈদিক ধর্ম্ম ও সদাচারের অনুসরণ পূর্ব্বক অভিলষিত পরিবর্ত্তনের পথে অগ্রসর হইতেছে। শ্রীভগবানের আশীর্ব্বাদ, কর্ম্মিবৃন্দের একাগ্র নিষ্ঠা ও পরস্পরের সহিত নির্ব্বিরোধ ব্যবহার জাতীয় তপস্যাকে সাফল্য-মণ্ডিত করিবে।

বৈদ্য-ব্রাহ্মণ সমিতির পরিচয়

বৈদ্য-ব্রাহ্মণ সমাজের সামাজিক ও আধ্যাত্মিক শ্রেয়ঃ সাধনের জন্য বৈদ্য-ব্রাহ্মণ সমিতি নামক একটী সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। ইহা নিতান্ত আধুনিক অনুষ্ঠান নহে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যে

ঋষিকল্প বৈদ্যমনীষী সমগ্র ভারতে অলৌকিক প্রতিভা-সম্পন্ন অদ্বিতীয় পণ্ডিত বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, সেই গঙ্গাধর-সদৃশ গঙ্গাধর বঙ্গীয় বৈদ্যের ব্রাহ্মণ্য সম্বন্ধে সাধারণের প্রমাদ ভঞ্জনপূর্ব্বক * প্রত্যেক বৈদ্য-হৃদয়ে এই জাতীয় অনুষ্ঠানের হৈম ভিত্তি স্থাপন করিয়া যান। পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী সাধনার দ্বারা জীবনের প্রতি কার্য্যে বৈদ্যের ব্রাহ্মণ্য সপ্রমাণ করিয়া তদুপরি যে মণিময় মন্দিরের সূচনা করেন, বেদাচার্য্য উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় তাহার সুবর্ণশীর্ষে জয় পতাকা উড্ডীন করিয়া তাহার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বৈদ্য ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের বশিষ্ঠ-কল্প পুরোধা পণ্ডিত প্যারীমোহন 'বৈদ্যবর্ণ-বিনির্ণয়' গ্রন্থে ৪০ বৎসর পূর্ব্বে ও কবিরাজ গোপীচন্দ্র ২৫ বৎসর পূর্ব্বে 'বৈদ্যপুরাবৃত্ত' নামক পুস্তকে বিপুল গবেষণা পূর্ব্বক বৈদ্যের মুখ্য ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদন পূর্ব্বক মন্দির বেদিতে এক অপূর্ব্ব দেব বিগ্রহ স্থাপন করিয়াছিলেন। অনন্তর বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে বহু মনীষী বৈদ্যপণ্ডিত এ বিষয়ে পুস্তকাদি প্রচার করিয়া বৈদ্যসমাজে বিপুল উৎসাহের সৃষ্টি করেন। 'ধন্বন্তরি' পত্রিকা প্রথম ও দ্বিতীয় পর্য্যায়ে প্রতি বৈদ্যগৃহে ব্রহ্মণ্যদেবের আবাহনী গাহিয়াছিল, মহামহোপাধ্যায় ৺দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রণীত 'অম্বষ্ঠ কোন্ বর্ণ', কবিচন্দ্রোপাধিক শ্রীরামকমল প্রাণাচার্য্য প্রণীত 'বৈদ্যত্রিজাতি-সংগ্রহ সংহিতা', ৺বসন্তকুমার সেন-শর্ম্মা প্রণীত 'বৈদ্যজাতির ইতিহাস', শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ সেন শর্ম্মা কবিরত্ন মহাশয় প্রণীত 'বঙ্গীয় বৈদ্যজাতি', শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন সেন শর্ম্মা প্রণীত 'বৈদ্যতত্ত্ব সংগ্রহ', মৎপ্রণীত 'বৈদ্যজাতির উৎপত্তির ইতিহাস' ইত্যাদি

* কবিরাজ গঙ্গাধর কবিরত্ন মহাশয় প্রমাদভঞ্জনী নাম্নী বিস্তীর্ণ মনুটীকায় বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। তিনি এ বিষয়ে একখানি বাঙ্গালা পুস্তকও লেখেন, তাহা এখন পাওয়া যায় না।

অগণিত পুস্তক বৈদ্যসমাজকে জাতীয় সদাচার পালনের দ্বারা ব্রহ্মণ্যদেবের পূজাসম্ভার সংগ্রহে উদ্বুদ্ধ করে। তখন কি রাঢ়ীয় কি বঙ্গীয় কোন সমাজে এমন এক ব্যক্তিও বিদ্যমান ছিলেন না, যিনি আপনার হৃদয়াসনস্থিত দেবতার ব্রাহ্মণ্যে সংশয়ান ছিলেন, অথবা তদ্বিরুদ্ধে কিছু বলিয়াছিলেন বা লিখিয়াছিলেন।

প্রাচীন বৈদ্য পণ্ডিতগণের শতাব্দী-ব্যাপী আয়োজনে যে কিছু ত্রুটি ছিল, তাহা সম্প্রতি সংশোধন পূর্ব্বক ভারতগৌরব মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন দেবশর্ম্মা সরস্বতী মহোদয় ভক্ত-পরায়ণ সহকারিবৃন্দের সহায়তায় মহামহোৎসবে যে সত্য দেবতার ষোড়শোপচারে পূজা আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা প্রত্যেক বৈদ্যের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়, পরম রমণীয় ও ভজনীয়। এই বৈদ্যব্রাহ্মণ সমিতির ন্যায় পবিত্র তীর্থস্থান বৈদ্যের আর দ্বিতীয় নাই। আপাততঃ চারি বৎসর মাত্র পূর্ব্বে গঠিত হইয়া থাকিলেও, ইহা শত বৎসরের সাধনার পরিণতি, সহস্র সহস্র ভক্তের আকুল উচ্ছ্বাসের বহিঃপ্রকাশ! বৈদ্যব্রাহ্মণ সমিতির রাঢ়-বঙ্গে বিস্তৃত অসংখ্য শাখা এই উক্তির সত্যতা সপ্রমাণ করিতেছে।

বৈদ্য-ব্রাহ্মণ সমিতির উদ্দেশ্য

জননী যেমন সন্তানের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণসাধনে সতত সমুৎসুক, বৈদ্যব্রাহ্মণ সমিতিও তদ্রূপ বৈদ্যসম্প্রদায়ের সর্ব্ববিধ কল্যাণসাধনে যত্নবতী। বৈদ্যব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের সর্ব্বতোমুখী শ্রীবৃদ্ধিই এই সমিতির উদ্দেশ্য। স্বজাতীয় ধর্ম্ম ও সদাচার রক্ষা, লুপ্তপ্রায় জাতীয় গৌরবের উদ্ধার, দুঃস্থ বৈদ্যসন্তানের জীবিকার ব্যবস্থা, পণপ্রথার প্রতীকার, ছিন্নভিন্ন বৈদ্যসমাজ গুলিকে একাচারনিষ্ঠ করিয়া সম্মিলিত করিবার চেষ্টা, সংঘশক্তি গঠন এবং সংঘশক্তির আশ্রয়ে বিবিধ উন্নতিকর কার্য্যের অনুষ্ঠান সমিতির আকাঙ্ক্ষিত। বৈদ্যব্রাহ্মণ সমিতি কোনও জাতির

সহিত বিরোধিতা করিতে চাহে না। সকল জাতির প্রতি সহানুভূতি-পূর্ণ ব্যবহার দ্বারা হিন্দুজাতির অভ্যুত্থানে সহায়তা করাই তাহার অন্তরতম উদ্দেশ্য।

ব্রাহ্মণাচার গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা

এই সকল উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সর্ব্বাদৌ বৈদ্যের ব্রাহ্মণাচার গ্রহণ-পূর্ব্বক সংঘবদ্ধ হওয়া আবশ্যক। প্রথমে গৃহ, পরে পালঙ্কাদি বিবিধ আস্‌বাব-উপকরণ, এই কথাটা মনে রাখিয়া সমিতি সমাজগৃহের সংস্কারে সর্ব্বাগ্রে মনোনিবেশ করিয়াছেন। সমাজগৃহ সুসংস্কৃত না হইলে, অন্যান্য অনুষ্ঠানের প্রতি মনোনিবেশ করা যায় না। ব্রাহ্মণাচার প্রবর্ত্তন দ্বারা সমগ্র বৈদ্যসমাজকে সমিতির পৃষ্ঠপোষকরূপে সংঘবদ্ধ করিয়া সত্যধর্ম্মের প্রভাবে জাতীয় আত্মপ্রত্যয়, সংযম ও সদাচারকে ফুটাইয়া তুলিতে পারিলে, পণপ্রথাদি অন্যান্য কদাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা ও জয়লাভ সম্ভবপর হইবে।

বৈদ্যসম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণত্ব প্রচার বা ব্রাহ্মণত্ব প্রতিষ্ঠাই বৈদ্যব্রাহ্মণ সমিতির একমাত্র উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু ইহারই আশ্রয়ে আমাদের সর্ব্ববিধ ঐহিক ও পারমার্থিক মঙ্গল সম্ভব হওয়ায়, এবং অন্য কোন উপায়ে তাহা সম্ভব না হওয়ায়, সর্ব্বাগ্রে বৈদ্যসমাজের সর্ব্বত্র ব্রাহ্মণাচার প্রচলনের জন্যই সমিতি বিশেষ চেষ্টা করিতেছে।

সমিতি নিখিল বৈদ্যব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষিত

বৈদ্যব্রাহ্মণ সমিতির কার্য্যাবলী আচার্য্য গঙ্গাধর প্রমুখ প্রাচীন বৈদ্যপণ্ডিতদিগের মতানুসারিণী, ৺মহামহোপাধ্যায় দ্বারকানাথ, পরমহংস শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী, মহামহোপাধ্যায় গণনাথ, বৈদ্যরত্ন যোগীন্দ্রনাথ প্রভৃতি ভারতবিখ্যাত পণ্ডিতমণ্ডলী দ্বারা সমর্থিত, অশীতি সহস্র বৈদ্যসন্তানের ঐকান্তিক আনুকূল্য দ্বারা পৃষ্ঠপোষিত।

যাঁহারা ধর্ম্মে অনাস্থা প্রযুক্ত সমাজ-বন্ধনকে উপেক্ষা করিয়া এখনও সমিতির সহিত সহযোগিতা করিতে অগ্রসর হন নাই, তাঁহাদের পিতা ও পিতামহাদি গঙ্গাধরের বাণী শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহারা জীবিত থাকিলে আজ তদীয় সন্তানেরা কিছুতেই জাতীয় কর্ত্তব্য পালনে ঔদাসীন্য অবলম্বন করিতে পারিতেন না। কিন্তু ইঁহারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উদাসীন হইলেও কার্য্যতঃ কোনরূপ বিরোধিতা করেন না; বরং অনেক ক্ষেত্রে একটু বুঝাইলেই আনন্দের সহিত সমিতির সেবায় আত্মনিয়োগ করেন।

সমিতির উচ্ছেদে অগ্রসর—শ্রীযুক্ত কালীচরণ সেন! *

এই জননীরূপিণী সমিতির গ্লানিজনক নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছেন গৌহাটীর গবর্ণমেণ্ট প্লীডার রায় বাহাদুর কালীচরণ সেন, বি-এল্, ধর্ম্মভূষণ মহাশয়। কালীচরণ বাবু প্রবীণ উকিল, বহুকাল দক্ষতার সহিত সরকারি উকিলের কার্য্য করিয়া রাজপ্রদত্ত সম্মানে ভূষিত হইয়াছেন; যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণও তাঁহার ধর্ম্মনিষ্ঠায় প্রীত হইয়া তাঁহাকে 'ধর্ম্মভূষণ' উপাধিতে মণ্ডিত করিয়াছেন। আমরা আশা করিয়াছিলাম, ধর্ম্মভূষণ মহাশয় বৈদ্যসন্তানের ধর্ম্মরক্ষার আন্দোলনে নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মভূষণ উপাধির সার্থকতা করিবেন। আমরা মনে করিয়াছিলাম, বৈদ্যপণ্ডিতগণের শাস্ত্রবিদ্যার সহিত তাঁহার ব্যবহার-বিদ্যা-মার্জ্জিত বাগ্মিতা মিলিত হইয়া সুষুপ্ত বৈদ্য হৃদয়েও অপূর্ব্ব উন্মাদনার সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইবে, নিস্তেজ প্রাণকে উত্তেজিত

* বলিতে লজ্জা হয়, আর একটী লোক সম্প্রতি কালীবাবুর পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। মোহমুদ্গরের দ্বিতীয় খণ্ডে পাঠকগণ ইঁহাকেই বিশেষভাবে দেখিতে পাইবেন। ইঁহারা দুই জনেই ফরিদপুর নিবাসী।

করিবে, বৈদ্যের ব্রাহ্মণাচার গ্রহণ ২।৩ বৎসরের মধ্যেই সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু হায়, কাহার নিদারুণ অভিশাপে মহারাজ রাজবল্লভের বংশধর আজ নিখিল বৈদ্যসমাজের বিরুদ্ধাচারণ করিয়া তদীয় শুভ্র যশে দুরপণেয় কলঙ্ককালিমা লেপন করিতে বদ্ধ পরিকর! বিধাতার নিগূঢ় অভিপ্রায় কে বুঝিবে? কিন্তু যাঁহারা শাস্ত্রজ্ঞানে সমগ্র ভারতে অপরাজেয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, সেই ভারত-বিশ্রুত বৈদ্যপণ্ডিতগণের বিরুদ্ধে শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর মহাশয় কি অভিপ্রায়ে এবং কোন্ সাহসে দণ্ডায়মান হইয়াছেন, তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য!

কালীবাবুর গর্হিত আচরণ

শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর কেবল কথা ও কার্য্যদ্বারা প্রতিকূলতা করিয়া নিরস্ত হন নাই; বৈদ্যব্রাহ্মণ সমিতির কার্য্যাবলীর প্রতি তীব্র দোষারোপ করিয়া কাশী, কলিকাতা, বহরমপুর ও অন্যান্য নানা স্থানের নানাবিধ প্রকাশ্য সংবাদ পত্রে বারংবার পত্র ছাপাইয়াছেন (বলাবাহুল্য, এই সকল সংবাদ পত্রে সমিতির কৃত প্রতিবাদ কচিৎ ছাপা হইয়া থাকে), এবং পরিশেষে বৈদ্যব্রাহ্মণ সমিতির সিদ্ধান্তে দোষারোপ করিয়া বৈদ্যপ্রবোধনী নাম্নী সমিতির প্রচার-পুস্তিকার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিয়াছেন। এত বড় দুঃসাহসিকতার কার্য্যে তিনি কিরূপে ও কাহার ভরসায় অগ্রসর হইয়াছেন, তাহা আমাদের অজ্ঞাত। আবহমান কালের প্রসিদ্ধি ও আত্ম-প্রত্যয়ের অনুসরণ করিয়া মহামহোপাধ্যায় ভরত মল্লিক ও গঙ্গাধর হইতে আজ পর্য্যন্ত সকলে বলিতেছেন, বৈদ্য জন্মতঃ ব্রাহ্মণবর্ণ অথবা মুখ্য ব্রাহ্মণ, অতএব ব্রাহ্মণাচারই বৈদ্যের স্বধর্ম্ম, কিন্তু কালীবাবু অদ্ভুত শাস্ত্র-যুক্তির সহিত প্রচার করিতেছেন, বৈদ্য বৈশ্যবর্ণ এবং বৈশ্যাচার পালন পূর্ব্বক ১৫ দিন অশৌচ পালন ও নামান্তে 'গুপ্ত' শব্দ ব্যবহার

করাই তাহার কর্ত্তব্য। কালীবাবুর প্রণীত পুস্তকখানির নাম 'বৈদ্য'। শুনিয়াছি, ইহার প্রায় ১০,০০০ খণ্ড ছাপা হইয়া চারিদিকে বিতরণ হইয়াছে। প্রথম সংস্করণ বৈদ্যপুস্তকে এমন অসম্ভব যুক্তিতর্কের অবতারণা করা হইয়াছিল, এমন ভিত্তিহীন বাক্যকে শাস্ত্রীয় প্রমাণ বলিয়া উপস্থাপিত করা হইয়াছিল যে, তাহাতে লেখকের দুর্গতি দেখিয়া আমরা তাহার কোন প্রতিবাদই আবশ্যক মনে করি নাই। কোন কোন বৈদ্য লেখক কালীবাবুর স্বজাতি-দ্রোহিতায় আত্মসংবরণ করিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহার প্রতি কটূক্তি করিয়াছেন, কিন্তু সমিতি সর্ব্বদাই ঐরূপ কটুভাষা প্রয়োগের নিন্দা করিয়াছেন। কালীবাবু ঐ সমস্ত সমালোচনা পাঠ করিয়া এমনই ধৈর্য্যচ্যুত হইয়াছিলেন যে, তাহাদের প্রতিবাদকল্পে ক্ষিপ্রতার সহিত আরও দুইখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা ছাপাইয়া 'বৈদ্য' পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপাইয়া ফেলিলেন। আমরা শুনিয়াছি, তিনি নাকি ঢাকায় তাঁহার কোন বন্ধুর নিকটে বলিয়াছেন যে, তাঁহার দেহে মহারাজ রাজবল্লভের এক বিন্দু শোণিত থাকিতে তিনি এই জাতিদ্রোহকর কর্ম্ম হইতে বিরত হইবেন না এবং বৈদ্যব্রাহ্মণ সমিতির কার্য্যে বাধা দান করিবার উদ্দেশ্যে তিনি ১০,০০০ মুদ্রা ব্যয় করিতেও প্রস্তুত আছেন। কালীবাবু বাঙ্গালার গ্রামে গ্রামে এবং প্রায় প্রতি গৃহে 'বৈদ্য'পুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ করিয়া এবং যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদিগকে সমিতির বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া এ যাবৎ স্বীয় প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছেন।

কালীবাবুর কীর্ত্তি

কালীবাবু মনে করেন, বৈদ্য পুস্তকখানি তাঁহার 'একুশ রত্ন'! কীর্ত্তিমান্ পুরুষ কীর্ত্তির জন্য যে পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহা যে স্বজাতির অভিসম্পাতে অচিরে কাল-সাগরে বিলীন হইবে, তাহা কালীবাবু ভাবেন নাই। উহার প্রথম সংস্করণ খানি দেখিয়া লোকে হাসিয়া-

ছিল। উহা প্রতিবাদেরা অযোগ্য বলিয়া অনেকে উহাকে একেবারেই অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন, কেহ বা মোটা মোটা বিষয়ে লেখকের অসাধারণ অজ্ঞতা ও ভুল ভ্রান্তির আলোচনা করিয়া সাধারণের নিকটে পুস্তকের যথার্থ মূল্য কি, তাহা জানাইয়া দিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যেই বৈদ্য-হিতৈষিণী-নাম্নী সমিতির পরিচালিত মাসিক পত্রিকায় ঐ পুস্তক সম্বন্ধে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেন শর্ম্মা, এম-এ মহাশয়ের সুলিখিত ধারাবাহিক প্রবন্ধও বাহির হয়। জ্ঞানাঞ্জন-গ্রন্থাবলীর দ্বিতীয় শলাকাতে শ্রীযুক্ত যদুনন্দন শর্ম্মা মহাশয়ও কিছু রূঢ় ভাষায় উহার আলোচনা করেন। আমরা মনে করিয়াছিলাম, অতঃপর কালীবাবু নিরস্ত হইবেন। কিন্তু তিনি অধিকতর উৎসাহের সহিত তাঁহার পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির করিয়াছেন। পাকা উকিলের হাতে পড়িলে তদ্বীরের জোরে পচা মামলার চেহারাও যেমন বদ্‌লাইয়া যায়, দ্বিতীয় সংস্করণ 'বৈদ্য' পুস্তক তেমনই যেন কাহার চাতুরীপূর্ণ কৌশলে সাজিয়া গুজিয়া বাহির হইয়াছে। প্রবীণ উকীল মহাশয় এবারে সাবধান হইয়া নিজের পক্ষকে প্রবল করিবার অভিপ্রায়ে নিঃসঙ্কোচে সদসৎ সর্ব্বপ্রকার উপায়ই অবলম্বন করিয়াছেন। 'In love or war there is nothing unfair'—এই বিলাতী নীতি সম্মুখে রাখিয়া তিনি আপনার ধর্ম্মবুদ্ধিতে কোনরূপ আঘাত লাগিতে দেন নাই। শাস্ত্রানভিজ্ঞ পাঠকগণ বিশেষতঃ কালীবাবুর অনুবর্ত্তী ব্যক্তিরা এবং পুরোহিতশ্রেণীর অজ্ঞ-বিজ্ঞ স্বার্থলোলুপ ব্রাহ্মণেরা, যাঁহারা বৈদ্যব্রাহ্মণকে শূদ্র বা অন্ততঃ বৈশ্য করিয়া রাখিতে পারিলেও বড়ই আনন্দিত হন, তাঁহারা এই পুস্তক দেখিয়া মহা সুখী হইয়াছেন। কালীবাবুর কথার সত্যাসত্যতা পরীক্ষা করিবার সামর্থ্য বা সময় যাঁহাদের নাই, সেই সকল যাজক ব্রাহ্মণেরা একজন বৈদ্যের মুখ হইতে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির অনুকূল কথা বাহির হইতেছে দেখিয়া

আনন্দে অধীর হইয়াছেন। অনেক উদাসীন বৈদ্য সন্তান তাঁহার বাক্চাতুর্য্যে মোহিত হইয়া সংশয়াকুল হইয়াছেন। কিন্তু বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা ধর্ম্মভূষণ মহাশয়ের দুঃসাহসে ও কৌশলপূর্ণ অনৃত ভাষণে ধর্ম্মের দোহাই দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছেন। অনেক সময়ে আমাদের এরূপ মনে হইয়াছে যে, ইহা হয় ত আসলেই তাঁহার লেখা নয়, হয় ত ইহা আসামবাসী কোন বৈদ্য-বিদ্বেষী ভট্টাচার্য্যের লিখিত, অথবা কোন ভট্টাচার্য্য তাঁহাকে যেমন বুঝাইয়াছেন, তিনি তেমনই লিখিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত উকিল মহাশয় অনুকূল সত্য প্রমাণের অসদ্ভাব দেখিয়া সমাজ-দরবারে 'যেন তেন প্রকারেণ' মামলা জিতিবার জন্য অসাধু উপায় অবলম্বন করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। বোধ হয় আশা ছিল, প্রতিপক্ষে যখন অধিকাংশই টুলো-পণ্ডিত, তখন এই উপায়েই তাহাদের মুখবন্ধ করিয়া সমাজের নিকটে অনুকূল রায় আদায় করিতে পারিবেন। কিন্তু কৌশল দ্বারাই সর্ব্বত্র জয়লাভ হয় না, কৌশল দ্বারা অধিক কাল লোককে ভুলাইয়া রাখাও চলে না। আপাততঃ কোন কোন বৈদ্যগৃহে উকিল মহাশয়ের পসার-প্রতিপত্তি কিঞ্চিৎ বাড়িলেও মক্কেলগণ যাহাতে শীঘ্রই তাঁহার হাতছাড়া হন, সে ব্যবস্থা আমরা করিতেছি। আমরা মক্কেল এবং উকিল—সকলকেই চাই। এই উদ্দেশ্যেই এই মোহমুদ্গরের আবির্ভাব।

শ্রীযুক্ত কালীবাবুর দ্বারা উৎসাহিত হইয়া মূর্খ পুরোহিতেরা আজ পণ্ডিত সাজিয়াছে। তাহারা বলিতেছে যে, বৈদ্য বৈশ্যবর্ণ, অতএব বৈদ্যের পক্ষে বৈশ্যবৎ কার্য্য করাই শাস্ত্রসম্মত, ব্রাহ্মণবৎ কার্য্য করিলে তদীয় গৃহে আমরা শ্রাদ্ধে যোগদান বা আহার করিব না। শ্রীযুক্ত ধর্ম্মভূষণ মহাশয় এইরূপে স্বধর্ম্মাশ্রয়ী নিরীহ বৈদ্য সন্তানের ধর্ম্ম পালনে ব্যাঘাত জন্মাইয়া যে অধর্ম্ম সঞ্চয় করিতেছেন তজ্জন্য তাঁহাকে শেষে

পরিতাপ করিতেই হইবে। সেই আসন্ন সঙ্কটকালে কেহই তাঁহাকে বাঁচাইতে পারিবে না।

বৈদ্য ব্রাহ্মণ সমিতির কর্ত্তব্য

বৈদ্য ব্রাহ্মণসমিতির কর্ত্তব্য শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুরকে যেরূপে হউক, স্বজাতি-দ্রোহ হইতে নিরস্ত করা। তিনি আমাদেরই একজন। আমরা তাঁহাকে ধর্ম্মনিষ্ঠ বলিয়া শুনিয়াছি। তাঁহার মত প্রবীণ ব্যক্তি বৃদ্ধ বয়সে জেদের বশবর্ত্তী হইয়া অসত্যের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন, ইহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। অথচ তিনিই বৈদ্য পুস্তকের লেখক বলিয়া প্রকাশ। অতএব যদি কেহ তাঁহার যুক্তিতর্কের অসারতা ও প্রমাণাবলীর অসত্যতা অনুধাবন করিয়া কোন রূঢ় কথা কহিয়া থাকে, আশা করি, ধর্ম্মভূষণ মহাশয় তাহাতে বিচলিত না হইয়া সত্যার্থ নির্ণয়ের জন্য অধিকতর যত্ন-পরায়ণ হইবেন। আমাদের বিশ্বাস, এই পুস্তকের সাহায্যে তাঁহার পুস্তকের দোষগুলি উদ্ঘাটিত হইলে তিনি স্বীয় ভ্রমের জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইবেন এবং আমাদিগকে স্নেহভরে আলিঙ্গন দান করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। এস্থলে একটী কথা বলিয়া রাখি, বৈদ্য পুস্তকের প্রকৃত লেখক যিনিই হউন, যে স্থানে দেখিব, তিনি জানিয়া শুনিয়া সত্যের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিতেছেন, সে স্থানে আমরা তাঁহার অপরাধ মার্জ্জনা করিতে পারিব না। কারণ অজ্ঞতা বশতঃ ভ্রম বরং মার্জ্জনীয়, জ্ঞানকৃত অপরাধ কিছুতেই মার্জ্জনীয় নহে।

'বৈদ্য' পুস্তকের সার মর্ম্ম

বৈদ্য পুস্তকের সার মর্ম্ম দুইটি বাক্যে সমাহৃত করা যাইতে পারে—

(১) বঙ্গদেশীয় বৈদ্যগণ জাতিতে অম্বষ্ঠ।

(২) অম্বষ্ঠ জাতি বৈশ্যবর্ণের অন্তর্ভূত।

এই দুইটী অদ্ভুত সিদ্ধান্ত সপ্রমাণ করিবার জন্য তিনি যে ভাবে শ্রম স্বীকার করিয়াছেন, তাহা দেখিলে দুঃখ হয়। বহু স্থানে ধর্ম্ম শাস্ত্রের এমন মজার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, পড়িতে পড়িতে হাস্য সংবরণ করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। তাঁহার শেষ কথা এই, বৈদ্য 'অম্বষ্ঠবর্ণ' বৈশ্য, অতএব তাহার ক্রিয়াকর্ম্ম বৈশ্যবৎ হওয়াই উচিত।

মোহমুদ্গরের সার মর্ম্ম

এই পুস্তক কালীবাবুর বৈদ্যগ্রন্থের খণ্ডন। জ্ঞানাঞ্জন শলাকারূপিণী গুরুকৃপা যাহাদের নয়ন উন্মীলন করিতে পারে নাই, তাহাদের দুর্গম মোহদুর্গ ধ্বংস করিবার জন্যই এই মুদ্গরের সৃষ্টি। ইহার সার মর্ম্ম এইরূপে সন্নিবদ্ধ করা যাইতে পারে—

(১) বঙ্গদেশীয় বৈদ্যগণ জাতিতে অম্বষ্ঠ নহে, ইহারা সনাতন বৈদ্যকুল-জ ব্রাহ্মণ।

(২) অম্বষ্ঠ জাতি বৈশ্যবর্ণের অন্তর্ভূ'ত নহে।

কালীবাবুর অভিমত সত্যবিরুদ্ধ, যুক্তিবিরুদ্ধ, শাস্ত্রবিরুদ্ধ। দুই একটী স্থান ব্যতীত আর কুত্রাপি তাঁহার কোন সিদ্ধান্ত ভ্রমশূন্য দেখিলাম না। এই মিথ্যার রাশি আজ বৈদ্যসম্প্রদায়ের চক্ষে ধর্ম্মভূষণ মহাশয়ের গৌরববৃদ্ধি করিতেছে কি? ধর্ম্মভূষণ মহাশয় যে কতদূর অসাধু সমালোচক, তাহা এইবার দেখাইব।

সমালোচনায় অসাধুতা

বৈদ্যপ্রবোধনী বৈদ্যব্রাহ্মণ সমিতি কর্ত্তৃক প্রকাশিত বহু গবেষণাপূর্ণ পুস্তক। ইহাতে শাস্ত্র, ইতিহাস, লোকব্যবহার, জনপ্রবাদ প্রভৃতির সাহায্যে বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব সপ্রমাণ হইয়াছে। বিশিষ্ট বৈদ্যপণ্ডিতগণ

এই পুস্তক প্রণয়নে সাহায্য করিয়াছেন, কিন্তু স্থানের অল্পতা প্রযুক্ত সকল কথাই সংক্ষেপে বলিতে হইয়াছে। বিস্তীর্ণ গ্রন্থ পাঠ করিবার ধৈর্য্য বা সময় আজকাল কয় জন লোকের আছে? এই জন্যই সংক্ষেপের দিকে কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি ছিল। উপরন্তু স্বজাতীয় শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণ যাহা বলিতেছেন, তাহাতে যে বৈদ্যসমাজের কাহারও সন্দেহ বা বিদ্রোহ হইতে পারে, ইহা তাঁহাদের ধারণাতেই আসে নাই। যাহা হউক, এই সামান্য দোষেই সমস্ত জিনিষটা মিথ্যা হইয়া যাইতে পারে না। গণেশ ঠাকুরের ইঁদুরের লেজটী একটু ছোট আঁকা হইলে, সমস্ত ছবিটাই একেবারে মাটী হইয়া যায় না। বাহনজীর লেজের বাহার একটু কম হইলেও গণেশজীকে সকলেই চিনিতে পারে। কালীবাবু ঐ জাতীয় অতি তুচ্ছ খুঁটিনাটী ধরিয়া বৈদ্যব্রাহ্মণ সমিতির সিদ্ধান্তকে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তজ্জন্য আমাদের দুঃখ নাই। কারণ বিশেষজ্ঞগণ কালীবাবুর অভিপ্রায় সহজেই বুঝিতে পারিবেন। একটা উদাহরণ দিতেছি।

বৈদ্যপ্রবোধনীতে রামায়ণ হইতে একটী শ্লোক উদ্ধার করা হইয়াছে—

কচ্চিদ্দেবান্ পিতৄন্ ভৃত্যান্ গুরূন্ পিতৃসমানপি।
বৃদ্ধাংশ্চ তাতবৈদ্যাংশ্চ ব্রাহ্মণাংশ্চাভিমন্যসে॥

(রামায়ণ, অযোধ্যা, ১০০ সর্গ)

[এই শ্লোকে 'ভৃত্য' শব্দের অর্থ 'চাকর' নহে, হিন্দুপরিবারে যাহারা ভরণীয় তাহাদিগকে 'ভৃত্য' বলা যাইতে পারে, যথা ভার্য্যাদি (মনু, ৪।২৫১), এস্থলে ভরণযোগ্য গুরুগণকে বুঝাইতেছে] রামচন্দ্র ভরতকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, 'হে ভরত, তুমি দেবগণকে, পিতৃগণকে, ভরণীয় ব্যক্তিগণকে, পিতৃতুল্য গুরুজনদিগকে, বৈদ্যগণকে এবং ব্রাহ্মণগণকে সম্বর্দ্ধনা ও সম্মাননা কর ত?" এস্থলে বৈদ্য ও ব্রাহ্মণ

পৃথক্ উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া বৈদ্যগণ অব্রাহ্মণ হইয়া গেল, এমন কেহ মনে করিবেন না। এই 'বৈদ্য' শব্দের অর্থ 'ভিষক্ ব্রাহ্মণ' হইতে পারে, 'বেদজ্ঞ বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ'ও হইতে পারে। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ বা ভূতদয়ার্থ চিকিৎসা-প্রবৃত্ত (ত্রিজ) ব্রাহ্মণ সাধারণ (দ্বিজ) ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহা সত্যেন্দ্র বাবুও তদীয় পুস্তকের ৫২ ও ৫৩ পৃষ্ঠায় পৃথক্ পৃথক্ স্বীকার করিয়াছেন, কেবল ঐ চিকিৎসক ত্রিজ ব্রাহ্মণই যে প্রকৃষ্টরূপে সর্ব্ববিদ্যাবান্ হওয়ায় 'বৈদ্য' শব্দ তাঁহাতেই চরিতার্থ হইয়াছে, ইহা বুঝেন নাই। যাহা হউক, ভগবান্ রামচন্দ্রের ন্যায় ক্ষত্রিয়ের নিকটেও বৈদ্যগণকে ব্রাহ্মণাদির সহিত পূজা পাইতে দেখিলে নিরক্ষর লোকেও বুঝিতে পারে যে, সেই বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণ, তাহারা সেই প্রাচীনকালের 'বৈদ্য' যাহারা "দ্বিজেষু শ্রেয়াংসঃ" বলিয়া বিদিত ছিল।

বৈদ্যপ্রবোধনী এই দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই 'তাতবৈদ্য' শব্দটীকে দুই ভাবে লইয়াছে—

(১) তাতসদৃশাঃ বৈদ্যাঃ, পিতৃবৎ পূজনীয়াঃ বৈদ্যকুলজাঃ চিকিৎসক-ব্রাহ্মণাঃ অর্থাৎ পিতৃতুল্য পূজনীয় চিকিৎসক বৈদ্য-ব্রাহ্মণগণ। এক্ষেত্রে 'তাত' শব্দ পরবর্ত্তী 'বৈদ্য' শব্দের সহিত সমাসবদ্ধ।

(২) 'তাত' শব্দ সম্বোধনে, হে তাত ভরত! বৈদ্যাঃ বেদজ্ঞাঃ চিকিৎসকা বা! এস্থলে দুইটী শব্দ পৃথক্, একত্র সমাসবদ্ধ নহে।

যাহা হউক, দ্বিতীয় পক্ষে 'তাত' শব্দের সহিত সমাস হইল না বলিয়া বৈদ্যের গৌরব কমিয়া গেল না। বৈদ্যের পূজ্যত্বের প্রমাণ সকল শাস্ত্রেই আছে। বেদজ্ঞ ভিষক্ ব্রাহ্মণকে কে না সম্মান করে? চরক বলিয়াছেন—

শীলবান্ গুণবান্ বিপ্র স্ত্রিজাতিঃ শাস্ত্রপারগঃ।
প্রাণিভি র্গুরুবৎ পূজ্যঃ প্রাণাচার্য্যঃ স হি স্মৃতঃ॥—

(সত্যেন্দ্র, পৃঃ ৫২)

['মতিমান্ যুক্তঃ' স্থলে সত্যেন্দ্র বাবু 'গুণবান্ বিপ্রঃ' লিখিয়াছেন ; ভালই করিয়াছেন ।]

বৈদ্য 'প্রাণাচার্য্য', 'গুরুবৎ পূজ্য', 'বিপ্র', 'ত্রিজ' । চরক অন্যত্র বলিয়াছেন, 'কেহই বৈদ্যের নমস্কারের যোগ্য নয়'—

"গুরুবৎ ভাবয়েৎ রোগী বৈদ্যং তস্য নমস্ক্রিয়াম্ ।
মুনয়ো যদি গৃহ্ণন্তি তে ধ্রুবং দীর্ঘরোগিণঃ ॥" - চরক

'শঙ্করবিজয়' গ্রন্থে রহিয়াছে —

'পিতৃকৃতা জনিরস্য শরীরিণঃ
সমবনং গদহারিষু তিষ্ঠতি ।
জনিতমপ্যফলং ভিষজং বিনা
ভিষগসৌ হরিরেব তনুভৃতঃ ।'

অর্থাৎ, পিতা শরীর উৎপাদন করেন, কিন্তু রক্ষার ভার চিকিৎসকের হস্তে । চিকিৎসক ব্যতীত জীবনই নিষ্ফল হইতে পারে, এজন্য শরীরধারী ব্যক্তির নিকটে চিকিৎসক হরির তুল্য পূজ্য ।' বৈদ্যের পূজ্যত্ব সম্বন্ধে ইহার অধিক আর কিছু বলিবার আছে কি ? তবে বৈদ্যগণকে সমাসবদ্ধ 'তাতবৈদ্য' শব্দদ্বারা পিতৃতুল্য বলিলে ক্ষতি কি হইল ? রাজপুতানায় বৈদ্যকে 'বৈজ্জবাপ' বলা হয় । অতএব 'তাত' শব্দ পৃথক্ ভাবে লইলেও যেমন বৈদ্যের পিতৃবৎ পূজনীয়ত্বের কোনরূপ হানি হয় না, সেইরূপ 'তাত' শব্দ বৈদ্য শব্দের সঙ্গে সমস্তভাবে গ্রহণ করিলেও কোনরূপ বিকৃত বা অতিরঞ্জিত অর্থ হয় না, প্রকৃত অর্থেরই বোধ হয় । আর মুদ্রিত রামায়ণে যখন 'তাতবৈদ্যাংশ্চ' এইরূপ সমাসবদ্ধ ভাবে পদটী রহিয়াছে, টীকাকারেরাও কেহ বিরুদ্ধ কথা বলেন নাই, তখন বৈদ্যপ্রবোধনীর কৃত সর্ব্বশাস্ত্রের

অনুকূল অর্থ গ্রহণ করিতে কালীবাবু এত নারাজ কেন? 'তাত' শব্দটী যে বিশ্লিষ্ট করিয়া সম্বোধন পদরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে, তাহা ত বৈদ্যপ্রবোধনীতে (৪ পৃঃ) স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে, তবে 'জাতিতত্ত্ব'-প্রণেতা শ্যামাচরণ বিদ্যাবারিধির শ্যাম আচরণের অনুকরণে এ অর্থশূন্য সমালোচনা কি জন্য? অপর কেহও ত বলিতে পারেন, 'তাতস্য বৈদ্যাঃ' এই অর্থে 'তাতবৈদ্যাঃ'। বস্তুতঃ 'তাত'শব্দ সম্বোধনে প্রযুক্ত হউক, আর নাই হউক, তাহাতে কি আসে যায়? কালীবাবু ৬ই বৎসর পূর্ব্বে যে ব্যর্থ সমালোচনা করিয়াছেন, এই দীর্ঘকালের মধ্যেও তাহার ব্যর্থতা বুঝিয়া দেখিবার সময় সত্যেন্দ্র বাবুর হয় নাই। কালীবাবু যখন প্রবোধনীর পশ্চাতে লাগিয়াছেন, তখন সত্যেন্দ্র বাবুকেও তাহাই করিতে হইবে! এই জন্যই সত্যেন্দ্র বাবু নিজ পুস্তকের ৫১-৫২ পৃষ্ঠাতে রামায়ণ হইতে দশ লাইন পাঠ তুলিয়া মহা আড়ম্বর করিয়াছেন। এইরূপ সমালোচনার দ্বারা মূর্খ পুরোহিত-সমাজকে ভুলান যাইতে পারে, বিদ্বান্ বৈদ্য সমাজে যশস্বী হওয়া যায় না।

সমালোচনায় শঠতা

এই অংশের সমালোচনা করিতে গিয়া বৈদ্য পুস্তকের লেখক যে অসাধু পথ অবলম্বন করিয়াছেন, আমরা তজ্জন্য কালীবাবুকেই দায়ী করিব। কিন্তু কালীবাবু স্বয়ং এরূপ আচরণ করিয়া থাকিলে প্রত্যেক বৈদ্যই লজ্জায় মস্তক নত করিবেন। কালীবাবু বৈদ্য-প্রবোধনীর সমালোচনায় অগ্রসর হইয়া লিখিয়াছেন—

বৈদ্য প্রবোধনী বলিতেছেন—

"উৎকৃষ্ট বিদ্যাসম্পন্ন সর্ব্ববেদজ্ঞ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদিগকেই বৈদ্য বলা হইয়াছে। অতি পূর্ব্বকালে যে বিপ্রগণ সর্ব্ববিদ্যা সম্পন্ন হইয়া চিকিৎসাদ্বারা সর্ব্ববর্ণের রক্ষক বা পিতৃ-স্বরূপ হইতেন, তাঁহাদিগকেই 'বৈদ্য', 'তাতবৈদ্য' (তাত—পিতা) 'সর্ব্বতাত' (সকলের

পিতৃস্বরূপ) প্রভৃতি নাম দেওয়া হইত। ইহাঁরাই লোকানুগ্রহার্থ চিকিৎসা করিতেন বলিয়া 'ভিষক্' এবং আয়ুর্ব্বেদাধ্যয়নার্থ পুনরায় বেদোক্ত আয়ুর্ব্বেদোপনয়ন বিধি অনুসারে উপনীত হইয়া সর্ব্ববিদ্যাবান্ হইতেন বলিয়া 'ত্রিজ' নামে অভিহিত হইতেন। এই সম্বন্ধে প্রমাণ বলিয়া নিম্নলিখিত কয়েকটী বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন—

(ক) "যত্রৌষধী সমগ্মত রাজানঃ সমিতাবিব।

বিপ্রঃ স উচ্যতে ভিষগ্ রক্ষোহামীবচাতনঃ॥—(ঋগ্বেদ, ১০মণ্ডল, ৯৭ সূক্ত)

ইহার সায়ণ ভাষ্য—বিপ্রঃ প্রাজ্ঞো ব্রাহ্মণঃ। অমীবা ব্যাধিঃ তস্য চাতনঃ চাতয়িতা চিকিৎসকঃ॥

যে স্থানে নানাবিধ ওষধি থাকে, সেই স্থানে ওষধি শক্তিজ্ঞ প্রাজ্ঞ ব্রাহ্মণকে ভিষক্ (চিকিৎসক) বলে

(খ) ওষধয়ঃ সমবদন্ত সোমেন সহ রাজ্ঞা।

যস্মৈ কৃণোতি ব্রাহ্মণ স্তং রাজন্ পারয়ামসি॥" ঋক্—ঐ

সায়ণ ভাষ্য—যস্মৈ রুগ্নায় ব্রাহ্মণঃ ওষধিসামর্থ্যজ্ঞো ব্রাহ্মণো বৈদ্যঃ কৃণোতি করোতি চিকিৎসাম্। অর্থ, যে রুগ্নকে ওষধি শক্তিজ্ঞ ব্রাহ্মণ চিকিৎসক চিকিৎসা করেন।

এই দুইটী মন্ত্র দ্বারা কি ইহাই প্রমাণিত হইল, যে চিকিৎসক (বৈদ্য) সেই ব্রাহ্মণ?"

এ স্থলে দ্রষ্টব্য এই যে, বৈদ্যপ্রবোধনীর যে অংশ বৈদ্যপুস্তকে উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহার **প্রথম আট পংক্তি তৃতীয় সংস্করণ হইতে** এবং **পরবর্ত্তী প্রমাণগুলি দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে** উদ্ধৃত করা হইয়াছে। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ঋক্‌মন্ত্র দুইটীর যে **বাঙ্গালা অর্থ বৈদ্য-প্রবোধনীর বলিয়া চালান হইয়াছে, তাহা তাঁহার নিজের মনগড়া**! আমরা বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা করিতেছি, তৃতীয় সংস্করণ বৈদ্য-প্রবোধনী কালীবাবুর চক্ষের সম্মুখে থাকিতেও প্রমাণ উদ্ধারের বেলা সহসা দ্বিতীয় সংস্করণের আমদানি কেন হইল? তৃতীয় সংস্করণের প্রবোধনীতে মহীধর-কৃত

সুবিস্তৃত ভাষ্য ও তাহার বিশদ বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইয়াছে। মহীধরের ভাষ্য সায়ণাচার্য্যের ভাষ্য অপেক্ষা সমধিক প্রামাণ্য ও পরিস্ফুট, তাহা গোপন করিয়া কালীবাবু কি উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় সংস্করণের সায়ণভাষ্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা সুধী সমাজ ভাবিয়া দেখিবেন। বৈদ্য-প্রবোধনীর বিরুদ্ধে ধোঁকা ও ধাপ্পা* দিয়া যেরূপে হউক ডিক্রি আদায় করিতে হইবে বলিয়া সাক্ষ্যের গোলমাল করা এবং সাক্ষীকে আহ্বান না করা প্রবীণ উকিল ধর্ম্মভূষণ মহাশয়ের পক্ষে কি শোভন হইয়াছে? বৈদ্যপ্রবোধনীতে ঋক্‌মন্ত্র দুইটীর যে ব্যাখ্যা আছে, তাহা না দিয়া নিজের মনগড়া অসঙ্গত ব্যাখ্যা বৈদ্যপ্রবোধনীর স্কন্ধে চাপাইয়া যাহাতে বৈদ্যপ্রবোধনী হাস্যাস্পদ হয়, সে চেষ্টা কেন? প্রথম ঋকের বাঙ্গালা ব্যাখ্যায় প্রবোধনীতে রহিয়াছে, "তোমরা তোমাদের আশ্রিত যে **বিপ্রের** নিকটে গমন কর, **তাহাকেই** ভিষক্‌ বা বৈদ্য বলা যায়।" দ্বিতীয় ঋকের ব্যাখ্যায় "ওষধিসামর্থ্যজ্ঞ যে **ব্রাহ্মণ অর্থাৎ বৈদ্য** রুগ্নের চিকিৎসা করেন" এইরূপ আছে। পূর্ব্বমন্ত্রে **ব্রাহ্মণকে** 'ভিষক্‌' বলা হইয়াছে, এবং পরবর্ত্তী মন্ত্রে **ভিষকের** পরিবর্ত্তে 'ব্রাহ্মণ' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা স্বয়ং বেদপুরুষের সাক্ষ্য। একমাত্র ব্রাহ্মণই ভিষক্‌ না হইলে বেদপুরুষ প্রথম মন্ত্রে "বিপ্রঃ স উচ্যতে ভিষক্‌" না বলিয়া "**নরঃ** স উচ্যতে ভিষক্‌" এবং দ্বিতীয় মন্ত্রে "যস্মৈ কৃণোতি ব্রাহ্মণঃ" না বলিয়া "যস্মৈ কৃণোতি **মানবঃ**" এইরূপই বলিতেন। ধর্ম্মভূষণ কালীবাবু স্বয়ং ভগবান্‌কেও মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়াইতে ইতস্ততঃ করেন নাই! আবার বৈদ্যপ্রবোধনীর অনুবাদ বলিয়া নিজের মনগড়া কথা চালাইয়াছেন! তিনি প্রথম মন্ত্রের ব্যাখ্যায় চুপি চুপি

* এরূপ ভাষা আমরা কালীবাবুর কাছেই শিখিয়াছি। 'বৈদ্য' পুস্তকে ১০৮ পৃষ্ঠায় তিনি বৈদ্যব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের প্রতি এইরূপ ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন।

লিখিয়াছেন—"ওষধি শক্তিজ্ঞ প্রাজ্ঞ ব্রাহ্মণকে ভিষক্ বলে"। এস্থলে 'ব্রাহ্মণকে' না বলিয়া 'ব্রাহ্মণকেই' বলিলে তবে ঋক্‌মন্ত্রের মর্ম্ম ও প্রবোধনীর অনুবাদের প্রতি সুবিচার করা হইত। 'ব্রাহ্মণকেই' না বলিয়া 'ব্রাহ্মণকে' বলায় ক্ষত্রিয়-বৈশ্যাদির নিবৃত্তি হইল না, অর্থাৎ ওষধি-শক্তিজ্ঞ প্রাজ্ঞ ক্ষত্রিয়াদিও 'ভিষক্'-পদবাচ্য হইতে পারে, এরূপ ইঙ্গিত রহিল। পরবর্ত্তী মন্ত্রের ব্যাখ্যাতেও কালীবাবু ঐরূপ চাতুরী দেখাইয়া লিখিয়াছেন—"ওষধিশক্তিজ্ঞ ব্রাহ্মণ চিকিৎসক চিকিৎসা করেন"। এস্থলেও এই ইঙ্গিত রহিয়াছে যে, ওষধি-শক্তিজ্ঞ ক্ষত্রিয়াদিও ঐ কার্য্য করিতে পারেন। অতঃপর কালীবাবু পরিহাস পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিতেছেন—"এই দুইটী মন্ত্রদ্বারা কি ইহাই প্রমাণিত হইল, যে চিকিৎসক সেই ব্রাহ্মণ?" আরও আশ্চর্য্য এই যে, বৈদ্যপ্রবোধনীর সমালোচনার বেলা এই কথা, অথচ বেশী দূরে নয়, ছয় পংক্তি নিম্নে, নিজের যেমন আবশ্যক হইয়াছে, অমনই বলিয়াছেন, "**ব্রাহ্মণগণই** ঐ শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিতেন।...যখন অম্বষ্ঠ জাতির উৎপত্তি হইল, তখন **ঋষিগণ** অম্বষ্ঠ জাতির চিকিৎসাবৃত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়া আয়ুর্ব্বেদখানি তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিলেন **তদবধি ব্রাহ্মণগণ** কর্ত্তৃক চিকিৎসা ব্যবসায় পরিত্যক্ত হইল।" কি ঐতিহাসিক গবেষণা! আমরা ইহা কিছু পরে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিব, এক্ষণে শুধু এই টুকু মাত্র দেখাইতেছি যে, যে কালীবাবু নিজের দায়ে স্বীকার করিতেছেন যে, প্রাচীনতম কালে ব্রাহ্মণগণই চিকিৎসাশাস্ত্রের অধ্যাপনা ও চিকিৎসা করিতেন, সেই কালীবাবুই বৈদ্যপ্রবোধনীকে আক্রমণ করিবার প্রয়োজন হওয়ায় বৈদিক যুগের চিকিৎসকের স্বরূপ অনায়াসে ভুলিতে পারিলেন, বেদমন্ত্রের বিকৃত ব্যাখ্যা করিলেন, প্রবোধনীর ব্যাখ্যাকে বিকৃত ভাষায় পরিবর্ত্তিত করিলেন এবং পরিশেষে পরিহাস করিবারও সাহস হইল!

আমরা বৈদ্যপ্রবোধনীর তৃতীয় সংস্করণে ঐ উদ্ধৃত অংশ কিরূপ আছে, তাহা দেখাইতেছি—

"উৎকৃষ্ট-বিদ্যাসম্পন্ন. সর্ব্ববেদজ্ঞ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদিগকেই '**বৈদ্য**" বলা হইয়াছে। অতি পূর্ব্বকালে যে বিপ্রগণ সর্ব্ব-বিদ্যাসম্পন্ন হইয়া চিকিৎসা দ্বারা সর্ব্ববর্ণের রক্ষক বা পিতৃস্বরূপ হইতেন, তাঁহাদিগকেই 'বৈদ্য', 'তাত-বৈদ্য' (তাত = পিতা), 'সর্ব্বতাত' (সকলের পিতৃস্বরূপ) প্রভৃতি নাম দেওয়া হইত। ইহাঁরাই লোকানুগ্রহার্থ চিকিৎসা করিতেন বলিয়া 'ভিষক্' এবং আয়ুর্ব্বেদাধ্যয়নার্থ পুনরায় বেদোক্ত আয়ুর্ব্বেদোপনয়ন বিধি অনুসারে উপনীত হইয়া সর্ব্ববিদ্যাবান্ হইতেন বলিয়া 'দ্বিজ' নামে অভিহিত হইতেন। এই সম্বন্ধে কয়েকটী প্রমাণ যথা—

(১) শ্রৌত ও স্মার্ত্ত প্রমাণ—

"যত্রৌষধীঃ সমগ্মত রাজানঃ সমিতাবিব।
বিপ্রঃ স উচ্যতে ভিষগ্ রক্ষোহামীবচাতনঃ॥"

(ঋগ্বেদ ১০ মণ্ডল ৯৭ সূক্ত ও
যজুর্ব্বেদ (বাজসনেয়ী সংহিতা) ১২।৮০।

অত্র মহীধরভাষ্যম্—'হে ওষধীঃ ওষধয়ঃ, যত্র বিপ্রে ভৈষজ্যকর্ত্তরি ব্রাহ্মণে যূয়ং সমগ্মত সংগচ্ছত রোগং জেতুং, কে ইব রাজান ইব যথা রাজানঃ দমিতৌ যুদ্ধে শত্রূন্ জেতুং গচ্ছন্তি; স ভবদাশ্রিতো **বিপ্রঃ ভিষক্ বৈদ্য উচ্যতে** কথ্যতে। কীদৃশো বিপ্রঃ রক্ষোহা রক্ষাংসি হন্তীতি রক্ষোঘ্নং পুরোডাশং কৃত্বা রক্ষসাং হন্তা রক্ষোপদ্রবনাশকঃ; তথা অমীবচাতনঃ অমীবান্ রোগান্ চাতয়ন্তি নাশয়ন্তি ইতি, ঔষধদানেন রোগনাশকঃ॥'

[অর্থাৎ—সামন্ত রাজগণ যেমন সম্রাটের সহিত সম্মিলিত হইয়া যুদ্ধ জয় করিতে গমন করেন, হে ওষধিগণ, তোমরা সেইরূপ তোমাদের

আশ্রিত যে বিপ্রের নিকট গমন কর, **তাঁহাকেই** ভিষক্ বা বৈদ্য বলা যায়। সেই ভিষক্ পুরোডাশ যজ্ঞ করিয়া রক্ষোভয় নিবারণ করেন এবং ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা রোগ নাশ করিয়া থাকেন]।

"ওষধয়ঃ সমবদন্ত সোমেন সহ রাজ্ঞা।

যস্মৈ কৃণোতি ব্রাহ্মণস্তং রাজন্ পারয়ামসি॥" (ঋক্ ঐ)

অত্র সায়ণঃ—যস্মৈ রুগ্নায় ব্রাহ্মণঃ **ওষধিসামর্থ্যজ্ঞো ব্রাহ্মণঃ বৈদ্যঃ** কৃণোতি করোতি চিকিৎসাম্ [অর্থাৎ—ওষধিগণ তাহাদের রাজা চন্দ্রকে বলিতেছে, হে রাজন্, ওষধি-সামর্থ্যজ্ঞ **যে ব্রাহ্মণ অর্থাৎ বৈদ্য** রুগ্নের চিকিৎসা করেন, তিনি যে রোগীর জন্য আমাদিগকে উৎপাটিত করিতেছেন, তাঁহাকে আমরা রোগমুক্ত করিব, ইত্যাদি]।"

বৈদ্যপ্রবোধনীর প্রকৃত পাঠের সহিত মিলাইলে সকলেই দেখিতে পাইবেন,প্রবোধনীর কথা বলিয়া 'বৈদ্য' পুস্তকে যাহা উদ্ধৃত করিয়া কালীবাবু সমালোচনা করিয়াছেন, তাহা কতদূর বিকৃত। বৈদ্য-প্রবোধনী, তৃতীয় সংস্করণ, ১৩৩৩ সালে মুদ্রিত ; বৈদ্যপুস্তক, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৩৪ সালে মুদ্রিত। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সর্ব্বোপরি যে ৮ পংক্তি প্রবোধনী হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে—তাহা অবিকল ঐরূপ তৃতীয় সংস্করণে আছে, দ্বিতীয় সংস্করণে নাই। অতএব বেশ স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, মুখপাত টুকু ঠিক রাখিয়া দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল প্রমাণ যোজনা করিয়া, নিজের মনগড়া বিকৃত অনুবাদ বৈদ্যপ্রবোধনীর স্কন্ধে চাপাইয়া, একটা অসম্ভব বস্তুকে লোকের চক্ষের সম্মুখে ধরিয়া টিট্‌কারী দেওয়াই ধর্ম্মভূষণ মহাশয়ের সাধু উদ্দেশ্য ছিল !

কিন্তু এরূপ অসাধুতা ধর্ম্মভূষণ মহাশয়ের পক্ষে সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। বৈদ্য যতই নষ্টবুদ্ধি হউক, সে এতদূর নীচ হইতে পারে না। পাঠক ভাবিয়া দেখুন, 'বৈদ্য' পুস্তক পাঠকালে কয়জন লোক

বৈদ্যপ্রবোধনী খুলিয়া এ সকল কথা মিলাইয়া দেখিতে পারে? এরূপ ভাবে 'হয়' কে 'নয়' করিয়া লোকের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপের চেষ্টা কি ভাল? এইরূপ চমৎকার সমালোচনাপূর্ণ পুস্তক দ্বারাই কি বৈদ্যসম্প্রদায়ের ধর্ম্ম রক্ষা হইবে? এই শ্রেণীর সমালোচনার দ্বারাই কি বৈদ্যপ্রবোধনীর খণ্ডন হইবে? যে সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত 'বৈদ্য' পুস্তক পড়িয়া কালীবাবুকে ধন্য ধন্য করিয়াছেন, সে কি তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞানের জন্য, না ব্যবহার-সুলভ চাতুরী ও অসত্য ভাষণের জন্য?*

এই প্রসঙ্গে আমরা চরক, সুশ্রুত ও অভিধানের প্রমাণ হইতে দেখাইব যে, 'ভিষক্' ও 'বৈদ্য' শব্দ চিকিৎসক অর্থে ব্রাহ্মণেই প্রযুক্ত হইত। ভিষকের স্বরূপ নির্ণয়ে আয়ুর্ব্বেদই শ্রেষ্ঠ ও নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ, কারণ তাহাতেই কে ভিষক্ বা বৈদ্য হইবার অধিকারী, তাহা লিখিত হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদীয় অভিধানে 'ভিষক্' শব্দের লক্ষণ প্রদত্ত হইয়াছে, সুতরাং অব্রাহ্মণ ভিষক্ বা বৈদ্য হইতে পারে কি না, তাহা এইক্ষণেই বুঝা যাইবে। কালীবাবু ঋগ্বেদের শ্রৌত প্রমাণের বিরুদ্ধে কথা কহিবার পূর্ব্বে, এই গুলি অনুসন্ধান করিলেই সকল সন্দেহ হইতে মুক্তিলাভ করিতেন, আর অনর্থক অর্থের অপব্যয় করিয়া স্বজাতির বিরুদ্ধে সমরায়োজন করিতে হইত না।

ব্যাধির আক্রমণে মানবজীবন বিপন্ন হইলে যিনি রোগশয্যায় শয়ান রোগীকে পিতার অধিক যত্নে রক্ষা করেন, পিতার অধিক অভয় দান করেন, তিনি পিতৃতুল্য পূজনীয় ত বটেই, উপরন্তু ব্রাহ্মণ

* ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের যে কতদূর অধঃপতন হইয়াছে, ইহা তাহারই প্রমাণ। 'জাতিতত্ত্ব নামক পুস্তকে বৈদ্যকে চণ্ডালসদৃশ অস্পৃশ্য সঙ্কীর্ণ শূদ্র বলিয়া গালি দেওয়ায় যে সকল পণ্ডিত তাহার তারিফ্ করিয়াছিলেন, কালীবাবুর পুস্তকেরও তাঁহারাই তারিফ্ করিতেছেন। তাঁহাদের এরূপ করিবার কারণ এই যে, ঐ পুস্তক দুই খানির মধ্যে কোনটীতেই বৈদ্যদিগকে ব্রাহ্মণবর্ণীয় বলা হয় নাই।

রোগীও তাহার নমস্কার লইবে না, লইলে অল্পায়ু হইবে, ইহা বলিয়া প্রাণাচার্য্য বৈদ্য বা ভিষক্ যে বিপ্রশ্রেষ্ঠ, দ্বিজের উপর ত্রিজ, অতএব সকলের প্রণম্য, ইহা চরক বলিয়াছেন। বৈদ্যের দয়া-প্রবৃত্ত চিকিৎসাবৃত্তি কেবল **ব্রাহ্মণের** জন্যই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। রাগদ্বেষ-বিবর্জ্জিত মুনিগণ ইহা বারংবার বলিয়াছেন। আয়ুর্ব্বেদের আচার্য্যগণ যে সে ব্রাহ্মণকেও আয়ুর্ব্বেদের শিক্ষা দিতেন না, কারণ শাস্ত্র তাদৃশ শিক্ষাদান নিষেধ করিয়াছেন, 'তদ্‌বিদ্যকুলজম্ অথবা তদ্‌বিদ্যাবৃত্তম্... অধ্যাপ্যম্ আহুঃ' (চরক, বিমানস্থান, ৮ম অধ্যায়)। যে যে বংশে আয়ুর্ব্বেদ পুরুষানুক্রমে অনুশীলিত হইত, সেই আদি বৈদ্যব্রাহ্মণ অর্থাৎ অঙ্গিরা, ভরদ্বাজ, মুদ্‌গল, কাশ্যপ ধন্বন্তরি, আত্রেয়, অগস্ত্য প্রভৃতি ঋষিদিগের বংশধরগণকে, অথবা যে ব্রাহ্মণেরা আয়ুর্ব্বেদকে ষট্‌বৃত্তির অধিক সপ্তম বৃত্তিরূপে অবলম্বন করিতেন, (ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য চিকিৎসায় অনধিকারী হওয়ায়) কেবল তাঁহাদিগকেই আয়ুর্ব্বেদ শিখিয়া আর্য্যসমাজে চিকিৎসা করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছিল। যে সে ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যকেও আয়ুর্ব্বেদ শিখান হইত না, যে যে বংশে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা প্রচলিত ছিল, কেবল সেই বংশীয় বিদ্যার্থীরাই বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য আয়ুর্ব্বেদের নির্দ্দেশ মত তাহাতে শিক্ষা পাইত, চিকিৎসা করিবার জন্য নহে (চরক, সূত্রস্থান, ৩০অ)। সাধারণ ব্রাহ্মণ,ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র চিকিৎসায় অনধিকারী, তাহাদের কৃত ঔষধাদিও সকলের অস্পৃশ্য ও সেই ঔষধ সেবন জাতিভ্রংশের কারণ বলিয়া সুপ্রাচীন কাল হইতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। সনাতন বৈদ্যকুলজ ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য শ্রেণীর ব্রাহ্মণও এই ঔষধপাকে অধিকারী নহেন, ইহা সকলেই জানে (কালী বাবুর বৈদ্য পৃঃ ৫—৬; শিবদাস সেন প্রণীত প্রাচীন টীকা, প্রায় ৭০০ বৎসরের পুরাতন)। কিন্তু যে ব্রাহ্মণবংশে আয়ুর্ব্বেদ পুরুষানুক্রমে চিরকাল অধীত হইত, যাঁহারা আয়ুর্ব্বেদেই প্রতিষ্ঠিত, সেই বংশীয় অর্থাৎ বৈদ্যব্রাহ্মণবংশীয় ব্যক্তিরাই বিদ্যা-সমাপ্তিতে চিকিৎসা করিবার যোগ্যতা

অর্জ্জন করিয়া বৈদ্য বা ভিষক্ (Physic) শব্দ দ্বারা পরিচিত হইতে পারিতেন (চরক, চিকিৎসা স্থান, ১ম অধ্যায়)। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বৈদ্যবংশীয় ব্রাহ্মণ না হইলে যেমন আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষায় অধিকার পাওয়া যাইত না, তদ্রূপ তিন বেদ সমাপ্ত না করিয়াও আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন সম্ভব হইত না। আপনার স্বাধ্যায় সহিত অন্যান্য বেদ সমাপনান্তে আয়ুর্ব্বেদ অধীত হইলে বিদ্যাবত্তাসূচক 'বৈদ্য' শব্দ (চরক, চিকিৎসা, ১অ) বিদ্যাস্বামী ব্রাহ্মণে (মনু ২।১১৪ ও ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ) প্রযুক্ত হইয়া চরিতার্থ হইত। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের যেমন বেদপাঠে ও যজনে (নিজের পূজায়) অধিকার আছে, কিন্তু বেদের অধ্যাপনায় ও যাজনে (পৌরোহিত্যে) অধিকার নাই, তদ্রূপ অন্যের চিকিৎসা করিবার অধিকারও তাহাদের নাই। তাহারা তিন বর্ণকে আয়ুর্ব্বেদ অধ্যাপনাও করিতে পারিত না, ইহা বৈদ্যবংশীয় ব্রাহ্মণেরাই করিতে পারিতেন। ক্ষত্রিয় আয়ুর্ব্বেদ পড়িতেন আত্মরক্ষার্থ অর্থাৎ নিজের প্রয়োজনের জন্য, পরের চিকিৎসার জন্য নহে, এবং বৈশ্য বৃত্ত্যর্থ অর্থাৎ কৃষি-বাণিজ্যাদি নিজ জাতীয় বৃত্তির সুবিধার জন্য আয়ুর্ব্বেদীয় গাছ-গাছড়ার চাষ ও আয়ুর্ব্বেদোক্ত বিবিধ দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় বা বাণিজ্যে সুবিধার জন্য যেরূপ আবশ্যক হইত, সেইরূপ অধ্যয়ন করিতেন (চরক, সূত্রস্থান, ৩০ অঃ)। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য প্রয়োজনাভাবে বিবিধ রোগীর সুচিকিৎসার জন্য তন্ন তন্ন করিয়া নিখিল আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়নে বা তৎসংক্রান্ত জটিল সমস্যার সুমীমাংসায় প্রায়শঃ যত্নপর হইতেন না এবং চিকিৎসাধিকার না থাকায় [Physic (Physician) ভিষজ্] ভিষক্ বা বৈদ্য উপাধি পাইতেন না। শাস্ত্রে পরিষ্কার উক্ত আছে. ক্ষত্রিয় আবশ্যক হইলে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে এবং বৈশ্য বৈশ্যকে উপনয়ন দিয়া আয়ুর্ব্বেদ অধ্যাপনা করিতে পারে,—ব্রাহ্মণকে উপনয়ন দিতে বা অধ্যাপনা করিতে পারে না, কিন্তু, '**ভিষক্**' তিন বর্ণকে উপনয়ন দিয়া অধ্যাপনা করিবেন, ইহাই

বিধি (সুশ্রুত, সূত্রস্থান, ২ অঃ)। এখানে ভিষক্ শব্দদ্বারা ব্রাহ্মণকেই বুঝান হইয়াছে এবং এতদ্বারা ইহাও স্পষ্ট বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, ভিষক্ শব্দ কদাপি ক্ষত্রিয়ে বা বৈশ্যে প্রযোজ্য নহে, উহা ব্রাহ্মণেই প্রযোজ্য। পাঠকের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য মূল শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত করিতেছি—ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যানাম্ অন্যতমম্ **ভিষক্** শিষ্য মুপনয়েৎ (সুশ্রুত, সূ, ২ অঃ); পুনশ্চ **ব্রাহ্মণ** স্ত্রয়াণাং বর্ণানাম্ উপনয়নম্ কর্তুমর্হতি, রাজন্যোদ্বয়স্য বৈশ্যো বৈশ্যস্যৈবেতি (সুশ্রুত, সূ, ২ অঃ)। এ স্থলে বলা হইতেছে, কেবল **ব্রাহ্মণই** তিনবর্ণকে উপনয়ন দিয়া আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা দিবেন। তবেই **ভিষক্ যে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোন জাতি নহে, তাহা সপ্রমাণ হইল**। যাহা স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্ম, ধর্ম্মগ্লানি হইলে তাহাও বুঝাইতে এত ক্লেশ পাইতে হয়! কিন্তু ধর্ম্মভূষণ মহাশয়কে আজ ধর্ম্মকথা শুনাইতে হইতেছে, ইহাই আমাদিগের মর্ম্মান্তিক হইয়াছে।

ব্যবহারতঃও কি উত্তর ভারতে, কি দক্ষিণ ভারতে, কি পশ্চিম ভারতে, কুত্রাপি অব্রাহ্মণ 'ভিষক্' বা 'বৈদ্য' দেখা যায় না। কাব্যে, ইতিহাসে বা পুরাণে কুত্রাপি অব্রাহ্মণ বৈদ্যের উল্লেখ নাই। পরীক্ষিৎ, ভীষ্ম, ভোজরাজ প্রভৃতিকে চিকিৎসা করিবার জন্য সমাগত ভিষক্‌গণ সকলেই বিপ্রকুলোদ্ভূত বলিয়া বর্ণিত আছেন।

বৈদ্য বা ভিষক্ বলিলে চিরকাল ভারতীয় হিন্দুসমাজে ও সাহিত্যে সেই ব্রাহ্মণকে বুঝায় যে ব্রাহ্মণ চিকিৎসা করেন। ইহা কুত্রাপি কোন ক্ষত্রিয়কে বা বৈশ্যকে বুঝায় নাই। কোন ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য চরিত্রোৎকর্ষে ব্রাহ্মণতুল্য হইলে তাহার প্রতি ব্রাহ্মণোচিত কুশলপ্রশ্ন করিলে যেমন অন্যায় হইত না, (রঘু, ১।৫৮) তেমনই বিদ্যাবত্তার জন্য বিদ্বান্ অর্থে 'বৈদ্য' শব্দও 'দ্বু' একস্থানে তাহাদের প্রতি প্রযোজ্য দেখা যায়। কিন্তু চিকিৎসাবৃত্তির বিদ্যমানতার উপরেই চিকিৎসকার্থে 'বৈদ্য' শব্দের

প্রবৃত্তি নির্ভর করায়, এই অর্থে 'বৈদ্য' বা 'ভিষক্' শব্দ অব্রাহ্মণের প্রতি প্রযুক্ত হইবার উপায় নাই। ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য পুরোহিত যেমন কুত্রাপি নাই, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য বৈদ্যও তদ্রূপ কোথাও নাই। ক্ষত্রিয় আপন যজন করিতে পারে, কাহারও যাজন করিতে পারে না, এই নিষেধ বৈশ্যের প্রতিও। ক্ষত্রিয় যে সত্ত্বপ্রধান পবিত্র বৃত্তিতে (চিকিৎসায়) অনধিকারী, বৈশ্য যে তাহাতে আরও অনধিকারী, ইহা বলিয়া দিতে হয় না। সে নিজের বৃত্তি অর্থাৎ কৃষি, গোপালন ও ও বাণিজ্যের সুবিধার জন্য পশুচিকিৎসা, বনৌষধিবিজ্ঞান ও দ্রব্যগুণ শিখিতে পারিত। হিন্দুজাতির সমাজসংস্থান হইতেও বুঝা যায় যে, যে চিকিৎসককে চিকিৎসার অঙ্গভূত সমন্ত্রক হোম ও নানাবিধ মন্ত্রক্রিয়া অপরের জন্য করিতে হইত, সেই পরার্থে যজ্ঞকর্ত্তা, প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থাদাতা চিকিৎসক কখনই অব্রাহ্মণ হইতে পারে না (মনু, ১০ অ, ৭৭)। যিনি চারিবর্ণের মুখে অন্তিম জলগণ্ডূষদাতা, যিনি আয়ুর্ব্বেদের রক্ষক, যিনি দ্বিজের উপর ত্রিজ, চাতুর্ব্বর্ণ্যের প্রাণাচার্য্য, চাতুর্ব্বর্ণ্যের নিকট গুরুর তুল্য পূজনীয়, প্রণম্য, শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মতে স্বয়ং নারায়ণের ন্যায়, সেই বৈদ্য শাস্ত্রশাসিত হিন্দুস্থানের কুত্রাপি বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য বর্ণ হইতে পারে না। এক অংশে ব্রাহ্মণ, অন্য অংশে অব্রাহ্মণ, ইহা হইতেই পারে না। ভারতের সর্ব্বত্র বৈদ্য ব্রাহ্মণ, আর বঙ্গে অব্রাহ্মণ, ইহা আরও অসঙ্গত, কারণ বঙ্গীয় বৈদ্যগণই ভারতের আয়ুর্ব্বেদ-গুরু এবং তাহারা যে পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের সারস্বত বৈদ্যবংশ হইতে অভিন্ন, তাহা তাঁহাদের বংশগত প্রাচীন পদবী, গোত্র, বেদশাখা ও সারস্বত প্রসিদ্ধি হইতেও বুঝা যায়। দুর্জ্জয় কুলজীতে প্রাচীন বৈদ্যগণকে সারস্বত ও বৈষ্ণব এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। বঙ্গীয় বৈদ্যগণ তাঁহাদেরই ধারা, যাঁহাদের বংশধরেরা এখনও পঞ্জাবে সারস্বত (বৈদ্য) ব্রাহ্মণ বলিয়া বিদিত।

অভিধানের প্রমাণও বড় অল্প প্রমাণ নহে। বৈদ্যের লক্ষণ বলিতে গিয়া আয়ুর্ব্বেদীয় প্রামাণিক অভিধান রাজ-নিঘণ্টু বলিতেছে, যে **বিপ্র** বেদে অধীতী, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের পারে গমন করিয়াছেন, এবং অন্যান্য বিবিধ ব্রাহ্মণোচিত গুণগ্রামে ভূষিত তিনিই বৈদ্য। বৈদ্য অন্য জাতীয় হইবার অণুমাত্র সম্ভাবনা থাকিলে, এই লক্ষণবাক্যে '**বিপ্র**' পদটী থাকিত না। নিম্নে প্রমাণটী উদ্ধৃত করিলাম—

'**বিপ্রো**' বৈদ্যক-পারগঃ শুচিরনূচানঃ কুলীনঃ কৃতী
ধীরঃ কালকলাবিদাস্তিকমতি দক্ষঃ সুধী ধার্ম্মিকঃ।
স্বাচারঃ সমদৃগ্ দয়ালু রখলো যঃ **সিদ্ধমন্ত্রক্রমঃ**
শান্তঃ কামম্ **অলোলুপঃ** কৃতযশা বৈদ্যঃ স বিদ্যোততে॥
—রাজনিঘণ্টু, ২০ বর্গ।

পুনশ্চ—'বিপ্রঃ স উচ্যতে ভিষক্' ইত্যাদি ঋক্-অংশের কেমন চমৎকার ব্যাখ্যা এই প্রাচীন অভিধানে রহিয়াছে দেখুন—

'রাজানো বিজিগীষয়া নিজভুজ-প্রকাণ্ড-মোজোজয়া-
চ্ছৌর্য্যং সঙ্গবরাঙ্গসদ্মনি যথা সংবিভ্রতে সংহৃতাঃ।
যস্মিন্নোষধয় স্তথা সমুদিতাঃ সিধ্যন্তি বীর্য্যাধিকা-
বিপ্রোঽসৌ ভিষগুচ্যতে স্বয়মিতি শ্রুত্যাপি
সত্যার্পিতম্'—রাজনিঘণ্টু, ২০ বর্গ।

অর্থ এইযে, যে **ব্রাহ্মণে** ওষধিগণ প্রকাশিত হইয়া শক্তির সহিত কার্য্য করে, সেই **বিপ্রকে** ভিষক্ বলে, ইহা সাক্ষাৎ শ্রুতির সত্য বচন।

[এই সাক্ষাৎ শ্রুতি-বচনকে ধর্ম্মভূষণ মহাশয় কিরূপে হত্যা করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে।]

ভেষজার্থে ওষধি-খনন ও বৈদ্যব্রাহ্মণের কার্য্য, যথা—

যথাবদুত্থায় শুচিপ্রদেশজাঃ **দ্বিজেন** কালাদিকতত্ত্ববেদিনা।
যথাযথং চৌষধয়ো গুণোত্তরাঃ প্রত্যাহরন্তে যমগোচরানপি॥
—রাজনিঘণ্টু॥

বলা বাহুল্য, এস্থলে 'দ্বিজ' শব্দের অর্থ ব্রাহ্মণ, কারণ ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ৯৭ই সূক্তে ওষধি খনন-কর্ত্তাকে **ব্রাহ্মণই** বলা হইয়াছে। রাজনিঘণ্টু ঐ ওষধি-খনন মন্ত্রের ব্যাখ্যায় 'বিপ্র' শব্দই ব্যবহার করিয়াছেন—

যেন ত্বাং খনতে ব্রহ্মা যেনেন্দ্রো যেন কেশবঃ
তেনাহং ত্বাং খনিষ্যামি সিদ্ধিং কুরু মহৌষধি।
বিপ্রঃ পঠন্নিমং মন্ত্রং প্রযতাত্মা মহৌষধীম্
খাত্বা খাদিরকীলেন যথাবত্তাং প্রয়োজয়েৎ॥—রাজনিঘণ্টু

প্রাচীনতম কালের ঋগ্বেদ, আয়ুর্ব্বেদ ও পরবর্ত্তী কালের অভিধানের প্রমাণ হইতেও জানা যাইতেছে যে, চিরকাল ব্রাহ্মণকেই 'ভিষক্' বা 'বৈদ্য' বলিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে।

শ্রীযুক্ত কালীবাবুও যে একথা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তাহা বলিয়াছি। বৈদ্য, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২৮ পৃষ্ঠার নিম্নভাগে তিনি বলিতেছেনঃ—"চিকিৎসা-শাস্ত্রের প্রণেতা **ঋষিগণই** ছিলেন এবং **ব্রাহ্মণগণই** ঐ শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিতেন।" কালীবাবু এস্থলে সত্যকথাই বলিয়া ফেলিয়াছেন, কারণ 'ব্রাহ্মণগণই' বলাতে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিতেন না, ইহাই বলা হইল। কিন্তু কালীবাবুর ভাষা এস্থলে ঠিক হয় নাই, তিনি অনবধানতাবশতঃ 'অধ্যাপনা' অর্থেই 'অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা' ব্যবহার করিয়াছেন, এবং এই অধ্যাপনা 'ব্রাহ্মণাদি **তিন** বর্ণীয় ব্রহ্মচারীদিগের অধ্যাপনা'! যাহা হউক, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ঈদৃশ অধ্যাপনা

করিতেন না সুতরাং চিকিৎসাও করিতেন না, ইহা তিনি নিজমুখে কিয়ৎ নিম্নে স্পষ্টভাবেও স্বীকার করিয়াছেন। জেরা না করিতেই ত সত্য কথা আপনি বাহির হইতেছে, তবে বৈদ্যপ্রবোধনীকে কি জন্য এত আক্রমণ, কি উদ্দেশ্যেই বা এরূপ অসাধু সমালোচনা?

স্বজাতির ঘোর অমর্য্যাদা

কয়েক পংক্তি নিম্নে কালীবাবু বলিতেছেন যে, বৈদ্যমহর্ষিগণ কালক্রমে ঐ পবিত্রবৃত্তি অম্বষ্ঠদিগকে দিয়া নিজেরা দায়মুক্ত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি, এখনও উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি, কালীবাবু লিখিয়াছেন—"ক্রমে যখন অম্বষ্ঠ জাতির উৎপত্তি হইল, তখন ঋষিগণ অম্বষ্ঠ জাতির চিকিৎসাবৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া 'আয়ুর্ব্বেদং দত্তুস্তস্মৈ' আয়ুর্ব্বেদখানি তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিলেন। তদবধি **ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক** চিকিৎসা-ব্যবসায় পরিত্যক্ত হইল।" ইহার কিছু পূর্ব্বে বলিয়াছেন, পূর্ব্বে **ব্রাহ্মণগণই** ঐ শাস্ত্রের অধ্যয়ন অধ্যাপনা করিতেন"। অতএব এই দুই বাক্য হইতে জানা যাইতেছে যে, কালীবাবুর মতেও অম্বষ্ঠজাতির উৎপত্তির পূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণ চিকিৎসা করিতেন। কিন্তু অম্বষ্ঠগণকে চিকিৎসা শাস্ত্র দিলেন বলায় নিজেরা তদবধি চিকিৎসাবৃত্তি পরিত্যাগ করিলেন, ইহা কিরূপে জানা যায়? অপিচ **ব্রাহ্মণগণই** চিকিৎসাবৃত্তি করিতেন এবং তাঁহারাই উহা দিলেন বলায় বুঝা যায় যে, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য চিকিৎসাই করিত না তা দিবে কি? ক্ষত্রিয় বৈশ্য চিকিৎসায় নিযুক্ত থাকিলে এই নূতন উৎপন্ন জাতিটাকে চিকিৎসাবৃত্তির অধিকার দিবার কোন প্রয়োজনও হইত না। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আয়ুর্ব্বেদ স্বয়ং বলিতেছেন যে, তদ্বিদ্যকুলজ অর্থাৎ তদ্‌বিদ্যাতে বৃত্তিমান্ হইয়া প্রতিষ্ঠিত বৈদ্যকুলজ ব্রাহ্মণগণই চিরকাল ভূতদয়ার্থ চিকিৎসার উদ্দেশ্যে আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিবেন, তবে নিন্দিত চিকিৎসাজীবী অম্বষ্ঠের হাতে

আয়ুর্ব্বেদ ছাড়িয়া দেওয়া হইল, এ কেমন কথা? তবে কি ভূতদয়ার্থ চিকিৎসা পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হউক, এমন নির্ম্মম ইচ্ছা মহর্ষিদের মনে উদিত হইয়াছিল, এবং যে বৃত্তিকে রামানুজ তদীয় রামায়ণ টীকায় 'চিকিৎসা মহতে পুণ্যায়' বলিয়াছেন (এবং শাস্ত্রদৃষ্ট চিকিৎসক নিন্দা অজ্ঞচিকিৎসক এবং চিকিৎসা বিক্রেতার প্রতিই প্রযোজ্য, চিকিৎসা-বিজ্ঞান, ভূতদয়ার্থ-চিকিৎসা বা তন্নিষ্ঠ বৈদ্যের প্রতি প্রযোজ্য নহে, বলিয়াছেন), সেই পবিত্র বৃত্তিদ্বারা পুণ্যার্জ্জনের সুযোগও পরিত্যাগ করিয়াছিলেন? আর কবেই বা ঐরূপ ইচ্ছা হইল? অম্বষ্ঠের চিকিৎসা-বৃত্তি ত মনুতে উক্ত হইয়াছে। মনুর পৌত্র অর্থাৎ অত্রির পুত্র মহর্ষি পুনর্ব্বসু চরকসংহিতায় বলিয়াছেন, বৈদ্যকুলজ ব্রাহ্মণগণই আয়ুর্ব্বেদের স্বামী, কিন্তু তিনি অম্বষ্ঠের নামও করেন নাই। সুতরাং ব্রাহ্মণগণ অম্বষ্ঠকে আয়ুর্ব্বেদ দিয়া নিজেরা চিকিৎসা ত্যাগ করিয়াছিলেন, ইহা প্রকৃত ঐতিহ্য নহে। অম্বষ্ঠের হাতে যদি চিকিৎসাবৃত্তি ছাড়িয়া দেওয়া যাইত, তবে মূর্দ্ধাবসিক্তের হাতেও যাজন বা অধ্যাপনাটা ছাড়িয়া দিয়া মহর্ষিরা আরও নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন। 'দদুঃ' পদের অর্থ কি 'ছাড়িয়া দেওয়া'? আর আয়ুর্ব্বেদের এক অংশ ছাড়িয়া দিলেও ত 'দেওয়া' হয়, ভূতদয়ার্থ পবিত্র মানব চিকিৎসা নিজেদের হাতে রাখিয়া উহার নিন্দিত ব্যবহারটা ('তে নিন্দিতৈ বর্ত্তয়েয়ু র্দ্বিজানামেব কর্ম্মভিঃ' —মনু, ১০।৪৬) অম্বষ্ঠের হাতে ছাড়িয়া দিলে, উভয় দিকই রক্ষা পাইতে পারে। তবে ভারতীয় নিখিল বৈদ্যব্রাহ্মণগণ একদিন এক প্রকাণ্ড সভা আহ্বান করিয়া সকলে এক যোগে আয়ুর্ব্বেদ ত্যাগ করিয়া সংসারকে বিপৎ সাগরে ভাসাইয়া দিলেন, ইহা কে বিশ্বাস করিবে? ব্রাহ্মণগণ যেদিন আয়ুর্ব্বেদ ত্যাগ করিলেন, সেই দিনই বৈশ্য-অম্বষ্ঠের *

* কালীবাবুর মতে অম্বষ্ঠগণ 'অম্বষ্ঠবর্ণ বৈশ্য', সত্যেন্দ্র বাবুর মতে অম্বষ্ঠগণ 'পারিভাষিক বৈশ্য' !!

সংখ্যা রক্তবীজের বংশের ন্যায় এত অধিক বাড়িয়া উঠিল, যে তাহারা নগরে নগরে, পল্লীতে পল্লীতে দোকান খুলিয়া ভারতবাসীদের নিকটে মূল্য বিনিময়ে চিকিৎসা বিক্রয় করিয়া তাহাদিগকে ধন্য করিল! এই অভিনব জাতিটী সহসা আয়ুর্ব্বেদে এমনই ব্যুৎপন্ন হইল যে, সমাজ অচঞ্চল চিত্তে ভারতের বিরাট চিকিৎসা ভার তাহাদের হাতে তুলিয়া দিল! এ সকল কথা কি কালীবাবু সুস্থ মনে বিশ্বাস করিতে পারেন? একথা যে নিতান্ত প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধ তাহা ভীষ্ম, পরীক্ষিৎ, ভোজদেব প্রভৃতির চিকিৎসার্থ সমাগত বৈদ্যদিগের পরিচয় হইতে জানা যায়, সমগ্র উত্তর ভারতে অম্বষ্ঠের অবিদ্যমানতা হইতেও জানা যায়। বস্তুতঃ কালীবাবুর কথা সত্য হইলে, নিখিল ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদ সম্মেলনে কেবলমাত্র অম্বষ্ঠজাতিই গিস্‌গিস্ করিত, ব্রাহ্মণ একটীও দেখা যাইত না!

আয়ুর্ব্বেদ বলিতেছেন, চিকিৎসার তুল্য পবিত্র দয়ার কার্য্য আর নাই, এদিকে মনু বলিতেছেন, সূত যেমন ক্ষত্রিয় বৃত্তির নিন্দিত অংশ দ্বারা জীবিকা করিবে, অম্বষ্ঠ তদ্রূপ চিকিৎসার নিন্দিত অংশ দ্বারা জীবিকা করিবে। এখানে দুইটী কথা আছে, **'নিন্দিত চিকিৎসা'** এবং সেই 'নিন্দিত চিকিৎসার **বিক্রয় দ্বারা** জীবিকা'। ইহাই অম্বষ্ঠের হীনতা সূচক জীবিকা। গো-মেষ-মহিষাদি ও অস্পৃশ্য চণ্ডালাদির চিকিৎসাই হীন চিকিৎসা এবং এইরূপ চিকিৎসা বিক্রয়দ্বারা জীবিকা বৈদ্যব্রাহ্মণের পক্ষে হীনতর। এই হীন চিকিৎসাও অন্য জাতির পক্ষে নিষিদ্ধ। অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণবর্ণীয় এবং শাস্ত্রতঃ অধিকারী বলিয়াই ব্রাহ্মণগণ তাহাকে এই অধিকার দিয়াছিলেন (মনু ১০।৪৭), ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যকে দেন নাই।

এ পর্য্যন্ত আমরা কালীবাবুর উদ্ধৃত বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণের বচনটীর প্রামাণিকতা স্বীকার করিয়া এত কথা বলিলাম। এক্ষণে ঐ বচনটী

যে কত বড় একটা মিথ্যা কথা, তাহা দেখাইব। কালীবাবু ৮ম পৃষ্ঠার ফুটনোটে এবং পুনশ্চ ২৮ পৃষ্ঠায় বৃহদ্ধর্ম্ম-পুরাণের বচনটী প্রেম সহকারে তুলিয়াছেন—

"আয়ুর্ব্বেদং দদুস্তস্মৈ বৈদ্যনাম চ পুষ্কলম্।
তেনাসৌ পাপশূন্যোঽভূৎ অম্বষ্ঠ-খ্যাতিসংযুতঃ॥"

কিন্তু তিনি দুই পংক্তি মাত্র উঠাইয়াই নিবৃত্ত হইলেন কেন? আমরা পাঠকের কৌতুহল নিবারণের জন্য আরও কতকটা উঠাইয়া দিতেছি—

"আয়ুর্ব্বেদং দদুস্তস্মৈ বৈদ্যনাম চ পুষ্কলম্।
তেনাসৌ পাপশূন্যোঽভূৎ অম্বষ্ঠ-খ্যাতিসংযুতঃ॥
অস্মাভি র্যানি শাস্ত্রাণি কৃতানি **সঙ্করোত্তম**।
তানি **তুভ্যঞ্চ দত্তানি** ন প্রমাদ্যে কথঞ্চন॥
চিকিৎসা কুশলো ভূত্বা কুশলী তিষ্ঠ ভূতলে।
শূদ্রধর্ম্মান্ সমাশ্রিত্য বৈদিকানি করিষ্যথ॥
আয়ুর্ব্বেদস্তু যো দত্ত **স্তুভ্য** মম্বষ্ঠ ভূসুরৈঃ।
তেন **মন্তুঃ** ন চৈবান্যৎ পুরাণাদি বদিষ্যসি॥
আয়ুর্ব্বেদাৎ পরং নান্যৎ যুষ্মাকম্ বাচ্যমর্হতি।
বৈশ্যবৃত্ত্যা ভৈষজানি কৃত্বা দাস্যসি সর্ব্বতঃ॥"

বৃহদ্ধর্ম্ম, ১৪অ, উত্তর খণ্ড।

পাঠক একটু লক্ষ্য করিলে দেখিবেন, ইহার মধ্যে কত অদ্ভুত কথা সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রথম শ্লোকে অম্বষ্ঠ জাতির কিরূপে 'বৈদ্য নাম হইল, তাহাই যেন বুঝাইবার চেষ্টা করা হইতেছে। প্রাচীন বৈদ্য মহর্ষিরা কেবল যে তাহাদিগকে চিকিৎসা ছাড়িয়া দিলেন তাহা নয়, আপনাদের ' বৈদ্যনামটীও দিয়া তাহাদিগকে 'জাঁকাল' করিলেন।

তদবধি অম্বষ্ঠেরাই 'বৈদ্যজাতি' নামে প্রসিদ্ধ! পাঠক দেখুন, বাঙ্গালার বাহিরে কুত্রাপি বৈদ্যজাতি না থাকায়, ইহা যে বঙ্গীয় বৈদ্যগণকে লক্ষ্য করিয়া লেখা হইয়াছিল, তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। সনাতন বৈদ্যকুলজ বঙ্গীয় ব্রাহ্মণদিগের উপর অম্বষ্ঠত্ব আরোপ করিবার পরও যখন তাহারা সহজে 'অম্বষ্ঠ' এই জাতি নাম গ্রহণ করিল না, তখন তাহাদের বৈদ্য নাম সত্ত্বেও যে তাহারা অম্বষ্ঠজাতি ভিন্ন আর কিছুই নহে, তাহা সমাজ মধ্যে প্রচার করিবার জন্য কোন দুষ্ট স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণ এই কাণ্ড করিয়াছে! উদ্ধৃত অংশের কিঞ্চিৎ উপরে বেণরাজার যথেচ্ছাচার এবং বর্ণব্যভিচার দ্বারা বর্ণসঙ্কর সৃষ্টির কথা আছে। মহর্ষিরা আসিয়া রাজাকে নরকের ভয় দেখাইলে, 'কেমন নরক হয় দেখি' বলিয়া তিনি রাজ্যে ব্যভিচারের স্রোত আরও বাড়াইয়া দিলেন। মন্বাদি মহর্ষিরা যে অম্বষ্ঠকে বিবাহিত পত্নীতে জাত বলিয়াছেন, এই জাল বেদব্যাস তাহাকে ব্যভিচার ও বলাৎকার হইতে উৎপন্ন বলিতেছে—

"বলাৎকারেণ ব্রাহ্মণ্যাং সঙ্গময্য তু ক্ষত্রিয়ম্।
পুত্র মুৎপাদয়ামাস বেণো নাস্তিক-সত্তমঃ॥
এব মন্যং তথান্যস্যাং সঙ্গময্য তু ভূপতিঃ।
পুত্রান্ বৈ জনয়ামাস বর্ণসঙ্করকারকঃ॥

১৩শ অ, উত্তর খণ্ড।

অনন্তর তিনি নানা অকার্য্যে কুকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে ব্রাহ্মণেরা হুঙ্কার দ্বারা রাজাকে বিনষ্ট করিলেন। অনন্তর পৃথু রাজা হইলেন। ব্রাহ্মণেরা বলিলেন, 'রাজা, তুমি বর্ণসঙ্করদের একটা ব্যবস্থা কর'। রাজা বলিলেন, 'যদি বলেন ত, **সবগুলিকে মারিয়া ফেলি।**' মহর্ষিরা বলিলেন, 'মারিয়া কাজ নাই, উহাদিগকে ডাকিয়া পাঠাও এবং উহাদিগের জাতি ও বৃত্তি ঠিক করিয়া দাও'। রাজা তাহাদিগকে

ডাকিলেন, 'তাহারা বলিল, আমরা বেশ আছি, আমাদের জন্য কাহারও ভাবনার প্রয়োজন নাই'। ব্রাহ্মণেরা এই উত্তর শুনিয়া হাসিলেন, রাজা রাগিলেন। অনন্তর ব্রাহ্মণদের আদেশে রাজা করণ, অম্বষ্ঠ, কাংস্যকার, স্বর্ণকার প্রভৃতি **৩৬ জাতি বর্ণসঙ্করকে বাঁধিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন।** তখন তাড়নায় তাহাদিগের চৈতন্য হইল, তাহারা 'রাজা, রক্ষা কর' বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণগণ বলিলেন, 'হে সঙ্করগণ, তোমরা ৩৬ প্রকার শূদ্রজাতি হইয়াছ। এক্ষণে তোমরা নিজ শক্তি অনুসারে কে কোন্ বৃত্তি লইবে, বল'। অনন্তর প্রথমে **করণগণ** বলিল, 'আমরা মূর্খ, জাতিহীন ও বুদ্ধিহীন। আমরা কি বলিব? আপনারা যাহা বিবেচনা হয়, বলুন'। তখন ব্রাহ্মণেরা বলিলেন—

'অয়ন্তু করণোনাম শ্রীযুক্তো বর্ত্ততাম্ সদা, ইত্যাদি। ভাবার্থ, করণগণের ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তি আছে; ইহারা সৎ শূদ্র।

তার পর ব্রাহ্মণেরা কারামুক্ত অম্বষ্ঠকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'এ অপর এক সঙ্কর, বৈশ্যাতে **ব্যভিচার** দ্বারা ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক উৎপাদিত, অতএব ইহার নাম অম্বষ্ঠ। আমরা এই ব্রহ্মপুত্র অম্বষ্ঠের সংস্কার করিব, যাহাতে এ সংস্কৃত হইয়া পুনরুৎপন্নের ন্যায় হয়।'

অয়মন্যঃ সঙ্করোহি বেণস্য বশগঃ পুরা।
বৈশ্যাম্ সমুপগময্য চক্রেহন্যমপি সঙ্করম্॥
তস্মাৎ অম্বষ্ঠনামা চ সঙ্করোহয়ং ধরাপতে।
অস্মাভি রস্য সংস্কারঃ কর্ত্তব্যো বিপ্রজন্মনঃ।
যেনাসৌ সংস্কৃতো ভূত্বা পুনর্জাত ইবাস্ত চ॥" ১ম অঃ, ৩৮-৩৯

উদ্ধৃত বাক্যের তৃতীয় পংক্তিতে 'তস্মাৎ' আছে, কিন্তু 'কস্মাৎ' তাহা বুঝিবার উপায় নাই। তার পর তাহাকে আয়ুর্ব্বেদ দিয়া বিবিধ

সদুপদেশ দিলেন। সেই অম্বষ্ঠ বিপ্রাজ্ঞা শিরে ধারণ করিয়া ব্রাহ্মণ-দিগকে ভক্তিভরে প্রণামপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়াইয়া রহিল। অনন্তর ব্রাহ্মণগণ তাহাকে অন্যান্য আবশ্যক উপদেশ দিয়া বিদায় দিলেন। এইরূপে সমস্ত সঙ্করদিগের ব্যবস্থা হইয়া গেলে তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, আমাদের ক্রিয়াকর্ম্ম কাহারা করিবেন? ব্রাহ্মণেরা সেদিকে বেশ হুঁসিয়ার। বলিলেন—'উত্তমানাং হি জাতীনাং পুরোধাঃ শ্রোত্রিয়াঃ বয়ম্', তোমরা উত্তম সঙ্কর, তোমাদের পৌরোহিত্য আমরাই করিব, আর 'অন্যেষাঞ্চৈব জাতীনাং পুরোধাঃ পতিতো দ্বিজঃ' অর্থাৎ পতিত দ্বিজেরা অপর সঙ্করদিগের পুরোহিত হইবে।

এই সকল উপাখ্যান পড়িলেই মনে হয়, রাজা গণেশের সময়ে ম্লেচ্ছ-ব্যভিচার দুষ্ট কোন কুলীন ব্রাহ্মণ নিজের সমাজের দারুণ ব্যভিচার-দোষ ঢাকিবার জন্যই যেন এইস্থলে সকল জাতির উপর কলঙ্ক অর্পণ করিবার চেষ্টা করিতেছে। কারণ, সকল জাতিগুলিই ব্যভিচার ও বলাৎকার হইতে জাত এই ধারণা জন্মাইতে পারিলে, সর্ব্বসাধারণের নিকটে ব্রাহ্মণের উপহাস্য হইবার ভয় থাকে না!

এই শ্রেণীর জাল বচনের একটি লক্ষণ এই যে, ইহাদের মধ্যে মূর্দ্ধাব-সিক্তের কথা কোথাও নাই! যে বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণের মতে মূর্দ্ধাবসিক্তাদি সকলেই বর্ণসঙ্কর, তাহার উচিত ছিল, মূর্দ্ধাবসিক্তকেও কিছু একটা বৃত্তি দিয়া আপ্যায়িত করা এবং 'সঙ্করোত্তম' নামটা তাহাকেই দিয়া তাহার ইতিহাস সর্ব্বাগ্রে দেওয়া। তাহা না করিয়া অম্বষ্ঠকে 'সঙ্করোত্তম' বলায় ঐ পুরাণ রচয়িতার বিশিষ্টরূপ অম্বষ্ঠপ্রীতিই প্রকাশ পাইতেছে। অতঃপর এই বেদব্যাসটা বলিতেছেন, যাবতীয় বৈদ্যশাস্ত্র যাহা আমরা অর্থাৎ যাজক ব্রাহ্মণেরা প্রস্তুত করিয়াছি, (অর্থাৎ যাহা তোমরা বৈদ্যেরা কর নাই), সেই সমস্ত তোমাদিগকে দিলাম (এমনই আমাদের উদারতা!), দেখিও তাহাতে যেন মত্ত হইও না, অন্য পুরাণাদি অধ্যয়ন,

আলোচনা বা ব্যাখ্যা করিতে অগ্রসর হইও না (পুরাণ পাঠক 'সূত' অপেক্ষাও তোমরা যে নিকৃষ্ট!) বেশ করিয়া চিকিৎসা শিখিয়া কুশলে থাক (আমরা তোমাদের মঙ্গলই চাই), আর তোমরা শূদ্রধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া বৈদিক ক্রিয়াকর্ম্ম করিবে (আমরা তোমাদের প্রতি এতদূর পক্ষপাতী যে, তোমরা শূদ্র হইলেও তোমাদিগকে দ্বিজকর্ম্ম করিবার অনুমতি দিতেছি, কিন্তু তোমরা মনে রাখিও যে, দ্বিজাতিবিহিত কর্ম্ম করিলেও তোমরা শূদ্র)! হে অম্বষ্ঠ, তোমাকে পৃথিবীর দেবতা আমরা (ভূসুর) যে আয়ুর্ব্বেদ দিয়াছি, সেই আয়ুর্ব্বেদ ব্যতীত তোমাদের আর কিছু পঠনীয় বা পাঠনীয় নাই, এজন্য পুরাণাদি স্পর্শ করিও না।" কালীবাবু এই বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণের প্রামাণ্য স্বীকারপূর্ব্বক যখন আয়ুর্ব্বেদং দদুস্তস্মৈ" ইত্যাদি বচন উদ্ধার করিয়াছেন, তখন উদ্ধৃত বচনের নিম্নেই এই যে সব শ্লোক রহিয়াছে, তাহাদের প্রামাণ্যও স্বীকার করিয়া তাঁহার নিজের এবং স্বজাতিবর্গের বর্ণসঙ্করত্বও ত স্বীকার করিতেছেন! তবে আর অম্বষ্ঠের বৈশ্যবৎ আচার কেন বলিতেছেন? আমরা ত দেখিতেছি যে, এখানে স্পষ্ট ভাষায় শূদ্র ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া বৈদিক কার্য্য করিবে, এই বিধান থাকায় অম্বষ্ঠের পক্ষে শ্রাদ্ধাদি যাবতীয় বৈদিককর্ম্ম শূদ্রবৎ করাই উচিত বলা হইয়াছে। অমরকোষ ত বলিতেছে, 'আচণ্ডালাৎ তু সঙ্কীর্ণা অম্বষ্ঠকরণাদয়ঃ' অর্থাৎ অম্বষ্ঠ সঙ্কীর্ণ জাতিবিশেষ, পুরাণ ও অভিধানের এমন সুন্দর প্রমাণ অগ্রাহ্য না করিয়া কুল্লুকের মতে সায় দিয়া আপনাকে অশ্বগর্দ্দভী-সঞ্জাত অশ্বতরবংশীয়বৎ মনে করাই ত আরও ভাল!

বস্তুতঃ বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণের ও অমরের এই স্মৃতিবিরুদ্ধ কথা যে অর্থশূন্য অতএব অগ্রাহ্য, তাহা কালীবাবু (ও সত্যেন্দ্র বাবু) ব্যতীত আর সকলেই স্বীকার করিবেন। অনুলোমজ বৈধ পুত্রকে যাহারা বর্ণসঙ্কর বলে, এবং যাহারা অমরাদির বচনে 'মূর্দ্ধাভিষিক্তাদয়ঃ' না বলিয়া

অম্বষ্ঠের নামই সর্ব্বাগ্রে বসাইয়াছে, তাহারা যে অম্বষ্ঠকে লক্ষ্য করিয়া গুপ্তহত্যার গুপ্ত ফাঁদ পাতিয়াছে, ইহা নিশ্চিত। একে ত বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ একখানি উপপুরাণ, তদুপরি যে অংশে এই উক্তিটী আছে, তাহার অর্ব্বাক্‌কালিকত্বের যথেষ্ট প্রমাণ ঐ স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়। পণ্ডিত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় বলিয়াছেন—"বৃহদ্ধর্ম্ম প্রণেতা বাঙ্গালার সামান্য ব্যক্তি, তাঁহার গ্রন্থে 'রায়' শব্দ থাকাতে বুঝিতে হইবে, ইহা কোন ঋষি-প্রণীত গ্রন্থ নহে।" উদ্ধৃত বাক্যের ভাষাও চমৎকার। কোথাও প্রথম পুরুষ, কোথাও মধ্যম পুরুষ, কোথাও তুভ্যম্, কোথাও 'যুষ্মাকম্', কোথাও 'করিষ্যথ', কোথাও 'বদিষ্যসি', একবার 'পরম্' পুনশ্চ তদর্থক 'অগ্রে'—একি পণ্ডিতের রচনা? আবার বিধি অর্থে ভবিষ্যৎ-বোধক 'করিষ্যথ' 'বদিষ্যসি', কেন? জালকর্ত্তার ব্যাকরণ বিদ্যা যেমন, "শূদ্রধর্ম্মান্ সমাশ্রিত্য বৈদিকানি করিষ্যথ" বলায় স্মৃতির বিদ্যাও তদ্রূপ বুঝা যাইতেছে। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণের সূচীপত্রে যে কয়টী অধ্যায়ের উল্লেখ আছে, এই জালবচন তাহাদের মধ্যে কোনটিতেই নাই, ইহা তদতিরিক্ত একটা প্রক্ষিপ্ত অধ্যায়ে শোভা পাইতেছে! দ্বাদশ অধ্যায় বিশিষ্ট মনুসংহিতার অধ্যায় ও বিষয় গ্রন্থমধ্যেই উল্লিখিত আছে, দ্বাদশ অধ্যায়ের অতিরিক্ত ত্রয়োদশ অধ্যায় থাকা যেমন অসম্ভব এবং নাই, বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণের অতিরিক্ত অধ্যায়ও তদ্রূপ অসম্ভব, সুতরাং জাল বুঝা যাইতেছে।

এ হেন জাল বচনের দ্বারা কালীবাবুর মত প্রবীণ উকিল মহাশয় প্রতারিত হইলে দুঃখের সীমা থাকে না। কিন্তু যখন দেখি, তিনি জানিয়া শুনিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক ঐ সকল জাতীয় অমর্য্যাদাকর বাক্যকে প্রমাণরূপে মানিয়া লইয়াছেন এবং স্বজাতিকে পুনঃ পুনঃ তাহা শুনাইতেছেন, (বৈদ্য পুস্তক, ২য় সংস্করণ পৃষ্ঠা ৮ এবং ফুটনোট পৃষ্ঠা ২৮),

তখন ধৈর্য্য রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। [শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রবাবুও এই পুরাণ বাক্যকে প্রমাণ বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন !! (পৃষ্ঠা ৪১).]

বৈদ্য বৈশ্যবর্ণ নহে

(ক) কুলপঞ্জিকার সাক্ষ্য—

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণের জাল বেদব্যাস অম্বষ্ঠ সম্প্রদায়কে জেলে পুরিয়াছে, চাবুক লাগাইয়াছে এবং যাহা খুসি বলিয়া গালি দিয়াছে! অম্বষ্ঠ বর্ণসঙ্কর, জারজ, শূদ্র—কিছুই বলিতে বাকি রাখে নাই, আবার আশ্বাস দিয়াছে যে তাহারাই তাহাদের পৌরোহিত্য করিবে এবং অনুগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে উপনয়ন সংস্কারও দিবে! কোন জাতির প্রতি বিশেষ আক্রোশ না থাকিলে এরূপ কথা কেহ বলিতে পারে না। পাঠকবর্গ অবগত আছেন, অদ্যাপি দুষ্ট ব্রাহ্মণেরা 'ইত্যমরঃ' বলিয়া অমরকোষের নামে ঐরূপ একটা অশ্লীল গালি আওড়াইয়া থাকে, যদিও উহা কোন অমরকোষে বা কোন শাস্ত্রে নাই। কালীবাবু প্রাচীন সমাজে চারিদিকে নিরপেক্ষ পণ্ডিত ব্যক্তিদিগকে শোভা পাইতে দেখিয়াছেন. কিন্তু সমাজ একান্ত পণ্ডিতশূন্য না হইলে, মন্বাদি স্মৃতির বিরুদ্ধে এই সকল বীভৎস উক্তি সমাজে কিরূপে চলে? বৈদ্যগণের মধ্যে সেনরাজগণকে প্রাচীনতম বৈদ্যদিগের মধ্যে ধরা যাইতে পারে, তাঁহারা জাতিতে 'অম্বষ্ঠ' হইলে, আজ বাঙ্গালা সমাজে ও সাহিত্যে 'অম্বষ্ঠ' শব্দটা কি সকলের নিকটে পরিচিত থাকিত না? বৈদ্যদিগের পক্ষে 'অম্বষ্ঠ' বলিয়া পরিচয় দেওয়াই ত গৌরবের বিষয় হইত? 'বৈদ্য' বলিয়া পরিচয় সকল অম্বষ্ঠের হয়ই বা কিরূপে, সকলে ত চিকিৎসা করিত না? সেন রাজগণ তাঁহাদের প্রদত্ত দানপত্রে বা রচিত পুস্তকে কোথাও আপনাদিগকে অম্বষ্ঠ বলিয়া পরিচয়ও দেন নাই, বৈশ্য বা ক্ষত্রিয় বলিয়াও পরিচয় দেন নাই, কোনও প্রমাণে তাঁহাদের এরূপ বলা যায় না, বরং তাহারা আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন (পরে

দ্রষ্টব্য) এবং বাহিরের নানা প্রমাণ হইতে তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়াই জানা যায়। কিন্তু কালক্রমে ভগবান্ যেমন ভূত হইয়াছিল, বৈদ্যদিগের চিকিৎসাবৃত্তি দেখিয়া অল্পজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা তাহাদিগকে অম্বষ্ঠ জ্ঞান করিয়া, (অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ নহে, এই ভুল ধারণবশতঃ) বৈদ্যদিগের ব্রাহ্মণাচার লোপ করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছিল। আমরা দেখিতে পাই, নুলো পঞ্চানন পঞ্চদশ শতাব্দীতেও সেনরাজগণকে কুত্রাপি 'অম্বষ্ঠ' বলেন নাই, 'বৈদ্য'ই বলিয়াছেন ; কিন্তু এই বৈদ্য যে শাস্ত্রোক্ত অম্বষ্ঠ জাতি এই ভ্রম তাঁহার ও অন্যান্য কুলাচার্য্যদিগের মধ্যে কাহারও কাহারও মাথায় ঢুকিয়াছিল এবং তাঁহাদের মুখে 'অম্বষ্ঠেরা মাতৃবর্ণ' এইরূপ প্রচারের ফলেই লোকে ক্রমে ক্রমে তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণেতর জাতি বিশেষ বলিয়া মনে করিতেছিল। তাঁহারা যে ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণত্ব হইতে বৈশ্যত্বে নামিতেছিলেন, তাহার প্রমাণ বৈদ্য পুস্তকে উদ্ধৃত নুলোর * বচন হইতেই পাওয়া যায়।

বৈদ্য রাজা আদিশূর ক্ষত্রিয়-আচার।
বেদে ব্রহ্মবৎ কার্য্যে মাতৃ-ব্যবহার॥

বৈদ্য ২য় সংস্করণ ২৪ পৃষ্ঠা।

ইহাতে তিনটী কথা আছে, ব্রহ্মবৎ, ক্ষত্রিয়বৎ, ও (মাতৃবৎ অর্থাৎ) বৈশ্যবৎ। একই জাতির ত্রিবিধ আচার! বৈদ্যকুলপঞ্জীতে এই আশ্চর্য্য হেঁয়ালির সদুত্তর দেওয়া হইয়াছে। বৈদ্যজাতি নাকি যুগে যুগে পতিত হইয়া এইরূপ অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে! এজন্য স্থলভেদে বৈদ্যদিগের ত্রিবিধ আচারই বিদ্যমান। কিন্তু ভারত সমাজে একমাত্র অম্বষ্ঠ জাতিরই যে যুগে যুগে এইরূপ বিচিত্র অধোগতি হইল, ইহার নিশ্চয় কোন গুপ্ত কারণ থাকিবে! যাহা হউক, অম্বষ্ঠ পতিত হইয়া কিরূপ হইয়াছে, তাহা ভরতমল্লিক ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দে এইরূপ বলিয়াছেন—

* ইঁহার প্রকৃত নাম পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়, ইনি একজন অসাধারণ তেজস্বী কুলাচার্য্য ছিলেন। ইঁহার 'গোষ্ঠি কথা ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত। (বৈদ্য ২০ পৃষ্ঠা)

সত্যে বৈদ্যাঃ **পিতুস্তুল্যাঃ** ত্রেতায়াঞ্চ তথা স্মৃতাঃ।

দ্বাপরে **বৈশ্যবৎ** প্রোক্তাঃ কলাবপি তথা মতাঃ॥

(চন্দ্রপ্রভা, ৪ পৃঃ)

চতুর্ভুজের কুলচন্দ্রিকা বচন আরও সুন্দর—

'সত্যে বৈদ্যাঃ **পিতুস্তুল্যাঃ** ত্রেতায়াঞ্চ তথা স্মৃতাঃ।

দ্বাপরে **ক্ষত্রবৎ** প্রোক্তাঃ কলৌ বৈশ্যোপমাঃ স্মৃতাঃ॥"

মুদ্রিত কণ্ঠহারে যে বাঙ্গালা ভূমিকা লেখা হইয়াছে, তাহাতে এই বচন আছে। কালীবাবুর নিকটে এই অংশ অতি 'প্রামাণিক' (বৈদ্য পৃঃ ৬)।

অম্বষ্ঠের পিতা ব্রাহ্মণ, সুতরাং ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য কুলাচার্য্যগণের মতে জানা যাইতেছে যে, অম্বষ্ঠ জাতি জন্মতঃ ব্রাহ্মণ এবং প্রথমে তাহার সমস্ত ক্রিয়াকর্ম্ম ব্রাহ্মণবৎ হইত, পরে তাহারা ক্ষত্রিয়বৎ এবং শেষে বৈশ্যবৎ কার্য্য করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কৃপায় বৈদ্যভাগ্যে বৈশ্যের অবস্থাতেও 'কুলষ্টপ্' পড়ে নাই!

কালীবাবু কুলপঞ্জিকার উক্তির উপরে গভীর আস্থাসম্পন্ন। তিনি বলিয়াছেন—"কুলাচার্য্যগণ কেহই স্বকীয় স্বাধীন মতের উপর গ্রন্থ প্রতিষ্ঠিত করেন নাই। সকলেই পূর্ব্ব পূর্ব্ব কুলাচার্য্যগণের উক্তির উপর নির্ভর করিয়া গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। পূর্ব্ব কুলাচার্য্যগণের উক্তির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করাই তাঁহাদের ধর্ম্ম ছিল" (বৈদ্য, পৃষ্ঠা ৭)। এক্ষণে কুলপঞ্জিকাকারদিগের কথাতেই ত বেশ জানা যাইতেছে যে, বৈদ্যগণ জন্মতঃ বৈশ্যোপম অর্থাৎ বৈশ্যাচারী নহে, তাহারা ব্রাহ্মণোপম অর্থাৎ ব্রাহ্মণাচারী।

পুনশ্চ মুলো—"আদিশূর রাজা বৈদ্য **বৈশ্যে তার জাতি।**

একচ্ছত্রী রাজা ছিল **ক্ষত্রবৎ** ভাতি॥"

এস্থলে বুঝা যাইতেছে যে, রাজা ছিলেন বলিয়াই আদিশূরের 'ক্ষত্রবৎ ভাতি' ছিল, পরন্তু তিনি 'বৈদ্য' বলিয়া বিদিত ছিলেন। বৈদ্য আদিশূরের প্রায় ৪।৫ শত বৎসর পরে নুলো তাঁহার জাতি নির্ণয় করিতে প্রয়াস পাইয়া প্রসিদ্ধির আশ্রয় বলিতেছেন, আদিশূর ক্ষত্রিয় ছিলেন না, তিনি বৈদ্যসম্প্রদায়েরই একজন। কিন্তু তাঁহার সূক্ষ্ম স্মার্ত্তবুদ্ধির সাহায্যে ঐ বৈদ্যকে বৈশ্য মনে করায়, ঢোক গিলিয়া বলিলেন, 'বৈশ্য তার জাতি' !

আদিশূর রাজা 'বৈদ্য', ইহাই ত তাঁহার জাতিপরিচয়ে যথেষ্ট, এস্থলে 'বৈশ্যে তার জাতি' বলায়, 'বৈদ্য' শব্দ যে সনাতন বৈদ্যকুলজ ব্রাহ্মণের বংশধরকে বুঝাইত, তাহা কুলাচার্য্য মহাশয় ইচ্ছা করিয়াই হউক, আর ভুল করিয়াই হউক, বলিলেন না। তাহাকে বৈশ্য করিবার জন্যই যেন 'বৈশ্যে তার জাতি' এরূপ রচনা করা হইল! রাজা আদিশূর অম্বষ্ঠ বলিয়া পরিচিত থাকিলে, কোন গোলই হইত না, নুলো তাঁহাকে অম্বষ্ঠ বলিয়াই বর্ণনা করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা না বলিয়া 'বৈদ্য রাজা আদিশূর' বলায় ইহাই প্রতীতি হয় যে, তিনি 'বৈদ্য' বলিয়াই বিদিত ছিলেন। বস্তুতঃ 'বৈদ্য'সম্প্রদায়েরই একজন না হইলে, 'বৈদ্য রাজা আদিশূর' এরূপ বলার কোন সার্থকতাও থাকে না। সুতরাং সেন-রাজগণের সময়ে তাঁহারা যে 'বৈদ্য' বলিয়াই পরিচিত ছিলেন, 'অম্বষ্ঠ' নাম যে বাঙ্গলার কেহ তখন জানিত না, তাহা বেশ বুঝা যায়। সেনরাজগণের সমসাময়িক 'মেনহাজ উদ্দিন্‌' তদীয় তবাকত-ই-নাসিরিতে লিখিয়াছেন, "সেন-রাজগণ জাতিতে বৈদ্য ছিলেন"। (সত্যেন্দ্র, পৃষ্ঠা ৩৯) এতদ্দ্বারা বেশ বুঝা যায় যে, যাঁহারা "দ্বিজেষু শ্রেয়াংসঃ", দ্বিজের উপর 'ত্রিজ', তাঁহাদের বংশধরগণ সাধারণ সপ্তশতী প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর ব্রাহ্মণ হইতে আপনাদিগকে পৃথক্ করিয়া পরিচয় দিবার জন্য গৌরবময় 'বৈদ্য' শব্দটী ব্যবহার করিতেন,

এবং রাজজাতিরূপেও প্রজাবর্গ হইতে পৃথক্ থাকায় 'বৈদ্য' নামে পৃথক্ সম্প্রদায় হইতে ক্রমশঃ 'বৈদ্য' জাতিতে পরিণত হইয়াছিলেন! সেনরাজগণের সময়ে বৈদ্যের 'অম্বষ্ঠ' বলিয়া পরিচয় ছিল না। কিন্তু বঙ্গবিজয়ের তিন চারিশত বৎসর পরে তাঁহাদের জাতি পরিচয় দিতে উদ্যত হইয়া তদানীন্তন স্মার্ত্তপণ্ডিতগণ বৈদ্য শব্দ শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট কোন জাতিকে বুঝায় না জানিয়াই, ভ্রমক্রমে জাতিবাচক 'অম্বষ্ঠ শব্দদ্বারা তাঁহাদের পরিচয় দিয়া থাকিবেন। বৈদ্যসম্প্রদায়ের উপর অম্বষ্ঠজাতিত্বের আরোপ ভ্রান্তির ফল। অম্বষ্ঠের বৈশ্যবর্ণত্ব খ্যাপনও ঐরূপ দ্বিতীয় ভ্রান্তি। স্মার্ত্তেরা যে ভ্রম করিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী কালে কোন কোন বৈদ্য (কালীবাবু ও সত্যেন্দ্র বাবুর মত) গুরু-পুরোহিতের নিকটে অবিনয়ের ভয়ে (বৈদ্যপ্রতিবোধিনী, পৃষ্ঠা ৮৭।৮৮) এবং শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস কবিরাজ মহাশয়ের কথামত 'জলেবাস করিয়া কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করা' অবিবেচনার কার্য্য, এই অতিবুদ্ধি নীতি অনুসারে, অথবা ব্রহ্মশাপের আতঙ্কে তাহাকেই প্রকৃত জাতীয় ঐতিহ্য বলিয়া মানিয়া লইলেও নুলো পঞ্চানন প্রভৃতি বৈদ্যকে 'জন্মতঃ বৈশ্য' বলেন নাই! নুলোর উক্তি একস্থানে এইরূপ—

"বল্লাল লয় যদা পদ্মিনী জাতিহীনা।
লক্ষ্মণ কহে **দ্বিজে** এ প্রথা ত দেখ না॥
তাই বল্লাল ত্যজে কুপুত্র বলিয়া সুতে।
লক্ষ্মণ তেজে পৈতা **বৈদ্য**-কুল রক্ষিতে॥

(সম্বন্ধ নির্ণয় ৫৮৫—৫৮৯)

এখানেও 'দ্বিজ' ও 'বৈদ্য' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, অম্বষ্ঠ শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই। বরং এই প্রসঙ্গে "শূদ্রকন্যা **ব্রহ্ম**-জায়া না লাগে অরত্নী" এরূপ বলিয়া সেনরাজগণকে মূলতঃ 'ব্রাহ্মণ' বলিয়াছেন! পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণ

ও কায়স্থ কুলপঞ্জিকায় কোন কোন কুলাচার্য্য সেনরাজগণকে সাহস করিয়া স্পষ্টাক্ষরে 'অম্বষ্ঠ' বলিয়াছেন! কিন্তু এই সকল কুলাচার্য্য এমনই পণ্ডিত ছিলেন যে, তাঁহাদের মুখনিঃসৃত কোন শাস্ত্রীয় কথা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে হয় না। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ অম্বষ্ঠকে ব্রাহ্মণের পুত্র বা ব্রহ্মপুত্র স্থির করিয়া অম্বষ্ঠ-বংশজাত বল্লালকে ব্রহ্মপুত্রবংশ-জাত বা ব্রহ্মপুত্র বংশীয় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই ব্রহ্মপুত্র তাঁহাদের মতে তন্নামা প্রসিদ্ধ নদ! বল্লাল কিরূপে ব্রহ্মপুত্র হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে অনেক গল্পও রচিত হইয়াছিল! কুলপঞ্জিকায় লিখিত একটি গল্পের অর্থ এই যে, বল্লাল ব্রাহ্মণবেশী ব্রহ্মপুত্র নদের বীর্য্যে জাত! বারেন্দ্র কুলজীগ্রন্থে কোন কুলাচার্য্য সংস্কৃত শ্লোকাবলী লিখিয়া ঘটনাটা এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—

"তচ্ছ্রুত্বা ব্রহ্মপুত্রোঽপি তামুবাচ সতীং প্রতি।
হে রাজকন্যে সুভগে ব্রহ্মপুত্রোঽহমাগতঃ ॥
... ...
কালে তদ্গর্ভতো জাতো বল্লালসেন-ভূপতিঃ ॥"

(গৌড়ে ব্রাহ্মণ, ২৬১ পৃষ্ঠা)।

সংস্কৃত শ্লোকে রচিত হইয়াও ইহা যে শাস্ত্রের বচন হইয়া দাঁড়ায় নাই, ইহা আমাদের ভাগ্য বলিতে হইবে। যাহা হউক, রাজা গণেশের সময়ে, বৈদ্য ও অম্বষ্ঠ যে অভিন্ন, এইরূপ ধারণা কুলাচার্য্য ও পুরোহিত শ্রেণীর স্মার্ত্ত পণ্ডিতদের মধ্যে প্রায় বদ্ধমূল হইয়াছিল। **বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণের** ও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের প্রক্ষেপটা ইহার কিছু পরেই হইয়া থাকিবে। প্রাচীনকালে সামাজিক ক্রিয়া কর্ম্মে কুলাচার্য্যগণ কুলবর্ণনা করিবার সময় কোন্ রাজার রাজত্ব সময়ে কি উপলক্ষ্যে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ বঙ্গে আসিয়াছিলেন, কোন্ রাজা তাঁহাদিগকে

কৌলীন্য দিয়াছিলেন ইত্যাদি সমাজসমক্ষে বলিতেন, এবং সেই সঙ্গে বৈদ্যরাজাদিগের জাতিতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া, তাঁহারা যে 'অম্বষ্ঠ' ছিলেন, তাহাও সকলকে শুনাইতেন, কিন্তু তথাপি জনসাধারণ ঐ শব্দটীর সহিত চেনা-পরিচয় করিয়া উঠিতে পারে নাই। বৈদ্যগণও তাহা মানিয়া লন নাই। বহু কুলপঞ্জিকায় সেন-রাজগণ বৈদ্য বলিয়াই বর্ণিত আছেন, অম্বষ্ঠ বলিয়া নহে (পরে দ্রষ্টব্য)। কোন প্রাচীন বৈদ্য-কুলপঞ্জিকার নাম 'অম্বষ্ঠ-কুলপঞ্জিকা' নহে, প্রত্যেক কুলপঞ্জিকার নাম 'বৈদ্য-কুলপঞ্জিকা'। 'অম্বষ্ঠ' সম্বন্ধে কোন কথাই ৭০০ বৎসর পূর্ব্বের চায়ু, ভরতমল্লিক দুর্জ্জয় (১৪০০) ও কণ্ঠহারের (১৬৫৩) কুলপঞ্জিকায় নাই। বৈশ্যাগর্ভে বৈদ্যের উৎপত্তির কথাও চায়ু, দুর্জ্জয় ও কণ্ঠহার বিদিত ছিলেন না। ১৩৪৭ খৃষ্টাব্দের চতুর্ভুজও বৈদ্য-কুলচন্দ্রিকায় 'অম্বষ্ঠ' শব্দ বা বৈদ্যের বৈশ্যাগর্ভে জন্মের কথা লিখিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। ঐ মর্ম্মের যে সকল শ্লোক উহাতে দেখা যায়, তাহা মহারাজ রাজবল্লভের আদেশে পরে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। কুলপঞ্জিকা-লেখক ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কেহ কেহ বৈদ্যগণকে অম্বষ্ঠ বলিয়াছেন বটে, কিন্তু কোন বৈদ্য-কুলপঞ্জিকা তাহা না বলায় ঐরূপ উক্তি বিশ্বাসের অযোগ্য। আমাদের মনে হয়, ভরত মল্লিকের চন্দ্রপ্রভায় অম্বষ্ঠোৎপত্তির কাহিনী বাহির হইবার পরে কতকগুলি লোকে ঐ কাহিনীকে আরও পল্লবিত করিয়া স্কন্দপুরাণের নাম দিয়া কুলচন্দ্রিকায় প্রবিষ্ট করাইয়াছে। বৈদ্য সম্প্রদায়ের শাস্ত্রীয় ও সংস্কৃত জাতি-নাম 'অম্বষ্ঠ' হইলে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত কোন কুলগ্রন্থেই তাহা ব্যবহৃত হইল না কেন? ইহা কি নিতান্ত আশ্চর্য্য নহে? তাই বলি, কুল-পঞ্জিকাস্থিত 'বৈদ্য' শব্দই বঙ্গীয় বৈদ্যদিগের বোধক একমাত্র সংস্কৃত শব্দ এবং ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, তাঁহারা আদি বৈদ্য-ব্রাহ্মণদের কুলে জাত বৈদ্য-ব্রাহ্মণ।

অপর শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের নিকটে শুনিয়া কোন কোন বৈদ্য আপনাদিগকে হয় ত অম্বষ্ঠ বলিয়া মনে করিতেছিলেন, কিন্তু তথাপি নিঃসংশয়রূপে বুঝিয়া জাতি নামটী বদ্‌লাইয়া ফেলিতে সমর্থ হন নাই।

কালীবাবু শব্দকল্পদ্রুম ও চন্দ্রপ্রভাকে প্রমাণ বলিয়া মানিয়াছেন, (বৈদ্য, পৃষ্ঠা ৭ ও ৯)। এক্ষণে আমরা এই দুইটী প্রমাণের পরীক্ষা করিব। কুল্লূক, রাজা গণেশ ও রঘুনন্দনাদির সময় হইতে প্রায় ২০০ বৎসর পরে মহামহোপাধ্যায় ভরতমল্লিক কর্ত্তৃক চন্দ্রপ্রভা রচিত হয়। এই সুদীর্ঘ কাল গুরুপুরোহিতদের মুখে নিজেদের জাতি-নাম 'অম্বষ্ঠ, ইহা শুনিতে শুনিতে মহামহোপাধ্যায় ভরতমল্লিক প্রভৃতির মনেও সেই সন্দেহ ঘনাইয়া আসিতেছিল। চন্দ্রপ্রভার রচনাকাল ১৬৭৫, প্রথম মুদ্রণ হয় সন ১২৯৯ সালে অর্থাৎ ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে। তাহার ৪০ বৎসর পূর্ব্বে শব্দকল্পদ্রুমের প্রথম সংস্করণ এবং এখন হইতে ১৮ বৎসর পূর্ব্বে দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রিত হয়। ঐ শব্দকল্পদ্রুমে 'বৈদ্য' বা 'অম্বষ্ঠ' শব্দের অর্থ আমরা সকলকে দেখিতে অনুরোধ করি। এই দুয়ের কোন স্থলেই 'বৈদ্য' বা 'অম্বষ্ঠ' যে বর্ণসঙ্কর বা বৈশ্যবর্ণ তাহা বলা হয় নাই, বরং 'বৈদ্য' শব্দ স্থানে বৈদ্যোৎপত্তিবিষয়ক যে চারিটী ভিন্ন ভিন্ন মত উপন্যস্ত করা হইয়াছে, তাহাতে আর কিছু না হউক, বৈদ্যের ব্রাহ্মণবর্ণত্বই সপ্রমাণ হইয়াছে। শব্দকল্পদ্রুমে যে চারিটী বিবরণ আছে, তাহা নিম্নে ক্রমে ক্রমে দিতেছি—

নং ১। এই বিবরণ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে আছে। ইহার সার মর্ম্ম এই যে, বৈদ্য কোন ব্রাহ্মণের স্ত্রীতে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের মধ্যে একজনের দ্বারা উৎপাদিত। অশ্বিনীকুমার তাহাকে সযত্নে চিকিৎসাশাস্ত্র ও অন্যান্য শাস্ত্র অধ্যাপনা করেন। তিনি পৃথিবীতে জ্যোতির্বিজ্ঞানবিৎ ও বিপ্র বলিয়াই বিদিত হইয়াছিলেন। (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, ব্রহ্মখণ্ড, ১০ অ)।

এস্থলে জন্মে অপসদত্ব-দোষ অর্পণ করিলেও বৈদ্যকে অব্রাহ্মণ বলা হয় নাই, 'বিপ্র' বলা হইয়াছে।

নং২। এই বিবরণও ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ হইতে গৃহীত। কেহ দেবতা ও ব্রাহ্মণের বিত্ত হরণ করিলে, নানাবিধ নরকে বহুযুগ কষ্ট সহ্য করিয়া শত জন্ম মূষিক হয়, তারপর পক্ষীও কৃমি হয়, তারপর বৃক্ষ হইয়া ক্রমশঃ মনুষ্য হয়। মনুষ্যজন্মে প্রথমে ম্লেচ্ছজাতি, পরে স্বর্ণকার, অনন্তর সুবর্ণবণিক, পরে যবনসেবী গণক ব্রাহ্মণ, তারপর "বিপ্রো দৈবজ্ঞোপজীবী বৈদ্যজীবী চিকিৎসকঃ" অর্থাৎ গণনাকুশল চিকিৎসক হইয়া জন্মগ্রহণ করে। এখানেও বৈদ্যের যতই নিন্দা থাকুক, তাহাকে অব্রাহ্মণ বলা হয় নাই, 'বিপ্র' বলা হইয়াছে। (ব্রহ্মখণ্ড)

নং৩। এই বৃত্তান্তটী দ্বিতীয় বৃত্তান্তেরই মত। জীব অনেক ঘুরিয়া শেষে সপ্তম জন্মে গণক ও বৈদ্য হয়। [এখানে বৈদ্য 'ব্রাহ্মণ' কি 'অব্রাহ্মণ' তাহা সুস্পষ্ট বলা হয় নাই]

কিন্তু এস্থলে দ্রষ্টব্য এই যে, গণকত্ব ও বৈদ্যত্ব একই কর্ম্মের ফল ও এক সঙ্গে লিখিত হওয়ায়, ইহাদের মধ্যে একটী ব্রাহ্মণ হইলে অপরটীও ব্রাহ্মণ হইবে। নং ১ ও নং ২ বিবরণে গণকত্ব ও বৈদ্যত্ব একাধারে উল্লেখ করিয়া তদ্বান্ ব্যক্তিকে 'বিপ্র' বলা হইয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে নং ৩ বিবরণে 'গণক' ও 'বৈদ্য' যে দুই শ্রেণীর ব্রাহ্মণকে বুঝাইতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

এই সকল উৎপত্তির বিবরণ যতই অসম্ভব হউক, একটী কথা এই জানা যাইতেছে যে, 'বৈদ্য' ব্রাহ্মণ। এই জন্য বহু পণ্ডিতের মন হইতে 'বৈদ্য ব্রাহ্মণ', এই ধারণা একেবারে অন্তর্হিত হয় নাই। সাধু-প্রকৃতিক স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণেরা বৈদ্যকে ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করিতেন এবং অদ্যাপি করেন। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে এই জন্যই সংস্কৃত কলেজেও বৈদ্যের অধ্যাপকতা ও বেদের বিভাগে অধ্যয়ন সম্ভব হইয়াছিল। এইজন্যই

বৈদ্যগণ যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদের ন্যায় মহামহোপাধ্যায় উপাধি ধারণ করিলে বা প্রতিগ্রহ করিলে তাঁহারা কলহ করিতেন না, আশ্চর্য্যও হইতেন না। পাতিত্যের জন্য বৈশ্যবৎ ১৫ দিন অশৌচ পালন এবং গুপ্তান্ত নামেই দৈব ও পিত্র্য কার্য্যগুলি করিলেও বৈদ্য অপতিত অবস্থায় যে অধিকার-গুলি ভোগ করিত, তাহা ব্রাহ্মণ সমাজ একেবারে কাড়িয়া লন নাই। ইহার কারণ আর কিছুই নয়, চিকিৎসক বলিয়া তাঁহাদিগকে অন্যান্য জাতির মত একেবারে অবজ্ঞাত করা সহজ হয় নাই।

নং ৪। মহামহোপাধ্যায় ভরতমল্লিক প্রণীত চন্দ্রপ্রভা নামক কুল-গ্রন্থ হইতে অবিকল গৃহীত। এই পুস্তকেও বৈদ্য যে জন্মতঃ ব্রাহ্মণ তাহা লেখা হইয়াছে। তাহার বৈশ্যত্ব বা শূদ্রত্ব কদাচার হেতু পাতিত্য বশতঃ, জন্মতঃ মাতৃবর্ণত্ব হেতু নহে, এরূপ কথা ভরত স্পষ্টই বলিয়াছেন। তিনি পরিষ্কার ভাষায় বলিয়াছেন, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য যেরূপ পতিত হইয়াছে, আমরাও তদ্রূপ পতিত হইয়াছি, ইহা স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য ও বাচস্পতি মিশ্র লিখিয়াছেন। তবেই বুঝা যাইতেছে যে, সেকালের পণ্ডিত বৈদ্যেরাও পুরোহিত শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের কথাকে একে-বারে বেদবাক্য বলিয়া মানিতেন। কুলাচার্য্যদের এক কথায় কুলীনেরা যেমন নিষ্কুল ও নিষ্কুলেরা কুলীন হইয়া যাইত, সেই রূপ তাহাদের যজমান বৈদ্যেরাও, তাহারা 'পতিত হইয়াছে' শুনিয়াই আপনাদিগকে পতিত বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। ভরতমল্লিক কি ভাবে সসঙ্কোচে আপনার জন্মতঃ দ্বিজত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা দেখাইতেছি—

প্রথম অধ্যায়—"নত্বা শিবং শিবকরং শিবয়া সমেতং
বাণীং গুরূন্ দ্বিজগণং **ভিষজাং** গণঞ্চ।
গৌরাঙ্গমল্লিকসুতো ভরতো বিনীতঃ
বৈদ্যাত্মজো বদতি বৈদ্যকুলস্য তত্ত্বম্॥

এস্থলে দ্রষ্টব্য এইযে, এই পুস্তকে ৪৫০ পৃষ্ঠা ও প্রত্যেক পৃষ্ঠাঙ্ক

দুই স্তম্ভ করিয়া সর্ব্বশুদ্ধ ১৪০০০ শ্লোক বিদ্যমান আছে; তন্মধ্যে প্রায় এক সহস্র স্থলে বৈদ্য বা ভিষক্ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে এবং মাত্র ১২ দ্বাদশ স্থলে 'অম্বষ্ঠ' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। ভরত বলিতেছেন—

'বৈদ্যানাম্ কীর্ত্তনাৎ পুণ্যং বিপ্রাণাম্ ইব জায়তে।
তস্মাচ্চ পূর্ব্বৈঃ কৃতিভিঃ কৃতা পঞ্জী ময়াঽপি চ ॥ ৭ ॥

বৈদ্যদিগের বংশকীর্ত্তন করিলে বিপ্র-গুণকীর্ত্তনের ন্যায় পুণ্য হইবে, এই আশায় পূর্ব্ববর্ত্তী বৈদ্যকুলাচার্য্যগণ এবং আমি বৈদ্যকুল-পঞ্জী রচনা করিয়াছি।

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাম্ আরোগ্যম্ মূলমুত্তমম্।
তৎ বৈদ্যাৎ জায়তে যস্মাৎ তদ্বৈদ্যো বর্ণ উত্তমঃ ॥ ১০ ॥

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গের মূল আরোগ্য বৈদ্যের কৃপা বশতঃ হয়, অতএব বৈদ্য বর্ণোত্তম অর্থাৎ ব্রাহ্মণ।

সর্ব্বেষা মেব বর্ণানাং মাননীয়ঃ শুভপ্রদঃ।
যস্য সংকীর্ত্তনাৎ পুণ্যমারোগ্যমপি জায়তে ॥ ১ ॥

যিনি সকল বর্ণের মাননীয়, হিতকারী, যাঁহার কীর্ত্তন হইতেও পুণ্য ও আরোগ্য হইয়া থাকে।

বৈদ্য যে ব্রাহ্মণ, এ বিশ্বাস মহামহোপাধ্যায়ের ধমনীতে প্রবহমান! কুলাচার্য্যদিগের ও স্মার্ত্ত পণ্ডিতদের কথায় বৈদ্যগণ অম্বষ্ঠজাতি এরূপ ধারণা হইলেও, অম্বষ্ঠ যে জন্মতঃ ব্রাহ্মণবর্ণীয় এ বিশ্বাস তাঁহার ছিল। প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁহার হৃৎপিণ্ড তাঁহাকে একথা শুনাইতেছিল। কিন্তু তাঁহার চারিদিকে ব্রাহ্মণগণ শুনাইতেন 'বৈদ্য পতিত'। তবে 'পতিত' হইলে আর 'বর্ণোত্তম' বলা চলে কি? তাই আমরা পরবর্ত্তী শ্লোকে 'বৈদ্য সকলের প্রণম্য' এরূপ কথা পাইতেছি না। বৈদ্য সকল বর্ণের প্রণম্য, ইহা চরকে পাঠ করিয়া থাকিলেও আজ মহামহো-পাধ্যায়ের লেখনী হইতে সেই কথা বাহির হইতেছে না, সুতরাং অনেক

ভাবিয়া লিখিলেন, '**মাননীয়**'। বৈদ্যের গুণকীর্ত্তনে পুণ্য হয়, শুধু এ কথা বলিলেই ত হইত, অন্যত্র এ কথা বলিয়াছেন, কিন্তু তৃপ্তি অনুভব করিতেছেন না, কি যেন বলা হইল না, অথচ তাহা মুখ ফুটিয়া বলিবার যো নাই, কারণ তাঁহারা যে এখন 'পতিত'! শেষে উপমার ভিতর দিয়া কোনরূপে লিখিলেন, 'বৈদ্যানাং কীর্ত্তনাৎ পুণ্যং **বিপ্রাণামিব** জায়তে"। হায়, আজ যদি এই স্বজাতি-সেবক মহাত্মা দেখিতে পাইতেন, বাঙ্গালার সহস্র সহস্র গৃহে বৈদ্যগণ অবিকল ব্রাহ্মণাচার পালন করিতেছেন, তবে তাঁহার হৃদয়-নিহিত শল্য উৎপাটিত হইত!

অতঃপর বৈদ্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে নিজ ভাষায় মহামহোপাধ্যায় লিখিতেছেন—

সত্যত্রেতাদ্বাপরেষু যুগেষু ব্রাহ্মণাঃ কিল।
ব্রহ্মক্ষত্রিয়বিট্‌শূদ্রকন্যকা উপযেমিরে॥ ২ অ-১ শ্লোক

পূর্ব্বে ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের কন্যা বিবাহ করিতেন। এইরূপে স্বজাতির অম্বষ্ঠত্ব উপন্যস্ত করিয়া, তাঁহারা যে কতদূর বিদ্বান্ হইতেন, তাহা বর্ণনা করিয়া মনে আনন্দ অনুভব করিতেছেন—

তত্র বৈশ্যসুতায়াং যে জজ্ঞিরে তনয়া অমী।
সর্ব্বে তে মুনয়ঃ খ্যাতা বেদবেদাঙ্গপারগাঃ॥ ২ অ-২

সেই আদি অম্বষ্ঠগণ **সকলেই বেদ-বেদাঙ্গপারগ মুনি ছিলেন।**

শিক্ষাদাতা কুলাচার্য্যগণের মুখে যেমন শুনিয়াছিলেন, মহামহোপাধ্যায় তেমনই লিখিলেন—

তেষাং মুখ্যোঽমৃতাচার্য্য স্তস্থাবম্বাকুলে হি তৎ।
ইত্যসাবুক্ত স্ততো জাতিপ্রবর্ত্তনাৎ॥ ২অ-৩

সেই মুনিগণের মধ্যে অমৃতাচার্য্য শ্রেষ্ঠ। তিনি অম্বা কুলে থাকায় তাঁহার নাম অম্বষ্ঠ হইল।

এ স্থলে ভরত এই মাত্র স্বীকার করিতেছেন যে, মাতৃকুলে কিছুকাল থাকায় অমৃতাচার্য্যের 'অম্বষ্ঠ' এই নাম হইয়াছিল। অমৃতাচার্য্য বৈশ্য হইয়া গিয়াছিলেন, একথা বলিতেছেন না। 'অম্বষ্ঠ' নাম সম্বন্ধে সংশয় থাকিলেও তিনি প্রতিবাদ করিতে পারেন নাই, কারণ স্মার্ত্ত বৃদ্ধগণ ঐরূপ বলিতেন। শাস্ত্রানুসন্ধানপূর্ব্বক তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, অম্বষ্ঠ পিতৃবর্ণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হইত, মাতৃবর্ণ হইত না। কুলীনের ছেলে শ্রোত্রিয় মাতুলের ঘরে পালিত হইলেই যদি শ্রোত্রিয় না হয়, তবে ব্রাহ্মণের পুত্র বৈশ্য মাতুলের গৃহে থাকিলে বৈশ্যই বা কেন হইবে? ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সে কালের ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ বিবাহ করিয়া (বাঙ্গালী) কুলীন ব্রাহ্মণের ন্যায় স্ত্রীকে তদীয় পিত্রালয়ে ফেলিয়া রাখিতেন না। কোন ব্রাহ্মণের অনুলোমজ পুত্র মাতুলালয়ে গিয়া দিন কতক থাকিলেই সে মাতামহের বর্ণ পাইয়া যাইবে,এত বড় বিষম কথা! ইহা কোন্ স্মৃতির ব্যবস্থা? যাহা হউক, মহামহোপাধ্যায় অম্বষ্ঠ নামটা স্বীকার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহার বৈশ্যবর্ণত্ব স্বীকার করেন নাই।

অম্বষ্ঠ যে দ্বিজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, তাহা তিনি বলিয়াছেন—

"জননীতো জনুর্লব্ধ্বা যজ্জাতা বেদসংস্থিতেঃ।
অম্বষ্ঠা স্তেন তে সর্ব্বে দ্বিজা বৈদ্যাশ্চ কীর্ত্তিতাঃ॥৪

জননী হইতে জন্মলাভ করিয়া পুনশ্চ বৈদিক সংস্কার দ্বারা দ্বিতীয়বার জাত হওয়ায় অম্বষ্ঠগণ দ্বিজ ও বৈদ্য বলিয়া সুবিদিত। অম্বষ্ঠ বৈশ্য হইলে, 'বৈশ্য' শব্দই ব্যবহৃত হইত। এস্থলে 'দ্বিজ' শব্দের অর্থ ব্রাহ্মণে; 'উত্তম বর্ণ' ত পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে"।

[**দ্বিজত্ব** স্থাপিত হইল।] বল্লাল-লক্ষ্মণ কলহে বহু বৈদ্য

নিরুপবীত হইলেও এবং রঘুনন্দন ও বাচস্পতি মিশ্র বৈদ্যকে 'শূদ্র' বানাইতে চাহিলেও ভরত তাহা স্বীকার করিতেছেন না—

"সত্যে বৈদ্যাঃ পিতুস্তুল্যাঃ ত্রেতায়াঞ্চ তথা স্মৃতাঃ।

দ্বাপরে **বৈশ্যবৎ** প্রোক্তাঃ কলাবপি তথা মতাঃ॥"৫

বৈদ্যগণ অম্বষ্ঠ এবং অম্বষ্ঠের পিতা ব্রাহ্মণ, ইহা স্বীকৃত হইয়াছে। এক্ষণে মহামহোপাধ্যায় প্রাচীন যুগের কথা স্মরণ করিয়া বলিতেছেন, হায়, আমাদিগের কি অধঃপতন হইয়াছে, আমরা সত্যযুগে **ব্রাহ্মণ** ছিলাম, ত্রেতাতেও **তদ্বৎ**, তখন আমাদের ক্রিয়াকর্ম্ম উপনয়ন, বিবাহ, শ্রাদ্ধ, সকল সংস্কার অবিকল শাস্ত্রীয় আচারে অর্থাৎ **ব্রাহ্মণাচারেই** হইত; দ্বাপরে আমরা বৈশ্যবৎ হইয়া পড়িয়াছিলাম। তখন ক্রিয়াকর্ম্ম বৈশ্যবৎ হইত, কলিতেও তাহাই আছে। 'অম্বষ্ঠ মাতৃবর্ণ বলিয়া চির-কালই বৈশ্যাচারী', একথা মহামহোপাধ্যায় বলিতেছেন না। স্মৃতি পুরাণে ও ইতিহাসে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতির পতনের কথা আছে, মহামহোপাধ্যায় ভাবিতেছেন, হয় ত আমার জাতিও সেই ভাবে পতিত হইয়া থাকিবে! কিন্তু পতিত হউক, আর নাই হউক, কলিযুগে 'বৈশ্যোপম' হইয়া যেমন বৈশ্য-বর্ণ হইয়াছে, সত্যযুগে সেইরূপ 'পিতুস্তুল্যাঃ' থাকায় পিতৃবর্ণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণবর্ণ ছিল, ইহা জানা যাই-তেছে। এই শ্লোকটী কুলচন্দ্রিকা হইতে উদ্ধৃত করিয়া পূর্ব্বে (৪৩ পৃষ্ঠায়) দেখান হইয়াছে যে, বৈদ্যগণ সত্যযুগে **ব্রাহ্মণ**, ত্রেতায় **ব্রাহ্মণ**, দ্বাপরে ক্ষত্রিয় ও কলিতে বৈশ্যবৎ।

ব্রাহ্মণের সন্তান ব্রাহ্মণ অম্বষ্ঠ এখনও নিজ গোত্রে পরিচয় দিয়া থাকে। মহামহোপাধ্যায় বলিতেছেন—

"যস্য যস্য মুনের্যো যঃ সন্তানঃ সঃ স বিশ্রুতঃ।

তত্তদ্গোত্রাদিনা বৈদ্যঃ শ্রৈষ্ঠ্যাত্তস্ত স্বকর্ম্মণা॥৯॥

বৈদ্যগণ যে যে মুনির সন্তান, সেই সেই মুনির নামে গোত্র পরিচয়

দিয়া থাকেন। বৈদ্য ব্রাহ্মণ বলিয়াই তাঁহার নিজস্ব গোত্রের কথা মহামহোপাধ্যায় বলিলেন।

মহামহোপাধ্যায় এতদ্দ্বারাও বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন। পাতিত্য হেতু আজ বৈশ্য বলিয়া গণ্য হইলেও, সাধারণ বৈশ্যাদি অপেক্ষা অম্বষ্ঠের উৎকর্ষ এই যে, অম্বষ্ঠের গোত্র নিজস্ব জিনিষ, আমরা জানি, কে কোন মহনীয় ঋষি-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। অনন্তর মহামহোপাধ্যায় স্মৃতি হইতে প্রমাণ তুলিয়া সপ্রমাণ করিতেছেন যে, বৈদ্য অর্থাৎ অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণের বিবাহিত বৈশ্যকন্যাতে জাত, সে ব্রাহ্মণ পিতার আত্মা বা স্বরূপ, অর্থাৎ পিতৃবর্ণ। ব্রাহ্মণের বৈশ্যকন্যা বিবাহ অনিন্দ্য ও সন্তানবর্দ্ধন, সুতরাং অম্বষ্ঠ অব্রাহ্মণ নহে।

তিস্রো বর্ণানুপূর্ব্ব্যেণ দ্বে তথৈকা যথাক্রমম্।
ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং ভার্য্যাঃ স্বা শূদ্রজন্মনঃ ॥১০॥
যদুচ্যতে দ্বিজাতীনাং শূদ্রাদ্দারোপসংগ্রহঃ।
নৈতন্মম মতং যস্মাৎ তত্রাত্মা জায়তে স্বয়ম্ ॥১১॥
... ...
সবর্ণেভ্যঃ সবর্ণাসু জায়ন্তে বৈ সজাতয়ঃ।
অনিন্দ্যেষু বিবাহেষু পুত্রাঃ **সন্তানবর্দ্ধনাঃ** ॥১৩

অর্থাৎ, ব্রাহ্মণ তিন বর্ণ হইতে ভার্য্যা গ্রহণ করিতে পারেন, যথা, ব্রাহ্মণ কন্যা, ক্ষত্রিয় কন্যা ও বৈশ্য কন্যা। শূদ্র কন্যাকে ভার্য্যা রূপে গ্রহণ করা উচিত নহে, কারণ ঐ বিবাহই ব্যর্থ। আত্মার প্রজননই বিবাহের উদ্দেশ্য, ভার্য্যাতে আত্মাই জন্মগ্রহণ করে, অথচ শূদ্রাবিবাহ অমন্ত্রক হওয়ায় সংস্কারাভাবে শূদ্রার পত্নীত্ব সিদ্ধ হয় না এবং তদীয় গর্ভে দ্বিজের আত্মজ বা ঔরস পিণ্ডদ পুত্র জন্মলাভ করে না। এই পুত্রকে মনু 'শৌদ্র' বলিয়াছেন। সবর্ণা স্ত্রীতে সবর্ণ পতি হইতে পিতার 'সজাতি সন্তান উৎপন্ন হয়। অনিন্দ্য বিবাহে

অর্থাৎ কি সবর্ণ বিবাহে, কি অনুলোম বিবাহে সন্তানবর্দ্ধন পুত্রই জন্মিয়া থাকে। অসবর্ণ বিবাহে পুত্রগণ পিতার 'সজাতি' না হইলেও তাহার সহিত সমবর্ণ (সবর্ণ) হয়। ঐ সকল পুত্রের মূর্দ্ধাভিষিক্ত, অম্বষ্ঠ প্রভৃতি পৃথক জাতি নাম থাকিতে পারে, কিন্তু তাহারাও পিতার সন্তানবর্দ্ধন হয়, অর্থাৎ **ব্রাহ্মণ** হয়, ইহাতে অব্রাহ্মণ জাতির 'বৃদ্ধি' হয় না। মনু নবম অধ্যায়ে ১৫৮-১৬০ শ্লোকে দ্বাদশবিধ পুত্রের কথা বলিয়াছেন। তন্মধ্যে কানীন, সহোঢ়, ক্রীত, পৌনর্ভব, স্বয়ংদত্ত ও শৌদ্র, ইহারা পিতার গোত্র ও ধন পায় না। অপর ছয় পুত্র যথা. ঔরস, ক্ষেত্রজ, দত্ত, কৃত্রিম, গূঢ়োৎপন্ন ও অপবিদ্ধ, ইহারা পিতার গোত্র ও ধন প্রাপ্ত হয়। এখন স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, বিবাহিত বৈশ্যকন্যাতে জাত অনিন্দ্য-পুত্র অম্বষ্ঠ পিতার **ঔরস** পুত্র. সুতরাং গোত্র ও ধনে অধিকারী ঔরস পুত্র পিতার **গোত্র** পাইয়া পিতার বর্ণই প্রাপ্ত হয়, সুতরাং অম্বষ্ঠ **ব্রাহ্মণ**।

'অম্বষ্ঠ' যে ব্রাহ্মণের বৈধ সন্তান-বর্দ্ধন পুত্র, তাহা মহামহোপাধ্যায় পূর্ব্ব শ্লোকের 'পুত্রাঃ সন্তানবর্দ্ধনাঃ'র ঠিক পরবর্ত্তী শ্লোকে মূর্দ্ধাভিষিক্ত, অম্বষ্ঠ প্রভৃতি নাম করিয়া জানাইয়াছেন। এগুলি বিবাহিত স্ত্রী পক্ষে এরূপও বলিয়াছেন। তৎপরবর্ত্তী শ্লোকে প্রতিলোমজাত পুত্রদের নাম বলিয়াছেন, কিন্তু এস্থলে বিবাহের সম্ভাবনা না থাকায় বুঝা যায় যে, তাহারা 'সন্তানবর্দ্ধন' নহে। [মহামহোপাধ্যায় না বলিলেও সংহিতায় পরবর্ত্তী শ্লোকে "অসৎসন্তস্ত বিজ্ঞেয়াঃ প্রতিলোমানুলোমজাঃ" এই যাজ্ঞবল্ক্যোক্তি হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, প্রতিলোমজাত পুত্রগণ অসৎ পুত্র হওয়ায়, অনুলোমজাত 'অম্বষ্ঠ' সৎপুত্র অর্থাৎ পিতার সন্তানবর্দ্ধন, অর্থাৎ সজাতি না হইলেও সবর্ণ। যথা

> বিপ্রান্মূর্দ্ধাভিষিক্তোহি ক্ষত্রিয়ায়াং বিশঃ স্ত্রিয়াম্।
> জাতোঽম্বষ্ঠস্তু শূদ্রায়াং নিষাদঃ পারশবোঽপি বা।১০॥

বৈশ্যাশূদ্রোশ্চ রাজন্যান্মাহিষ্যোগ্রৌ সুতৌ স্মৃতৌ।
বৈশ্যাত্তু করণঃ শূদ্র্যাং বিন্নাস্বেষ বিধিঃ স্মৃতঃ ॥১৫

বিবাহিত স্ত্রীতে জাত পুত্রদের কথা এখানে বলা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে অম্বষ্ঠ একজন। অতএব মহামহোপাধ্যায় (২য় অঃ, ১ শ্লোকে) নিজ কথায় যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা স্মৃতি বাক্য দ্বারা সমর্থিত হইল। [ইহাদের মধ্যে শূদ্রা-পুত্রদের উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু শূদ্রাপুত্র যাজ্ঞবল্ক্য বা মনুর 'অভিমত' নহে, সুতরাং সন্তানবর্দ্ধন নহে, প্রতিলোমজাত পুত্রও সন্তানবর্দ্ধন নহে, ইহা অব্যবহিত পরে সংহিতার ১ম অ, ৯৩।৯৪।৯৫ শ্লোকে বলা হইয়াছে।]

অতঃপর মনু, পরাশর ও শঙ্খ হইতে বচন তুলিয়া অম্বষ্ঠের জন্ম যে ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যা হইতে, তাহা কহিয়া যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত অন্য স্মৃতির বিরোধ নাই, দেখাইলেন। [শঙ্খ ও পরাশরের উক্তি তত্তৎ সংহিতায় না পাওয়া গেলেও, মনু-বাক্যটী ঠিক আছে দেখিয়া, আমরা মহামহোপাধ্যায়ের অভিপ্রায় বুঝিতে পারি] এখন সমাজে অম্বষ্ঠের স্থান কিরূপ, তাহা দেখাইতে হইবে। অম্বষ্ঠ পূর্ব্বকালে যখন পিতৃবৎ (ব্রাহ্মণ) ছিল, তখন ক্ষত্রিয়ের উপরে তাহার স্থান ছিল এবং ব্রাহ্মণবর্ণ মধ্যে তাহার তৃতীয় স্থান ছিল। যথা—

ব্রহ্মা মূর্দ্ধাভিষিক্তশ্চ বৈদ্যঃ ক্ষত্রবিশাবপি।
অমী পঞ্চ দ্বিজা এষাং যথাপূর্ব্বঞ্চ গৌরবম্ ॥

ইতি হারীতঃ।

মহামহোপাধ্যায় বলিতেছেন, ব্রাহ্মণ, মূর্দ্ধাবসিক্ত, বৈদ্য, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য গৌরব অনুসারে এইরূপ পরে পরে দ্বিজাতিগণের নাম উল্লেখ করিলে দেখা যায় যে, বৈদ্যের নাম ক্ষত্রিয়ের উপরে হারীতে এই শ্লোক পাওয়া যায় না। যাহা হউক, বৃদ্ধানুমোদিত হওয়ায় ভরত ইহা ত্যাগ করেন নাই, বিশেষতঃ তিনি ইহা দ্বারা বৈদ্যদিগের সামাজিক

প্রতিষ্ঠা কিরূপ তাহাই দেখাইতেছেন। ক্ষত্রিয়ের উপরে থাকায় মহামহোপাধ্যায় এখানেও সমাজকে বুঝাইতেছেন যে, বৈদ্য ব্রাহ্মণবর্ণীয় বলিয়াই ক্ষত্রিয়ের উপরে। সুতরাং রঘুনন্দন প্রভৃতি বৈদ্যকে পতিত বলিলেও, এমন কি 'শূদ্রবৎ' বলিলেও. তিনি তাহাকে ক্ষত্রিয়ের উপরে রাখিতেছেন। ইহা অপেক্ষা রঘুনন্দনের তীব্রতর প্রতিবাদ অন্য কোন বৈদ্যসন্তান করিতে পারেন নাই! মহামহোপাধ্যায় বলিতেছেন, তোমরা আমাদিগকে যতই পতিত বল, আমাদের স্থান ক্ষত্রিয়ের উচ্চে, আমরা **ব্রাহ্মণ**। এখনও ক্ষত্রিয়ের উপরে আমাদের সামাজিক স্থান. অতএব আমরা তোমাদের রটান পাতিত্য স্বীকার করি না, সমাজ তাহা স্বীকার করে না। যে টুকুতে বাধ্য করিয়াছ সেই টুকুতেই আমরা অব্রাহ্মণ, আর সকল বিষয়ে ব্রাহ্মণ।

অনন্তর বৈদ্যদিগের ব্রাহ্মণত্বে বৃদ্ধ বৈদ্যদিগেরও মত আছে দেখাইতেছেন—

"মূর্দ্ধাভিষিক্তাম্বষ্ঠয়োরপি **পিতৃবত্ত্বাৎ দ্বিজত্বম্**"

চন্দ্রপ্রভা, পৃঃ ৫।

অম্বষ্ঠ 'দ্বিজ' কেন? 'মাতৃবৎ' বলিয়া নহে, কিন্তু 'পিতৃবৎ' বলিয়াই তাহার দ্বিজত্ব। মহামহোপাধ্যায় ভরত মল্লিক অম্বষ্ঠের উৎপত্তি ও বর্ণ সম্বন্ধে আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে যে কথা বলিয়াছেন, বৈদ্যব্রাহ্মণ সমিতি এবং প্রত্যেক বৈদ্যব্রাহ্মণ পণ্ডিত সেই কথা বলিতেছেন, কেবল কয়েক জন দুষ্ট ব্রাহ্মণ ও তাহাদের চরণ-চাটা কয়েক জন দুষ্ট বৈদ্য অন্য কথা বলেন। ব্রাহ্মণদের মধ্যে ভাল মন্দ চিরকাল আছেন। অনুকূল ব্রাহ্মণেরা বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব অস্বীকার করিতেন না বলিয়াই মহামহোপাধ্যায় এরূপ লিখিতে পারিয়াছিলেন। প্রবল প্রতিপক্ষ স্মার্ত্ত-সম্রাট রঘুনন্দনের বৈদ্যপাতিত্য সূচক শাসন প্রতিকূলে না থাকিলে, অদ্বিতীয় সমাজসেবক মহামহোপাধ্যায় ভরত মল্লিক আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বেই বৈদ্য-ব্রাহ্মণ

সমিতির কার্য্য শেষ করিতেন, আজ মহামহোপাধ্যায় গণনাথকে এত শ্রমস্বীকার করিতে হইত না। স্মার্ত্ত সম্রাটের শাসন বাক্য এই যে, বৈদ্য আর পূর্ব্বের বৈদ্য নাই, সে পতিত হইয়া শূদ্র হইয়াছে। রাজা গণেশের শাসন বাক্যে কালীবাবুর সন্দেহ হয়, কিন্তু স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের শাসনে ত সন্দেহ করিবার যো নাই। তবে গণেশ-শাসন অপেক্ষা সেরা রঘুনন্দন-শাসন মানিয়া কালীবাবু শূদ্রের মত ক্রিয়াকর্ম্ম কেন না করেন? সত্যেন্দ্র বাবুরও বৈশ্যাচার দ্বারা অবিনয় দেখান উচিত নয়, কবিরাজ বাচস্পতি মহাশয়েরও ত উচিত 'কুমীররা' যাহা বলিয়াছে, তাহা মানিয়া শূদ্রবৎ কার্য্য করা! কালীবাবু প্রভৃতি যদি রঘুনন্দনী শাসন না মানেন, তবে ত মহামহোপাধ্যায়ের "পিতৃবত্ত্বাৎ দ্বিজত্বম্", "সত্যে বৈদ্যাঃ পিতুস্তুল্যাঃ" ও "বর্ণ উত্তমঃ" প্রভৃতি স্মরণ করিয়া ব্রাহ্মণাচারেই সমস্ত ক্রিয়াকর্ম্ম করা উচিত! বৈশ্যাচারের মধ্য-লীলায় মগ্ন থাকেন কেন? সেকালে রাজশাসন অপেক্ষা ব্রাহ্মণ-শাসনকে ধর্ম্মের শাসন মনে করিয়া লোকে অধিক ভয় করিত! লোকে রাজা গণেশের কথা ভুলিয়াছে, কিন্তু রঘুনন্দনের কথা ভুলে নাই, বিশেষতঃ ভট্টাচার্য্যের শাসন স্মৃতিনিবন্ধে লিখিত হইয়া মন্বাদির উক্তির ন্যায় গৃহে গৃহে পঠিত ও পূজিত হইতেছে। রঘুনন্দনের শাসন রাজ-শাসনের অপেক্ষা অধিকতর অন্তরঙ্গ। একটীতে বৈশ্যত্বই সীমা, অপরটীতে শূদ্রত্ব! আজ যদি কোন রাজা বলেন, চুরি করিলে দক্ষিণ হস্ত ছেদন করা হইবে, এবং পরবর্ত্তী অপর রাজা বলেন, চুরি করিলে মস্তকচ্ছেদন করা হইবে, তবে পূর্ব্ববর্ত্তী রাজার হস্তচ্ছেদনের আদেশ, আর লোকনিয়ামক বলিয়া গ্রাহ্য হয় না। এরূপ অবস্থায় রাজা গণেশের আদেশের অস্তিত্বে কালীবাবুর সন্দেহের মূল্য কি? উহা থাকিলেই বা কি, আর না থাকিলেই বা কি? যাহা হউক, মহামহোপাধ্যায় ভরত মল্লিক প্রভৃতি রাঢ়ীয় বৈদ্য সমাজপতিগণ যে স্মার্ত্তশাসনের সম্মুখে একেবারে মস্তক নত করেন নাই, তাহা

রাঢ়ের অখণ্ডিত উপনয়ন ও বৈশ্যাচার হইতে জানা যাইতেছে। আবার 'বৈশ্যাচারী বা বৈশ্যবৎ', কিন্তু বৈশ্যবর্ণীয় নয়, এরূপ জ্ঞান থাকাতে প্রাচীন বৈদ্যরা বৈশ্যবৎ পঞ্চদশাহ অশৌচ পালন করিলেও, ব্রাহ্মণত্বের অভিমানে স্বচ্ছন্দে আচার্য্যত্ব ও প্রতিগ্রহ করিতেন, মহামহোপাধ্যায়াদি উপাধি ধারণ করিতেন, ব্রাহ্মণ শিষ্যকে চরণ ধূলি দিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। মহামহোপাধ্যায় মহাশয়ের সুযোগ্য বংশধর বিখ্যাত কবিরাজ জ্যোতির্ম্ময় সেনশর্ম্মা (মল্লিক) কবিচিন্তামণি মহাশয় আপনার পূর্ব্ব পিতামহের ভূরি ভূরি প্রতিগ্রহের কথা যেমন শুনিয়াছেন, অদ্যাপি গল্প করিয়া থাকেন। এই মহাপুরুষ নামমাত্রে বৈশ্যাচার স্বীকার করিয়া স্মার্ত্তপণ্ডিতদের মান রক্ষা ও মেজাজ ঠাণ্ডা করিয়াছিলেন, কিন্তু পারত পক্ষে কাপুরুষ আমাদের মত সমস্ত অধিকার বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত ছিলেন না।

মহামহোপাধ্যায় ভরতমল্লিক বৈশ্যাচার পর্য্যন্ত পাতিত্য স্বীকার করিয়াছিলেন, তন্নিম্নে নামেন নাই। এই স্বীকৃত বৈশ্যত্ব তাঁহাকে প্রতিমুহূর্ত্তে যন্ত্রণা দিত। অহীনকর্ম্মা শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হইয়া বৈশ্যবৎ আচার! তাই দারুণ ক্ষোভে কাতর হইয়া নিজেকে সান্ত্বনা দিতেছেন—

আয়ুর্ব্বেদোপনয়নাৎ বৈদ্যো দ্বিজ ইতি স্মৃতঃ।
তপোযোগাৎ পুরা বৈদ্যা স্তেজসা পিতৃবৎ স্মৃতাঃ॥ ২৫॥

এস্থলে 'দ্বিজ' পাঠ প্রকাশকের ভুল। ইহা 'ত্রিজ' হইবে। দ্বিজপুত্র উপনয়ন হইলেই 'দ্বিজ' হয়, পরে আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন কালে তাহাকে পুনরুপনয়ন দেওয়া হয়। এইজন্য বিদ্যাসমাপ্তিতে তাহাকে 'ত্রিজ' বলে, ইহা চরক বলিয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় চরকোক্তি স্মরণ করিয়া বলিতেছেন, বৈদ্যেরা 'ত্রিজ' এবং পূর্ব্বে সেই তেজোমণ্ডিত বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণ বলিয়াই গণ্য হইতেন।

[গঙ্গাধর কবিরাজ, কবিরাজ যশোদানন্দন সরকার, সতীশচন্দ্র শর্ম্মা,

অবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন ও দেবেন্দ্রনাথ সেন এই পাঁচজনের চরক-সংস্করণেই 'ত্রিজ' পাঠ আছে।]

বিপ্রক্ষত্রজতো ন্যূনাঃ ক্রিয়য়া বৈশ্যবৎ কৃতাঃ।
শনৈঃ শনৈঃ ক্রিয়ালোপাদথ তা বৈদ্যজাতয়ঃ॥
কলৌ শূদ্রসমা জ্ঞেয়া যথা ক্ষত্রা যথা বিশঃ। ইতি বিষ্ণুঃ ২৬।২৭

কালক্রমে বৈদ্যেরা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় হইতে হীন হইয়া বৈশ্যবৎ হইলেন এবং এক্ষণে আরও ক্রিয়ালোপ হওয়ায় তাঁহারা শূদ্রবৎ হইয়াছেন, মনে করা যাইতে পারে। 'যথা ক্ষত্রা যথা বিশঃ' বলায় সকল ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য যেমন শূদ্র হয় নাই, সেইরূপ সকল বৈদ্যও যে শূদ্র হয় নাই, তাহা বুঝা যাইতেছে। কিন্তু বৈদ্যের চরম পাতিত্যসূচক এই বচনটী বিষ্ণুতে নাই! সম্বন্ধনির্ণয়-কার এই শ্লোকটীকে একবার এ ঋষির, অন্যবার অন্য ঋষির বলিয়াছেন! বস্তুতঃ 'বৈদ্য' নামে কোন জাতি কোন স্মৃতিতে নাই, সুতরাং ইহা ঋষিপ্রণীত বাক্য হইতেই পারে না। এ শ্লোকের অর্থ উত্তর, পশ্চিম বা দক্ষিণ ভারতীয় কোন পণ্ডিতই বুঝিতে পারিবে না, কেবল বুঝিবে বাঙ্গালার জাল-রচনাকারী পণ্ডিতমণ্ডলী! এই ভিত্তিহীন বচনের বলে সকল বৈদ্যেরই ক্রিয়া-লোপের চরম হইয়াছে অর্থাৎ সকলেই শূদ্রবৎ হইয়াছে, ইহা ভরত-মল্লিকও বলিতেছেন না। কারণ, তিনি পূর্ব্বেই বলিয়াছেন যে, বৈদ্যগণ দ্বাপরে বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়া কলিতেও বৈশ্যবৎ আছে।

স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের শাসন এই যে, বৈদ্যেরা শূদ্র হইয়াছে, সেই শাসনকে বলবৎ করিবার জন্য অন্যান্য স্মার্ত্তেরা যে সকল নির্ম্মূল বচন আওড়াইতেন, মহামহোপাধ্যায় অনন্যোপায় হইয়াই সেইরূপ একটী বচন বিষ্ণুর নামে এখানে লিখিতে বাধ্য হইয়াছেন। আর একটি ঐরূপ বচন এই—

"যুগে জঘন্যে দ্বে জাতী ব্রাহ্মণঃ শূদ্র এব চ ॥২৮॥ ইতি যমঃ

কলিযুগে দুইটিমাত্র জাতি, ব্রাহ্মণ ও শূদ্র! মধ্যভাগে ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের স্থান নাই! সনাতন চাতুর্ব্বর্ণ্যের হানিসূচক এই বাক্য যতই অসঙ্গত হউক, স্মার্ত্তদিগের ইহা একটি প্রবল অস্ত্র হইয়াছিল, এটী তাঁহারা যমের বচন বলিয়া চালাইতেন, সুতরাং ভরতও তদ্রূপ লিখিয়াছেন। আপনাদের পাতিত্যসূচক নির্ম্মূল বচন কোন ব্যক্তিই ইচ্ছা করিয়া লিপিবদ্ধ করে না, কিন্তু সমাজে যখন কতক বৈদ্যকে সত্যই শূদ্রাচারী অর্থাৎ অনুপনীত দেখা যাইতেছিল, তখন না লিখিয়াই বা উপায় কি ছিল? কিন্তু এ কথা লিখিতে যে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়াছিল, ইহা প্রত্যেক স্বজাতিবৎসল ব্যক্তির অনুভূতি-সিদ্ধ! স্মার্ত্ত অত্যাচারে বৈদ্য-সমাজের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল, ভরত তাহা লিখিতেছেন—

"শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।

বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ ॥২৯॥ ইতি মনু-বচনং শ্রুত্বা 'এবমম্বষ্ঠাদীনামপি কলৌ শূদ্রত্ব মতি স্বস্বগ্রন্থেষু বাচস্পতিমিশ্রাদিভিস্তথা শুদ্ধিতত্ত্বে স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যেণাপি উক্তম্।" অর্থাৎ মনুতে আছে, কতকগুলি ক্ষত্রিয় এক সময়ে পতিত হইয়াছিল, কিন্তু সেই বচন ধরিয়া বাচস্পতি মিশ্র, রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি স্মার্ত্তেরা নিজ নিজ পুস্তকে 'এইরূপে অম্বষ্ঠগণও পতিত হইয়াছে', এইরূপ লিখিয়াছেন। এখন উপায় কি? অবিচার হইলেও ব্রাহ্মণ শাসন অমান্য করে, হিন্দুর এমন শক্তি ছিল না। ভরত বলিতেছেন, এই জন্যই পূর্ব্ববর্ত্তী কোন বৈদ্য-কুলপঞ্জিকায় শূদ্রত্ব মানিয়া লইয়াও এইরূপে মনকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে—

"অতিদিষ্টং হি বৈদ্যস্য শূদ্রত্বং ক্ষত্রিয়াদিবৎ।
তস্মাৎ ক্ষত্রবিশো স্বল্যঃ বৈদ্যঃ শূদ্রস্য পূজিতঃ" ॥৩০॥

অর্থাৎ বৈদ্য ত খাঁটি শূদ্র নয়, পূর্ব্বে দ্বিজ ছিল, এখন পতিত হইয়া শূদ্রবৎ হইয়াছে। অনেক ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য যেমন ক্রিয়ালোপহেতু শূদ্রবৎ

হইয়াছে, বৈদ্যও সেইরূপ ক্রিয়ালোপহেতু শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হওয়ায় অপর শূদ্রগণের নমস্য।

ঐ সময়ে স্মার্ত্তদিগের অনুগ্রহে (রাঢ়ীয় বৈদ্য ব্যতীত) বাঙ্গালার সকল জাতিই শূদ্র হইয়াছিল। বাঙ্গালায় ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য দ্বিজ বলিয়া গণ্য থাকিলে, বৈদ্য পণ্ডিতগণ এত সহজে শূদ্রত্ব স্বীকার করিতেন না।

আমরা শব্দকল্পদ্রুমের ও চন্দ্রপ্রভার সম্মিলিত প্রমাণ হইতে দেখিলাম যে, শব্দকল্পদ্রুমে চারি দফা বৈদ্যোৎপত্তির বিবরণে কুত্রাপি বৈদ্যের জন্মগত বৈশ্যত্ব প্রকাশিত হয় নাই, **বিপ্রত্বই** হইয়াছে। শব্দকল্পদ্রুম (প্রথম সংস্করণ) এখন হইতে এক শত বর্ষ পূর্ব্বে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয় এবং উহাতে তদানীন্তন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদেরই অভিমত প্রকাশিত হইয়াছে। চন্দ্রপ্রভা হইতে ধৃত ভরত মল্লিকের প্রমাণও ঐ সকল ব্রাহ্মণদের অভিমতের সহিত সগৌরবে ধৃত হইয়াছে ভরত মল্লিক বৈদ্য পণ্ডিতদের শীর্ষস্থানীয়। তবেই দেখা যাইতেছে যে, কি স্মার্ত্তপণ্ডিত, কি বৈদ্যপণ্ডিত উভয় শ্রেণীর সম্মিলিত মত এই যে, **বৈদ্য জন্মতঃ ব্রাহ্মণ-বর্ণায়।** তবে কালী বাবু যে বৈদ্যকে জন্মতঃ বৈশ্যবর্ণীয় সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা একান্ত অন্যায়, এবং শব্দকল্পদ্রুম ও চন্দ্রপ্রভার প্রমাণ উল্লেখ করিয়া নিজ মত স্থাপনের চেষ্টা দুরভিসন্ধিপূর্ণ চাতুরী ব্যতীত আর কিছুই নহে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, চায়ু প্রণীত ৭০০ বৎসরের পুরাতন কুলপঞ্জিকায় অম্বষ্ঠ শব্দ নাই, প্রায় ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দের দুর্জ্জয় কুলপঞ্জীতে 'অম্বষ্ঠ' শব্দ নাই। ৩০০ বৎসরের পুরাতন কণ্ঠহারের সদ্বৈদ্য কুলপঞ্জিকায়ও অম্বষ্ঠ শব্দ নাই। এই তিনখানি পুস্তকেরই নাম বৈদ্যকুল পঞ্জিকা। সংস্কৃত ভাষায় রচিত এই গ্রন্থত্রয়ে 'অম্বষ্ঠ' নাম ব্যবহৃত হয় নাই। কোনখানিতেই অম্বষ্ঠোৎপত্তির গল্পকাহিনী সন্নিবেশিত হয় নাই।

কোন বৈদ্যকে 'অম্বষ্ঠ' বলিয়া বিশেষিত করা হয় নাই। কোন বৈদ্যের নামান্তে গুপ্ত নাই। কিন্তু কালী বাবু বৈদ্য পুস্তকের ৬ পৃষ্ঠায় লিখিতেছেন—

"১২৯২ সনে শ্রীযুক্ত রাজকুমার সেনগুপ্ত ও খান্দারপাড়ার কুলীন শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত নানা স্থান হইতে ১৪ খানি হস্ত লিখিত কণ্ঠহার সংগ্রহ করিয়া কুলপঞ্জিকা মুদ্রিত করেন। তাঁহারাও বৈদ্যগণ যে অম্বষ্ঠ ও দ্বিজাতি তাহা মনুর ১০।৮ শ্লোক ও অন্যান্য শাস্ত্র বচন **মুখবন্ধে** উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করিয়াছিলেন এবং নিজেরা সেনগুপ্ত বলিয়াই স্বাক্ষর করেন। কণ্ঠহার একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ।"

এ সকল কথার অর্থ কি? অর্ব্বাচীন প্রকাশকেরা মুখবন্ধে মাথামুণ্ড কিছু লিখিলে তাহা প্রাচীন গ্রন্থকর্ত্তার স্কন্ধে চাপান যায় কিরূপে? প্রকাশকেরা 'সেনগুপ্ত' লিখিয়াছেন, সেজন্য কণ্ঠহার দায়ী নাকি? ইংরাজের আমলে যে সময় হইতে 'সেন', 'দাস', 'দত্ত' প্রভৃতি উপাধি-ধারী অন্য জাতীয় লোকেরা তত্তদুপাধিধারী বৈদ্যদিগের সঙ্গে এক মেসে বাস, এক আফিসে কাজ, এক স্কুলে বা কলেজে পড়া আরম্ভ করিতে-ছিলেন, বিশেষতঃ কলিকাতা অঞ্চলে নিমন্ত্রণাদিতে এক সঙ্গে আহারে বসিবার উপক্রম করিতেছিলেন, সেই সময়েই বৈদ্য মহোদয়েরা অন্য জাতি হইতে নিজেদের পার্থক্য বুঝাইবার জন্য পরিচয়ে বৈশ্যাচারানুযায়ী 'গুপ্ত'পদবী ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন। রাজকুমার বাবু ও চন্দ্রনাথ বাবু এই জন্যই 'গুপ্ত' শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন। তাঁহারা যে **জন্মতঃ** বৈশ্যবর্ণ, ইহা তাঁহারা মুখবন্ধে কুত্রাপি বলেন নাই, বরং মহামহোপাধ্যায় ভরতের প্রমাণাবলীর অনুসরণ করিয়া বৈদ্যকে জন্মতঃ ব্রাহ্মণই বলিয়াছেন। তবে ধোঁকা দিয়া সরলচিত্ত পাঠককে ভুলাইবার জন্যই যে এরূপ লেখা হইয়াছে; এবং শেষে **'কণ্ঠহার একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ'** এই কথাগুলি লিখিয়া কণ্ঠহারই যেন অম্বষ্ঠত্ব ও

বৈশ্যত্ব প্রচার করিয়া 'গুপ্ত' লিখিতে উপদেশ দিয়াছেন, এইরূপ বোধ জন্মাইবার চেষ্টা কালী বাবুর পক্ষে প্রশংসনীয় হয় নাই!

কণ্ঠহারের 'সদ্বৈদ্যকুলপঞ্জিকা' রচনার ২২ বৎসর পরে মহামহোপাধ্যায় ভরত মল্লিক 'চন্দ্রপ্রভা' ও 'রত্নপ্রভা' লেখা শেষ করেন। মহামহোপাধ্যায় দুইখানি পুস্তককেই 'বৈদ্যকুলপঞ্জিকা' নাম দিয়াছেন, 'অম্বষ্ঠ কুলপঞ্জিকা' বলেন নাই। রত্নপ্রভায় প্রায় ৩০০০ হাজার শ্লোক আছে, কিন্তু এই দীর্ঘ কলেবরের কুত্রাপি কোন বৈদ্যের পরিচয়ে 'অম্বষ্ঠ' শব্দ নাই। বৈদ্য বা ভিষক্ শব্দ শত শত বার আছে, কিন্তু পুনরুক্তি পরিহারের জন্য এক স্থলেও 'অম্বষ্ঠ' শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই। কেবল 'ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও অম্বষ্ঠ'দিগের পিতার ও মাতার অসপিণ্ডা স্ত্রীকে বিবাহ করা উচিত, এই সাধারণ স্মার্ত্ত ব্যবস্থায় অম্বষ্ঠ শব্দটী মাত্র একবার আছে, কিন্তু বৈদ্য সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করিয়া উহা ব্যবহৃত না হওয়ায় উহার জন্য কিছুই আসে যায় না। চন্দ্রপ্রভা গ্রন্থে প্রায় ১৪০০০ চৌদ্দ হাজার, তাহাতেও গ্রন্থ প্রারম্ভে জাতিবিষয়ক আলোচনা স্থলেই অম্বষ্ঠ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, অন্যত্র হয় নাই বলিলেই চলে। 'বৈদ্য' ও 'ভিষক্' শব্দ হাজার হাজার বার আছে, কিন্তু 'অম্বষ্ঠ' শব্দ মাত্র ১২।১৩ বার! ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, বৈদ্য ও অম্বষ্ঠ যে এক, ইহাতে বৈদ্য পণ্ডিতদিগের সংশয় ছিল, উহা তাঁহাদের স্বাভাবিক বা স্বসমাজের মত নহে। তাঁহারা দায়ে পড়িয়াই 'অম্বষ্ঠ' নামটী স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। রত্নপ্রভা ও চন্দ্রপ্রভা হইতে একটু উঠাইয়া দেখাই—

রত্নপ্রভা

বৈদ্যকুল-পঞ্জিকা

প্রারম্ভশ্লোকাঃ

পার্ব্বতীশঙ্করৌ নত্বা বৈদ্যানাং কুলপঞ্জিকাম্।
রত্নপ্রভাং সমাসেন কুরুতে ভরতো ভিষক্ ॥ ১ ॥

ময়া চন্দ্রপ্রভা নাম বৈদ্যানাম্ কুলপঞ্জিকা।
যা কৃতা তত্র সর্ব্বেষাং অস্ত্যশেষং বিবেচনম্ ॥ ২ ॥
অত্র সংক্ষেপতো বক্ষ্যে বৈদ্যান্ সর্ব্বান্ স্থলানি চ।
গোত্রাণি প্রবরানেবং বীজিনঃ পুরুষানপি ॥ ৩ ॥
সেনাদি-সর্ব্ব-বৈদ্যানাম্ তত্ত্বং চন্দ্রপ্রভোদিতম্।
ইহ সংক্ষেপতো বক্ষ্যে সেনাদি-ত্রিতয়ান্বয়ম্ ॥ ৪ ॥

প্রথম ৪টী শ্লোকেই ৪ বার 'বৈদ্য' ও ১ বার 'ভিষক্' আছে। এই পুস্তকের অধ্যায়ের নাম গুলিও এইরূপ—

১। সেনাদি-ত্রয়োদশ-বৈদ্যাঃ।
২। বৈদ্যানাম্ স্থানানি।
৩। বৈদ্যানাম্ পূজা-ব্যবস্থা।
৪। বৈদ্যানাম্ গোত্রাণি।
৫। বৈদ্যানাম্ বীজিপুরুষকথনম্।

ইত্যাদি।

মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রপ্রভায় পিতার ও নিজের পরিচয় এইরূপ দিতেছেন—

গঙ্গাকৃতস্নান-বিশুদ্ধমূর্ত্তি-
র্গঙ্গামৃদা দীপ্তবপুঃপ্রদেশঃ।
সুপূতবাসা জ্বলদগ্নিভাসঃ।
সোমাতিসৌম্যো দদৃশে মুদা যঃ ॥

দদৌ সদা য স্তুলসীদলানি ভব্যানি ভূরীণি সুসংস্কৃতানি।
ফলানি পুষ্পাণি মনোরমাণি প্রকামভক্ত্যা গরুড়ধ্বজায় ॥ পৃঃ ৩১

[ইনি স্বহস্তে নারায়ণ পূজা করিতেন]

পুনশ্চ—

পরো ভরতমল্লীকো দ্বিজবৈদ্যাঙ্ঘ্রি-সেবকঃ।
ভূরিশ্রেষ্ঠ-মহীপাল-সভাপ গুত-বিশ্রুতঃ।
বৈদ্যানামাজ্ঞয়া যোঽমুং কুরুতে কুলপঞ্জিকাম্॥

যে বৈদ্যকে তিনি পূর্ব্বে 'দ্বিজ' ও 'বর্ণোত্তম' (ব্রাহ্মণ) বলিয়াছেন, সেই দ্বিজ বৈদ্যের (স্বজাতির) তিনি সেবক।

অবসানশ্লোকাঃ

বিনায়কস্য চায়োশ্চ পন্থকায়োশ্চ বংশজাঃ।
প্রসিদ্ধাঃ কতিচিৎ প্রোক্তা ইহ বৈদ্যাজ্ঞয়া ময়া॥
এষামপ্যপরেষাঞ্চ সর্ব্বেষাং ভিষজাং ময়া।
বিজ্ঞাতা বংশজা যে যে যত্নাৎ বিবিধচেষ্টয়া॥
চন্দ্রপ্রভায়াং তে প্রোক্তা নৈব কেচিদুপেক্ষিতাঃ।
তত্রৈব সর্ব্বে বিজ্ঞেয়া বৈদ্যোঽপত্যাদিকং তথা॥
যত্নান্নাবগতা যে যে ত এব তত্র নোদিতাঃ।
তে বৈদ্যা বৃদ্ধবৈদ্যাদিদ্বারা জ্ঞেয়াঃ সদাশয়ৈঃ॥
ইতি গৌরাঙ্গমল্লীপুত্রো ভরতমল্লিকঃ।
চক্রে রত্নপ্রভাং নাম বৈদ্যানাং কুলপঞ্জিকাম্॥

ইতি শ্রীভরতমল্লিককৃতা রত্নপ্রভাখ্যা বৈদ্যকুলপঞ্জিকা সমাপ্তা।

চন্দ্রপ্রভা-শেষশ্লোকাঃ

তস্মাৎ সন্তো নিশম্যামুং সমাভাষ্য যথোচিতম্।
জানন্তু বৈদ্য-বর্গস্য পৌর্ব্বাপর্য্যোদিতং কুলম্॥

বহুনামেব **বৈদ্যানাম্** আজ্ঞয়ায়ম্ অতিশ্রমৈঃ।
ভরতেন কৃতো গ্রন্থঃ সদ্ভিরত্র প্রমুহ্যতাম্॥

ইতি হরিহর-খান-বংশসম্ভব-গৌরাঙ্গমল্লিকাত্মজ-শ্রীভরতসেন-বিরচিত-**বৈদ্যকুলপঞ্জিকা** চন্দ্রপ্রভা সমাপ্তা।

সর্ব্বত্রই এইরূপ 'বৈদ্য' শব্দের ব্যবহার।

পণ্ডিতপ্রবর ভরতমল্লিক অনিচ্ছাসত্ত্বেও অম্বষ্ঠত্ব পরিহার করিতে পারেন নাই, বরং কুলজিগ্রন্থে তাহা স্বীকার করিয়া অনেকটা পাকা করিয়াছিলেন। তাহার কিঞ্চিন্ন্যূন এক শত বৎসর পরে মহারাজ রাজবল্লভ অম্বষ্ঠত্বের সহিত বৈশ্যত্বকেও পাকা করিয়া তুলিয়াছিলেন! মহারাজ আপনার ও আপনার শ্রেণীর বৈদ্যদের ব্রাত্যত্বজনিত শূদ্রত্ব দূর করিবার জন্য অম্বষ্ঠের বৈশ্যবর্ণত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বৈশ্যবর্ণত্ব স্বীকার না করিয়া বিপ্রবর্ণত্বের দাবী করিলে তিনি কখনই ব্রাহ্মণদিগের নিকটে অনুকূল ব্যবস্থা পাইতেন না, ফলে তাঁহার শূদ্রত্বও ঘুচিত না, রাঢ়ায় বৈদ্যের সহিত আচারসাম্যও স্থাপিত হইত না। এই ঘটনার পর হইতে অনেক বৈদ্য স্মার্ত্তপণ্ডিতদের পরামর্শানুসারে বৈশ্যাচারকেই আপনাদের প্রকৃত শাস্ত্রীয় আচার মনে করিতেছিলেন। তদবধি বৈদ্যগণ আপনাদিগকে বৈশ্যবর্ণীয় মনে করিয়া প্রতিগ্রহ, গুরুবৃত্তি, ঊর্দ্ধপুণ্ড্র-ধারণ, স্বহস্তে নারায়ণের সেবা, পক্কান্নে ভোগ ও পিণ্ড দেওয়া প্রভৃতি দ্বিজজনোচিত সকল কার্য্যই ধীরে ধীরে ত্যাগ করিতেছিলেন, স্বহস্তে নারায়ণ সেবায় বৈশ্যের কথা কি, সৎশূদ্রেরও অধিকার আছে, পক্কান্নে ভোগ ও পিণ্ড দেওয়ায় বৈশ্যেরও অধিকার আছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পুরোহিতদের উপদেশে বৈদ্যগণ ক্রমে অসৎ শূদ্রের ন্যায় ব্যবহার করিতেও লজ্জা বোধ করিতেন না! তখনও শ্রেষ্ঠ বৈদ্য-সমাজে ব্রাহ্মণাচারের পরিবর্ত্তে সর্ব্ববিধ বৈশ্যাচার, অথবা নিকৃষ্ট সমাজে বৈশ্যাচারের পরিবর্ত্তে সর্ব্ববিধ শূদ্রাচা।

চলিত হয় নাই, তাই রক্ষা! পণ্ডিত বৈদ্যগণ তখনও ব্রাহ্মণাচার ও ব্রাহ্মণত্বের অভিমান ত্যাগ করেন নাই, সমাজেও বহু স্থলে তাঁহাদের ব্রাহ্মণবৎ সম্মান ছিল। ক্রমে সাধারণ বৈদ্য-গৃহে পুরোহিতের অত্যাচারে উপনয়ন, কুশণ্ডিকা, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি যাবতীয় ক্রিয়াকর্ম্মে অনাচার প্রবেশ করিতেছে দেখিয়া তাঁহারা সামাজিকগণকে সাবধান করিয়া দিতে লাগিলেন। একে ত পাতিত্যজনিত বৈশ্যাচারই কত দূর অপমানজনক, তাহার উপর আবার ঐ বৈশ্যাচার ক্রমশঃ শূদ্রাচারে পরিণত হইলে অধর্ম্মের ও অপমানের সীমা থাকিবে না, ইহা সকলকে বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। কিন্তু তখনও প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা বৈশ্যাচার দূর করিয়া ব্রাহ্মণাচার গ্রহণের অনুকূল সময় সমাগত হয় নাই! এজন্য ক্রিয়াকর্ম্মে ব্রাহ্মণাচার পালনীয় জানিয়াও তাহা পালন করিতে পারিতেছিলেন না। বৈদ্যগণ যে সনাতন বৈদ্যকুলজ ব্রাহ্মণ, অম্বষ্ঠ বা বৈশ্য নহেন, এই কথা আজ নূতন কেহ আবিষ্কার করে নাই, ইহা বৈদ্যদিগের সনাতন ধারণা। মধ্যে অম্বষ্ঠ-স্রোতে গা ভাসাইয়া দিলেও এই ধারণা একেবারে অন্তর্হিত হয় নাই। অম্বষ্ঠমানীরা জন্মতঃ আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া বিশ্বাস করিলেও মনে করিতেন যে, তাঁহারা যখন পতিত হইয়া এ যাবৎ বৈশ্যাচার পালন করিয়া আসিতেছেন, তখন বৈশ্যাচারই পালনীয়। সমস্ত সমাজ পুনর্ব্বার একযোগে কখনও ব্রাহ্মণাচার গ্রহণ করিবেন, একথা তখন কেহ স্বপ্নেও ভাবিতে পারিতেন না। কাহাকেও পতিত করা বা পতিত অবস্থা হইতে উদ্ধার করা সমাজের কাজ। ইহা নিজের ইচ্ছায় হয় না। এই জনাই হিন্দুসমাজের তদানীন্তন অবস্থায় প্রচলিত বৈশ্যাচার ত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার ব্রাহ্মণাচার গ্রহণ অন্যান্য জাতির ও সামাজিকবর্গের অনভিমত হইবে, এই আশঙ্কায়, হয়ত, সে আশা তাহাদের হৃদয়েই বিলীন হইত! যাহারা শূদ্রাচারী হইয়া পড়িয়াছিলেন; তাহারা বৈশ্যাচারী রাঢ়ী বৈদ্যদিগের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া অনেক

কষ্টে ঐটুকুমাত্র সংস্কার করিতে পারিয়াছিলেন। এইরূপে নামান্তে 'গুপ্ত' শব্দ ব্যবহার, ২৪ বৎসরের মধ্যে একটা উপনয়ন দেওয়া এবং গুপ্তান্ত নামে দৈব ও পিত্র্য কর্ম্ম করা ইত্যাদি বৈশ্যাচারের প্রতি সকলে মনোযোগ দিতেছিলেন। এখন সকলে বুঝিয়াছেন, যদি কেহ বাঙ্গালায় পতিত হইয়া থাকে, তবে সে ঐ অকৃতজ্ঞ পুরোহিত শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ, যাঁহাদের শরীরে কৌলীন্যের অনাচারে ও ম্লেচ্ছ যবনাদির অত্যাচারে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণশোণিত একবিন্দুও নাই। অদৃষ্টের পরিহাসে আজ অভিজাত শ্রেষ্ঠ বৈদ্য পতিত, আর উহারাই সকলের প্রণম্য! যাহারা বাঙ্গালীর সভ্যতা, বাঙ্গালীর ভাষা ও বাঙ্গালীর গৌরবের সৃষ্টি কর্ত্তা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, সেই বাঙ্গালার গুরুস্থানীয় বৈদ্যসম্প্রদায় আজ পতিত, কারণ তাহার চিকিৎসাবৃত্তি ঐ দুষ্টদিগের মিথ্যা কথায় আজ হীনবৃত্তি বলিয়া গণ্য! কতদিক হইতে শাস্ত্রের যে কত বিপর্য্যয় ও বিপরীত ব্যাখ্যা হইয়াছে, বৈদ্যকে পতিত করিবার চেষ্টায় হিন্দুশাস্ত্রকেই কিরূপে খণ্ড খণ্ড করা হইয়াছে, তাহা দেখিয়া অতি শান্তপ্রকৃতিক ব্যক্তিও প্রকৃতিস্থ থাকিতে পারেন না। আমরা অত বিশ্বাসের ফলে, সমাজে অন্যায় ভাবে বহু লাঞ্ছনা সহ করিয়া আজ তাহার প্রতিকারে যত্নবান্ হইয়াছি। এ অবস্থায় কালীবাবুর মত মনস্বী বৈদ্যদিগের উচিত, সমাজের সহিত একযোগে কার্য্য করা, বিরুদ্ধ পথ অবলম্বন করা উচিত নয়। কালীচরণ বাবু দুর্ব্বৃত্ত জালকর্ত্তাদের জালবচনের অনুসরণ করিয়া বৈদ্যের বৈশ্যবৃত্তিকেই আদর্শ জাতীয় বৃত্তি বলিয়া মনে করেন! তিনি 'বৈদ্য'পুস্তকে ইহাই সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, বঙ্গীয় বৈদ্য চিরকাল অম্বষ্ঠ-বৈশ্য বলিয়াই বিদিত, তাহারা যে সনাতন বৈদ্যকুলজ ব্রাহ্মণসন্তান, ইহা তাঁহার ধারণাতেই আসে না! [সম্প্রতি তাঁহার সুরে পোঁ ধরিবার লোকও পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু বৈদ্যব্রাহ্মণ-সমিতির দামামা ধ্বনি ঐ দুই সুরকেই ঢাকিয়া ফেলিবে!]

যাহা হউক, কালীবাবু বৈদ্যকে বৈশ্যবর্ণীয় বলায় সাধারণ পাঠকের পক্ষে তাঁহার কথার সত্যাসত্যতা নির্ণয় করিতে কষ্ট হইবে না। কারণ, (১) ইতিহাস, লোকাচার ও প্রসিদ্ধির সাহায্যে **বৈদ্যগণ যে ব্রাহ্মণ** তাহা প্রমাণিত হইলেই কালীবাবুর কথা মিথ্যা হইয়া পড়িবে। (২) **বৈদ্য যে অম্বষ্ঠ নয়,** অথবা (৩) **অম্বষ্ঠ যে বৈশ্য নয়,** ইহা প্রমাণিত হইলেও কালীবাবুর কথা মিথ্যা হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বৈদ্য ব্রাহ্মণ

প্রথম অধ্যায়ের শেষ অংশে বৈদ্য জন্মতঃ বৈশ্যবর্ণীয় নহে, ইহা অন্যান্য কুলজীর প্রমাণ হইতে ও মহামহোপাধ্যায় ভরতমল্লিকের স্পষ্ট উক্তি হইতে দেখান হইয়াছে। প্রবোধনীতে ইতিহাস, লোকাচার ও দেশপ্রসিদ্ধি হইতে যে সমস্ত প্রমাণ সন্নিবেশিত করিয়া বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব সপ্রমাণ করা হইয়াছে, তাহা দ্বারাই বৈশ্যত্ব নিরাকৃত হইয়াছে। কিন্তু ঐ সকল প্রমাণ অখণ্ডনীয় হইলেও অতি সংক্ষেপে বিবৃত হওয়ায় অনেকের বুঝিবার অসুবিধা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত কালীবাবু ও শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র বাবুও এই কারণে প্রবোধনীর সকল কথা বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। ইহা আমাদেরই ত্রুটি।

এই অধ্যায়ে আমরা প্রবোধনীর অনুসরণ করিয়া যে সকল অখণ্ডনীয় প্রমাণ উপস্থাপিত করিব, তাহা দ্বারা বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব নির্ব্যূঢ়-রূপে প্রমাণিত হইবে। বৈদ্য ব্রাহ্মণ ইহা সপ্রমাণ হইলেই, তাহার বৈশ্যত্ব অপ্রমাণ ও অলীক কথা বলিয়া জানা যাইবে।

বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব সম্বন্ধে আমরা ইতঃপূর্ব্বে এই প্রমাণগুলি দিয়াছি—

(১) শ্রুতির প্রমাণ।

(২) আয়ুর্ব্বেদের প্রমাণ।

(৩) অভিধানের প্রমাণ।

(৪) কুলপঞ্জিকা ও কুলাচার্য্যের প্রমাণ।

(৫) শব্দকল্পদ্রুমের প্রমাণ।

(৬) মহামহোপাধ্যায় ভরতমল্লিকের প্রমাণ।

অতঃপর বৈদ্যসমাজের চিরন্তন ব্রাহ্মণাচার একটী একটী করিয়া ধরিয়া দিব। আমরা কালীবাবু ও সত্যেন্দ্র বাবুর মনে কণামাত্র সন্দেহ থাকিতে দিব না। এই অধ্যায়টী পাঠ করিলেই তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন, না বুঝিয়া তাঁহারা কত বড় জাতিদ্রোহকর কার্য্য করিয়াছেন।

বৈদ্যসমাজে এখনও যে সকল ব্রাহ্মণাচার বর্ত্তমান আছে, অথবা যে সকল ব্রাহ্মণাচার একসময়ে বর্ত্তমান ছিল, নিম্নে তাহাদের উল্লেখ করা যাইতেছে—

(৭) বৈদ্যসমাজের চিরন্তন ব্রাহ্মণাচারের প্রমাণ—

১। **রাঢ়ে বৈদ্যই বৈদ্যের বৈদিক গুরু।** রাঢ়ে প্রতি বৈদ্যগৃহে উপনয়ন কালে মাণবকের পিতা, পিতৃব্য, মাতুল, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বা ঐরূপ অন্য কেহ আচার্য্যের কার্য্য করিয়া থাকেন। আচার্য্য হোমাদি করিয়া মাণবকের কর্ণে গায়ত্রীমন্ত্র দান করেন, তিনিই বৈদিক গুরু, তিনিই উপনয়নান্তে মাণবকের বেদ অধ্যাপনা করেন, "উপনীয় তু যঃ শিষ্যং বেদমধ্যাপয়েৎ দ্বিজঃ। সকল্পং সরহস্যং বা তম্ আচার্য্যং প্রচক্ষতে॥" (মনু, ২।১১০) ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য বর্ণ এই কার্য্য করিতে পারেন না, এজন্য ক্ষত্রিয়াদির উপনয়ন কালে একজন ব্রাহ্মণ (পুরোহিত অথবা গুরু) কর্ণে মন্ত্র দিয়া থাকেন। কিন্তু কোন বৈদ্য অভিভাবকই পুরোহিতকে এই কার্য্য করিতে দেন না। পুরোহিত মন্ত্রাদি পাঠে সহায়তা বা তন্ত্রধারকতা মাত্র করিয়া থাকেন। এই আচার্য্যত্ব বৈদ্যগণের ব্রাহ্মণত্বের একটী উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

প্রবোধনীতে আছে, বৈদ্য-উপনয়নে ব্রাহ্মণবৎ কার্পাসসূত্র-নির্ম্মিত যজ্ঞোপবীত ব্যবহৃত হয়, বৈশ্যবৎ মেষলোমের উপবীত ব্যবহৃত হয় না, ব্রাহ্মণবৎ বিল্বদণ্ড ও কৃষ্ণসার চর্ম্ম ব্যবহৃত হয়, ভিক্ষাকালেও ব্রাহ্মণবৎ "ভবতি ভিক্ষাং দেহি" বলা হয়, বৈশ্যবৎ 'ভিক্ষাং দেহি ভবতি" বলা হয় না। এই সকল খুঁটিনাটীও ব্রাহ্মণত্বের প্রমাণ।

কালীচরণ বাবু এতদুত্তরে বলিয়াছেন—"ব্রাহ্মণগণই" বৈদ্যদিগের যজ্ঞোপবীত দিয়া থাকেন, তাঁহারা অতটা তলাইয়া দেখেন না, এবং এরূপ পার্থক্য যে আছে, তাহা অনেকেরই জানা নাই। তাঁহারা নিজে যে ভাবে ভিক্ষা করিতেন, তদ্রূপই বলিতে শিক্ষা দেন।" (বৈদ্য, দ্বিতীয়সং, পৃষ্ঠা ৫৬) যাজ্ঞিক 'ব্রাহ্মণগণই' বৈদ্যের উপবীত দিয়া থাকেন, একথা মিথ্যা, ইহা উপরে দেখান হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গীয় স্মার্ত্ত পণ্ডিতেরা রাঢ়ী বৈদ্যদিগের সহিত কথা কহিবার কালে এই সকল জানিতে পারিয়া আশ্চর্য্য হন, এবং কেহ কেহ বৈদ্যের ব্রাহ্মণ্য সম্বন্ধে প্রমাণ পাইয়া সন্তুষ্টও হন। কালীচরণ বাবু জানিবেন, অনেক সময়ে তাঁহার মত বৈদ্যদিগের শূদ্রবৎ ব্রাহ্মণপদলেহিতা ও অন্যান্য কদাচারই বৈদ্যের ব্রাহ্মণ্যের বিরুদ্ধে প্রমাণরূপে দণ্ডায়মান হয়! তাঁহাদেরও গৃহে গৃহে যদি বৈদ্যগণই আচার্য্যরূপে বিদ্যমান থাকিতেন, তবে কি আজ এ কথা উঠিতে পারিত? বস্তুত বৈদ্যদিগের ব্রাহ্মণোচিত সম্মান একেবারে হ্রাস হইয়াছে সেই দিন হইতে, যে দিন হইতে বারেন্দ্র ও পূর্ব্ববঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণ বৈদ্যসম্বন্ধে একটা কুধারণা পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আনয়ন করিয়া রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ সমাজে ছড়াইয়াছেন, এবং বঙ্গীয় বৈদ্যগণও তাঁহাদের ভ্রষ্ট আচার সংশোধন না করায়, উহাই বৈদ্যগণের শাস্ত্রীয় আচার মনে করিয়া রাঢ়ীয় সমাজের সামাজিকবর্গও বৈদ্যকে শূদ্রজ্ঞানে নিন্দা করিতে শিখিয়াছেন। শ্রীযুক্ত কালীচরণ বাবুও আপন দেশের বর্ত্তমান আচারকে সমস্ত বৈদ্যের শাস্ত্রীয় আচার মনে করিয়া পুস্তকে ছাপাইয়া সকল সমাজের লোকদিগকে জানাইতেছেন যে, 'ব্রাহ্মণগণই বৈদ্যজাতির যজ্ঞোপবীত দিয়া থাকেন। 'ব্রাহ্মণগণ' দিয়া থাকেন এতে ভুল নাই, কিন্তু সেই ব্রাহ্মণ কে? এই উপনয়নে যে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ পুরোহিত বৈদ্যব্রাহ্মণ আচার্য্যের সহিত চিরকাল একযোগে কার্য্য করেন! কালীচরণ বাবু যেরূপ লিখিয়াছেন, তাহাতে

যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণই একমাত্র ব্রাহ্মণ এবং বৈশ্যগণ অব্রাহ্মণ, ইহাই প্রকাশ পাইতেছে! উপনয়নের অন্যান্য খুটিনাটী গুলিও উড়াইয়া দেওয়া যায় না, কারণ অজ্ঞ পুরোহিতেরা 'তলাইয়া' না দেখিতে পারেন, কিন্তু বিজ্ঞ সামাজিকবর্গ ত উপনয়নকালে উপস্থিত থাকেন? সেকালের স্বধর্ম্মনিষ্ঠ বৈশ্যগণই বা মিথ্যাচার অবলম্বন করিতে যাইবেন কেন? তাঁহাদের কর্ণে ত বৈশ্য-ব্রাহ্মণ সমিতি কোন মন্ত্র দিতে যায় নাই! তবে কুলাচার না হইলে সর্ব্বকর্ম্মে ব্রাহ্মণাচার পালন কিরূপে তাঁহারা অনুমোদন করিতেন? এই প্রসঙ্গে কালী বাবু বলিয়াছেন, "বৈশ্যগণ যে ব্রাহ্মণ নহে, তাহার প্রমাণ যে দেশে উপনয়ন অখণ্ডিত সে দেশ হইতেই পাওয়া যায়। বৈশ্য ব্রাহ্মণ হইলে ব্রাহ্মণের ন্যায় তাহারও ১০ দিন অশৌচ, এত বড় একটা মোটা কথায় কাহারও ভুল হইত না।" কি প্রসঙ্গে কি কথা! যেন রাঢ়ে 'উপবীত' অখণ্ডিত রহিয়াছে বলিয়া অন্যান্য পূর্ব্বাচারও অখণ্ডিত রহিরাছে! ভরত কি বলেন নাই যে, জন্মতঃ ব্রাহ্মণ হইলেও বৈশ্য ক্রিয়ালোপ হেতু ক্রমশ পতিত হইয়া বৈশ্যবৎ হইয়াছে? রঘুনন্দন কি বলেন নাই যে বৈশ্য শূদ্র হইয়াছে? তবে ১০ দিন স্থানে ১৫ দিন বা ৩০ দিন হইয়াছে বলিয়াই কি কালী বাবু ঐ ভ্রষ্ট আচারকে সনাতন কুলাচার মনে করিবেন? ১০ দিন অশৌচ প্রচলিত থাকিলে, আজ বৈশ্যের ব্রাহ্মণত্ব সম্বন্ধে কোন কথাই উঠিত না! উহা অপ্রচলিত বলিয়াই বৈশ্যের ব্রাহ্মণ্যে লোকের সংশয় হয়, এবং সেই সংশয় নিরসনের জন্যই বৈশ্য-প্রবোধনীতে এই সকল প্রমাণ দ্বারা বৈশ্যের ১৫ দিন বা ৩০ দিন অশৌচ যে ভ্রষ্টাচার তাহা সপ্রমাণ করা হইয়াছে। তবে কালীবাবু ঐ ১৫ দিন অশৌচের কথা তুলিয়া বৈদ্যকে বৈশ্যবর্ণ বলিতে চান কেন?

২। রাঢ়ের প্রায় সর্ব্বত্রই বৈদ্যগণের জননাশৌচ ব্রাহ্মণবৎ দশদিন। কলিকাতা অঞ্চলে ভ্রষ্টাচার

প্রবেশ করায় কোন কোন পরিবারে উহা একদিন সংক্ষিপ্ত হইয়া নয় দিন হইয়াছে, কিন্তু অধিকাংশ স্থানে অদ্যাপি দশদিন অশৌচই দেখা যায়। ঐ দিন নখ কাটিয়া স্নান করার পর হইতে প্রসূতির অস্পৃশ্যত্ব দূর হয়। ইহাও যে অতীত ব্রাহ্মণ্যের সাক্ষ্য তাহাতে সন্দেহ কি? মৃতাশৌচে পুরোহিতেরা গোলযোগ করেন, ১৬ দিনে কার্য্য করিয়া শ্রাদ্ধ পণ্ড করেন। কিন্তু জননাশৌচের বেলা গৃহী সনাতন কুলপ্রথা অনুসারে ব্রাহ্মণাচারই পালন করিয়া থাকে।

বল্লাল-লক্ষ্মণের কলহের ফলে উপবীত-ত্যাগী শাণ্ডিল্যগোত্রীয় বৈদ্যগণ নোয়াখালি জিলায় গিয়া বাস করেন। সংস্কারবর্জ্জন হেতু তাঁহারা ৩১ দিনে শ্রাদ্ধও করিয়া থাকেন, কিন্তু দশম দিনেই 'হাড়ি পাতিল' ফেলেন। এই প্রথা যে বৈদ্যের পূর্ব্বানুসৃত ব্রাহ্মণাচারেরই ভগ্নাবশেষ তাহাতে আর সন্দেহ কি? ৩০ দিন অশৌচ থাকিলেও যে বংশের গৃহলক্ষ্মীরা দশমদিনে 'হাঁড়ীকুড়ি' ফেলিয়া দেন, সে বংশে যে পূর্ব্বে ঐ দিনেই অশৌচান্ত হইত, ইহা ত সকলেই বুঝিতে পারে। তদুপরি যখন দেখা যায়, এই অসংস্কৃত বৈদ্যগণ আজও দেবীপূজায় তন্ত্রধারকতা করিয়া থাকেন ও সিদ্ধান্নেই দেবতাকে ভোগ দেন, তখন সকলগুলি মিলাইয়া একত্র বিচার করিলে তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষদের বর্ণসম্বন্ধে আর কোন সংশয় থাকে না। এখন কালীবাবু বুঝিতে পারিতেছেন কি যে, বৈদ্য 'ব্রাহ্মণ' বলিয়াই ব্রাহ্মণের ন্যায় তাহারও (সূতকে) দশদিন অশৌচ প্রথা চলিত রহিয়াছে এবং (মৃতকে) কোন কোন দেশে অশৌচান্ত না হইলেও 'হাঁড়ী-পাতিল' ফেলিয়া অশৌচান্ত করিবার মত ব্যবহার দেখা যাইতেছে?

৩। **উর্দ্ধপুণ্ড ধারণ**। প্রাচীন বৈদ্যেরা যে ব্রাহ্মণবৎ উর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিতেন, তাহা মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী কবিকঙ্কনের চণ্ডী কাব্য হইতে জানা যায় ("উঠিয়া প্রাতঃকালে উর্দ্ধ-ফোঁটা করি ভালে" ইত্যাদি)।

"উর্দ্ধফোঁটা ধারণ যে প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণাচার তাহা সর্ব্বজন বিদিত।" বৈদ্য-প্রবোধনীর এই উক্তিকে অপ্রমাণ করিতে গিয়া কালীবাবু লিখিতে-ছেন—"(মুকুন্দরাম) বৈদ্যগণ যে ব্রাহ্মণ এমন কথা বলেন নাই, (বৈদ্য, পৃষ্ঠা ৪২)···বরং ব্রাহ্মণের অধ্যায়ে বৈদ্যগণের বর্ণনা না করিয়া ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণের অধ্যায়ে বর্ণনা করিয়া বৈদ্যগণ যে ব্রাহ্মণ নহে, তাহাই প্রমাণ করিয়াছেন।" (বৈদ্য, পৃষ্ঠা ৪৪)।

মুকুন্দরাম ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে চণ্ডী-কাব্য রচনা করেন। সে সময়ে বৈদ্য সমাজের উপরে স্মার্ত্ত অত্যাচারের পূর্ণ জোয়ার চলিয়া গিয়াছে। পুরাণ-রচনাদি তখন শেষ হইয়াছে। বৈদ্যেরা অম্বষ্ঠ এ বিষয়ে স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণ তখন প্রায় একমত। সুতরাং ব্রাহ্মণ কবি হয় ত বৈদ্যকে অব্রাহ্মণ জ্ঞানে অব্রাহ্মণদিগের অধ্যায়ে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, এবং ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পরে বৈদ্যের কথা বলিয়া বৈদ্য যে ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য অপেক্ষা সামাজিক গৌরবে হীন, তাহাও যেন প্রকাশ করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন!

বৈদ্যের গৌরব ও প্রতিষ্ঠা যে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য অপেক্ষা উচ্চে তাহা কালীবাবু বৈদ্য-পুস্তকের ভূমিকায় দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় স্বীকার করিয়াছেন (গ্রন্থমধ্যেও বলিয়াছেন)। তবে বৈদ্যের সর্ব্ব শেষে উল্লেখ কিরূপে তাঁহার সহ্য হয়? বৈদ্য, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এক অধ্যায়ে আছে বলিয়া তাহারা গৌরবে সমান হইলে কালীবাবুর কথা মিথ্যা হয়, আর গৌরবে অসমান হওয়া সত্ত্বেও এক অধ্যায়ে উল্লেখ থাকিলে, বৈদ্য ব্রাহ্মণ-বর্ণীয় হইলেও ত হইতে পারে! ক্ষত্রিয় ও বৈদ্য বিভিন্ন বর্ণ হইয়াও যদি এক প্রকরণে স্থান পায়, তবে বৈদ্য এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ হইয়াও তাহাদের সহিত স্থান পাইতে পারে! বস্তুতঃ কালীবাবুর যুক্তি কিছুমাত্র সারবতী নহে। বৈদ্য-প্রবোধনী এমন কথা বলে নাই যে, কবিকঙ্কন বৈদ্যকে ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন। কিন্তু কবিকঙ্কন বৈদ্যকে অব্রাহ্মণ,

অম্বষ্ঠ অথবা বৈশ্য কিছুই বলেন নাই। বৈদ্য যে বর্ণীয়ই হউক ঊর্দ্ধ-ফোঁটা ধারণরূপ ব্রাহ্মণাচার তাহাদের মধ্যে আবহমান কাল হইতে প্রচলিত ছিল, ইহাই প্রবোধনী প্রমাণ করিতেছেন। কবিকঙ্কন 'বৈদ্যগণ' বলিয়াছেন, কোনও বিশিষ্ট বৈদ্যের উল্লেখ করিয়া এ কথা বলেন নাই। তবে সমস্ত জাতিটাই যে এই ব্রাহ্মণাচারে ভূষিত ছিল, তাহা বুঝা যাইতেছে। পাঠক এটুকু মনে রাখিবেন প্রাচীন কালে যে কোন ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র ঊর্দ্ধ-ফোঁটা ধারণ করিতে পারিত না। আধুনিক যুগে বৈষ্ণবগণের মধ্যে ইহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইলেও, অবৈষ্ণব গণের মধ্যে অদ্যাপি ব্যতিক্রম হয় নাই। শাক্ত গ্রন্থ চণ্ডীতে বর্ণিত বৈদ্যগণ যে বৈষ্ণব ছিলেন না, তাহা অনায়াসেই বুঝা যায়। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের ঊর্দ্ধপুণ্ড্রে বিশেষ প্রভেদও আছে। বৈদ্যদিগের ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ব্রাহ্মণোচিত না হইয়া বৈষ্ণবোচিত হইলে কবি বিশেষ করিয়া বৈদ্যপক্ষেই উহার উল্লেখ করিতেন না। কালীবাবু লিখিতেছেন—

"কবি গোপীনাথ দত্তের "দত্ত বংশাবলী"তে লিখিত আছে যে, বৈদ্য মহামহোপাধ্যায় চক্রপাণি দত্তের বংশধর শ্রীবৎস দত্ত যিনি "দত্ত খাঁ" নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন, তিনি ঊর্দ্ধ-তিলক দিতেন—"ঊর্দ্ধ-তিলক দিত ললাট পুরিয়া"—

একদিন তাঁর কাছে বিপ্র একজন।
নমস্কার করিলেক জানিয়া ব্রাহ্মণ॥
প্রায়শ্চিত্ত করিয়া প্রতিজ্ঞা কৈল পরে।
মোর বংশে কেহ যেন তিলক না ধরে॥
সেই হইতে ঊর্দ্ধ-তিলক হইল মানা।
এই বংশে তিলক না ধরে কোন জনা॥—(বৈদ্য, পৃ. ৪৪)।

শ্রীযুক্ত কালীবাবু বৈদ্য-প্রবোধনীকে পরাজয় করিবার জন্য এই যে প্রমাণটী লিখিলেন, তাহাতে নিজেই পরাজিত হইতেছেন, কারণ এস্থলে

একজন শূদ্রাচারী বৈদ্যেরও ব্রাহ্মণবৎ উর্দ্ধ-পুণ্ড্র ধারণ দেখা যাইতেছে। কালীবাবুর ভাষায় সে কালের বৈদ্যরা ত বৈদ্য-ব্রাহ্মণ সমিতির সভ্যদিগের মত হুজুগে মাতিয়া এই ব্রাহ্মণাচারটী গ্রহণ করে নাই, তাহারা ত পিতৃ-পিতামহের অনুষ্ঠিত আচারই পালন করিয়া আসিতেছিল, তবে কবি মুকুন্দরাম ও গোপীনাথের প্রমাণ হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, সনাতন কাল হইতে 'দত্ত খাঁ' মহাশয়েরা এবং অন্যান্য বৈদ্যগণ এই আচার পালন করিতে ছিলেন। মহারাজ বল্লাল ও বৈদ্য সভাসদ্ পণ্ডিতগণ এই আচার পালন করিতেন, কারণ মুকুন্দরামের লেখায়—কোন বিশেষ ব্যক্তি বা বংশের কথা নাই, 'বৈদ্যগণ' বলিয়া সকল বৈদ্যেরই উর্দ্ধপুণ্ড ধারণের কথা আছে। কিন্তু পাঠক এখানে দেখুন, দত্ত-খাঁ মহাশয়ের পরিবারে কি তুচ্ছ কারণে উর্দ্ধ-পুণ্ড্র ধারণ পরিত্যক্ত হইয়াছিল! বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণ বলিয়াই উর্দ্ধ-পুণ্ড্র ধারণ করিতেন, যখন অম্বষ্ঠের বৈশ্য খ্যাতি হইল, তখনও এই আচার বিলুপ্ত হয় নাই, যখন অনেকে উপবীত ত্যাগ করিয়া শূদ্রবৎ হইলেন, তখনও এই প্রাচীন আচার লুপ্ত হয় নাই। কিন্তু একদা একজন নমস্কার-ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ দত্ত খাঁ মহাশয়কে নমস্কার করিয়া বিপদে ফেলিল! শত শত ও সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ মন্ত্র শিষ্য ও অন্তেবাসী যাঁহাদের চরণোপান্তে বসিয়া উপদেশ লাভ করিত, আজ তাঁহাদের কি অবস্থা বিপর্য্যয়! এইরূপ নমস্কার যে পূর্ব্বে কোন বিপ্র ঐ বংশের কাহাকেও কখনও করে নাই, তাহা নয়, কিন্তু আজ দত্ত-খাঁ মহাশয়ের ফাঁড়া কাটিল না! মহামহোপাধ্যায় চক্রপাণি দত্তের বংশধর শ্রীবৎস দত্ত ঐ পবিত্র কুলাচার লোপ করিতে কিঞ্চিৎ মাত্র ইতস্ততঃ করিলেন না। "সেই হইতে উর্দ্ধ তিলক হইল মানা" এবং সেই হইতে "এই বংশে তিলক না ধরে কোন জনা।" দ্রষ্টব্য এই যে, এই উর্দ্ধতিলক বৈষ্ণবোচিত হইলে, ইহা মানা করিবার প্রয়োজনই হইত না! কালীবাবু অনেক স্থানে বিস্ময়

প্রকাশ করিয়াছেন, আচার কিরূপে লুপ্ত হয়। কিন্তু তাঁহাদের ত্রিশ দিন অশৌচ হওয়া অবধি একে একে কত দ্বিজাচার বিলুপ্ত হইয়াছে, এবং এখন বৈশ্যাচার গ্রহণ করিয়াও সে সকলের কত গুলি উদ্ধার করিতে পারিতেছেন না, তাহা কি তিনি অবগত নহেন? কালীবাবুরা এখন বহু পুরুষ উপবীতী দ্বিজ। তথাপি তাঁহাকে স্বহস্তে বিগ্রহ পূজা করিতে দেখিলে অথবা পক্ব অন্নদ্বারা ভোগ ও পিণ্ড দিতে দেখিলে ব্রাহ্মণেরা আশ্চর্য্যই বা হয় কেন, এবং ঐ ব্যবহারের সমর্থন না করিয়া বাধাই বা দেয় কেন? দত্ত খাঁ মহাশয় উপবীতশূন্য শূদ্রাচারী অবস্থায় আপনাকে উর্দ্ধ-পুণ্ড্র ধারণে অনধিকারী জানিয়া—ঐ আচার পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্যবহারে সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই সময়ে উপবীত গ্রহণ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণাচারী হইলেই ন্যায্য আচরণ হইত, তাহা হইলে উর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ ত্যাগ করিতে হইত না। কালীবাবুর উচিত নামান্তে 'গুপ্ত' শব্দ ব্যবহার ও ১৫ দিন অশৌচ পালনের পরিবর্ত্তে 'শর্ম্মন্' শব্দ ব্যবহার ও ১০ দিন অশৌচ পালন করা এবং পূর্ব্ব পুরুষদের ন্যায় উর্দ্ধ-তিলক ধারণ করা। তিনি ধর্ম্মনিষ্ঠ, প্রত্যহ সাধন ভজন করিয়া থাকেন, এ অবস্থার তাঁহার পক্ষে ব্রাহ্মণাচার গ্রহণে বিরত থাকা অত্যন্ত অশোভন বলিয়াই বোধ হয়!

আমরা বৃদ্ধ-প্রমুখাৎ অবগত আছি যে, শোভাবাজারের মহারাজ নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের সময়ে বৈদ্যদিগের উর্দ্ধ-পুণ্ড্র ধারণ সঙ্গত কি অসঙ্গত, এরূপ প্রশ্ন উঠিলে পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন বৈদ্যদিগের ব্রাহ্মণত্বের সপক্ষে প্রমাণ উপস্থিত করিয়া মুকুন্দরামের উক্তি দ্বারা ঐ ব্যবহারের সমর্থন করিয়াছিলেন।

বৈদ্য-ব্রাহ্মণ সমিতির সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেন-শর্ম্মা গীতাচার্য্য স্মৃতিশাস্ত্রী মহাশয় বলেন যে, বাল্যকালে শোভাবাজারের

রাজবাটীতে তিনি মাতুলবংশকে প্রতি বর্ষে পণ্ডিত-বিদায় উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া প্রতিগ্রহ করিতে দেখিয়াছিলেন। গীতাচার্য্য মহাশয়ের মাতামহ প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন, তদীয় মৃত্যুর পর তৎপুত্র প্রিন্সিপ্যাল বিপিন বিহারী গুপ্তশর্ম্মা মহাশয় ঐ বিদায় আনিতেন। এক সময়ে বিপিন বাবু পীড়িত হওয়ায়, তিনি যাইতে পারিবেন না শুনিয়া মহারাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর তাঁহাকে দেখিতে আসেন, এবং তখন স্থির হয় যে, তাঁহার ভাগিনেয় বালক গীতাচার্য্য (তখন তাঁহার বয়স ১৪ বৎসর মাত্র) প্রতিনিধি হইয়া যাইবেন। বালক গীতাচার্য্য মহারাজের সহিত যথাকালে রাজবাটীতে উপস্থিত হইলে অধ্যক্ষ মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি সন্ধ্যা জান' ? গীতাচার্য্য উত্তর করিলেন, 'হাঁ'। অধ্যক্ষ পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কোন্ বেদী ? গীতাচার্য্য উত্তর করিলেন, 'যজুর্ব্বেদী কাণ্বশাখী'। অধ্যক্ষ পুনশ্চ সন্ধ্যামন্ত্র পাঠ করিতে বলায়, বালক গীতাচার্য্য এমন সুস্পষ্ট উচ্চারণ পূর্ব্বক আবৃত্তি করিতে লাগিলেন যে, তিনি তখন সাতিশয় প্রীত হইয়া একখানি রূপার থালের উপর মাল্য ও রূপার বাটী, তাহাতে দুই খানি গিনি ও চন্দন, হস্তে লইয়া গীতাচার্য্যকে উর্দ্ধপুণ্ড্র তিলক পরাইয়া ঐ গুলি তাঁহাকে দিলেন। গীতাচার্য্যও 'ওঁ স্বস্তি' বলিয়া গ্রহণ করিলে মহারাজ নরেন্দ্রকৃষ্ণ তাঁহাকে প্রথমতঃ সাষ্টাঙ্গে পরে হাঁটু গাড়িয়া এবং শেষে দাঁড়াইয়া প্রণাম করিলেন। অন্যজাতির বাটীতে এইরূপ প্রতিগ্রহ চিরকালই চলিয়া আসিতেছিল, এক্ষণে অন্যান্য জাতিরা বৈদ্যের অন্নই ভোজন করিতে চাহিতেছে না, তা প্রতিগ্রহে নিমন্ত্রণ করিবে কি ? সমগ্র পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে বৈদ্যবালক যে সম্মান পাইল তাহা রাঢ়ীয় সমাজের সনাতন রীতির অনুমোদিত। কালীবাবু অথবা সত্যেন্দ্র বাবু এ সকল বৃত্তান্তের সংবাদ রাখেন কি ? এই শ্রেণীর অজ্ঞাত-বৈদ্যগৌরব 'সর্ব্বজ্ঞ' লেখকদিগের হাতে পড়িয়া বৈদ্যগৌরবকে পদে পদে লাঞ্ছিত হইতে

হইতেছে। রাঢ়ীয় বৈদ্যের কদাচারকে যেমন উত্তরপশ্চিম প্রদেশীয় বৈদ্যের সদাচার বলিয়া মনে করা উচিত নহে,তদ্রূপ পূর্ব্ববঙ্গের ততোধিক কদাচারকেও বঙ্গদেশীয় বৈদ্যের সনাতন আচার মনে করা অত্যন্ত অন্যায়।

৪। **বৈদ্যপণ্ডিতগণের অধ্যাপনা বৈদ্যসম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণ্যের একটী প্রবল প্রমাণ।** কালীবাবু বৈদ্য পুস্তকের ৩৭ পৃষ্ঠায় বৈদ্য প্রবোধনীকে পরিহাস করিয়াছেন, কারণ প্রবোধনীর মতে "বৈদ্যগণ যখন আয়ুর্ব্বেদের অধ্যাপনা করেন. তখন তাঁহারা ব্রাহ্মণ।" পুনশ্চ কালীবাবু বলিতেছেন "আমরা আয়ুর্ব্বেদের অধ্যাপনা করাইয়া থাকি, অতএব আমরা ব্রাহ্মণ। এরূপ যুক্তি অপ্রাসঙ্গিক।' আমরা জিজ্ঞাসা করি, সারা ভারতে কাহারা আয়ুর্ব্বেদের অধ্যাপনা করিতেছে? কোন ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য কি এ কার্য্য করিতেছে? শাস্ত্রে কি ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যকে এ কার্য্যের অধিকার দেওয়া হইয়াছে? চরক ও সুশ্রুত বলিলেন, ব্রাহ্মণই তিন বর্ণকে আয়ুর্ব্বেদ অধ্যাপনা করিবে, (পৃষ্ঠা২৭-২৮), কালীবাবুও একথা বৈদ্য পুস্তকের ২৮ পৃষ্ঠায় স্বীকার করিয়াছেন, তবে কোন্ মুখে প্রবোধনীকে পরিহাস করিতে সাহস করেন? কালীবাবুর কথার মধ্যে সামঞ্জস্য নাই। কারণ ৩৮ পৃষ্ঠায় তিনি বলিতেছেন, 'সুশ্রুত ত্রিবর্ণকেই আয়ুর্ব্বেদের অধ্যাপক বলিয়াছেন।' ৩৪ পৃষ্ঠায় "তখন (প্রাচীনকালে) ত্রিবর্ণই বৈদ্য (চিকিৎসক) হইতে পারিতেন।" আমরা ইতঃপূর্ব্বে এই সকল কথার আলোচনা করিয়াছি। তবে পাঠক মহাশয়কে স্মরণ করাইয়া দিই যে, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়-বৈশ্যকে এবং বৈশ্য বৈশ্যকে অধ্যাপনা করিতে পারিতেন, ত্রিবর্ণকে নহে; ইহা কালীবাবুর ভ্রম। ক্ষত্রিয় আয়ুর্ব্বেদের জ্ঞান নিজের রক্ষার জন্য প্রয়োগ করিতেন, বৈশ্য আয়ুর্ব্বিজ্ঞান কৃষি-বাণিজ্যাদি তদীয় বৃত্তির পরিপুষ্টির জন্য প্রয়োগ করিতেন। এরূপ অবস্থায়, যে কার্য্যে

ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য অনধিকারী এবং কেবল বৈদ্য-কুলজ ব্রাহ্মণগণই অধিকারী, সেই কার্য্যে বঙ্গ-দেশীয় বৈদ্যকে অধিকারী দেখিতেছি, তবে বঙ্গদেশীয় বৈদ্যের ব্রাহ্মণ্যের ইহা যে একটী বিশিষ্ট প্রমাণ, তাহাতে আর সন্দেহ কি? বঙ্গীয় বৈদ্যগণ বিবিধ আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থ লিখিয়া নিখিল ভারতের আয়ুর্ব্বেদ গুরুর আসনে আসীন রহিয়াছেন, ইহা যে তাঁহাদের ব্রাহ্মণত্বের প্রমাণ তাহাতে সন্দেহ কি? অনধিকারী হইলে ধর্ম্মভীরু বৈদ্যগণ কখনও আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থ প্রণয়নে ও ব্রাহ্মণের জন্য আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থ ব্যাখ্যায় অগ্রসর হইতেন না।

কালীবাবু দেখিয়াও দেখেন না, শুনিয়াও শুনেন না, 'বৈদ্য' পুস্তকের ২য় পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—

"রাঢ়দেশীয় বৈদ্যগণ চিরদিনই দ্বিজধর্ম্মী ও উপবীতধারী ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকের মন্ত্র-শিষ্য ছিল এবং সম্ভবতঃ এখনও আছে। মহারাণী স্বর্ণময়ী শ্রীখণ্ডের বৈদ্যগোস্বামী মহাশয়দিগের মন্ত্রশিষ্যা ছিলেন। বহু সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ বংশও বৈদ্য গোস্বামিগণের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভাজনঘাটের প্রখ্যাতনামা কৃষ্ণকমল গোস্বামী মহাশয় ঢাকায় অনেক নবশাখের দীক্ষাগুরু ছিলেন। শ্রীরামপুর ও ইস্‌লামপুরের বৈদ্য ঠাকুর মহাশয়গণের ব্রাহ্মণ শিষ্য দেখিতে পাওয়া যায়। মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ সদাশিব কবিরাজের পৌত্র পুরুষোত্তমের চারিজন ব্রাহ্মণ শিষ্যের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। চৈতন্যচরিতামৃতে লিখিত আছে, সেই পুরুষোত্তম কবিরাজের চারিজন ব্রাহ্মণ শিষ্য ছিলেন। [কালীবাবু দুইবার কেন লিখিলেন জানি না] শ্রীমুখ, মাধবাচার্য্য, পণ্ডিত যাদবাচার্য্য ও দেবকীনন্দন। শেষোক্ত ব্যক্তি গৌড় রাজ্যের অতীব প্রধান লোক বলিয়া প্রখ্যাত ছিলেন। ইনি শ্রীমদ্‌বৈষ্ণব-বন্দনা গ্রন্থের প্রণেতা।

মহাপ্রভুর পারিষদগণের মধ্যে অনেক কৃতবিদ্য ও ভক্ত বৈদ্য সন্তান ছিলেন। চৈতন্যচরিতামৃত প্রণেতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী, সংস্কৃত চৈতন্য-চরিত প্রণেতা মুরারিগুপ্ত, লোচন দাস, কবি কর্ণপুর, শিবানন্দ সেন, রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভৃতি সকলেই বৈদ্য সন্তান ছিলেন। বৈদ্যগণ আয়ুর্ব্বেদ, কাব্য, ব্যাকরণ, নাটক, অলঙ্কার প্রভৃতি অধ্যয়ন করিতেন। বেদাদি শাস্ত্রের অধ্যয়নে অধিকারী ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কবিভূষণ, কবীন্দ্র, কবিরত্ন প্রভৃতি বহু উপাধিধারী পণ্ডিত ছিলেন।

স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঈশ্বর গুপ্তের গ্রন্থাবলীতে লিখিয়াছেন,—'কাঁচরাপাড়া গ্রামের রামচন্দ্র দাস একটী বৈদ্যবংশের আদি পুরুষ। তাঁহার একমাত্র পুত্রের নাম রামগোবিন্দ। রামগোবিন্দের দুইপুত্র, বিজয়রাম ও নিধিরাম। বিজয়রাম পণ্ডিত বলিয়া খ্যাত ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার বিলক্ষণ অধিকার ছিল। সেই জন্য বাচস্পতি উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহার আর একটা টোল ছিল। তথায় অনেক ছাত্র সংস্কৃত সাহিত্য, ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার প্রভৃতি তাঁহার নিকট শিক্ষা করিত। তিনি সংস্কৃত ভাষায় কয়েকখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, কিন্তু তাহা প্রকাশিত হয় নাই'।

প্রসিদ্ধ ডিঃ গুপ্ত (৺দ্বারকানাথ গুপ্ত) মহাশয়ের পূর্ব্বপুরুষ রাম রাম দাস নামে একজন পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার উপাধি অলঙ্কারবাগীশ ছিল। তিনি শোভা-বাজারে মহারাজ নবকৃষ্ণের সভাপণ্ডিত ছিলেন। চক্রদত্ত-প্রণেতা মহামহোপাধ্যায় চক্রপাণি দত্ত, সুপদ্ম ব্যাকরণ প্রণেতা মহামহোপাধ্যায় শ্রীপতি দত্ত প্রভৃতি বৈদ্য পণ্ডিতগণ মহামহোপাধ্যায় উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। মাধবকর, মেদিনীকর, ভারত-বিশ্রুত ভরত মল্লিক প্রভৃতি শত শত পণ্ডিত বৈদ্য জাতির মধ্যে বিদ্যমান ছিলেন। একালেও অশেষ শাস্ত্রদর্শী ৺দ্বারকানাথ সেন কবিরত্ন ও বিজয়রত্ন সেন প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায় উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। এই সকল শাস্ত্রজ্ঞ মহা মহাপণ্ডিতগণ কেহই কখনও সেন শর্ম্মা বা দাশ শর্ম্মা প্রভৃতি উপাধি গ্রহণ করেন নাই এবং বরাবরই ১৫ দিন অশৌচ পালন করিতেন।"

কালীবাবু দেখিয়াও দেখেন না, শুনিয়াও শুনেন না, এ কথা কেন বলিয়াছি, তাহা বোধ হয় পাঠক মহাশয় বুঝিতেছেন। কিন্তু বুঝিয়াও না-বুঝ সাজিয়া পরকে ধোঁকা দিবার চেষ্টা করা অতীব গুরুতর অপরাধ। কালীবাবু এখানে যে মহামহোপাধ্যায় বৈদ্য পণ্ডিত মণ্ডলীর নাম করিয়াছেন, তাঁহারা কি বৈদ্যের ব্রাহ্মণাচারে বা ব্রাহ্মণ পরিচয়ের বিরোধী ছিলেন? এই স্বর্গত মহাত্মাদের নিকট হইতে কোন্ দেবদূত কালীবাবুর নিকটে আসিয়া তাঁহাকে জানাইয়া গিয়াছেন, যে তাঁহারা কখন কোনরূপ ব্রাহ্মণাচার পালন করেন

নাই, অথবা নামান্তে 'শর্ম্মা' লেখেন নাই? ব্রাহ্মণ্যে বিশ্বাস করা এক কথা এবং ব্রাহ্মণাচারে প্রতিষ্ঠিত থাকা আর এক কথা। পূর্ব্ব পুরুষেরা পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতিকূলতা বশতঃ আপনাদিগকে জন্মতঃ 'ব্রাহ্মণ' জানিয়াও বৈশ্যাচার পালন করিতে বাধ্য হইতেন, কিন্তু তাঁহারা নিজেদের ব্রাহ্মণ্যে বিশ্বাস করিতেন বলিয়াই, তাঁহাদের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া আজ আমরা ব্রাহ্মণাচার পালনে সমর্থ হইয়াছি। তাঁহাদের জীবিত কালে সময় অনুকূল হয় নাই, এজন্য হয়ত তাঁহারা শর্ম্মান্ত নামে কার্য্য করিতে পারেন নাই। কিন্তু কালীবাবুর কথা যে মিথ্যা অর্থাৎ স্বর্গত পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকেই যে শর্ম্মান্ত নামে কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা দেখাইব। প্রথমতঃ মহর্ষিকল্প গঙ্গাধর কবিরাজ। প্রদত্ত তালিকার মধ্যে তাঁহার নাম নাই। তিনি আপনাকে ও আপনার জাতিকে ব্রাহ্মণ বলিয়াই বিশ্বাস করিতেন, তজ্জন্য অনেক লড়াই করিয়াছেন, স্বর্গত জননীর শ্রাদ্ধও একাদশাহে করিয়াছিলেন। তল্লিখিত সুবিস্তীর্ণ প্রমাদভঞ্জনী-নামক মনুসংহিতার টীকায় এ সম্বন্ধে সকলের প্রমাদ ভঞ্জন করিয়া শেষে আপনাকে 'ব্রাহ্মণ' বলিয়াই পরিচয় দিয়াছেন—'ইত্যম্বষ্ঠ-**দ্বিপ্রকুলসম্ভবেন** বৈদ্যগঙ্গাধররায়েণ কৃতা প্রমাদ-ভঞ্জনী টীকা সমাপ্তা'। শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেনশর্ম্মা সরস্বতী মহোদয়ের পিতা কাশীরাজের রাজবৈদ্য ভারতবিদিত ৺বিশ্বনাথ বিদ্যাকল্পদ্রুম আপনাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিতেন, এবং তাঁহার গৃহে সর্ব্ববিধ সংস্কার ব্রাহ্মণাচারেই হইত। কিন্তু ইঁহার নামও ঐ তালিকায় নাই! এগুলি কি জ্ঞানকৃত অপরাধ নহে? মহামহোপাধ্যায় দ্বারকানাথ কবিরত্ন মহাশয়ের নামে যাহা লিখিয়াছেন **তাহাও মিথ্যা**। কবিরত্ন মহাশয় পুস্তক লিখিয়া বৈদ্যজাতির ব্রাহ্মণত্ব প্রচার করিয়াছিলেন, কখনও নামান্তে 'গুপ্ত' শব্দ ব্যবহার করিতেন না, শিষ্যদিগকে বৈদ্যের

ব্রাহ্মণ্যসম্বন্ধে উপদেশ দিতেন, এবং তাঁহার কোন কোন পুস্তকে অদ্যাপি শর্ম্মান্ত নাম তাঁহার হস্তাক্ষরে লিখিত আছে। তিনি 'অম্বষ্ঠ কোন্ বর্ণ' নামক পুস্তিকা দ্বারা সাধারণ্যে বৈদ্যের ব্রাহ্মণ্য প্রচার করিয়াছিলেন, তদীয় পুত্র শ্রীযুক্ত বৈদ্যরত্ন কবিরাজ যোগীন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, এম্ এ মহাশয় ১৩১৪ সালের চৈত্র সংখ্যার বৈদ্যহিতৈষিণী পত্রিকায় এ সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়াছেন। [বৈ০ প্রতি০ ৩৩ পৃষ্ঠাও দ্রষ্টব্য।]

তিনি মহামহোপাধ্যায় উপাধি প্রাপ্তি উপলক্ষ্যে বৈদ্যসভার নিকট হইতে যে অভিনন্দন পত্র পাইয়াছিলেন, তাহাতে 'অম্বষ্ঠ' শব্দ নাই, 'ত্রিজ শব্দ আছে। ['ত্রিজ' শব্দ দ্বিজের উপর, ইহার অর্থ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, 'দ্বিজেষু বৈদ্যাঃ শ্রেয়াংসঃ' এতখানি না বলিয়া এক কথায় 'ত্রিজ' বলিলেই চলে]—

যৎ সুশ্রুতোঽপি সমিতৌ ননুবাগ্ভটোঽপি
বাদেষু যদ্ দৃঢ়বলোঽসি কিমত্র চিত্রম্।
এতত্তু চিত্রমতি বৈদ্যকশাস্ত্রশিক্ষাং
যৎ ত্বং ত্রিজোঽপি পুনরত্রিজবৎ দদাসি॥

সুশ্রুত, বাগ্ভট, দৃঢ়বল, অত্রিপুত্র পুনর্ব্বসু—এই মহর্ষিগণই আয়ুর্ব্বেদের আদি গুরু। তাঁহাদের নাম লইয়া কবিরত্ন মহাশয়ের পাণ্ডিত্যের প্রশংসা করা হইতেছে। অথচ সুশ্রুত শব্দের অর্থ, যাঁহার বহু পাণ্ডিত্য; বাগ্ভট শব্দের অর্থ, যিনি বাগ্যুদ্ধে বীর, দৃঢ়বল শব্দের অর্থ, যিনি বিশেষ শক্তিশালী। ত্রিজ শব্দে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, অত্রিজ শব্দে অত্রিপুত্র পুনর্ব্বসু। শ্লোকের অর্থ এই, সভাতে বিচার বিতর্ক উঠিলে আপনি যে সুশ্রুত, বাগ্ভট ও দৃঢ়বল হইয়া একাকী তিন ব্যক্তি হইতে পারেন, তাহাতে বিস্ময়ের কারণ কি? আপনি 'ত্রিজ' হইয়াও আবার যে অ-ত্রিজের (অথচ পুনর্ব্বসুর) ন্যায় আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র অধ্যাপনা করিয়া থাকেন, চারি ব্যক্তির ন্যায় হন, তাহাই বিচিত্র।

অন্যান্য প্রাচীন বৈদ্য পণ্ডিতগণ পুস্তকাদিতে নামান্তে 'শর্ম্মন্' শব্দ ব্যবহার না করাতেই তাঁহারা আপনাদের ব্রাহ্মণ্যে সন্দিহান ছিলেন, ইহা সপ্রমাণ হয় না। কারণ তাহা হইলে বাল্মীকি, বেদব্যাস, পরাশর, উশনা, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, ভবভূতি, ভারবি, কালিদাস সকলেই অব্রাহ্মণ হইয়া পড়েন!

তারপর কালীবাবু যে পাঁচ জন মহামহোপাধ্যায়ের নাম তালিকায় উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহাদের স্বীয় ব্রাহ্মণ্যে বিশ্বাস না থাকিলে, এবং ঐ উপাধি তাঁহাদের বংশে আবহমান কাল হইতে প্রচলিত না থাকিলে, তাঁহারা উহা ধারণ করিতেন কি? কালীবাবু কোন ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যকে এই উপাধি ধারণ করিতে শুনিয়াছেন কি? এই বিস্তীর্ণ ভারত-ভূমিতে কালীবাবু কি এমন একজন ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যকে দেখাইতে পারেন, যিনি কোনকালে ব্রাহ্মণসমাজের অনুমোদন ক্রমে ব্রাহ্মণসমাজ প্রদত্ত বাচস্পতি, শিরোমণি, মহামহোপাধ্যায় প্রভৃতি উপাধি ধারণ করিয়াছেন?

কালীবাবু শোভাবাজারের সভাপণ্ডিত বৈদ্য রামরামদাসের নাম করিয়াছেন। রামরামদাশ মৌদ্‌গল্য গোত্র, ইঁহার বংশধরগণ 'দাশ' শব্দকে শূদ্রত্ববোধক 'দাস' হইতে অভিন্ন বিবেচনা করিয়া 'গুপ্ত' শব্দের প্রচলনের সময়ে (মাত্র ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে) 'দাশ' শব্দ একেবারে বর্জ্জন করিয়া (বৈদ্যত্বসূচক!) 'গুপ্ত' শব্দটী ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন, তদবধি ইঁহারা 'ডি-গুপ্ত বংশ' (দ্বারকানাথ গুপ্তের বংশ) বলিয়া বিদিত! কালীবাবু কি জানেন না, কোন্ জাতি সভাপণ্ডিত হইয়া থাকে? অন্যজাতি সভাপণ্ডিত হইলে রাজসভার ও রাজার মান বজায় থাকে? একথা কেহ কল্পনাও করিতে পারে কি? পূর্ব্বে ঐ শোভাবাজারের রাজবাটীতে বৈদ্য পণ্ডিতদের বার্ষিক বিদায় প্রাপ্তির কথা বলিয়াছি।

কালীবাবু তালিকার মধ্যে কবি কর্ণপুরের নাম করিয়াছেন। তিনি জানেন না যে, আমরা কবিকর্ণপুরের আত্মকুলজীতে কবিকর্ণপুরের ব্রাহ্মণত্বের নিঃসংশয় প্রমাণ পাইয়াছি। তিনি লিখিয়াছেন, কেন্দুলীনিবাসী ভক্ত **জয়দেব গোস্বামীর** বংশজ বীরভূম জেলার বীরহাম্বীর রাজার রাজ পণ্ডিত ৺বিষ্ণুপদ শিরোমণির একমাত্র কন্যা গঙ্গাদেবীর সহিত নরহট্ট (কাঁচরাপাড়া) নিবাসী সেন শিবানন্দ গোস্বামীর পুত্র চৈতন্যদেবের প্রিয় শিষ্য কবি **কর্ণপুর সেন গোস্বামীর** ১৫৩৯ খৃষ্টাব্দে ফাল্গুনমাসে শুক্লা অষ্টমীতে বিবাহ হয়। কালীবাবু কি মনে করেন, এই বিবাহ Civil marriage Act অনুসারে হইয়াছিল ? এস্থলে ব্রাহ্মণ পরিচয়ে বিদিত জয়দেব যে 'বৈদ্য ব্রাহ্মণ' ছিলেন এবং বৈদ্য কবিকর্ণপুরও যে ব্রাহ্মণাচারী ছিলেন, তাহা বুঝা যাইতেছে। এই প্রাচীন পুঁথি নাটোরে আছে।

তালিকায় সংস্কৃত চৈতন্যচরিত প্রণেতা মুরারি গুপ্তের নাম দেখা যায়। এই মুরারি গুপ্ত মহাপ্রভুর পারিষদ ছিলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে এইরূপ লেখা আছে—

"শ্রীমুরারি গুপ্ত শাখা প্রেমের ভাণ্ডার।
প্রভুর হৃদয় দ্রবে শুনি দৈন্য-যাঁর॥
প্রতিগ্রহ নাহি করে, না লয় কারো ধন।
আত্মবৃত্তি করি করে কুটুম্ব ভরণ॥
চিকিৎসা করেন যাঁরে হইয়া **সদয়**।
দেহ-রোগ ভব-রোগ দুই তার ক্ষয়॥

অধ্যাপনা যাজন ও প্রতিগ্রহ এই তিনের মধ্যে প্রতিগ্রহ ব্রাহ্মণের অন্যতম বৃত্তি। অন্য কোন জাতির প্রতিগ্রহে অধিকার নাই—ইহাই শাস্ত্র বিধি। শাস্ত্র ব্রাহ্মণের অধ্যাপনা বৃত্তির প্রশংসা করিয়াছেন এবং যাজন ও প্রতিগ্রহের নিন্দা করিয়াছেন। উদ্ধৃত স্থলে মুরারি

গুপ্তের প্রতিগ্রহে অধিকার সুব্যক্ত হইয়াছে, প্রতিগ্রহে অধিকার সত্বেও তিনি ঐ কার্য্যকে নিকৃষ্ট জানিয়া ঐ কার্য্য হইতে বিরত থাকিতেন, এই কথা এস্থলে তাঁহার মাহাত্ম্য-খ্যাপনার্থ বলা হইয়াছে। নতুবা যাঁহার প্রতিগ্রহে অধিকার নাই, তিনি প্রতিগ্রহ করেন না, এইকথা বলিয়া প্রশংসা করা সম্ভব হয় না। মুরারি গুপ্ত বৈদ্যকুলজ ব্রাহ্মণের অধ্যাপনা ও চিকিৎসা রূপ শ্রেষ্ঠ দুইটী বৃত্তি বা স্বভাবজ কর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাই এস্থলে বলা হইয়াছে। অতঃপর **অযাচিত** প্রভৃতি উপায়ে তাঁহার সংসার চলিয়া যাইত। ('অমৃতং স্যাৎ অযাচিতম্'—মনু, ৪।৫)

গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত চৈতন্যচরিতামৃত টীকায় মুরারি গুপ্তকে 'বিপ্র' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। [ঐ সময়ের অন্যান্য বৈদ্যপণ্ডিতদেরও 'বৈদ্য-উপাধ্যায়', 'বিপ্র' ইত্যাদি বিশেষণ আছে। সে সকল অপ্রাসঙ্গিক বোধে উল্লিখিত হইল না]

শ্রীযুক্ত কালীবাবু মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ সদাশিব কবিরাজের পুত্র পুরুষোত্তম কবিরাজের চারিজন ব্রাহ্মণ শিষ্যের উল্লেখ করিয়াছেন এবং ১ম পৃষ্ঠার পাদটীকায় একটী শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন —

'তস্য প্রিয়তমাঃ শিষ্যা শ্চত্বারো ব্রাহ্মণোত্তমাঃ।
শ্রীমুখো মাধবাচার্য্যো যাদবাচার্য্যপণ্ডিতঃ॥
দেবকীনন্দনদাসঃ প্রখ্যাতো গৌড়মণ্ডলে।
যেনৈব রচিতা পুস্তী শ্রীমদ্‌বৈষ্ণববন্দনা॥ চৈতন্যচরিতামৃত'

কবিরাজ পুরুষোত্তমের চারিজন ব্রাহ্মণোত্তম শিষ্য ছিল। কিন্তু এই শ্লোকে বৈদ্যগুরুর ব্রাহ্মণ শিষ্য থাকার সংবাদ অপেক্ষা আমরা আর একটী উৎকৃষ্টতর সংবাদ এই পাইতেছি যে, ইহাদের মধ্যে যিনি নিখিল গৌড়মণ্ডলে বিখ্যাত ছিলেন, তিনি বৈদ্যবংশীয়। ইনি বৈষ্ণববন্দনা-রচয়িতা 'দেবকীনন্দন দাশ'। কালীবাবু এস্থলে 'দেবকী-নন্দন দাস' লিখিয়া ছন্দঃপাত করিয়াছেন। ছন্দের অনুরোধে 'দেবকী-

-নন্দনো দাসঃ' বলাও যায় না, কারণ তাহা হইলে 'দাস'শব্দ তৎক্ষণাৎ বিশেষণ হওয়ায় পদবী বুঝাইবে, 'কৃষ্ণদাস' শব্দের অংশের ন্যায় নামাংশ হ'বে না। দাস পদবী-যুক্ত দেবকীনন্দন অবশ্যই শূদ্রজাতীয় হইয়া পড়িবেন! শূদ্রকে অন্যান্য ব্রাহ্মণের সঙ্গে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত করা যায় না। অতএব এস্থলে 'দেবকীনন্দনো দাশঃ' এই পাঠই সমীচীন (চন্দ্রপ্রভা পৃঃ ২৫৮)। ইহার অর্থ 'দাশোপাধিকঃ দেবকীনন্দনঃ' ইনি দাশোপাধিক ব্রাহ্মণ হওয়ায় মৌদ্গল্য গোত্রীয় দাশশর্ম্মা বৈদ্যব্রাহ্মণ হইয়া পড়েন। বৈষ্ণববন্দনা পুস্তকও ইহাতে সাক্ষ্য দিবে।

কালীবাবু লিখিয়াছেন 'বহু সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ বংশও বৈদ্য গোস্বামিগণের নিকটে মন্ত্রগ্রহণ করিয়াছিলেন।' ইহাও এই বৈদ্য গুরুগণের ব্রাহ্মণ্যের প্রমাণ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্ব হইতেই বৈদ্যদিগের ঠাকুর ও গোস্বামী উপাধি ছিল। যাঁহারা মনে করে, চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর হইতে বৈদ্যবংশে গোস্বামী উপাধির প্রচলন হইয়াছে, তাঁহারা ভ্রান্ত। যাঁহারা মনে করেন, অন্যান্য জাতির মধ্যেও গোস্বামী উপাধি আছে বলিয়া এই উপাধিটী ব্রাহ্মণ্য সম্বন্ধে প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না, তাহাদের কথাও সমীচীন নহে। কারণ শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্ব কালে কোন অব্রাহ্মণের পক্ষে এই উপাধি ধারণের সম্ভাবনা ছিল না, ইহা তাঁহারাও স্বীকার করিবেন। (বোপদেব-গোস্বামী, জয়দেব গোস্বামী, কান্দু ঠাকুর, পানু ঠাকুর প্রভৃতি মহাপ্রভুর বহুপূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন। অতএব "**ব্রাহ্মণেতর** জাতিতে গোস্বামী পদবী মহাপ্রভু চৈতেন্যদেবের সময় হইতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে" (বৈদ্য পৃষ্ঠা ৪৭), কালীবাবুর এই উক্তি হই তই বৈদ্যগণের ব্রাহ্মণত্ব সপ্রমাণ হইতেছে। স্বয়ং মহাপ্রভু বৈদ্যকে 'ব্রাহ্মণ' জানিতেন বলিয়াই তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। ইহা শুধু আমাদের কথা নহে, 'আলোচনা' পত্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

মহাশয়ও 'নদের নিমাই' নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"সেই সময় শ্রীপাঠ নবদ্বীপে কুমারহট্ট (বর্ত্তমান হালিসহর) নিবাসী বৈদ্যবংশীয় প্রভুপাদ ঈশ্বরপুরী নামক জনৈক প্রেমবিহ্বল বৈষ্ণব আসিয়া উপস্থিত হন। ইনি মাধবেন্দ্রপুরী নামক জনৈক মহাপুরুষের শিষ্য" ইত্যাদি। বৈদ্য গোস্বামী ও ঠাকুরগণ চারি বর্ণকেই মন্ত্র দিতেন, যথা,—

অভানি লোকৈ রথ রায়ঠাকুরঃ
স বৈষ্ণবত্বেন জগৎ-প্রতিষ্ঠিতঃ।
দয়ালুতাক্রান্তমনাঃ মুরদ্বিষো
দদৌ চ মন্ত্রং নিখিলাসু জাতিষু॥

চন্দ্রপ্রভা, ৩৫১ পৃষ্ঠা।

অর্থাৎ, লোকে ইঁহাকে 'রায়ঠাকুর' বলিত; বৈষ্ণবত্ব হেতু ইনি জগতে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন এবং দয়াপরবশ হইয়া ব্রাহ্মণাদি সকল জাতিকে কৃষ্ণমন্ত্র দান করিয়াছিলেন; কালীবাবু বলেন কায়স্থজাতীয় 'গোস্বামী'ও আছেন। কিন্তু বৈদ্য গোস্বামী ও কায়স্থ গোস্বামীর পার্থক্য এই যে, বৈদ্য গোস্বামীরা আবহমান কাল হইতে 'গোস্বামী' উপাধি ধারণ করিতেছেন, কিন্তু কায়স্থ গোস্বামীরা শ্রীশ্রীচৈতন্য দেবের আবির্ভাবের পর হইতে ঐ উপাধি ধারণ করিতেছেন। এই কারণেই বৈদ্যগোস্বামীদের ব্রাহ্মণ শিষ্যের অভাব নাই, কিন্তু কায়স্থ গোস্বামী মহাশয়দিগের একজনও ব্রাহ্মণশিষ্য দেখা যায় না। বৈদ্য ব্রাহ্মণ বলিয়া পূর্ব্ব হইতেই টোল রাখিয়া অধ্যাপনা করিতেছে, এজন্য তাহার ব্রাহ্মণ শিষ্যও যথেষ্ট। কিন্তু কায়স্থাদি জাতিরা বৈষ্ণব যুগেও অধ্যাপনা বৃত্তি হাতে লইতে পারেন নাই, তাঁহাদের টোল নাই, ছাত্রও নাই। সমাজ-সংস্থান একদিনেই বদলাইয়া যায় না। এইজন্য বৈষ্ণব যুগেও অনধিকারী কোন জাতির পক্ষে টোল খুলা বা ব্রাহ্মণকে মন্ত্র দেওয়া সম্ভব হয় নাই। তবেই দেখা যাইতেছে, বৈদ্যের

ব্রাহ্মণশিষ্য, গোস্বামী ও ঠাকুর উপাধি, টোল রক্ষা, অধ্যাপনা ও গুরুবৃত্তি আবহমান কাল হইতে এবং এই জন্যই বৈদ্য ব্রাহ্মণ।

বৈদ্য প্রবোধনীতে লিখিত হইয়াছে যে, প্রাচীন কুষ্ঠিপত্রে 'সেন রাঘব শর্ম্মণঃ' এইরূপ লেখা দেখতে পাওয়া গিয়াছে। এই রাঘব সেন চট্টগ্রামের অশেষ-শাস্ত্রদর্শী প্রখ্যাতনামা কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ সেনশর্ম্মা কবিরত্ন মহাশয়ের পূর্ব্বপুরুষ। কালীবাবু ইহার প্রতিবাদে লিখিয়াছেন,—

"রাঢ় দেশের কুলগ্রন্থে এরূপ কোন পাঠ নাই।" অপিচ শ্রীখণ্ডের সমাজপতি রাঘবচন্দ্রের বংশের শ্রীযুক্ত গিরিজামোহন রায় মহাশয় তাঁহাকে পত্র দিয়াছেন যে, তাঁহাদের বংশতালিকায় 'শর্ম্মা' শব্দের উল্লেখ নাই!

আমরা আজিমগঞ্জ-নিবাসী শ্রীযুক্ত গিরিজামোহন রায় মহাশয়কে বিলক্ষণ চিনি। তিনি রাঘব সেনের বংশ বটে, কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ রাঘব সেন আর ও রাঘব সেন এক ব্যক্তি নহেন। ভিন্ন বংশকে পিতৃবংশ বলিয়া গিরিজা বাবু একটু বেশী দূরে গিয়াছেন। ইনি ধন্বন্তরি গোত্রীয়, উনি বৈশ্বানর গোত্রীয়। এতৎ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ কবিরত্ন মহাশয়ের উক্তি প্রামাণ্য, কারণ তিনিই তাঁহার অধস্তন পুরুষ। কবিরত্ন মহাশয় তদীয় "বঙ্গীয় বৈদ্যজাতি"র ৯১ পৃষ্ঠায় এইরূপ লিখিয়াছেন—

"চট্টলস্থ বরমা গ্রামের বৈশ্বানর গোত্র সেন বংশের কুষ্ঠিপত্রের শিরোভাগের লিখিত শ্লোক দৃষ্টে জানা যায়, তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ 'শর্ম্মা' লিখিতেন—

রাঢ়ায়াং পশ্চিমে দেশে কুলচ্ছত্র-সমুদ্ভবঃ।
বৈশ্বানরস্য গোত্রস্য সেন-রাঘবশর্ম্মণঃ॥
চট্টলে গচ্ছতি সত্যো রামস্তিষ্ঠতি বঙ্গকে।
যশো রাঢ়ে সমুদিত্য সেনাটাবুপতিষ্ঠতি॥

সুতরাং, কালীবাবুর সমালোচনা যে এস্থলে সম্পূর্ণ লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াছে, তাহা দেখা গেল।

এই প্রসঙ্গে আমরা অন্যান্য প্রাচীন বৈদ্যদিগের নামান্তে 'শর্ম্মা' ব্যবহারের নিদর্শন দিতেছি। তাম্রশাসনে শ্রীপীতবাস গুপ্ত শর্ম্মা ও শ্রীকৃষ্ণ ধরদেবশর্ম্মার উল্লেখ আছে। এই পীতবাস গুপ্তশর্ম্মা মঙ্কর গুপ্তের প্রপৌত্র, বরাহ গুপ্তের পৌত্র ও সুমঙ্গল গুপ্তের পুত্র, সুতরাং 'গুপ্ত' শব্দটী যে পদবী মূলক তাহাতে ভুল নাই তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ ধরদেবশর্ম্মা জগৎ ধরের প্রপৌত্র, নারায়ণ ধরের পৌত্র, নরসিংহ ধরের পুত্র। সুতরাং এস্থলে 'ধর' শব্দও যে কৌলিক পদবী তাহা বুঝা যাইতেছে। নামের পূর্ব্বে শ্রী-শব্দ দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, ইহারা বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ। অন্যদেশে শ্রী-শব্দ ব্যবহারের রীতি নাই, ইহা 'শ্রীবোপদেবঃ কবিঃ' এই প্রসঙ্গে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়ও বলিয়াছিলেন। দ্বিতীয় তাম্রশাসনটীর পাঠোদ্ধার করিয়া শ্রীযুক্ত **রামগতি ন্যায়রত্ন** মহাশয় তদীয় সাহিত্য-বিষয়ক গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন।

প্রথম তাম্রশাসনটীর পাঠোদ্ধার শ্রীযুক্ত **অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়** মহাশয় করিয়াছেন। দুই জনের কেহই বৈদ্য নহেন এবং দুই জনেই বিশ্বাস যোগ্য ব্যক্তি, সুতরাং এই পাঠোদ্ধারে বৈদ্যদিগের পক্ষে টানিয়া কথা কহা হইয়াছে, এমন কেহই বলিতে পারিবেন না। এক্ষণে কথা এই যে, বাঙ্গালী ব্রাহ্মণদের মধ্যে রাঢ়ী, বারেন্দ্র বা বৈদিক শ্রেণীতে 'গুপ্ত' উপাধি নাই। 'ধর' উপাধিটী রাঢ় ও বারেন্দ্র শ্রেণীর মধ্যে নাই, বৈদিক শ্রেণীর মধ্যে আছে, কিন্তু লক্ষ্মণ সেনের সময় বৈদিক ব্রাহ্মণগণ বঙ্গে আগমন করেন নাই, ইহা বৈদিক ব্রাহ্মণগণেরই নিজের কথা। শ্রীকৃষ্ণ ধরশর্ম্মার গার্গ্যগোত্র, অঙ্গিরোবৃহস্পতি-শিনি-গর্গ-ভরদ্বাজ প্রবর। এই গোত্র ও প্রবরের বৈদ্য অদ্যাপি বিদ্যমান

আছেন। সুতরাং ইনি যে বর্ত্তমান বৈদ্য ব্রাহ্মণদের একজন পূর্ব্ব পুরুষ তাহা বুঝা যাইতেছে।

অপর প্রতিগ্রহীতা পীতবাস গুপ্তশর্ম্মার গোত্রটী ঠিক পাঠ করা যায় না। মৈত্রেয় মহাশয় 'শখল্য' পাঠ করিয়া বন্ধনীর মধ্যে শাণ্ডিল্য লিখিয়াছেন। অর্থাৎ তিনি জানাইয়াছেন যে, যে পাঠ আছে তাহা 'শখল্য', তবে বোধ হয় উহা 'শাণ্ডিল্য'। 'শখল্য" শব্দের পরেও তিনি কিয়দংশ পাঠ করিতে পারেন নাই। এই সকল কারণে যাহা পাঠ করা যায়, বৈদ্যপ্রবোধনীতে তাহাই উদ্ধৃত হইয়াছে, যেটুকু সংশয়ারূঢ় তাহা উদ্ধৃত হয় নাই। কিন্তু 'গুপ্ত' পদবী হ'তেই বুঝা যাইতেছে যে, এই ব্রাহ্মণ নিশ্চিতই বৈদ্যব্রাহ্মণ। এজন্য বৈদ্যপ্রবোধনীতে আবশ্যক অংশ উঠাইয়া লেখা হইয়াছে—"এখানে গুপ্তশর্ম্মা উপাধি দ্বারাই প্রতিগ্রহীতার বৈদ্যত্ব সূচিত হইতেছে। কারণ রাঢ়ীয় বা বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের মধ্যে 'গুপ্ত' উপাধি নাই"। ইহার সমালোচনায় কালীবাবু লিখিয়াছেন—"বৈদ্যপ্রবোধনী সাহিত্য পত্রিকা হইতে তাম্রশাসনের উপরি উক্ত অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন, কিন্তু কি জানি কি মতলবে গোত্রটী চাপা দিয়াছেন" (বৈদ্য, পৃঃ ১০৬)। কালীবাবু আমাদের কু-মতলব ঠাহরাইয়াছেন, কিন্তু যে অংশ ঠিকভাবে লিখিত হয় নাই, তাহার একটা অপ্রকৃত পাঠ কল্পনা করিয়া আমরা তাহাকে সপক্ষে খাড়া করি নাই, ইহাই আমাদের অপরাধ। আমাদের পরিত্যক্ত অংশ যাহা তিনি তুলিয়াছেন, তাহা এইরূপ—

"শখল্য (শাণ্ডিল্য) স্য (স) গোত্রায় ত্র্যর্ষি-প্রবরায় মক্করগুপ্তস্য প্রপৌত্রায় বরাহ-গুপ্তস্য পৌত্রায় সুমঙ্গল-গুপ্তস্য পুত্রায় শান্তি বারিক-শ্রীপীতবাস-গুপ্তশর্ম্মণে" ইত্যাদি (বৈদ্য, পৃঃ ১০৬—১০৭)।

কালীবাবু লিখিতেছেন—

"গুপ্ত তাঁহার কৌলিক উপাধি। পীতবাসের শাণ্ডিল্য গোত্র ছিল এবং তাঁহার তিন ঋষির (মূলে ত্র্যর্ষি) প্রবর ছিল। শাণ্ডিল্য গোত্রের তিন প্রবর যথা শাণ্ডিল্যাসিতদেবলাঃ' (বৈদ্য, ১০৭ পৃঃ)

গুপ্ত যে ইহাদের কৌলিক উপাধি তাহা কালীবাবু স্বীকার করিতেছেন। 'শখল্যস্ত' কথাটা যে কি, তাহা বুঝা যায় না। অক্ষয় বাবু 'শখল্য' পাঠ পৃথক করিয়াছেন, পরে যে একটা 'স্ত' আছে, তাহাও বুঝা যায় নাই, এজন্য উহাকে বন্ধনীর মধ্যে (স) এইরূপ লিখিয়াছেন। যাহা হউক, 'শাণ্ডিল্য' পাঠ যখন নাই, তখন কালীবাবু 'পীতবাসের শাণ্ডিল্য গোত্র ছিল' ইহা কিরূপে বলেন? তারপরে বলিতেছেন –

"এখন দেখা যাউক, **গুপ্ত বৈদ্যের** শাণ্ডিল্য গোত্র আছে কি না।......গুপ্ত বৈদ্যের তিন গোত্র, কাশ্যপ, গৌতম ও সাবর্ণি।

'গুপ্ত বৈদ্যের শাণ্ডিল্য গোত্র নাই। কাজেই উল্লিখিত পীতবাস শাণ্ডিল্য গোত্রীয় খাঁটি ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি বৈদ্যজাতীয় নহেন। গুপ্ত বৈদ্যের মধ্যে শাণ্ডিল্য গোত্র নাই।

বৈদ্যব্রাহ্মণগণের শর্ম্মার দুটী পুঁজ ছিল, তাহা বিলয় প্রাপ্ত হইল। বৈদ্যপ্রবোধনীর অপব্যাখ্যা বৈদ্যগ্রন্থে প্রদর্শিত হইয়াছে। এবার আর অপব্যাখ্যা নহে, ধোঁকা দিয়া মিথ্যাকে সত্য প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস!"

পাঠক কালীবাবুর সৌজন্যপূর্ণ ভাষার দিকে লক্ষ্য করিবেন। আমরা ব্যবহারজীবী নহি। সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য বলিয়া অনর্থক হৈ-চৈ করিয়া গলাবাজি বা কলমবাজি দ্বারা জয়লাভ করিতে চাহি না। সত্য ও ধর্ম্মের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কালীবাবু বলুন, এই কথাগুলি তিনি কেন বলিলেন? শাণ্ডিল্য পাঠ যখন ঐ স্থানে নাই, তখন তিন অক্ষরের কোন শব্দ আছে বলিয়াই কি তাহাকে নিজের সুবিধা মত

শাণ্ডিল্য পড়িতে হইবে? কালীবাবু নিজেই বলিতেছেন গুপ্ত বৈদ্যদিগের তিনটী গোত্র আছে, কাশ্যপ, গৌতম, সাবর্ণি। কুলপঞ্জিকায়ও ঐ কথা বলা হইয়াছে। তাম্রশাসনের প্রাচীনরীতির লেখা সুস্পষ্ট না হইলে পড়া বড়ই গোল। তবে পীতবাস গুপ্তশর্ম্মা মহাশয় কাশ্যপ গোত্র, গৌতম গোত্র বা সাবর্ণি গোত্রও ত হইতে পারেন। 'সাবর্ণি'কে কুলপঞ্জিকায় 'সাবর্ণ'ও বলা হয়। আপস্তম্বে সাবর্ণের তিন প্রবরও বলা হইয়াছে, যথা, ভার্গব, ঔর্ব্ব, জামদগ্ন্য। আশ্বলায়ন মতেও তিন প্রবর। [বৌধায়ন মতে পঞ্চ প্রবরও আছে, কিন্তু এখানে তিন প্রবর বলায় তাহা ধরা হইল না] তবে পীতবাস গুপ্ত শর্ম্মা সাবর্ণ গোত্র, তিনপ্রবর ও বৈদ্যব্রাহ্মণ হইলেন—সকল দিকে মিলিয়া গেল। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি, কালীবাবুর 'শাণ্ডিল্য' গোত্র পাঠ স্বীকার করিলেও 'গুপ্ত' পদবীর কি করিবেন? 'গুপ্ত' পদবী ত 'বৈদ্য শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য শ্রেণীতে দেখা যায় না। তিনি কি প্রয়োজন হইয়াছে বলিয়া রাঢ়ী ও বারেন্দ্র শ্রেণীর মধ্যে উহা সৃষ্টি করিবেন?

'সেন-রাঘবশর্ম্মণঃ' ও পীতবাস-গুপ্তশর্ম্মণে' এই দুই প্রমাণ সম্বন্ধে কালীবাবু ও সত্যেন্দ্র বাবু একইরূপ যুক্তিতর্ক করিয়াছেন। পাঠকবর্গ এক্ষণে সুবিচার করুন।

প্রবোধনী পাঠকদিগকে ধোঁকা দিয়া মিথ্যাকে সত্য প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস করিয়াছে, ইহাও শুনিতে হইল! এই সকল অন্যায় উক্তির বিরুদ্ধে আমরা কোনরূপ রূঢ় ভাষা প্রয়োগ করতে চাহিনা। আমাদের আশা এই, শ্রীযুক্ত কালীবাবু নিজের ভ্রম বুঝিয়া বিরোধিতা ত্যাগ করিবেন এবং বন্ধুভাবে আমাদের সহিত একযোগে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইবেন।

'শর্ম্মন্' শব্দ সম্বন্ধে উৎকল-কারিকার যে প্রসিদ্ধ শ্লোক প্রবোধনীতে উল্লিখিত হইয়াছে, অনেক ব্রাহ্মণ প্রথমে তাহা বিশ্বাস করিতে

চাহিতেন না, বলিতেন ব্রাহ্মণদিগেব মধ্যে কর, ধর ইত্যাদি উপাধি কি আছে ? পরে যখন ধরাইয়া দেওয়া হইল যে, সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় আশুতোষ শাস্ত্রী, এম্-এ মহাশয়দিগের মৌলিক উপাধি 'ধর', এখন 'ভট্টাচার্য্য' উপাধি দ্বারা ধর-উপাধি গোপন করিয়াছেন, এবং 'কর' উপাধিক ব্রাহ্মণও বৈদিক ব্রাহ্মণদের মধ্যে যখন দেখাইয়া দেওয়া গেল, তখন তাঁহারা নিরস্ত হইলেন। কালীবাবু লিখিতেছেন, তিনি শ্রীক্ষেত্রের প্রধান পাণ্ডামহাশয়ের নিকট হইতে একটী তালিকা আনিয়া দেখিয়াছেন যে, "তাহাতে ধন্বন্তরি গোত্র কি সেন, দত্ত, গুপ্ত, প্রভৃতি পদবীর উল্লেখ নাই।" (বৈদ্য, পৃঃ ১১১)। এই সংবাদ সত্য নহে। বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণদের মধ্যেও এমন অনেক উপাধি আছে, যাহার সন্ধানই কেহ রাখে না। পাণ্ডা হইলেও কালীঘাটের 'হালদার' মহাশয়েরা বা শ্রীরামপুর-মাহেশের 'অধিকারীরা' কখনই এ সকল বিবরণ দিতে পারিবেন না। এজন্য আমরা কালীবাবুর সংগৃহীত সংবাদ বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। পাণ্ডামহাশয়কে চিঠি লিখিবার পূর্ব্বে যে কোন "উড়ে বামুন"কে জিজ্ঞাসা করিলেও ত আমাদের কথার সত্যতা বুঝিতে পারিতেন, কারণ অধিকাংশ উড়িয়া বামুনেরা মৌদ্গল্য গোত্রের দাশ। কালীবাবু কিছু নিম্নেই লিখিতেছেন, "লাল মোহন বিদ্যানিধি তাঁহার (সম্বন্ধ) নির্ণয় গ্রন্থের পরিশিষ্টে দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণের যে কারিকা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা এই—

"করশর্ম্মা ভরদ্বাজো ধরশর্ম্মা চ গৌতমঃ।
আত্রেয়ো রথশর্ম্মা চ নন্দ (নন্দী) শর্ম্মা চ কাশ্যপঃ।
কৌশিকো দাশশর্ম্মা চ পতিশর্ম্মা চ মুদ্গলঃ॥"

বলা বাহুল্য, বাঙ্গালার যে বৈদিক ব্রাহ্মণেরা দক্ষিণ হইতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদেরই ঐ সকল গোত্র ও পদবী। কালীবাবু পুনশ্চ

লিখিতেছেন, "নানা দেশের নানা প্রকার পদ্ধতি ও গোত্র প্রচলিত আছে"। তবে বৈদ্যপ্রবোধনীর উদ্ধৃত—

"করশর্ম্মা ভরদ্বাজো ধরশর্ম্মা পরাশরঃ (পাঠান্তর কৌশিকঃ)।
মৌদ্‌গল্য দাশশর্ম্মা চ গুপ্তশর্ম্মা চ কাশ্যপঃ।
ধন্বন্তরিঃ সেনশর্ম্মা দত্তশর্ম্মা চ কৌশিকঃ॥"

এই কারিকাটীকে উড়াইয়া দেন কি করিয়া?

অতঃপর কালীবাবু বলিতেছেন,—"সেন-উপাধিক গয়ালী পাণ্ডা-গণের গৌতম গোত্র এবং গুপ্ত উপাধিক গয়ালীগণ কণ্বগোত্র। বঙ্গীয় সেন উপাধিধারী বৈদ্যগণের আট গোত্র, গৌতম গোত্র নাই। বঙ্গীয় গুপ্ত বৈদ্যগণের তিন গোত্র। কণ্বগোত্র নাই।"

এতদ্দ্বারা কালীবাবু এই বলিতে চাহিতেছেন যে, অন্যদেশে সেন হউক, গুপ্ত হউক, দাশ হউক, নন্দ (নন্দী) হউক, কর হউক, ধর হউক—কোন পদবীরই ব্রাহ্মণ-পরিচয়ে বাধা নাই, কেবল বাঙ্গালায় সেন, গুপ্ত, দাশ, কর, ধর ব্রাহ্মণ না হইলেই হইল! স্বজাতি-প্রীতিই কি ইহার কারণ? মথুরার অমৃতসেনী, পাঞ্জাবের দত্তশর্ম্মা, গুজরাটের নন্দী, সোম, দাশ ইত্যাদি তাহারাও ত ব্রাহ্মণ। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ তাঁহার এথ্‌নলজি সংক্রান্ত পুস্তকে বলিয়াছেন, There are thirteen Sarmans among the Nagar Brahmans in Guzerat—দত্ত, নন্দী, সোম, চন্দ্র ইত্যাদি ১৩ প্রকার বিভিন্ন প্রকারের শর্ম্মা গুজরাটেও আছে। আবার গৌতম, কণ্ব প্রভৃতি গোত্রের ব্রাহ্মণ বঙ্গে না থাকিলেও, বঙ্গের বাহিরে ঐ সব গোত্রের ব্রাহ্মণ থাকিতে কোন বাধা নাই, কিন্তু গয়ায় কি দাক্ষিণাত্যে ধন্বন্তরি অথবা শক্তি গোত্রীয় ব্রাহ্মণ নাই বলিয়া বাঙ্গালার ধন্বন্তরি গোত্রীয় বা শক্তি গোত্রীয় সেনেরা ব্রাহ্মণ হইবে না! এ যুক্তি বড় মন্দ নয়!

বৈদ্যব্রাহ্মণ সমিতির ও ব্রাহ্মণ্যের একনিষ্ঠ সাধক অধ্যাপক শ্রীহেমচন্দ্র সেন শর্ম্মা, এম্-এ মহোদয় ১।১।২৯ তারিখে আমাকে পত্র দ্বারা এইরূপ জানাইয়াছেন – "আমি বড়দিনের ছুটীতে কাশীতে গিয়াছিলাম। পথে গয়ায় নামি। গয়ার পাণ্ডা ৺ বালগোবিন্দ সেনের পৌত্র ও মতিলাল সেনের পুত্রের সহিত দেখা হয়। পাণ্ডা ঠাকুরকে তাঁহার গোত্র জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন তাঁহার গোত্র **কৌশিক**।" কালীবাবু সেন বৈদ্যদিগের যে আট গোত্রের কথা বলিয়াছেন, কৌশিক তাহাদের মধ্যে একটী। চন্দ্রপ্রভায় ৭ম পৃষ্ঠায় নামগুলি এইরূপ আছে—

ধন্বন্তরিশ্চ শক্তিশ্চ তথা বৈশ্বানরাত্মকৌ।
মৌদ্গল্য-**কৌশিকৌ** কৃষ্ণাত্রেয় আঙ্গিরসোঽপি চ॥
অষ্টৌ গোত্রাণি সেনানাম্ - "

কৌশিক গোত্রীয় সেন-গণ গয়ায় ব্রাহ্মণ, আর ১০০ মাইল পূর্ব্বে বাঙ্গালার হাওয়ার গুণে অব্রাহ্মণ, ইহাও আমাদিগকে বিশ্বাস করিতে হইবে? বস্তুতঃ কৌশিক গোত্রীয় সেন বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণ প্রমাণিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গীয় আট গোত্রের সেন এবং নিখিল বৈদ্য সম্প্রদায় ব্রাহ্মণ প্রমাণিত হইতেছে! সুতরাং গয়ায় কণ্বগোত্রীয় গুপ্তগণ যেমন ব্রাহ্মণ, বঙ্গে কাশ্যপ, সাবর্ণ ও গৌতম গোত্রীয় 'গুপ্ত'গণও তদ্রূপ ব্রাহ্মণ। 'সেন-উপাধিক গয়ালী পাণ্ডাগণের গৌতম গোত্র'—কালীবাবুর এই উক্তি সত্য নহে। কোন কোন সেন গৌতম-গোত্রীয় হইতে পারে। বাঙ্গালায় যেমন সেন-উপাধিক বৈদ্যদিগের ধন্বন্তরি, শক্তি, বৈশ্বানর প্রভৃতি আট গোত্র, গয়াতেও ঐরূপ একাধিক গোত্র আছে। এইজন্যই অধ্যাপক মহাশয় কৌশিক সেনকে দেখিয়াছেন, কালীবাবু গৌতম সেনকে দেখিয়াছেন। আইনজ্ঞ কালীবাবু এক আইন সর্ব্বত্র খাটাইতে গিয়া এই গলতি করিয়াছেন!

(৫) আদিশূর ও সেনরাজগণের ব্রাহ্মণত্ব

বৈদ্যগণের ব্রাহ্মণত্বের প্রমাণ। আদিশূর ও সেন-রাজগণ ব্রাহ্মণ কারণ, —

(ক) তাঁহারা বৌদ্ধধর্ম্মের উচ্ছেদ করিয়া বৈদিক ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ভিন্ন অন্য যে কোন জাতির পক্ষে বৌদ্ধধর্ম্মই সুবিধাজনক, অতএব রাজা অন্যজাতীয় হইলে বৈদিক ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করিতেন না। অথচ ঐ রাজারা ক্ষত্রিয় ছিলেন না, ইহা কালীবাবু বলিয়াছেন (বৈদ্য, পৃষ্ঠা ২৫)।

(খ) 'রাজন্যধর্ম্মাশ্রয়ঃ' 'ক্ষত্রচারিত্র্যচর্য্যা', প্রভৃতি শব্দ হইতেও বুঝা যায় যে ঐ রাজারা ক্ষত্রিয় ছিলেন না। কিন্তু শাস্ত্রানুসারে নিম্নবর্ণীয় ব্যক্তির পক্ষে উচ্চ বর্ণের বৃত্তি নিষিদ্ধ (মনু ১০।৯৫)। অতএব তাঁহারা উচ্চবর্ণীয় অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহারা ক্ষত্রিয়ত্বের ভান করেন নাই।

(গ) অক্ষত্রিয় রাজা হইলে, কান্যকুব্জ হইতে আগত ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের প্রদত্ত ভূমি, বিত্ত, অন্ন গ্রহণ করিতে পারিতেন না। কারণ 'ঘোর স্তস্য প্রতিগ্রহঃ', ঐরূপ রাজা দশ হাজার 'কসাই'য়ের তুল্য (মনু, ৪।৮৬)।

(ঘ) বেদবিৎ ব্রাহ্মণ সমস্ত জগতের রাজা হইবার উপযুক্ত। "সৈনাপত্যঞ্চ রাজ্যং চ দণ্ডনেতৃত্বম্ এব চ। সর্ব্বলোকাধিপত্যং চ বেদশাস্ত্রবিদর্হতি॥" (মনু, ১২।১০০) ক্ষত্রিয় ত জন্মতঃ এ সকল কার্য্যের অধিকারী, ব্রাহ্মণই জন্মতঃ এইগুলিতে অধিকারী নহেন। কিন্তু যদি তিনি বেদবিৎ হন তবে এ সকল কার্য্যই তিনি সহজভাবে করিতে পারেন, তাঁহার পক্ষে ইহা আপদ্ধর্ম্মের ব্যবস্থা নহে। দ্বারভাঙ্গার রাজা এইরূপ ব্রাহ্মণ রাজা, এবং ভারতবর্ষের গুরুস্বরূপ। অন্যথা আপদ্ধর্ম্মকে সহজ ধর্ম্ম করায় তিনি পতিত হইতেন। প্রাচীনকালে সেন রাজগণের

এই গৌরব ছিল, কিন্তু হতভাগ্য আমরা আজ তাঁহাদের ও আমাদের জাতিতত্ত্বই বিদিত নহি!

(ঙ) ক্ষত্রিয়ত্বের ভান করিলে ক্ষত্রিয় বলিয়াই পরিচয় দিতে হইত, রাজন্য-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছি, "ক্ষত্রিয়ের ন্যায় আচরণ করিতেছি" এরূপ বলা হইত না! 'ব্রহ্মক্ষত্রিয়' পদ আরও পরিস্ফুট। উহা হইতে তাঁহারা যে ব্রাহ্মণ হইয়াও ক্ষত্রিয়বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন, ইহাই জানা যায়।

(চ) 'চন্দ্রবংশীয়' বলায় কালীবাবু লিখিতেছেন—"চন্দ্রবংশীয় রাজাগণ সকলেই ক্ষত্রিয় ছিলেন। বল্লাল সেন অম্বষ্ঠ বৈদ্য জাতি হইয়াও যদি কখন চন্দ্রবংশীয় বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন, তাহা **সম্পূর্ণ ভ্রান্তি বিজৃম্ভিত** বই আর কি বলিব? প্রবোধনীর মতে বল্লাল ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাহা হইলে "চন্দ্রবংশীয় কথাটা **খাপ খায় না**।" (পৃষ্ঠা, ২৩)।

অর্থাৎ সেন রাজগণ নিজেদের জাতি ভুলিয়া গিয়াছিলেন, তাই এই ভ্রান্তি! কালীবাবু পরের মুখে যা তা শুনিয়া নিজের জাতি নির্ণয় করিতেছেন, এবং তাহাকে সত্য ভাবিয়া সেনরাজগণের উক্তিকে 'মিথ্যা' বলিতেছেন! চন্দ্রবংশে কত ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন, তাহা পুরাণ পাঠ করিলেই কালীবাবু দেখিতে পাইতেন! অত্রি, অত্রির পুত্র চন্দ্র ও তৎপুত্র বুধ সকলেই যে ব্রাহ্মণ বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছেন। চন্দ্র যে 'দ্বিজরাজঃ', 'রাজা ব্রাহ্মণানাম্'—এ রাজা যে ব্রাহ্মণজাতীয় রাজা! ইঁন যে "ন-ক্ষত্র-পতি"! সাধারণ ক্ষত্রিয়েরা ত ব্রহ্মার বাহু হইতে নিঃসৃত হইয়াছিলেন। কিন্তু ব্রহ্মার মুখমণ্ডলস্থিত চন্দ্র ও সূর্য্য স্থানীয় দুই চক্ষু হইতে যে সকল ব্রাহ্মণেরা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই ব্রহ্মর্ষি ব্রাহ্মণদের বংশে জাত হইয়াও যাঁহারা ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারাই চন্দ্রবংশীয় ও সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়। ইহারা ক্ষত্রিয় হইয়া

ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম পালন করিতে থাকিলেও সাধারণ ক্ষত্রিয় নহেন, ইহা জানাইবার জন্যই চন্দ্র ও সূর্য্যবংশের নামে ইহারা পরিচয় দিতেন। এই জন্য 'বৈয়াঘ্রপদ্যগোত্রায় সাঙ্কৃতিপ্রবরায় চ' মন্ত্রে চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় ভীষ্মদেবের নিজস্ব গোত্র উল্লিখিত দেখা যায়। কারণ ব্যাঘ্রপাদ ও সাঙ্কৃতি তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ। কিন্তু তাই বলিয়া চন্দ্র ও সূর্য্যের বংশে সকলেই ক্ষত্রিয় হইয়া গিয়াছিল, এ কথাও সত্য নহে। চন্দ্রবংশীয় ব্রাহ্মণেরা যাঁহারা অতি প্রাচীনকালে ক্ষত্রিয় আচার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা "চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়" বলিয়াই বিদিত এবং ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম মানিয়া চলিতে বাধ্য হইতেন। যাঁহারা অর্ব্বাচীন কালে ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারাই আপনাদিগের প্রাচীনতর বংশকাহিনী স্মরণ করিয়া আপনাদিগকে 'চন্দ্রবংশীয়' রাজন্যধর্ম্মাশ্রয়ী ব্রাহ্মণ বা 'ব্রহ্মক্ষত্র' বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।

চন্দ্রের ও সূর্য্যের সন্তানেরা মূলতঃ ক্ষত্রিয় (ব্রাহ্মণ নহে), সুতরাং তদ্বংশীয়েরা ক্ষত্রিয়, এরূপ স্বীকার করিলেও 'চন্দ্রবংশীয়' বা 'সূর্য্যবংশীয়' বলিলে ক্ষত্রিয় হইতে হইবে এরূপ ধারণা ভ্রান্ত। বিশ্বামিত্র সূর্য্যবংশীয় রাজা। তিনি ব্রাহ্মণ হইলে তদ্বংশজাত বিশ্বামিত্র-গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ এবং পুরাণের অন্যান্য সূর্য্যবংশীয় ও চন্দ্রবংশীয় বহু রাজা ব্রাহ্মণত্বলাভ করিয়া যে সকল নূতন নূতন ব্রাহ্মণধারার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাঁহারা কি চন্দ্রবংশীয় বা সূর্য্যবংশীয় নহেন? তবে বল্লালাদি ব্রাহ্মণরাজা যে ব্রহ্মক্ষত্র ও চন্দ্রবংশীয় বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, তাহা ত 'ভ্রান্তিবিজৃম্ভিত' নহে! তাহাই তাঁহাদের প্রকৃত বংশ বিবরণ। ভ্রান্তি কালীবাবুর!

সুশ্রুত সংহিতার টীকায় এক স্থলে ডল্লনাচার্য্য লিখিতেছেন—"নগরীবর-মথুরা-সমীপে অঙ্কোলানামকং বৈদ্যস্থানম্ অস্তি, যত্র **সৌর-বংশজা ব্রাহ্মণা** সমস্তভূমিপতিমান্যা অশ্বিনীকুমারসমানাঃ পার্ব্বণচন্দ্ররুচিযশঃ প্রসাধিতদিঙ্মণ্ডলা বৈদ্যাশ্চ অভুবন্। তদন্বয়ে গোবিন্দ-

নামা চিকিৎসকশিরোমণি রভূৎ। ততস্তৎপুত্রো ভিষক্‌শিরোমুকুটমণিঃ জয়পালঃ সমজনি।”

এখানে **সূর্য্যবংশীয় ব্রাহ্মণদের** কথা রহিয়াছে। তাঁহাদের কিরূপ প্রতিষ্ঠা তাহাও দেখুন এবং তাঁহারা যে ভিষক্, চিকিৎসক ও বৈদ্য শব্দ দ্বারা অভিহিত হইয়াছেন, তাহাও দেখা যাইতেছে। সূর্য্য যে আয়ুর্ব্বেদ-সংহিতা রচনা করিয়াছিলেন, তাহা শাস্ত্র বলিতেছে। কালীবাবু শাস্ত্রবিশ্বাসী। তিনি কুলার্ণব তন্ত্রের পঞ্চদশোল্লাসে দেখিবেন—

“বিচিন্ত্য তেষামর্থং চৈবায়ুর্ব্বেদং চকার সঃ।
কৃত্বা তু পরমং বেদং ভাস্করায় দদৌ বিভুঃ।
স্ব-তন্ত্রসংহিতাং তস্মাৎ ভাস্করশ্চ চকার সঃ।
ভাস্করশ্চ স্বশিষ্যেভ্য আয়ুর্ব্বেদং স্বসংহিতাম্।
প্রদদৌ পাঠয়ামাস তে চক্রুঃ সংহিতাস্ততঃ ?”

এই ভাস্করসংহিতার বিবরণ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন শর্ম্মা সরস্বতী প্রণীত ‘প্রত্যক্ষ-শারীরম্’ গ্রন্থের প্রারম্ভেও আছে। ঋগ্বেদে দৃষ্ট হয়, প্রস্কন্ন মুনি সূর্য্যকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহার কৃপায় আরোগ্য লাভ করিয়াছিলেন। শাম্বও সূর্য্য স্তব করিয়া কুষ্ঠরোগ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। সূর্য্য-পূজা দ্বারা ব্যাধি আরোগ্য হয়, ইহা সর্ব্বজন-প্রসিদ্ধ। অধিকন্তু ভাস্করের আয়ুর্ব্বেদ অধ্যাপনার কথা উপরে বলা হইয়াছে। তবে চন্দ্রবংশীয় ও সূর্য্যবংশীয় যে সকল ব্রাহ্মণের বংশে আয়ুর্ব্বেদ চিরকাল অনুশীলিত হইতেছে, তাঁহারা আপনাদিগকে সূর্য্য-বংশীয় বা চন্দ্রবংশীয় ব্রাহ্মণ বা বৈদ্য বলিয়া পরিচয় দিলে সেরূপ পরিচয় “ভ্রান্তি বিজৃম্ভিত” বলা নিতান্ত অজ্ঞতার ও বাচালতার পরিচায়ক বলিতে হয়।

(ছ) সেনরাজগণ ২৫০ বারেন্দ্র ব্রাহ্মণকে ভ্রষ্টাচার জানিয়া দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন, গুণবান্ ব্রাহ্মণদিগকে কৌলীন্য দিয়াছিলেন, পুনশ্চ নিগুর্ণ দেখিলে কৌলীন্য কাড়িয়া লইয়াছিলেন, ইহা তাঁহাদের ব্রাহ্মণ সমাজপতিত্বের পরিচায়ক। কোন অব্রাহ্মণের পক্ষে ব্রাহ্মণ সমাজকে এরূপ শাসন করার কথা কেহ শুনিয়াছেন কি ?

(জ) বল্লাল প্রভৃতি কর্ত্তৃক 'দানসাগর', 'অদ্ভুতসাগর' প্রভৃতি স্মৃতি গ্রন্থের রচনা হইতেও তাঁহাদের ব্রাহ্মণত্ব বুঝা যায়, কারণ অব্রাহ্মণ স্মৃতি গ্রন্থ রচনা করিতে পারে না। বল্লালরচিত স্মৃতিনিবন্ধের প্রামাণ্য স্মৃতিসম্রাট রঘুনন্দন ও অন্যান্য পশ্চিম দেশীয় পণ্ডিত স্বীকার করিয়াছেন।

(ঝ) 'ক্ষ্মাপালনারায়ণ', 'শ্রুতিনিয়মগুরু', 'বিশ্ববন্দ্য', 'ব্রহ্মবাদী' প্রভৃতি বিশেষণ হইতেও বুঝা যায় যে, সেনরাজগণ অব্রাহ্মণ ছিলেন না।

(ঞ) সেনরাজগণের নামান্তে 'দেব' শব্দ ব্যবহার সত্যই ব্রাহ্মণত্বের পরিচায়ক। একথা ঠিক যে, 'দেব' শব্দ আর্য্যত্বের বোধক এবং সেই জন্য দ্বিজা স্ত্রীর নামান্তে 'দেবী' শব্দ ব্যবহৃত হয়। কিন্তু 'দেব' শব্দ দ্বারা কোন্ বর্ণের আর্য্য তাহা বুঝা যায় না বলিয়া বৈশ্যগণ 'দেবভূতি' বা 'দেবগুপ্ত', ক্ষত্রিয়গণ 'দেববর্ম্মা' ও ব্রাহ্মণগণ 'দেবশর্ম্মা' বা শর্ম্মা বলিয়া থাকেন। আবার দ্বিজ শব্দ যেমন তিন বর্ণের বাচক হইলেও সাধারণতঃ 'ব্রাহ্মণ' অর্থেই ব্যবহৃত হয়, তদ্রূপ 'দেব' শব্দ দ্বারাও কেবল ব্রাহ্মণকেই বুঝান হইত। এই জন্য বিধি আছে, 'দেবঃ শর্ম্মা চ বিপ্রস্য'। আবার "দেবপূর্ব্বং নরাখ্যং হি শর্ম্মবর্ম্মাদিসংযুতম্" এরূপ বিধানও রহিয়াছে। পণ্ডিতদিগের অভিমত দুই রূপ—ব্রাহ্মণ নামান্তে দেবশর্ম্মা বলিবেন, অথবা দেব বা শর্ম্মা যাহা ইচ্ছা ব্যবহার করিবেন। বস্তুতঃ দেবশর্ম্মা ও শর্ম্মা দুই-ই যখন প্রচলিত রহিয়াছে, তখন 'দেব'ও কোন কোন স্থানে প্রচলিত আছে বা ছিল। সুতরাং নামান্তে 'দেব' শব্দ দেখিয়াই

তাহাকে নরপতিত্ব বাচক মনে করা উচিত নহে। বিশেষতঃ যদি নৃপতি, রাজন্, নরপতি প্রভৃতি শব্দ ঐ সঙ্গেই বিশেষণ রূপে থাকে, তাহা হইলে 'দেব' শব্দের পুনশ্চ 'নৃপ' অর্থ কল্পনা সমীচীন নহে। আর 'দেববৎ পূজ্য' এই অর্থে 'দেব' এরূপ তর্ক করিলেও বলা যাইতে পারে যে, বাঙ্গালায় ঐ অর্থে 'ঠাকুর' শব্দ ব্রাহ্মণেই প্রযোজ্য হয়, সুতরাং উহা ব্রাহ্মণত্বেরই বাচক। এক্ষণে দেখা যাক্, সেনরাজগণ 'দেব' শব্দ নৃপার্থে ব্যবহার করিয়াছেন, কি নৃপ বা নৃপবাচক অন্য শব্দের সহিত ব্রাহ্মণ অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। আমরা অন্য তাম্র ফলকাদির অনুসন্ধানে যাইব না। কালীবাবু যাহা প্রামাণিক বলিয়া (॥৶০—১৲) ৬ পৃষ্ঠা উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতেই দেখা যায়—'পরম-ভট্টারক-মহারাজাধিরাজ-শ্রীবল্লাল-সেন-**দেব**পাদানুধ্যাত' দুইবার আছে। এস্থলে 'ভট্টারক', 'মহারাজ', 'অধিরাজ' সবই বলা হইয়াছে। সুতরাং নামান্তে "রাজা ভট্টারকো দেবঃ" এই অর্থে দেব বলিবার অবকাশ নাই! অপিচ রাজা নিজের জাতি বলেন নাই বলিয়া যে 'চার্জ্জ' আনা হয়, তাহা ত এই 'দেব' শব্দকে ব্রাহ্মণবাচক মনে করিলেই 'ডিস্‌মিস্' হইয়া যায়। স্মৃতি গ্রন্থ প্রণেতা রাজা কি এমনই বোকা ছিলেন যে, সঙ্কল্পের সময়ে ব্রাহ্মণেরা নামান্তে 'শর্ম্মা' বলে, ক্ষত্রিয়েরা 'বর্ম্মা' বলে, বৈশ্যেরা 'গুপ্ত' বলে, শূদ্রেরা 'দাস' বলে, ইহা রাজ্যের সর্ব্বত্র দেখিয়াও তিনি নামান্তে বর্ণপরিচায়ক কোন শব্দই ব্যবহার করিলেন না? 'শ্রীমান্ লক্ষ্মণসেন-দেবনৃপতিঃ' অনেক স্থলে আছে (সত্যেন্দ্র বাবুর বৈদ্যপ্রতিবোধিনী ২য় পৃষ্ঠা)।

কালীবাবু লিখিয়াছেন, "আসামে কোচবংশীয় রাজগণ অদ্যাপি 'দেব' শব্দ ব্যবহার করিতেছেন।" কিন্তু তাহাতে আমাদের কি? উহারা 'দেব' ছাড়িয়া 'শর্ম্মা' ব্যবহার করুক না।

(ট) কালীবাবু লিখিয়াছেন, "বৈদ্য উমেশচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্ন বল্লাল-মোহমুদ্গর নামে একখানি ৫৫২ পৃষ্ঠার গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

বল্লাল যে অম্বষ্ঠ বৈদ্য তাহাই তাঁহার প্রতিপাদ্য ছিল।” (বৈদ্য পৃষ্ঠা ২৬)

কিন্তু কালাবাবু বৈদ্যপুস্তকের অন্যত্র লিখিয়াছেন, “অম্বষ্ঠগণ বৈশ্যাজাত হইলেও তাহারা আচারাদিতে ব্রাহ্মণসদৃশ ও গৌণব্রাহ্মণ ইহাই তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল” (১২ পৃঃ)। বিদ্যারত্ন মহাশয় প্রতিপাদন করিয়াছিলেন যে, অম্বষ্ঠগণ ব্রাহ্মণ।

অতএব দুইটী বচন একত্র করিলে বুঝা যায় যে উমেশ চন্দ্রের মতে সেন রাজগণ ব্রাহ্মণ ছিলেন। শেষ বয়সে বিদ্যারত্ন মহাশয় বুঝিয়াছিলেন যে, অম্বষ্ঠ ও বৈদ্য এক বস্তু নহে এবং বঙ্গীয় বৈদ্যগণ সনাতন বৈদ্যকুলজ ব্রাহ্মণ, অম্বষ্ঠ নহে। অতএব তাঁহার পরিবর্ত্তিত মত অনুসারে সেন রাজগণও সনাতন বৈদ্যকুলজ ব্রাহ্মণ, অম্বষ্ঠ নহে। তিনি আমাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার পুস্তকের নূতন সংস্করণে প্রয়োজন মত পরিবর্ত্তন করিয়া দিবেন। [আমরা তাঁহার মতানুসারেই চলিতেছি।]

(ঠ) পৃথিবীপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ভাণ্ডারকর ও ভিন্সেণ্ট স্মিথ বলেন যে, সেনরাজগণ দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণ ছিলেন, দক্ষিণ হইতে বঙ্গে আগমন করেন।

(ড) ‘ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব’ গ্রন্থে হলায়ুধ বলিতেছেন যে, রাজা লক্ষ্মণসেনের অনুরোধে তিনি ঐ পুস্তকখানি কাণ্বশাখী যজুর্ব্বেদীয় ব্রাহ্মণদিগের জন্য রচনা করিলেন। রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের মধ্যে কাণ্বশাখী যজুর্ব্বেদীয় ব্রাহ্মণ নাই, বৈদিক ব্রাহ্মণদের মধ্যে আছে। কিন্তু এই বৈদিকেরা মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের সময়ে আসেন নাই। তবে, যে বৈদ্যগণ কাণ্বশাখী যজুর্ব্বেদী বলিয়া চিরকাল প্রসিদ্ধ, তাহারাই যে ‘ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্বে’ কাণ্বশাখী যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণ বলিয়া লক্ষিত হইয়াছে এবং রাজার ও রাজার স্বজাতীয় ব্রাহ্মণদের জন্য যে রাজাদেশে ঐ পুস্তক রচিত হইয়াছিল তাহা

বুঝা যাইতেছে। তখন ঐ পুস্তকের নাম 'বৈদ্যসর্ব্বস্ব' না হইয়া ব্রাহ্মণ-সর্ব্বস্ব হওয়ায় বেশ বুঝা যায় বৈদ্যগণ তখন ব্রাহ্মণবর্ণ বলিয়াই বিদিত ছিলেন এবং বঙ্গে তাঁহাদের সংখ্যাই অধিক ছিল।

৬। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে বৈদ্যগণের ব্রাহ্মণ-পরিচয় ব্রাহ্মণত্বের প্রমাণ। পূর্ব্বে ৮৮ পৃষ্ঠায় মুরারি গুপ্ত সম্বন্ধে—

(ক) "**প্রতিগ্রহ নাহি করে** না লয় কারো ধন" ইত্যাদি বলা হইয়াছে।

(খ) ঘনরাম প্রণীত শ্রীধর্ম্ম মঙ্গলে ১৭১০ খৃঃ দেখিতে পাই—

"স্বধর্ম্ম মণ্ডিত বিধর্ম্ম খণ্ডিত
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বৈদ্য॥
সমাদরে তস্য বৈসে ক্ষত্র বৈশ্য
ধন্য ধরা ধর্ম্মপাল।"

নগর পত্তন হইতেছে। কাহাকে কিরূপ বসান হইল, তাহাই বলা হইতেছে।

(গ) **মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর চণ্ডীকাব্যে** (প্রায় তিন শত বর্ষ পূর্ব্বে)—

বৈদ্যজনের তত্ত্ব গুপ্ত সেন দাস দত্ত
কর আদি বৈসে কুলস্থান।

* * * * * *

উঠিয়া প্রাতঃকালে **উর্দ্ধফোঁটা করি ভালে**
বসন মণ্ডিত করি শিরে॥ ইত্যাদি

(ঘ) জয়ানন্দ চক্রবর্ত্তীর চৈতন্য মঙ্গলে—

বৈদ্য ব্রাহ্মণ যত নবদ্বীপে বৈসে।
নানা মহোৎসব করে মনের হরষে॥

এখানে অন্য জাতির কথা বলা হইল না। সমাজে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কথাই বলা হইতেছে।

(ঙ) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদি লীলার একাদশ পরিচ্ছেদে রহিয়াছে—

"রঘুনাথ বৈদ্য **উপাধ্যায়** মহাশয়।
যাঁহার দর্শনে কৃষ্ণে প্রেম ভক্তি হয়॥

(চ) চৈতন্য ভাগবতে শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর লিখিয়াছেন—

রঘুনাথ বৈদ্য **উপাধ্যায়** মহামতি।
যাঁর দৃষ্টিপাতে কৃষ্ণে হয় রতি মতি॥

(ছ) শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত-লেখক কবিরাজ গোস্বামী সম্বন্ধে এইরূপ আছে—

রাঢ়ে জন্ম যার কৃষ্ণদাস **দ্বিজবর**।
শ্রীনিত্যানন্দের তিঁহো পরম কিঙ্কর।

(জ) চৈতন্য ভাগবতে—

রাঢ়ে জন্ম মহাশয় **বিপ্র** কৃষ্ণদাস।
নিত্যানন্দ পারিষদে যাঁহার বিকাশ॥

(ঝ) কবি গোপীনাথ দত্তের "দত্তবংশাবলী" হইতে পূর্ব্বেই উদ্ধৃত হইয়াছে। ৭৮ পৃষ্ঠা দেখ।

(ঞ) বৈদ্য বিজয় গুপ্তের মনসা মঙ্গলে—(ফুল্লশ্রী গ্রামের বর্ণনায়)

"চারিবেদাধ্যায়ী তথা ব্রাহ্মণ সকল।
বৈদ্যজাতি নিজশাস্ত্রে অতীব কুশল॥"

ইহা পতিতসাবিত্রীক বৈদ্যদিগের বর্ণনা। তথাপি ঐ দেশে অপর ব্রাহ্মণেরা আয়ুর্ব্বেদ হস্তগত করিতে পারে নাই!

(ট) ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরেও ব্রাহ্মণদের পরেই বৈদ্যদিগের কথা

আছে। বৈদ্য **মহেশ্বরাচার্য্য, 'বিপ্র'** বৈদ্য বোপদেব গোস্বামী কবিরাজ, জয়দেব গোস্বামী কবিরাজ, ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রসিদ্ধ কবিরাজ বিশ্বনাথ ও কবিরাজ কৃষ্ণদাস—ইঁহাদের **ব্রাহ্মণ** বলিয়া প্রসিদ্ধি থাকায় প্রাচীন কবিরাজগণ বা সমস্ত বৈদ্যগণ যে ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাহা বুঝা যায়। যে যে স্থলে বৈদ্যকে ব্রাহ্মণের সহিত সগৌরবে উল্লিখিত না করিয়া ক্ষত্রিয়-বৈশ্যের সঙ্গে বা তাঁহাদের পরে উল্লিখিত করা হইয়াছে, সেখানে বুঝিতে হইবে যে, উপবীত-ত্যাগী বৈদ্যের কথা হইতেছে। রাঢ়ীয় বৈদ্যগণ বৈশ্যাচার গ্রহণের পূর্ব্বে 'বিপ্র' ও 'দ্বিজবর' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, এবং পরেও দ্বিজ বলিয়া বৈশ্যত্বের প্রতিবাদ করিয়াছেন, যথা, 'দ্বিজ রামপ্রসাদ'।

(৭) **বৈদ্যগণ ব্রহ্মত্রা ভূমি পাইতেন। ইহাও ব্রাহ্মণত্বের প্রমাণ।** ইহার উদাহরণ, বৈদ্য প্রবোধনীতে দেওয়া হইয়াছে (পৃঃ ১৬)। প্রাচীন উদাহরণ পীতবাস গুপ্তশর্ম্মা ও শ্রীকৃষ্ণ ধর-দেবশর্ম্মা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। কালীবাবু পীতবাসকে উড়াইতে গিয়া যে অশ্লীলতা করিয়াছেন, তাহাও (৯৫ পৃষ্ঠা) দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট হইতে সাধকপ্রবর রামপ্রসাদ সেন ব্রহ্মত্রা ভূমি প্রাপ্ত হন। একজন কায়স্থ জমিদার প্রিন্সিপাল বিপিনবিহারী গুপ্ত মহাশয়ের বৃদ্ধ প্রপিতামহ ৺নন্দরাম গুপ্ত মহাশয়কে ১০১ বিঘা জমি ব্রহ্মত্রা করিয়া দিতে চাহিলে, উহা বহু ভূমি বলিয়া তিনি লইতে রাজি হন নাই, পরে ১০০ বিঘা জমি কবিরাজ মহাশয়ের গৃহ-বিগ্রহের সেবার জন্য দান করিয়া এক বিঘা মাত্র সেবাইত স্বরূপে কবিরাজ মহাশয়কে দান করেন। দানপত্রে ব্রহ্মত্রা লেখাসত্ত্বেও এবং 'বিধিবৎ উদকপূর্ব্বকং কৃত্বা' ইহা তাম্রশাসনে লেখা থাকিলেও ঐ দান 'ব্রহ্মত্রা' নহে, 'চাক্‌রান্' মাত্র এরূপ মনে করা নিতান্ত হীনচিত্ত ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব।

(৮) বৈদ্যগণের মধ্যে পাঁড়ে, মিশ্র, চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি কৌলিক পদবী ও মহামহোপাধ্যায়, বাচস্পতি, শিরোমণি প্রভৃতি বিদ্যাগত উপাধি তাহাদের ব্রাহ্মণত্বের প্রমাণ। কালীবাবু বলেন, এই সকল উপাধির "একটিও ব্রাহ্মণের জাতীয় উপাধি নহে। **শাস্ত্রানুসারে** ব্রাহ্মণের শর্ম্মা, ক্ষত্রিয়ের বর্ম্মা, বৈশ্যের গুপ্ত ও শূদ্রের দাস জাতীয় উপাধি।" (পৃষ্ঠা ৩৮)

এখানে সহসা 'শাস্ত্রানুসারে' কথাটা বসান হইল কেন? মুখোপাধ্যায়. বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কি রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের জাতীয় উপাধি নহে? পাঁড়ে, মিশ্র, চক্রবর্ত্তী কি বিস্তীর্ণ ভারত ক্ষেত্রে কোন ক্ষত্রিয়ের বা বৈশ্যের কৌলিক উপাধি? জল দিবার জন্য যে **ব্রাহ্মণ** ষ্টেশনে নিযুক্ত থাকে, সেও 'পাণি-**পাঁড়ে**'; দেববিগ্রহের সেবাইতরূপে সে **'পাণ্ডা'**, বিদ্বৎসভায় সে 'পণ্ডিত'। বাঙ্গালার রাঢ়ী মহাশয়দিগের কান্যকুব্জে অবস্থিতিকালে হয় ত ঐ সকল উপাধিই জাতীয় উপাধিরূপে ব্যবহৃত হইত, বঙ্গে আসিবার পর তাহা পাগড়ির সহিত অদৃশ্য হইলে নূতন উপাধি সৃষ্টি করিতে হইয়াছিল। যাহা হউক, এ সকল পদবী বা উপাধি ব্রাহ্মণ ভিন্ন অব্রাহ্মণকে কখন বুঝায় না; মহামহোপাধ্যায়াদি উপাধিও বাঙ্গালার বাহিরে কখন কোন অব্রাহ্মণ ধারণ করে নাই। তবে বাঙ্গালায় তাহার ব্যতিক্রম হইবে কেন? মুখোপাধ্যায় ইত্যাদি বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের জাতীয় উপাধি, চক্রবর্ত্তীও তাহাই, ওঝা মৈথিলী ব্রাহ্মণের জাতীয় উপাধি, মিশ্রও পশ্চিমা ব্রাহ্মণের জাতীয় উপাধি।

শ্রীযুক্ত কালীবাবু ৩৯ পৃষ্ঠায় বলিতেছেন, "বৈদ্যগণ দ্বিজাতি এবং শাস্ত্রে অধিকারী ছিলেন, কাজেই পণ্ডিত বৈদ্যের পক্ষে ঐ সকল (মহামহোপাধ্যায়, বাচস্পতি, শিরোমণি ইত্যাদি) উপাধি ধারণ করা বিচিত্র নহে।" শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র বাবুও এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। অব্রাহ্মণেরাও এই সকল উপাধি ধারণ করিতে সমর্থ, এই ধারণাই

অতীব বিচিত্র! এরূপ বদ্ধমূল ধারণা থাকিলে বৈদ্যপ্রবোধনীর ভুল ধরা সহজ হয়!

অতঃপর কালীবাবু লিখিতেছেন, "পণ্ডিতাগ্রগণ্য দ্বারিকানাথ সেন ও বিজয়রত্ন সেন গভর্ণমেণ্ট হইতে মহোমহোপাধ্যায় উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, **কিন্তু তাঁহারা কখনও শর্ম্মা লিখিয়া ব্রাহ্মণত্বের ভান করেন নাই।** গভর্ণমেণ্ট এখন মহা-মহোপাধ্যায় উপাধির জন্য একটি বৃত্তি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। **ঐ বৃত্তি ব্রাহ্মণগণের প্রাপ্য হওয়া উচিত, উহার প্রতি আমাদের লোভ সংবরণ করাই শ্রেয়ঃ।** ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ সমাজের ও শাস্ত্রের রক্ষক; হিন্দু রাজগণ তাঁহাদের রক্ষার বিধান করিতেন। সমাজও শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়ায় বিদায় ও বৃত্তি আদির দ্বারা এতকাল ব্রাহ্মণ জাতির রক্ষার বিধান করিতেছিলেন। **বৈদ্য পণ্ডিতগণ কখনও ঐরূপ বৃত্তি পান নাই।** তখন তাঁহাদের **মহামহোপাধ্যায় বৃত্তি নিয়া ব্রাহ্মণগণ সহ কলহ সৃষ্টি করা সুবুদ্ধির পরিচায়ক নহে।"** (পৃষ্ঠা, ৩৯)

এরূপ কথা যে একজন বৈদ্য লিখিতে পারেন, তাহা আমরা স্বপ্নেও ভাবি নাই। যে চিরন্তন বিদ্যা গৌরবের জন্য বৈদ্য সম্প্রদায় বিখ্যাত, সেই বিদ্যা গৌরবকে বিসর্জ্জন না দিলে যে অধঃপতনের চরম হয় না! কোথায় বহু সংখ্যক মহামহোপাধ্যায় হইয়া কিসে জাতীয় মান-মর্য্যাদার বৃদ্ধি হয়, তাহার চেষ্টা করিতে উপদেশ দিবেন, যে সকল সদাচার বিলুপ্ত হইতেছে, তাহাদের পুনরুদ্ধারের পরামর্শ দিবেন, না অম্লান মুখে বলিতেছেন, মহামহোপাধ্যায় বৃত্তি লইয়া ব্রাহ্মণগণ সহ কলহ সৃষ্টি করা সুবুদ্ধির পরিচায়ক নহে! দেশের যে উচ্চ রাজপদগুলি শ্বেত-ব্রাহ্মণদের হস্তে আছে তাহাতে ভাগ বসাইবার চেষ্টাও এ

দেশবাসীর পক্ষে সুবুদ্ধির পরিচায়ক নহে! স্বরাজের কথা কহিয়া ইংরাজের সহিত কলহ সৃষ্টি করাও সুবুদ্ধির পরিচায়ক নহে! খয়ের-খাঁই লোকেরা এরূপ বলিয়া থাকেন বটে, কিন্তু রায়-বাহাদুর ও গভর্ণমেণ্ট প্লীডার হইয়াও শ্রীযুক্ত ধর্ম্মভূষণ মহাশয় এরূপ বিসদৃশ কথা বলিয়াছেন বলিয়া আমরা শুনি নাই। তবে আজ বৈদ্যের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে একি কথা তাঁহার মুখ হইতে শুনিতেছি? তিনিই ত বৈদ্য পুস্তকের ২য় পৃষ্ঠায় কত বৈদ্য মহামহোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। এ সকল উপাধি ত ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ লইয়া গঠিত বঙ্গসমাজ চিরকাল অনুমোদন করিয়া আসিতেছে। শত শত বৈদ্য মহামহোপাধ্যায় বাঙ্গালায় সংস্কৃত বিদ্যা ও ব্রাহ্মণের গৌরব বর্দ্ধিত করিয়া জন্মভূমিকে ভারতবর্ষের শীর্ষস্থানীয় করিয়াছেন, শিক্ষার প্রভাবে বাঙ্গালী মাত্রকেই যেন ব্রাহ্মণ্যগৌরবে মণ্ডিত করিয়াছেন! আজ ধর্ম্মভূষণ মহাশয় দেশের এই গৌরবে স্বজাতির কতটা হাত ছিল, তাহা কেমন করিয়া ভুলিলেন? আর, কাহার টাকায় বৃত্তি দেওয়া হয়? একি অন্য শ্রেণীর ব্রাহ্মণকে বঞ্চিত করিয়া বৈদ্য পণ্ডিতগণকে দেওয়া হয়? আয়ুর্ব্বেদে ত অন্য ব্রাহ্মণের অধিকারই নাই। আয়ুর্ব্বিজ্ঞান বৈদ্যের জাতীয় বিদ্যা। সেই বিদ্যার উৎকর্ষ সাধন কে করিবে, পরে? কোন বৈদ্যপণ্ডিত নিজের কৌলিক বিদ্যায় সুপণ্ডিত হইয়া মহামহোপাধ্যায় হইলে বা গভর্ণমেণ্টের টাকায় বৃত্তি পাইলে, নিতান্ত ঈর্ষ্যান্বিত ব অসূয়াপর ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কাহার কি ক্ষতি?

এই প্রসঙ্গে বৈদ্যপণ্ডিতগণ শ্রাদ্ধাদিতে কখন বিদায় বা বৃত্তি আদি পান নাই বলিয়া যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা মিথ্যা। ৭০।৮০ বৎসর পূর্ব্বে এরূপ বিদায় ও বৃত্তি বৈদ্যেরা বহু পাইতেন। তৎপরে দ্যগণ 'বাবু' ও 'চাকুরিয়া' হইতে লাগিলেন, সংস্কৃত চর্চ্চা যেমন কমিতে লাগিল, ব্রাহ্মণের বৃত্তিকে তেমনই 'উঞ্ছবৃত্তি' বলিয়া কুঞ্চিত

নাসিকায় ঘৃণাভরে ত্যাগ করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণেরা সুযোগ বুঝিয়া যজমানদিগকে সুপরামর্শ দিতে লাগিলেন, অন্যান্য অব্রাহ্মণ জাতি ব্রাহ্মণের উত্তেজনায় বৈদ্যের প্রতি একটা বিদ্বেষভাব পোষণ করিতে লাগিল, বৈদ্যের বৃত্তি ও বিদায় অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া গেল। পরে হোমিওপ্যাথি, এলোপ্যাথি, হাকিমি প্রভৃতি বিবিধ চিকিৎসামার্গ সম্মুখে উন্মুক্ত হওয়ায় বৈদ্যের চিকিৎসা-গৌরব একেবারে অস্তমিত প্রায় হইল। যাহা হউক, ভগবৎ-কৃপায় পুনশ্চ আয়ুর্ব্বেদের উত্থানের লক্ষণ দেখিতেছি, **এক্ষণে সঙ্গে সঙ্গে বৈদ্যেরও উত্থান চাই।** এই জাতীয় দুর্দ্দিনেও ব্রাহ্মণপ্রধান শ্রীরামপুরে অপর শ্রেণীর ব্রাহ্মণ গৃহে যেঠেরা পূজায় পদধূলি দিবার জন্য এই ব্যক্তি বারংবার নিমন্ত্রিত হইয়াছে। আমার অঙ্গুষ্ঠ হইতে ভক্তিপূর্ব্বক চরণধূলি লওয়া হইয়াছিল এবং আমাকে পৈতা, পান, সুপারী, চিনি, সন্দেশ সরায় সাজাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। এক বনিয়াদী কায়স্থবাড়ীতে শ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া ভোজন করিবেন বলিয়া শ্রাদ্ধকর্ত্তা সর্ব্বাগ্রে আমাকে ও একটী রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণকে একসঙ্গে ভোজন করাইয়া দক্ষিণা দান পূর্ব্বক অনুমতি লইয়া ভোজন করিয়াছিলেন।

কালীবাবু বৈদ্যপুস্তকের ৫৭ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন—"রাজগণ ভূমি দান করিয়া নানা জাতিকে প্রতিষ্ঠা করিতেন, ইহার বহুল দৃষ্টান্ত বর্ত্তমান আছে। আসামদেশে হিন্দু রাজগণ ব্রাহ্মণেতর জাতিকে সদ্‌গুণের পুরস্কার স্বরূপ অনেক ভূমি দান করিয়াছিলেন। ঐ সকল দান-গ্রহীতার উত্তর পুরুষগণ অদ্যাপি তাহা ভোগ করিতেছে।"

বড়ই পরিতাপের বিষয় যে ধর্ম্মভূষণ মহাশয় ব্রহ্মত্রা ভূমি, চাকরান ভূমি বা বকশিসের কোন পার্থক্য বুঝিতে পারিলেন না। আমরা ৯৩-৯৪ পৃষ্ঠায় পীতবাস গুপ্ত শর্ম্মাকে যে ভূমি দেওয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছি (প্রবোধনীতে এইটী ও অন্যান্য আরও উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে) তাহা

"বিধিবৎ উদকপূর্ব্বকম্" অর্থাৎ যেমন করিয়া ব্রাহ্মণকে দিতে হয়, সেইভাবে দেওয়া হইয়াছে। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের দানপত্রেও ঐরূপ পাঞ্জাসমেত ব্রহ্মত্রা বলিয়া লিখিয়া দেওয়া হইয়াছে, এ সকলকে উড়াইয়া দিবার যো নাই। বৈদ্য চিরদিন অহীনকর্ম্মা অথচ স্বাধীন-বৃত্তিক এবং বিজ্ঞানের ও পাণ্ডিত্যের আধার। তাঁহারা অপর শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের ন্যায় বৃত্তি দ্বারা রাজাদিগের প্রতিপাল্য ছিলেন।

৮। **যাজনবৃত্তিও ব্রাহ্মণ্যের প্রমাণ**।—যাহারা পরের যাজন করে, তাহারা নিজেদের যাজনও করে। যে জাতি নিজেদের যাজন করে সে জাতি ব্রাহ্মণ। (৭৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণ আনয়নের পূর্ব্বে বৈদ্যগণ নিজেদের ক্রিয়া কর্ম্ম নিজেরাই করিতেন। আদিশূরের মত রাজা পুত্রেষ্টি যাগের সময়ে যে মাত্র পাঁচটী ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন, তাহা হইতেই এ সকল কথা বুঝা যায়। ঐ সময়ে দেশময় শিক্ষার ভার তাঁহাদের হাতেই ছিল। এজন্য প্রাচীন-কালে এত বৈদ্যপণ্ডিত ও তাঁহাদের প্রণীত এত সংস্কৃত গ্রন্থ! বৈদ্যপ্রবোধনীতে এই সকল পুস্তকের মধ্যে অনেকগুলির নাম উল্লিখিত হইয়াছে। এই অনন্যসাধারণ বিদ্যালোচনা হইতে বঙ্গে 'কবিরাজ' শব্দ কেবলমাত্র বৈদ্যপক্ষেই প্রযোজ্য হইয়া উঠিয়াছিল। বঙ্গে অপর শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা কবিরাজ উপাধি প্রাপ্ত হন নাই। দেশের সমগ্র সংস্কৃত শিক্ষা যাহাদের হাতে থাকে তাহারা অব্রাহ্মণ হইতে পারে না। ইহারা অম্বষ্ঠ হইলে চিকিৎসা দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিয়া সুখে কালাতিপাত করিতে পারিতেন, আজীবন বিদ্যালোচনা, বিদ্যাদান ও গ্রন্থ রচনা, ইহাতেই অধিকাংশ বৈদ্য আত্মনিয়োগ করিতেন না।

বৈদ্যদিগের গুরুবৃত্তি শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর বহু পূর্ব্ব হইতে। তাঁহাদের অগণিত ব্রাহ্মণ মন্ত্রশিষ্য ছিল। স্বয়ং চৈতন্য দেবও বৈদ্য সন্ন্যাসীর শিষ্য। বৈদ্যদের শাক্ত ও শৈব শিষ্যও যথেষ্ট ছিল। অদ্যাপি রাঢ়ে বৈদ্যের

এরূপ শিষ্যের একান্ত অভাব নাই। তবে বৈশ্যাচার ও শূদ্রাচার গ্রহণের পর হইতে অনেকে পুরোহিত শ্রেণীর হাতে যজমানদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছেন! রাঢ়ে প্রতি গৃহে বৈদ্যই বৈদ্যের আচার্য্য গুরু। বৈদিক দীক্ষা বৈদ্য অবৈদ্য-ব্রাহ্মণের নিকটে গ্রহণ করেন না। কালী-বাবুর পরামর্শ মত মহামহোপাধ্যায় উপাধির ন্যায় এই সকল ব্রাহ্মণ্য-সূচক গৃহাচারের প্রতি আস্থা না থাকিলে, তাহার অভাব আমাদিগকে আরও অব্রাহ্মণ করিয়া তুলিবে।

কালীবাবুর মতে বৈদ্যদিগের গোস্বামী, ঠাকুর প্রভৃতি উপাধি ও গুরুবৃত্তি ব্রাহ্মণত্বের প্রমাণ নহে। তিনি লিখিয়াছেন—

"আসাম প্রদেশে বৈষ্ণবগণের মধ্যে অনেক কায়স্থ ও শূদ্র গুরু আছে। তাঁহাদের হাজার হাজার শিষ্য আছে। কয়েক পুরুষ পরে এই অজুহাতে তাঁহারাও ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিতে পারেন। ঢাকা জেলার ভিতর সানাড়া নামক গ্রামে একটী কায়স্থ পরিবার গোস্বামী ও গুরু বলিয়া সুদীর্ঘকাল সম্মানিত।" (বৈদ্য, পৃঃ ৩৫)।

এস্থলে অনেকগুলি বিষয় দ্রষ্টব্য। প্রথমতঃ, কালীবাবু রাঢ়ের আচার মীমাংসায় আসাম ও পূর্ব্ববঙ্গের কথা তুলিয়াছেন। ইহা ন্যায়সঙ্গত নহে! রাঢ়ে ঐরূপ প্রমাণ দিতে পারিলে আমরা কালীবাবুর কথার সারবত্তা স্বীকার করিতাম। দ্বিতীয়তঃ, আসামে বহু বৈদ্যব্রাহ্মণ ও অন্য ব্রাহ্মণ লিপিবৃত্তিক হইয়া কায়স্থ সমাজে মিশিয়া গিয়াছেন। অতএব ভূতপূর্ব্ব বৈদ্যব্রাহ্মণ বা অন্য শ্রেণীর ব্রাহ্মণদিগের বংশধর বলিয়া তথায় কোন কায়স্থ মহাশয়ের গুরুবৃত্তি অদ্যাপি বিদ্যমান থাকিলে, তাহাতে বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই। খুব সম্ভব সানাড়ার কায়স্থ পরিবার এইরূপ ভূতপূর্ব্ব ব্রাহ্মণ বংশধর। বৈদ্যগণ রাঢ়ে পতিত হইয়া বৈশ্যাচারী হইলেও তাঁহাদের ব্রাহ্মণ শিষ্যগণ তাঁহাদের ত্যাগ করেন নাই। বহু ব্রাহ্মণ বংশ চৈতন্য দেবের বহুপূর্ব্ব হইতেই বৈদ্যদিগের যজমান।

ঐ প্রাচীন বৈদ্যদিগের ব্রাহ্মণাচার ও ব্রাহ্মণ-প্রসিদ্ধি না থাকিলে কান্যকুব্জীয় ব্রাহ্মণসন্তানেরা কখনই সহজে তাঁহাদিগকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিতেন না, এবং ধার্ম্মিক বৈদ্যগণও কখনই বেদ, স্মৃতি ও সদাচার পদতলে দলিত করিয়া গুরুবৃত্তি করিতে সাহসী হইতেন না! তৃতীয়তঃ, আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছি, ঢাকা জেলার যে কায়স্থ গোস্বামীদিগের কথা কালীবাবু বলিয়াছেন, তাঁহাদের একটীও **ব্রাহ্মণ শিষ্য নাই।** * অতএব উপরে অনুমিত দ্বিতীয় কথাটী বলবৎ না হইলেও কালী বাবুর কিছুই সুবিধা হইতেছে না। অর্থাৎ ঐ কায়স্থ পরিবারটী খাঁটী কায়স্থ হইলে ঐ উদাহরণ দ্বারা অব্রাহ্মণের পক্ষে ব্রাহ্মণশিষ্যের গুরু হওয়া সপ্রমাণ হইল না!

কালীবাবু লিখিয়াছেন, "বৈদ্যগণের পৌরোহিত্য কার্য্য করার কোন নিদর্শন নাই। নিজের বাড়ী দুর্গাপূজা কি কালীপূজা করিবার কোন বাধা নাই। চণ্ডীপাঠ সকল দীক্ষিত ব্যক্তিই করিতে পারেন। পুরাণপাঠে সকলজাতির সমান অধিকার শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। তন্ত্র-শাস্ত্রের বিধান মত আগমোক্ত পূজা গুরুর অভাবে যজমান নিজেই করিবে।" (বৈদ্য, পৃঃ ৫৯)।

কালীবাবুর এই কথাগুলি শুনিতে বেশ, কিন্তু কয়টী ব্রাহ্মণকে ইহা স্বীকার করাইতে পারিয়াছেন? শুধু ঐগুলি নয়, নারায়ণ-স্পর্শ, অন্নভোগ ও পক্কান্নে শ্রাদ্ধ করিবার অধিকারও প্রত্যেক বৈশ্যেরই আছে, তবে কালীবাবুর মতে বৈশ্যবর্ণ বৈদ্যের গৃহে এ গুলির অনুমোদন করিতে ব্রাহ্মণের মাথা কাটা যায় কেন? রাজনগরীয় গায়ত্রীর কথা কালীবাবু কি ভুলিয়া গিয়াছেন? কালীবাবুর মত পদস্থ বৈদ্যেরাও শূদ্রোচিত হীনতার সহিত এই অত্যাচার নীরবে সহ্য করেন কেন? রাঢ়ে যে অদ্যাপি গৃহে গৃহে বৈদ্যই বৈদ্যের বৈদিক গুরু বা আচার্য্য!

* ঢাকা-বানারি নিবাসী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাস শর্ম্মা প্রভৃতির নিকটে।

ইহা অপেক্ষা গুরুবৃত্তির অথবা ব্রাহ্মণত্বের আর কি বলবত্তর প্রমাণ আছে ?

(৯) বৈদ্যের নিজস্ব গোত্র ব্রাহ্মণ্যের প্রমাণ।

কালীবাবুর মতে বৈদ্যের আভিজাত্যগর্ব্বের কোন মূল্য নাই। উহা মিথ্যা ; কারণ, আমরা যাহাদিগের সন্তান বলিয়া পরিচয় দিই, আমরা তাহাদিগের সন্তান নয়! আমরা 'মৌদ্গল্য', "ভরদ্বাজ", 'আত্রেয়' প্রভৃতিকে 'বৈদ্য' বলিয়াছি। বৈদ্য শব্দের অর্থ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ। ঐ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের সহিত জাতিহিসাবে আমাদের কোন সম্বন্ধই নাই, কারণ তাঁহারা মুখ্য ব্রাহ্মণ এবং আমরা অম্বষ্ঠবর্ণ বৈদ্য!

কালীবাবু বলিতেছেন—

"প্রবোধনী বলেন –'মৌদ্গল্য, ভরদ্বাজ, আত্রেয়, কৃষ্ণাত্রেয়, কাশ্যপ, কৌশিক প্রভৃতি (বৈদ্যগণের গোত্র প্রবর্ত্তক) মহর্ষিগণও যে বৈদ্য ছিলেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় (চরক সূত্র-২১-২১ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।' ইহার অর্থ কি ? প্রবোধনীর মতে বৈদ্য শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ। সেরূপ স্থলে কেবল এই কয়জন ঋষি কেন, সমস্ত ঋষিগণই বৈদ্য। **আর বৈদ্য অম্বষ্ঠবর্ণ হইলে, ইহাঁরা কেহই যে অম্বষ্ঠ ছিলেন** না, ইহা নিশ্চিত।" (বৈদ্য, পৃষ্ঠা, ৫৯)

কালীবাবু যাহা বলিলেন, তাহারই বা অর্থ কি ? বৈদ্যপ্রবোধনী যে সকল মহর্ষিকে চরকের প্রামাণ্যে বৈদ্যদিগের পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছে, যাঁহাদের কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া বৈদ্যগণ চিরকাল 'তদ্বিদ্যকুলজ' হইয়াছে, তাঁহারা কি আদি বৈদ্য নহেন, তাঁহাদের সন্তানেরাই কি তাঁহাদের গোত্র নামে তত্তদ্গোত্রীয় বৈদ্য বলিয়া পরিচিত নহেন ?

আমি বৈদ্য কেন ? আমার পিতা যে বৈদ্য! পিতা বৈদ্য কেন ?

পিতামহ যে বৈদ্য! এইরূপে দেখিতে পাই, সাধারণ ব্রাহ্মণের ছেলে যেমন হিন্দুসমাজে পুরুষানুক্রমে ব্রাহ্মণ বলিয়া বিদিত হইয়াছে এবং সমাজে ব্রাহ্মণের অধিকার পাইয়াছে, বৈদ্যসন্তানও তদ্রূপ পুরুষানুক্রমে বৈদ্য বলিয়া বিদিত হইয়াছে এবং বৈদ্যবৃত্তি পাইয়াছে। ঐ আদি বৈদ্য ঋষিদের কথা পূর্ব্বে ও পরে উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহাদের যে সকল সন্তান প্রাচীন কাল হইতে আয়ুর্ব্বেদ ত্যাগ করিয়াছিলেন, অথবা যাঁহারা তত্তদ্‌বংশের অবিধি-উৎপাদিত ধারা, তাঁহারাই পিতৃবৃত্তিতে অনধিকার হেতু আয়ুর্ব্বেদকে সপ্তমবৃত্তি (স্বভাবজ কর্ম্ম) রূপে গ্রহণ করিবার গৌরব ও সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। তদীয় বংশধরেরা আজ সাধারণ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বা 'বামুন' বলিয়া বিদিত। এই সকল 'বামুন' দিগের সহিত পিতৃবৃত্তির অধিকারে গৌরবান্বিত বৈদ্যগণ মিশিতে চাহিতেন না।

কুলীনব্রাহ্মণ যেমন নিজপরিচয়ে 'কুলীন' শব্দটী ব্যবহার করিতে গৌরব অনুভব করেন, বৈদ্যব্রাহ্মণগণও তদ্রূপ আপনাদের শ্রেষ্ঠতা স্মরণ পূর্ব্বক 'বৈদ্য' নামেই চিরকাল সগৌরবে পরিচয় দিয়া আসিতেছেন। কে জানিত সংসার এমন নিরক্ষর হইবে যে, 'জাতবামুন'ই বামুন বলিয়া গণ্য হইবে, কিন্তু 'জাতবৈদ্য' বলিয়া পরিচয় দিলেও বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্বে সংশয় জাগিয়া উঠিবে!

কালীবাবুর শেষ বাক্যটীর অর্থ বোধ হয় এই যে, বৈদ্য যদি অম্বষ্ঠ-বর্ণ(?) হয়, তবে ঐ মহর্ষিরা অম্বষ্ঠ বলিয়া বিদিত না থাকায়, ইহাই সপ্রমাণ হয় যে, বৈদ্যগণ তাঁহাদের বংশধর নহে, অথবা তাঁহাদেরই দ্বারা বৈশ্যকন্যার গর্ভে উৎপাদিত! এজন্য পূর্ব্বপুরুষ 'বৈদ্য' বলিয়া পরিচিত থাকিলেও, আমরা যে অম্বষ্ঠ-বৈশ্য তাহাতে ভুল নাই! এস্থলেও, বোধ হয়, **আসামের** অসমীয়া ইতিহাস হইতে প্রমাণ তুলিয়া দেখান যাইতে পারে যে, বঙ্গদেশে বিভিন্নগোত্রীয় বৈদ্যদিগের আদি

জননীগণ অমুক অমুক বৈশ্যের কন্যা? ধন্য কালীবাবু! আপনিই ধন্য!

বৈশ্যপুস্তকের ৫৯ পৃষ্ঠার নিম্নভাগে আছে—

"রঘুনন্দন বলেন—'প্রত্যেক বংশের আদিপুরুষ ব্রাহ্মণকেই গোত্র বলে; সুতরাং ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কোনও বর্ণেরই গোত্র সম্ভবে না। অথচ বিবাহাদি ধর্ম্ম-কর্ম্মানুষ্ঠানে সর্ব্ব জাতিরই গোত্রোল্লেখ শাস্ত্রে আদিষ্ট হওয়ায় ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রদিগের স্ব স্ব গোত্রের অভাব হেতু পূর্ব্বপুরুষীয় পুরোহিতদিগের গোত্রই তাহাদিগের গোত্র বুঝিতে হইবে।' * এই মত ঠিক হইলেও অম্বষ্ঠ বৈদ্যের প্রতি বর্ত্তিতে পারে না। অম্বষ্ঠগণ যখন ব্রাহ্মণের **ঔরসে** বৈশ্যকন্যা জাত তখন যে ব্রাহ্মণ আদি পুরুষ হইতে জন্ম হইয়াছে, তাঁহার নাম অনুসারে বৈদ্যের গোত্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।"

কালীবাবু এস্থলে মহামহোপাধ্যায় ভরতমল্লিকের লিখিত বৈদ্যের 'নিজস্ব' গোত্রের কথা স্মরণ করিয়া আলোচনা করিতেছেন। শাস্ত্রানুসারে **কেবল ব্রাহ্মণেরই নিজস্ব গোত্র**। অতএব প্রাচীন কুলজি দেখিয়া এবং সামাজিকবর্গের নিকটে প্রসিদ্ধি শুনিয়া ভরত মল্লিক বৈদ্যের 'নিজস্ব' গোত্রের কথা যাহা বলিয়াছেন, তাহা বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্বের একটী প্রবল প্রমাণ (৫৪ পৃষ্ঠা)। ভরতমল্লিক বলিয়াছেন—

"যস্য যস্য মুনের্যোযঃ সন্তানঃ স স বিশ্রুতঃ।
তত্তদ্‌গোত্রাদিনা বৈদ্যঃ শ্রৈষ্ঠ্যাদ্যস্তু স্বকর্ম্মণা। (চন্দ্রপ্রভা)

অর্থাৎ, বৈদ্যদিগের গোত্রনাম পূর্ব্বপুরুষের নাম অনুসারেই হইয়াছে।

* —"বংশপরম্পরাপ্রসিদ্ধমাদিপুরুষব্রাহ্মণরূপং গোত্রম্। [illegible] পুরোহিতগোত্রপ্রবরৌ বেদিতব্যৌ। শূদ্রস্ত তু [illegible] সম্মুচ্ছিতগোত্রেঽপি বৈশ্যধর্ম্মাতিদেশাৎ পূর্ব্বপুরুষপুরোহিত[illegible]ভাগিত্বং প্রতীয়তে।"

যে বৈদ্য যে ঋষির সন্তান, সেই বৈদ্যের গোত্র সেই ঋষির নামানুসারেই হইবে। কালীবাবু, সত্যেন্দ্রবাবু ও তাঁহাদের শিক্ষাগুরু কুলপঞ্জিকাগণ সকলেই ইহার সত্যতা স্বীকার করেন। সকলেই বলেন বৈদ্যের গোত্র তাহার 'নিজস্ব' গোত্র। এদিকে স্বয়ং গৃহ্যসূত্র বলিতেছেন এবং স্মার্ত্ত-সম্রাট্ রঘুনন্দনও গৃহ্যসূত্রাদির প্রামাণ্যে বলিতেছেন যে, কেবল ব্রাহ্মণেরই নিজস্ব গোত্র হইয়া থাকে, তাহা ছাড়া অন্য বর্ণের অর্থাৎ ক্ষত্রিয়াদির ধার-করা গোত্র! অতএব কুলপঞ্জিকার প্রামাণ্যে ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণ, অন্যথা তাঁহাদের নিজস্ব গোত্র হইত না! প্রত্যক্ষতঃ ও দেখিতেছি, ধন্বন্তরি, বৈশ্বানর, শালঙ্কায়ন প্রভৃতি মহর্ষিগণের নামের গোত্র সাধারণ ব্রাহ্মণদিগের গোত্রতালিকায় নাই! এই সকল সুপ্রাচীন দেবকল্প ঋষি দেবতা বলিয়া এখন ব্রাহ্মণদের বন্দনীয়। ঐ দেবকল্প ঋষি বা দেবতাদিগের বংশধারা অদ্যাপি বৈদ্যদিগের মধ্যে বর্ত্তমান। এই সকল দেবকল্প ঋষিদের সন্তানগণ এবং তাঁহাদের স্বজাতীয় অন্য বৈদ্যব্রাহ্মণগণ মুখ্য ব্রাহ্মণ হইলেও কালীবাবুর মতে 'অম্বষ্ঠ'! কালীবাবুর মতে অম্বষ্ঠ বৈশ্যবর্ণ! অতএব বৈশ্যবর্ণেরও নিজস্ব গোত্র হইল! শাস্ত্রে কোনও জাতির সম্বন্ধে কিছু না কহিয়া **বর্ণ** নাম দ্বারা বলিয়া দেওয়া হইয়াছে, যে যে জাতি ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্রবর্ণের মধ্যে পড়িবে, তাহাদের গোত্র নিজস্ব গোত্র নহে, অর্থাৎ নিজেদের পূর্ব্বপুরুষের নামে নহে। তবে কালীবাবুর 'অম্বষ্ঠবর্ণ বৈশ্য' কিরূপে নিজপূর্ব্বপুরুষের নামে গোত্র-পরিচয় দেয়? তবে হয় **কালীবাবুর কথা মিথ্যা, নয় শাস্ত্র মিথ্যা**! ফলতঃ কালীবাবুর কথাই যে মিথ্যা, অর্থাৎ অম্বষ্ঠ যে বৈশ্যবর্ণ নহে, এবং বৈদ্যগণও যে অম্বষ্ঠ নহেন, ইহা সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। আর ইহাও বোধ হয় বুঝিতেছেন যে, কালী বাবু একজন মস্ত 'মহর্ষি' কারণ, তাঁহার কথায় ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক

শূদ্রাতে উৎপাদিত শৌদ্র পারশবও পূর্ব্বপুরুষদের গোত্রধারী হইবে! * ব্রাহ্মণ হইতে জাত বলিয়া শূদ্রেরও যদি নিজস্ব গোত্র থাকিতে পারে, তবে শাস্ত্র কেন এত বাজে কথা বলিয়া মাথা ঘামাইল? রঘুনন্দনই বা অত কথা কেন বলিলেন? এস্থলে আর একটু মজা আছে। কালীবাবু অম্বষ্ঠকে ব্রাহ্মণের **ঔরসে** বৈশ্যকন্যাতে জাত বলিয়াছেন, অথচ 'ঔরস পুত্র' হইয়াও অম্বষ্ঠ অব্রাহ্মণ! কালীবাবুর ভাষা ও ভাব বোঝা দেবতারও অসাধ্য!

১০। দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণদিগের সহিত আচারগত সাম্য এবং প্রাচীনকালে তাহাদিগের সহিত বিবাহ বৈদ্যদিগের ব্রাহ্মণ্যের প্রমাণ।

গোত্রসাম্য, পদবীসাম্য সামাজিক আচারসাম্য বৈদ্য ও বৈদিকদিগের মধ্যে যথেষ্ট। প্রাচীনকালে বিবাহও প্রচলিত ছিল। ইহা হইতেও বৈদ্যদিগের ব্রাহ্মণত্ব প্রমাণিত হয়। প্রবোধনীতে আছে—

'রামসেনেন জগৃহে নিজদুর্দ্দৈবদোষতঃ।
শ্যামদাশস্য মিশ্রস্য কন্যকা কটকস্থিতেঃ॥' (চন্দ্রপ্রভা, পৃঃ ১৯৬)

* ব্রাহ্মণের ঔরস পুত্র অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণবর্ণ, ব্রাহ্মণবর্ণ বলিয়াই সে পিতৃগোত্রভাক্। অব্রাহ্মণ হইলে তাহার পিতৃগোত্রে পরিচয় হইত না। কারণ একমাত্র ব্রাহ্মণেরই নিজস্বগোত্র। কালীবাবুর মতে বৈশ্যবর্ণ পিতৃগোত্রে পরিচয় দিতে সমর্থ! তবে পারশব শূদ্রও পিতৃগোত্রে অধিকারী হইয়া পড়ে! ইহা মনুবিরুদ্ধ (৯।১৬০)। ব্রাহ্মণের দ্বাদশবিধ পুত্রের মধ্যে সকলে পিতার গোত্র পায় না, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হয় না। যে ছয় প্রকার পুত্র পিতার গোত্র পায় (মনু ৯।১৫৯) তাহারাই সমাজে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত হইত। এই ছয় পুত্রের মধ্যে ঔরস সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণের 'ঔরস পুত্র', ব্রাহ্মণের আত্মা—ব্রাহ্মণ। কালীবাবুর মতে অম্বষ্ঠ ঔরস পুত্র হইলেও বৈশ্য! নিজস্বগোত্রের অধিকারী হইলেও বৈশ্য!!

অর্থ—রামসেন কটকনিবাসী শ্যামদাশ মিশ্রের কন্যাকে বিবাহ করেন। ইহা তদীয় দুর্ভাগ্যবশতঃ হইয়াছিল।

'বাণসেনঃ শশী সেনঃ পুণ্ডরীকাক্ষসেনকঃ।

তে সর্ব্বে ওড্রদেশীয়-বিদদাশসুতাসুতাঃ॥' (ঐ, ২১১ পৃঃ)

অর্থ—বাণসেন, শশী সেন, পুণ্ডরীকাক্ষ সেন, ইহারা সকলেই উড়িষ্যা দেশীয় বিদদাশের কন্যার পুত্র।

'অথো শরণকৃষ্ণেণ বালেশ্বরনিবাসিনঃ।

কন্যা মহেশদাশস্য গৃহীতা দৈবদোষতঃ॥' (ঐ, ১৪১ পৃঃ)

অর্থ—শরণকৃষ্ণ বালেশ্বরবাসী মহেশদাশের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

'ধনিরামো ভদ্রকস্থ-গোবিন্দদাশজা-পতিঃ॥' (ঐ, ১২৪ পৃঃ)

অর্থ ধনিরাম ভদ্রকবাসী গোবিন্দদাশের জামাতা।

কালীবাবু বলিয়াছেন, যে সকল মিশ্রোপাধিক উড়িষ্যাবাসীর সহিত বৈদ্যদিগের ক্রিয়াকর্ম্ম হইয়াছে, তাঁহারা বৈদিক ব্রাহ্মণ নহেন (বৈদ্য, পৃষ্ঠা ৫১ – ৫২)। কালীবাবুর মতে তাঁহারা উড়িষ্যাবাসী আচারভ্রষ্ট বৈদ্য। কিন্তু তাহা হইলে, তাঁহার নিজের কথায় ইহাই সপ্রমাণ হইল যে, 'মিশ্র' এই উপাধি তদানীন্তন বৈদ্যগণ ব্যবহার করিতেন, এবং তাঁহাদের সন্তানেরা অদ্যাপি এই উপাধি উড়িষ্যায় ব্যবহার করিতেছেন, এবং খাঁটী ব্রাহ্মণ বলিয়াই বিদিত আছেন। তাঁহাদের মধ্যে স্থানভ্রংশ বা আচার-ভ্রংশ বশতঃ কেহই শূদ্র বলিয়া বিদিত হয় নাই। কি উড়িষ্যায় কি বিহারে মিশ্রোপাধিক ব্যক্তিগণ কেহই অব্রাহ্মণ নহে। মিশ্র-উপাধিধারী ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা অন্য জাতি বাঙ্গালায় বিহারে বা উড়িষ্যায় নাই। সুতরাং এপথে বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রমাণ করা আরও সহজ হইল। আমরা বলিতেছিলাম, বৈদ্যেরা মিশ্রোপাধিক বৈদিক ব্রাহ্মণের ঘরে বিবাহ করিতেন, কালীবাবু বলিতেছেন, ঐ মিশ্রোপাধিক ব্রাহ্মণগণ

বাঙ্গালার প্রাচীন বৈদ্য! ভালই হইল। আমরা মনে করিতেছিলাম, দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণের ঘরে কোন পাশ্চাত্য বৈদিকের বিবাহ হইলে, পাশ্চাত্য বৈদিকেরা যেমন উহাকে নিন্দিত কর্ম্ম বলিয়া মনে করে, আভিজাত্যগর্ব্বী বৈদ্যগণও যাজনজীবী দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণদিগের ঘরে বিবাহ করাটাকে তদ্রূপ 'দুর্দ্দৈব' বলিয়া মনে করিতেন। কালীবাবু তাহার মীমাংসা করিয়া বলিতেছেন, বৈদ্যগণ স্বসমাজ হতে দূরে গিয়া বাস করিলে স্থানভ্রংশ দোষে পতিত হইতেন, এবং সেই জন্যই স্বজাতীয় বলিয়া এ সকল ক্ষেত্রে বিবাহ হইলেও, উহাতে দুঃখের কারণ থাকায় উহা 'দুর্দ্দৈব' বলিয়া বিবেচিত হইত। এক্ষণে সুধী পাঠকবর্গ বিচার করুন। ঐ 'দাশ' ও 'মিশ্র' উপাধিধারী উড়িষ্যাবাসী ব্রাহ্মণগণ চিরকালই 'শর্ম্মা' শব্দ নামান্তে ব্যবহার করিতেছেন এবং দশাহ অশৌচ পালন করিতেছেন। তাঁহারা বৈদ্য হইলে ত কথাই নাই—কিন্তু বৈদ্যই হউন, আর বৈদিক ব্রাহ্মণই হউন, তাঁহারা সনাতন ব্রাহ্মণকুলজ ব্রাহ্মণ, ইহাতে সন্দেহ নাই। ইঁহারা বঙ্গীয় বৈদ্যগণকে জামাতা করিয়াছেন, বঙ্গীয় বৈদ্যগণের কন্যা আনিতে পারেন নাই। বঙ্গীয় বৈদ্যগণও ব্রাহ্মণ-কন্যাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু সমাজে গৌরব প্রাপ্ত হন নাই, বরং লাঘব হইয়াছিল। অতএব বঙ্গীয় বৈদ্যগণ যে ঐ উড়িষ্যাবাসী ব্রাহ্মণগণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাহা নিশ্চিত। বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণ না হইলে 'বিবাহের' কথা কেহ স্বপ্নেও ভাবিতে পারিত না, এরূপ বিবাহ হইতই না। ইহা শাস্ত্র শাসিত বঙ্গ সমাজের প্রাচীন বিবাহচিত্র, ইহা Civil Marriage নহে, উপবীতত্যাগী ব্রাহ্মণের অপর শূদ্রশ্রেণীর সহিত বিবাহ নহে, ব্যভিচার নহে। ইহা সামাজিকগণের সমক্ষে বহ্নিস্থাপন পূর্ব্বক, নামগোত্র উল্লেখ পূর্ব্বক যথারীতি যথাশাস্ত্র সমন্ত্রক বিবাহ। ইহা হইতেই প্রাচীন বৈদ্যগণ যে ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাহা দিবালোকের ন্যায় প্রতীত

হয়। অতঃপর আধুনিক বৈদ্যদিগের ক্বচিৎ বৈশ্যত্ব ও ক্বচিৎ শূদ্রত্ব যে পাতিত্যের জন্যই হইয়াছে, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। নিরোলের 'সেন-মিশ্রগণ' ক্রমে শুধু 'সেন' ও অবশেষে বৈশ্য (সম্প্রতি 'সেনগুপ্ত') হইলেন! তদ্বংশীয় কেহ কেহ পূর্ব্ববঙ্গে গিয়া শূদ্রবৎ হইল, আর 'দাশ-মিশ্র' প্রভৃতি উড়িষ্যায় গিয়া ব্রাহ্মণত্ব রক্ষা করিলেন!

কালীবাবু নাছোড়-বান্দা! তিনি বলিয়াছেন, "শ্যামদাসের মিশ্র উপাধি দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব সূচিত হয় না। মিশ্র উপাধি **জাতিবাচক উপাধি নহে। উড়িষ্যায় গিয়া** সম্ভবতঃ **আজকাল** পাঁড়ে, দোবে, চোবে প্রভৃতি উপাধি গ্রহণের ন্যায় 'মিশ্র' উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন"। (বৈদ্য, পৃষ্ঠা ৫২)! একথা নিতান্তই উপহাস্য! উহা শত শত বৎসরের প্রাচীন উপাধি না হইলে ভরতমল্লিক ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে কুলজী গ্রন্থে লিখিতেন না। কুলাচার্য্যেরা কোন্ বংশ কোথায় গেল, কাহার কি পদবী তাহা বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন। আর উহা 'জাতিবাচক' নয় কিসে? বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি পদবী ব্রাহ্মণের শাস্ত্রীয় পদবী নহে, কিন্তু তাই বলিয়া সে গুলিও কি 'জাতীয় উপাধি নহে'? 'মুখোপাধ্যায়' উপাধি যুক্ত শূদ্র, বৈশ্য বা ক্ষত্রিয় কোথাও আছে কি? যদি না থাকে, তবে কাহারও নামান্তে মুখোপাধ্যায় উপাধি যেমন তাহার ব্রাহ্মণত্ব সূচিত করে, 'মিশ্র' উপাধিও তদ্রূপ উপাধিমানের ব্রাহ্মণত্ব সূচিত করিয়া থাকে। রাঢ়ীয় বৈদ্যের পাঁড়ে উপাধি আবহমান কাল হইতে চলিত। আমি বাঁকুড়া জেলায় তিলুড়ীগ্রামে গিয়াছিলাম, সেখানে প্রাচীন দলিল-পত্রে পাঁড়ে উপাধি স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি। বৈদ্যদিগের পাঁড়ে উপাধি সম্বন্ধে ১ম বর্ষের বৈদ্য-হিতৈষিণীতে ১৮২-১৮৩ পৃষ্ঠায় লিখিত বিবরণ হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিলাম—

"বাঁকুড়া জেলার তিলুড়ী গ্রামে পাঁড়ে উপাধিধারী বৈদ্যগণের সংবাদ

সুবিদিত। কিন্তু মানভূম জেলার মধুতটী গ্রামেও যে পুরুষানুক্রমে 'পাঁড়ে' বৈদ্য অনেক আছেন, ইহা অবগত হইয়া, নিম্নে তাঁহাদিগের নাম প্রকাশ করিতেছি। ইঁহারা সকলেই প্রায় ধন্বন্তরিগোত্রীয় 'সেন', কিন্তু স্মরণাতীত কাল হইতে পাঁড়ে উপাধিধারী।" বৈঃ হিতৈষিণীতে বহু নাম দেওয়া হইয়াছে, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ভদ্র মহোদয়গণকে পত্র লিখিয়া কালীবাবু সবিশেষ সংবাদ লইতে পারেন—

(১) তিলুড়ী শিক্ষাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা অসাধারণ কর্ম্মবীর শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সেন, এম্-এ. তিলুড়ী (২) শ্রীজয়গোপাল পাঁড়ে কাব্যব্যাকরণ-তীর্থ, কবিশেখর, শ্রীবৈদ্যনাথ ভৈষজ্যভবন. দেওঘর। যাহা হউক, বাঙ্গালার পশ্চিমপ্রান্তবাসী রাঢ়ীয় বৈদ্যদিগের আচার ব্যবহার ও প্রতিষ্ঠা আসামে দ্বীপান্তরিত রায় বাহাদুর মহাশয়ের নয়নগোচর বা শ্রুতিগোচর হয় নাই বলিয়া তাহাদিগের পদবী ও উপাধি সম্বন্ধে অজ্ঞতা বরং মার্জ্জনা করা যায়, কিন্তু কুলজি গ্রন্থে লিখিত 'মিশ্র' উপাধি লইয়া যে রসিকতা করিয়াছেন, তাহাও কি অন্ধ ও বধির বলিয়া মার্জ্জনা করিতে হইবে? ধর্ম্মনিষ্ঠ শত শত বৈদ্যের স্বয়ংদত্ত পরিচয় ও প্রাচীন দলিল-দস্তাবেজ হইতে যে কথা জানিতেছি, তাহা যে বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। এরূপ অবস্থায় কালীবাবুকে কি বলিতে ইচ্ছা করে? তাঁহার সকল সিদ্ধান্তেই সবজান্তার ভাব বিদ্যমান কেন? চন্দ্রপ্রভায় 'পাঁড়ে' উপাধি উল্লিখিত হয় নাই, সত্য; কিন্তু অনুল্লেখ (উপাধির আধুনিকত্বের) প্রমাণ নহে। 'মিশ্র' শব্দ ত উল্লিখিত হইয়াছে, এ উল্লেখ প্রাচীনত্বের সুস্পষ্ট প্রমাণ। কালীবাবুর 'উড়িষ্যায় গিয়া' কথাটাও আপত্তিজনক, কারণ নিরোলেও 'শ্যাম সেন মিশ্র' ছিলেন। প্রাচীন বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণাচারী ছিলেন বলিয়া, আসাম প্রভৃতি দূরদেশে গমন করিয়া তত্তৎস্থানে ব্রাহ্মণদের সহিত ক্রিয়াকর্ম্ম করিতে পারিয়াছিলেন। ঐ সকল ব্রাহ্মণেরাও ঈদৃশ কার্য্য করিয়া পতিত হইতেন

না। উৎকলবাসী বৈদিক ব্রাহ্মণদের ন্যায় আসামবাসী ব্রাহ্মণেরাও বঙ্গীয় বৈদ্যকে ব্রাহ্মণ বলিয়াই জানিতেন। কিন্তু বৈদ্য-প্রবোধনীর এইরূপ উক্তি কালীবাবুর অসহ্য। তিনি বলিতেছেন—

"বৈঃ প্রঃ মতে আসামে ব্রাহ্মণ-বৈদ্যের যৌন সম্বন্ধ অদ্যাপি প্রচলিত আছে।' ইহা সম্পূর্ণ অলীক।

আসামে বৈদ্যজাতি নাই। তাঁহারা বেজবড়ুয়াদিগকে বৈদ্য বলিয়া ব্যাখ্যা করেন এবং বেজবড়ুয়া অর্থ করিয়াছেন বৈদ্যব্রাহ্মণ—বৈদ্যের অপভ্রংশ বেজ এবং ব্রাহ্মণ বাচক বটু শব্দের অপভ্রংশ বড়ুয়া। জানিনা এ ব্যাখ্যা কাহার কল্পিত। বড়ুয়া একটী রাজদত্ত উপাধি, সকল জাতির মধ্যেই প্রচলিত আছে। শূদ্র জাতীয় অনেক বড়ুয়া আছে এমন কি মুসলমানের মধ্যেও রহিয়াছে। মঙ্গলদৈর হাইস্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত আবদুল লতিফ বড়ুয়া জীবিত রহিয়াছেন। বেজবড়ুয়া কোন জাতি বা শ্রেণী নাই। আসাম রাজার সময়ে কোন একজন খাঁটি ব্রাহ্মণ দেশান্তর হইতে চিকিৎসা শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন। তদানীন্তন রাজা তাঁহার চিকিৎসায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বেজবড়ুয়া উপাধি দিয়াছিলেন। বেজ অর্থ চিকিৎসক বড়ুয়া অর্থ প্রধান। উক্ত ব্রাহ্মণের বংশীয়গণ মাত্র অদ্যাপি বেজবড়ুয়া পদবী ব্যবহার করিতেছেন এবং বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণগণসহ চিরকাল অবাধে আদান প্রদান করিয়া আসিতেছেন।" (পৃঃ ৫৩)।

কালীবাবুর এই জেদ যে তিনি বৈদ্যকে অব্রাহ্মণ প্রমাণ করিবেনই। সুতরাং আমরা যদি দেখাই যে কোন প্রাচীন বৈদ্য নামের শেষে 'শর্ম্মা' উপাধি ব্যবহার করিতেছেন, তখন তিনি বলেন 'ও ত ব্রাহ্মণ, ও বৈদ্য নহে'। আর 'শর্ম্মা' না দেখাইতে পারিলে, 'পাঁড়ে'ই হউন, আর 'মিশ্র'ই হউন তিনি ব্রাহ্মণ নহেন, কারণ ব্রাহ্মণ হইলে' তিনি নামের শেষে শর্ম্মা যোগ করিতেন, অথবা ব্রাহ্মণ বলিয়া স্পষ্ট উল্লেখ করিতেন'! (বৈদ্য, পৃ ৫২)

উল্লিখিত সমালোচনায় কালীবাবু স্বীকার করিতেছেন, "কোন একজন **খাঁটী ব্রাহ্মণ** দেশান্তর হইতে চিকিৎসা শাস্ত্র **শিক্ষা**

কবিরিয়া আসিয়াছিলেন, তদানীন্তন রাজা তাঁহার চিকিৎসায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বেজবড়ুয়া উপাধি দিয়াছিলেন, **বেজ অর্থ চিকিৎসক** বড়ুয়া অর্থ প্রধান”। দেখা যাইতেছে, বেজবড়ুয়া উপাধিধারী ঐ ব্যক্তি রাজার চিকিৎসক-প্রধান ছিলেন, শুধু চিকিৎসক প্রধান নয়, ‘বৈদ্য-প্রধান’, কারণ ‘বেজ’ শব্দ বৈদ্য শব্দেরই অপভ্রংশ। কিন্তু এস্থলে ‘শর্ম্মা’ শব্দ না থাকিতেও কালীবাবু ইহাকে ‘খাঁটী ব্রাহ্মণ’ বলিয়া চেনেন কিরূপে? শান্তিপুরে, খুলনা, ঢাকা ও পাবনা জেলায় বেজ-গাঁ, বেজগাঁতি, বেজপাড়া প্রভৃতি শব্দ দ্বারা বৈদ্য-প্রধান গ্রাম বা বৈদ্য-পাড়াকেই বুঝান হইয়া থাকে। বৈদ্যেরাই সেকালে চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিত, অন্যে নহে। নাপিত বা নিম্নশ্রেণীর লোকেরা দেখিয়া শুনিয়া টোট্‌কা-টুট্‌কী প্রয়োগ করিতে শিখিত, আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিত না। রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র ও বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরাও উহাতে অনধিকারী ছিলেন। কালীবাবুও একথা বৈদ্যপুস্তকের ১৮-২৯ পৃষ্ঠায় স্বীকার করিয়াছেন। এই বৈদ্য-প্রধানের বংশে যাঁহারা জাত, তাঁহারা অদ্যাপি আসামে চিকিৎসা করিতেছেন এবং ভাল কথায় বৈদ্য’ বলিয়াই বিদিত। আসামের ঐ ‘বেজ’ ব্রাহ্মণটী যে বঙ্গদেশ হইতে গত কোন বৈদ্য ব্রাহ্মণ নহে, তাহা কালীবাবুকে কে বলিল? তদ্বংশীয়েরা বৈদ্যশ্রেণীর ব্রাহ্মণ না হইলে কোন্ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র না বৈদিক, তাহা কালীবাবু বলিলেন না কেন? তাহাদের গোত্র কি? কালীবাবু এই সকল তথ্য চাপিয়া রাখিলেন কেন? এ সকল সংবাদ অনুকূল হইলে উকিল কালীবাবু জানিয়া শুনিয়া সেগুলি বলিলেন না, এমন নির্ব্বোধ তিনি নহেন। যে হিন্দু রাজা বেজবড়ুয়াকে চিকিৎসার জন্য প্রতিষ্ঠিত করিলেন, সেই রাজা ও তাঁহার ধর্ম্মনিষ্ঠ প্রজাগণ কি অবৈদ্যের পাচিত ঔষধ খাইতেন? অবৈদ্যকে মুখে অন্তিম জল গণ্ডূষ দিতে ডাকিতেন? রাজার পক্ষে নিকটে

আয়ুর্ব্বেদের পীঠস্থান হইতে প্রবীণ চিকিৎসককে ডাকিয়া লইয়া যাওয়া স্বাভাবিক, না 'একজন' অনধিকারী ছাত্র পাঠাইয়া, কবে সে শিখিয়া আসিবে ভাবিয়া নিশ্চিন্ত থাকা স্বাভাবিক? এ ন্যায়শাস্ত্র নহে—শিখিতে না পারিলে বা মন্দরূপ শিখিলে তাহা দ্বারা কি উপকারের সম্ভাবনা? আর সেই প্রাচীনকালে ঐ অবৈদ্য আয়ুর্ব্বেদ শিখিবেই বা কেন, এবং কেই বা তাহাকে শিখাইবে? আমরা আসামের খবর রাখি না, কালীবাবুর ন্যায় সবজান্তাও নহি, কিন্তু সম্ভব-অসম্ভব জ্ঞান এবং যে অল্প বিচারশক্তি আছে, তাহা দ্বারাই অনুমান করিতে পারি যে, ঐ বেজবড়ুয়া উপাধিধারী ব্রাহ্মণ আসামে উপনিবিষ্ট ভূতপূর্ব্ব বঙ্গীয় বৈদ্য। রাজার চিকিৎসাব্যপদেশে তথায় গিয়া সম্মানিত 'বেজবড়ুয়া' উপাধি পাইয়াছিলেন এবং তখন বৈদ্যেরা ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রসিদ্ধি থাকায় তত্রত্য ব্রাহ্মণ শ্রেণীতেই মিশিয়া গিয়াছিলেন। উড়িষ্যায় যাহা ঘটিয়াছিল, এখানেও তাহা ঘটিয়াছে। বৈদ্য অব্রাহ্মণ হইলে এরূপ হইতে পারিত না। তবে "আসামে ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যের যৌনসম্বন্ধ অদ্যাপি প্রচলিত" বলিয়া বৈঃ প্রঃ কি দোষ করিয়াছে? বৈঃ প্রঃ বলিতেছে, ব্রাহ্মণে ও বৈদ্যে বিবাহ হইতেছে; কালীবাবু বলিতেছেন, ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণে হইতেছে। রহস্য মন্দ নয়! ভূতপূর্ব্ব বঙ্গীয় বৈদ্যসন্তানগণ যাঁহারা আসামে বেজ বা বেজবড়ুয়া বলিয়া বিদিত, তাঁহারা ব্রাহ্মণ, ইহা কালীবাবুই স্বীকার করিলেন। যাহা হউক, রহস্য ত্যাগ করিয়া আমাদের এই মত বিরোধে আমরা পাঠকবর্গকে আসামদেশীয় ও আসামপ্রবাসী কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির অভিমত দেখাইব। তাহা দেখিলেই পাঠকগণ কালীবাবুর মতের মূল্য বুঝিতে পারিবেন—

(১) "মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ গণনাথ সেন মহাশয়েষু -

সবিনয় নিবেদন,

আসামে 'বৈদ্য' ও ব্রাহ্মণে কোন ভেদ নাই। আসামে বৈদ্যেরা

বেজবরুয়া নামে খ্যাত ; তাঁরা ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণদের সঙ্গে বিবাহাদি চলাচল আছে। আমার ভ্রাতুষ্পুত্রীর বিবাহ **শ্রীযুক্ত মাণিক চন্দ্র বেজবরুয়ার সঙ্গে হইয়াছে, উনি বৈদ্য।"**

বিনীত

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র শর্ম্মা, গোস্বামী, বি-এল্, (উকিল)

নগাঁও, আসাম।"

এই পত্র খানি ১ম বর্ষের বৈদ্যহিতৈষিণীতে ২১ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

যে শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের সহিত 'বেজবরুয়া' ব্রাহ্মণদের বৈবাহিক আদান প্রদান হয়, ইহা সেইরূপ একজন ব্রাহ্মণের লিখিত। এই পত্রে আসামের ব্রাহ্মণ সমাজের অভিমত অভিব্যক্ত দেখিতে পাইতেছি। এই বেজবরুয়া ব্রাহ্মণেরাই আসামের বৈদ্যশ্রেণীর ব্রাহ্মণ! বৈদ্য শ্রেণী ও অবৈদ্য শ্রেণীর ব্রাহ্মণে জাতিগত কোন প্রভেদ নাই, ইহা পত্রেই প্রকাশ। পাঠক মহোদয় এখন দেখুন, বৈঃ-প্রঃ র কথা অলীক কি কালীবাবুর কথা অলীক।

এই অংশ মুদ্রিত হইবার কালে আমরা নিম্নে প্রদত্ত পত্র দুইখানি পাইয়াছি। গোয়ালপাড়া (আসাম) হইতে শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ সেন শর্ম্মা, বি-এল্, উকিল মহাশয় এইরূপ লিখিয়াছেন—

"বেজবরুয়াগণের সমষ্টি খুব কম। কয়েকটী পরিবার শিবসাগর জিলায় আছেন এবং ১টী পরিবার উত্তর লক্ষ্মীপুরে আছেন। ইঁহাদের কাশ্যপ গোত্র। ইঁহারা একটু নিম্নশ্রেণীর ব্রাহ্মণ বলিয়া আসামে পরিচিত ছিলেন। কিংবদন্তী আছে, ইঁহারা বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব বৈদ্য ; তজ্জন্যই বোধহয় ঐরূপ পরিচয় হইয়া থাকিবে। আজকাল ইঁহাদের সহিত অন্য সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবারে আদান প্রদান চলিতেছে। কবিরাজ শব্দটী আসামী শব্দ নহে। ইহা আসামী অভিধানে নাই। আসামী

পুরাতন কোন পুথিতেও ঐ শব্দটী পাওয়া যায় না। বৈদ্য অর্থে 'কবিরাজ' শব্দ ব্যবহার বাঙ্গালার নিজস্ব। আসামীতে কবিরাজ না বলিয়া 'বেজ' বলে। অভিধানে দেখিলাম বেজ ও বৈদ্য একার্থবাচক।"

—১৮।১২।২৮

শিবসাগর (আসাম) গবর্ণমেণ্ট-এডেড্ বেজবরুয়া স্কুলের হেড্ মাষ্টার শ্রীযুক্ত রত্নেশ্বর শর্ম্মা এম্-এ মহাশয় লিখিয়াছেন—

"মহাশয়ের দুইখানা পত্রই যথাসময়ে পাইয়াছি। আসামে বেজ-বরুয়া বংশ দুইটী। যদিও একবংশ এখানে আছে, অপর বংশের অনু-সন্ধান করিতে ব্যাপৃত থাকায় যথা সময়ে উত্তর দিতে পারি নাই, ক্ষমা করিবেন। অপরবংশের কোনো অনুসন্ধান পাওয়া গেল না। এখানকার বেজবরুয়া বংশের গোত্র কাশ্যপ, জাতিতে ব্রাহ্মণ, পূর্ব্বে যদিও **কবিরাজি ব্যবসায় ছিল, এখন তাঁহারা কবিরাজি এবং** (আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া) **চাকুরি প্রভৃতি করিয়া থাকেন**। বেজবরুয়া উপাধি Designatory title, অর্থ চিকিৎসক এবং ঔষধ প্রস্তুতকারক। ইহারা আসামের **আদিম অধিবাসী নহেন, অন্যান্য ব্রাহ্মণদের ন্যায়** বিগত ১৪১৪ শকাব্দে আসামে আসিয়া বসতি করেন। 'কবিরাজ' শব্দ আসামের আভিধানিক শব্দ নহে।"

—১৮।১২।২৮

বেজবরুয়াগণ ভূতপূর্ব্ব বঙ্গদেশীয় বৈদ্য, ইহা প্রথম পত্রে প্রকাশ। দ্বিতীয় পত্র প্রায় তাহা সমর্থন করিতেছে। কবিরাজী ব্যবসায় অন্য শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা করেন না বা করিতেন না, এজন্য বাঙ্গালার কাশ্যপ গোত্র কবিরাজ বংশ ও আসামের বেজবরুয়া (বৈদ্যরাজ বা কবিরাজ) বংশ মূলে অভিন্ন বলিয়া মনে হয়।

বস্তুতঃ বৈদ্য সাধারণের ভূতদয়ার্থ অনিন্দিত বৃত্তি, বিদ্যাবত্ত, সমাজ-

নেতৃত্ব, অহীনকর্ম্মতা, উদারতা, ঋজুতা, ধর্ম্মপ্রাণতা এবং সর্ব্ববিধ উৎকৃষ্ট সদাচার—এক কথায় সত্ত্বগুণভূয়িষ্ঠ চরিত্র বৈদ্যদিগের ব্রাহ্মণত্বেরই সমর্থন করে! বৈদ্যবংশের সামাজিক সম্মান, বৈদ্য নামের আবহমানত্ব, 'বদ্দিবামুন' প্রসিদ্ধি ও পূর্ব্বোক্ত প্রমাণ সমূহ বৈদ্যদিগকে **ব্রাহ্মণ** বর্ণেরই একটী শ্রেণী বলিয়া জানাইয়া দেয়। আজ জালালুদ্দিন মহম্মদ কবিরাজ হইতেছে, মুখোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি 'বৈদ্য' হইতেছে, সত্যেন্দ্র বাবুর জানা-শুনা 'আক্‌বর বদ্দি'ও নাড়ী টিপিতেছে, "অষ্টাঙ্গ-আয়ুর্ব্বেদ কলেজ' ও 'বৈদ্যশাস্ত্রপীঠ' হইতে সর্ব্বজাতীয় ছাত্রেরাই আয়ুর্ব্বেদীয় বিজ্ঞান অধিগত করিয়া আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসায় ব্রতী হইতেছে। এইরূপে 'এক পুরুষের'-বৈদ্য আজ চারিদিকেই দেখা যাইতেছে। কিন্তু যে সময়ে সমাজগুরু বৈদ্যের অগৌরব ভয়ে, কি ব্রাহ্মণ কি শূদ্র, কোন অবৈদ্যই ঔষধ পাক করিতে সাহস করিত না, যখন সমাজের ব্রাহ্মণ-শূদ্র কোন ব্যক্তিই অবৈদ্যের প্রস্তুত ঔষধ জাতিপাতের ভয়ে খাইত না,* স্বর্গদ্বার রুদ্ধ হইবার ভয়ে অন্তিমকালে মুখে এক গণ্ডূষ জল ও এক পান ঔষধ দিবার জন্য বৈদ্যকেই আহ্বান করা হইত, সেই সময়ে পুরুষানুক্রমে যাহারা বৈদ্য বা কবিরাজ বলিয়া

* কালীবাবু বৈদ্যপুস্তকের ৫ম ও ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি উদ্ধার করিয়া ইহার সত্যতা স্বীকার করিয়াছেন—

"শুদ্ধবংশোদ্ভবৈ র্বৈদ্যৈঃ কৃতং মাসঞ্চ মোদকম্।
শুদ্ধং রসায়নং ভোজ্যং তদন্যৈন কদাচন॥
অতঃ শূদ্রাদিভি র্বর্ণৈঃ পাচিতে খাদিতে সতি।
প্রায়শ্চিত্তীভবেচ্ছূদ্রো জাতিহীনো ভবেদ্দ্বিজঃ॥
বৈদ্যেন নহি যৎ পক্কম্ অভক্ষ্যং ব্যাধিবর্দ্ধনম্।
ইতি বিজ্ঞায় মতিমান্ বৈদ্যং পাকে নিযোজয়েৎ॥"

অবৈদ্যের পাককরা ঔষধ খাইলে শূদ্রকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় এবং দ্বিজমাত্রেই জাতিহীন হয়!

বিদিত ছিলেন, তাঁহাদের (কালীবাবুর ও আমাদের পূর্ব্ব পুরুষদের) শ্রেষ্ঠ মর্য্যাদা যাজক ব্রাহ্মণের ঈর্ষ্যার বস্তু হইয়াছিল। জিয়াগঞ্জ-মুর্শিদাবাদ, শ্রীখণ্ড, সাতশৈকা প্রভৃতি স্থানে পণ্ডিত-মূর্খ নির্ব্বিশেষে বৈদ্যগণ এখনও ব্রাহ্মণ বাটীতে নিমন্ত্রিত হইয়া ব্রাহ্মণদের সহিত পান-সুপারী ও যজ্ঞোপবীত পাইয়া আসিতেছেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বহরমপুর সহরে দুষ্টেরা সভাসমিতি করিয়া সামাজিকগণের অনুমোদিত এই প্রাচীন প্রথার লোপ করিয়াছে। যে প্রথা প্রাচীন সামাজিকবর্গের অনুমোদন ক্রমে এ যাবৎ চলিয়া আসিতেছিল, তাহা বৈদ্যদিগকে অপমানিত করিবার উদ্দেশ্যেই বন্ধ হইল! ইহা শুনিয়া কালীবাবুর মনে কোন কষ্ট না হইতে পারে, কিন্তু আমরা কি ছিলাম ও কি হইতেছি, তাহা মনে করিয়া চক্ষে জল আসে। যে মহামহোপাধ্যায় উপাধি বৈদ্য চিরকাল পাইয়া আসিতেছে, যাজক ব্রাহ্মণের প্ররোচনায় বৈদ্যকে তাহা আর দেওয়া হইবে না, এমন শুনিতেছি। ইংরাজি শিক্ষা ও সভ্যতার বিস্তারের সহিত দেশে ধর্ম্মবুদ্ধির পরিবর্ত্তে দুষ্ট-বুদ্ধি গজাইতেছে এবং ধর্ম্মের নামে ততই চারিদিকে ধর্ম্মের ভান হইতেছে। দুষ্টবুদ্ধি ব্রাহ্মণেরা, অন্য জাতীয় অজ্ঞ লোকদিগের ত কথাই নাই, আমাদের স্বজাতীয় কোন কোন বিজ্ঞ লোককেও নিজেদের হাতের মধ্যে আনিয়া সমিতির বিরুদ্ধে নিয়োজিত করিতেছে! যে সমিতি বঙ্গে চাতুর্ব্বর্ণ্য-প্রতিষ্ঠার জন্য ভগবৎ প্রেরণায় আবির্ভূত, তাহাকে নিরুদ্ধ করাই তাহাদের অভিপ্রায়! ইহারা গবর্ণমেণ্টকেও বুঝাইতেছে যে, বৈদ্যসন্তান 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি পাইতে পারে না, কারণ সে অব্রাহ্মণ! তাহাদেরই সুপরামর্শে নাকি বৈদ্যদিগের জন্য 'বৈদ্যরত্ন' নামে একটা নিম্নতর উপাধি সৃষ্টি করা হইয়াছে।

কালীবাবু স্পষ্টই বলিয়াছেন, "মহামহোপাধ্যায়ের বৃত্তি নিয়া ব্রাহ্মণগণসহ কলহসৃষ্টি করা সুবুদ্ধির পরিচায়ক নহে।" যাহাদের

সহিত পরামর্শ করিয়া কালীবাবু এই সুন্দর সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাঁহারা জানেন না যে, কোনও পণ্ডিত বৈদ্যসন্তান গবর্ণমেণ্ট নির্দ্দিষ্ট বৃত্তির জন্য লালায়িত নহে, কিন্তু তাই বলিয়া 'মহামহোপাধ্যায়" উপাধিটী নির্ব্বিবাদে ছাড়িয়া দিতেও বৈদ্যেরা প্রস্তুত নহে। শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় গণনাথ প্রতিদিন সহস্র মুদ্রা উপার্জ্জন করিয়া থাকেন, তিনি প্রারম্ভ হইতেই গবর্ণমেণ্টকে ঐ বৃত্তি শিক্ষাসংক্রান্ত অন্য কার্য্যে ব্যয়িত করিবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া উহা গ্রহণ করেন নাই। তবে বৃত্তির লোভ নির্লোভ বৈদ্যের কোথায়? যে বৈদ্য আবহমান কাল হইতে কোন যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণের নিকট ঔষধমুল্য বলিয়া এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করে নাই তাহাদিগকে আজ বৃত্তিহরণের লোভ পরিত্যাগের উপদেশ উপভোগ্য বটে! আমরা কালীচরণ বাবুকে পূর্ব্বে বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি, মহামহোপাধ্যায় উপাধিতে বৈদ্যের সনাতন অধিকার, আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ ঐ উপাধি সগৌরবে ধারণ করিতেন এবং যোগ্য পণ্ডিতগণকে উহা দান করিতেন। উহা হইতে বৈদ্যকে বঞ্চিত করিবার অধিকার কাহারও নাই। আর বৃত্তিটাও ত বৈদ্যশাস্ত্রে অভিজ্ঞতার জন্য দেওয়া হয় এবং রাজকোষ হইতেই দেওয়া হয়, কোন যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণকে বঞ্চিত করিয়া বা তাহার টেকের টাকা কাড়িয়া লইয়া বৈদ্যকে দেওয়া হয় না। তবে বৈদ্যের প্রতি এই ঈর্ষ্যা যে কতদূর জঘন্য তাহা সকলেই বুঝিতেছেন।

বঙ্গে যে 'কবিরাজ' উপাধি বৈদ্যের নিজস্ব ও বংশগত, যে উপাধি কোন ব্রাহ্মণ বংশের কুলজি হইতে কেহ দেখাইতে পারিবেন না, সেই 'কবিরাজ' উপাধি-বিশিষ্ট প্রাচীন পণ্ডিতগণ যে সকলেই বৈদ্যব্রাহ্মণ, ইহা বাঙ্গালী জনসাধারণও জানে। এই 'কবিরাজ' শব্দ এক একটী বংশে এক এক সময়ে প্রথম ব্যবহৃত হইয়া পরে পুরুষানুক্রমে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। 'কবি' শব্দের সংস্কৃত অর্থ পণ্ডিত।

কবিরাজ বা পণ্ডিতরাজ শব্দ প্রথমে জয়দেব, বোপদেব, বিশ্বনাথ, কৃষ্ণদাস প্রভৃতি অদ্বিতীয় বৈদ্য পণ্ডিতগণের নামের সঙ্গে এবং পরে তত্তদ্‌বংশীয়গণের মধ্যেই, যথা কবিরাজ সদাশিব, কবিরাজ রামচন্দ্র, কবিরাজ গঙ্গাধর, কবিরাজ দ্বারকানাথ ইত্যাদি ব্যবহৃত হইয়াছে। উহা বৈদ্যগণের চিকিৎসা বৃত্তির ন্যায় একচেটিয়া সম্পত্তি হইয়া উঠিয়াছিল। পণ্ডিত হউক আর নাই হউক, পাণ্ডিত্য বা কাব্য লেখার শক্তি থাকুক আর নাই থাকুক, চিকিৎসাবৃত্তিপরায়ণ বৈদ্যসন্তান মাত্রকেই 'কবিরাজ' বলা হইত, কিন্তু অন্যজাতীয় লোক অশেষ পণ্ডিত হইলেও, তাঁহার অশেষকবিত্ব শক্তি থাকিলেও 'কবিরাজ' উপাধি পাইত না। আজ অন্য জাতীয় লোকে চিকিৎসাবৃত্তি গ্রহণ করিয়া জীবিকার্জ্জনে প্রবৃত্ত হইলেই তাহাকেও লোকে 'কবিরাজ' বলিতেছে। এক্ষণে বঙ্গসাহিত্যে বা ভাষায় কবিরাজ শব্দের অর্থ বৈদ্যবৃত্তিপরায়ণ ব্যক্তি! এই অর্থ কিরূপে হইল, কালীবাবু তাহা ভাবিয়াছেন কি? পশ্চিম দেশে বিশিষ্ট বিশিষ্ট অবৈদ্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের নামের সঙ্গে কবিরাজ উপাধি দেখা যায় বটে, কিন্তু বঙ্গদেশে কিছুকাল পূর্ব্বেও উহা কেবলমাত্র বৈদ্যপণ্ডিতগণের মধ্যেই ব্যবহৃত হইত। 'কবিরাজ' শব্দের অর্থ-ব্যতিক্রমের এই ইতিহাস কালীবাবু জানেন না একথা কিরূপে বলি? তবে জানিয়াও তদীয় বৈদ্যপুস্তকের ৪৯ পৃষ্ঠায় যে গবেষণা করিয়াছেন, তাহা তাঁহারই শোভা পায়। তিনি বাঙ্গলায় অন্য শ্রেণীর ব্রাহ্মণের মধ্যে কবিরাজ উপাধি দেখাইতে না পারিয়া **আসামে** ঢু মারিয়াছেন, বলিতেছেন. সেই স্থানে কামরূপ জেলায় কে একজন ভট্টাচার্য্য ৩০০ শতবৎসর পূর্ব্বে "কবিরাজ নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন"। কালীবাবু ইহাই বুঝাইতে চাহেন যে, 'কবিরাজ' বলিলেই বৈদ্যকে বুঝাইত না, যাজক ব্রাহ্মণদিগেরও ঐ উপাধি ছিল। কিন্তু তবে কেন আবার বলিতেছেন, 'ইহাদের বংশে আর কাহারও কবিরাজ উপাধি ছিল না

ও নাই।” আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে আসামের বৈদ্যগণের নাম ‘বেজ-বরুয়া’, কবিরাজ নহে। বেজবরুয়া অর্থে বৈদ্যরাজ বা কবিরাজ হইলেও, কবিরাজ শব্দটী আসামী বৈদ্যগণের মধ্যে চলে নাই, ‘বেজ’ ও ‘বেজবরুয়া’ চলিয়াছে। বাঙ্গালায় যেমন অপর শ্রেণীর ব্রাহ্মণকে ‘বৈদ্য’ বলে না, আসামেও সেইরূপ অপর শ্রেণীর চিকিৎসাভিজ্ঞ ব্রাহ্মণকে ‘বেজবরুয়া’ বলে না। যাহা হউক, বাঙ্গালার ন্যায় আসামে ‘কবিরাজ’ শব্দটী জাতি বিশেষে নিবদ্ধ না হওয়ায় কোন কবিত্বসম্পন্ন ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণের প্রতি ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে উহা একবার মাত্র প্রযুক্ত হইতে দেখা যায়! কিন্তু বাঙ্গালাদেশের ব্যবহার জানিতে হইলে আমাকে পদে পদে আসামে যাইতে হইবে কেন? কালীবাবু আসামীদের সঙ্গে মিশিয়া দৈববিড়ম্বনায় আসামী হইয়াছেন, কিন্তু স্বপক্ষ সমর্থন করিতে তাহাদের মধ্যে একটীর অধিক ‘কবিরাজের’ সন্ধান পাইলেন না কেন? ইহাতেই কি সপ্রমাণ হয় না, যে বাঙ্গালার কবিরাজদিগের প্রভাবে আসামেও অবৈদ্যের প্রতি ‘কবিরাজ’ শব্দ অপ্রচলিত ছিল?

উল্লিখিত দশটী প্রসঙ্গে বৈদ্যপ্রবোধনী যে প্রণালী অনুসারে বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব সপ্রমাণ করিয়াছেন, সেই প্রণালীর অনুসরণ পূর্ব্বক শ্রুতি, স্মৃতি, অভিধান, ইতিহাস, লোকাচার, বাঙ্গালা সাহিত্য, প্রসিদ্ধি —সকল দিক্ হইতে দেখান হইল যে, **বৈদ্য মুখ্য ব্রাহ্মণ**, বৈশ্যবর্ণ নহে। কালীবাবুর বৈদ্য পুস্তকখানি কিরূপ ভ্রান্তিজালে পরিপূর্ণ তাহা কতক দেখাইলাম। যে যে স্থলে কালীবাবু মোহ বশতঃ বৈদ্যকে অব্রাহ্মণ সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন, সেই সেই স্থলেই সাংঘাতিক ভুল করিয়াছেন। সাধু ব্যক্তি ভ্রম বুঝিতে পারিলে লজ্জিত হইয়া সংশোধন করিয়া লন, আমরাও আশা করি, শ্রীযুক্ত রায়-বাহাদুর বৈদ্য পুস্তকের তৃতীয় সংস্করণে ভ্রম স্বীকার পূর্ব্বক বৈদ্য ভ্রাতৃবৃন্দকে এবং পুরোহিত মহাশয়গণকে ব্রাহ্মণাচার পালন করিতে ও করাইতে উদ্বোধিত করিবেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

বৈদ্য অম্বষ্ঠ নহে।

অতঃপর, বৈদ্য যে অম্বষ্ঠ নহে, তাহাই দেখাইতেছি। (১) ভারতের শ্রেষ্ঠ আয়ুর্ব্বেদবিৎ বঙ্গীয় বৈদ্যজাতি যদি মনূক্ত অম্বষ্ঠ জাতি হইত, তবে ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও যত্র তত্র অম্বষ্ঠনামক চিকিৎসাবৃত্তিক জাতিবিশেষের সত্তা অবশ্যই দেখিতে পাওয়া যাইত। কারণ, মনুর বচন নিখিল ভারতবর্ষ সম্বন্ধে প্রযোজ্য, তিনি বাঙ্গালার প্রতি প্রেমাধিক্য বশতঃ কেবল বাঙ্গালী বৈদ্যদিগের উৎপত্তির গুপ্তকথা প্রকাশ করিয়াছেন, অথবা মনূক্ত অম্বষ্ঠজাতি বঙ্গের প্রেমে পড়িয়া, ভারতের অন্যান্য সকল প্রদেশ ত্যাগ করিয়া বাছিয়া বাছিয়া অনার্য্যাধ্যুষিত বঙ্গের জলাভূমিতে নিঃশেষে আসিয়া বাস করিতেছে, একথা নিতান্তই অশ্রদ্ধেয়। (২) পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভারতের অন্যত্র কুত্রাপি অম্বষ্ঠজাতীয় চিকিৎসকের সত্তা নাই, সর্ব্বত্রই আয়ুর্ব্বেদবিৎ বৈদ্য (চিকিৎসক) বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ বলিয়াই বিদিত। এই সকল দেশে 'পুরোহিত' 'উপাধ্যায়' 'আচার্য্য' বা 'গুরু' বলিলে যেমন ব্রাহ্মণকেই বুঝায়, সেইরূপ 'বৈদ্য' (আয়ুর্ব্বেদবিৎ চিকিৎসক) বলিলেও কেবল ব্রাহ্মণকেই বুঝায়। (৩) অপি চ বঙ্গের বৈদ্য সাধারণ আপনাদিগকে অম্বষ্ঠ বলিয়া অবগত নহেন। (৪) তাঁহাদের প্রাচীন কুলাচার্য্য চায়ু ও দুর্জ্জয় স্বপ্রণীত কুলগ্রন্থে অম্বষ্ঠ শব্দ ব্যবহার করেন নাই, বৈদ্যের যে বৈশ্যাগর্ভে উৎপত্তি তাহাও বলেন নাই। চায়ুর সময় প্রায় ৭০০ বৎসর পূর্ব্বে; দুর্জ্জয়ের সময় ১৪০০ খৃষ্টাব্দে। কবি কণ্ঠহারের কুলপঞ্জীতেও অম্বষ্ঠ শব্দ বা বৈদ্য-উৎপত্তি বিষয়ক কোন কথাই নাই। 'বৈদ্যজাতির ইতিহাস' প্রণেতা স্বর্গত বসন্তকুমার সেন শর্ম্মা, বি-এল্ মহোদয় লিখিয়াছেন যে, কুলাচার্য্যগণ পূর্ব্ববর্ত্তীদিগের

মতানুসারেই কুলগ্রন্থ রচনা করেন। কালীবাবুরও ঐ মত (বৈদ্য, পৃঃ ৭)। এরূপ ক্ষেত্রে চায়ু, দুর্জ্জয় ও কণ্ঠহার প্রণীত কুলগ্রন্থে বৈদ্যের অম্বষ্ঠত্ব সম্বন্ধে কোন কথা না থাকায়, ১৩৪৭ খৃষ্টাব্দে প্রণীত চতুর্ভুজের মূলগ্রন্থে বৈদ্যোৎপত্তি-কাহিনী ও অম্বষ্ঠ শব্দ ছিল না বলিয়াই মনে হয়। বর্ত্তমানে চতুর্ভুজে অম্বষ্ঠ সম্বন্ধে যে সকল নির্ম্মূল স্কন্দবচন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা রাজা রাজবল্লভের সময়েই অর্থাৎ ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে রচিত ও প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে হয়। কারণ কূলাচার্য্য ভরতমল্লিক- ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দে, অর্থাৎ আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে, যখন রত্নপ্রভা ও চন্দ্র প্রভা নামক কুলগ্রন্থদ্বয় রচনা করিয়াছিলেন, তখনও তিনি চতুর্ভুজে ঐ সকল স্কন্দবচন দেখিতে পান নাই। বসন্ত বাবু বলেন, তদানীন্তন- কালেও যদি চতুর্ভুজে ঐ সমস্ত বচন থাকিত, তাহা হইলে চন্দ্রপ্রভায় তিনি অন্যপ্রকার কথার অবতারণা করিতেন না। (৫) ইহা হইতে বুঝা যায় যে, আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে বৈদ্যপণ্ডিতদের মনে, তাঁহাদের শাস্ত্রীয় জাতি নাম অম্বষ্ঠ এই ধারণা সবে মাত্র জন্মিতেছিল, গালব মুনি সম্বলিত বিচিত্র গল্পকাহিনী তখনও তাঁহারা শুনেন নাই। শাস্ত্র- চর্চ্চাপর স্মার্ত্তব্রাহ্মণদিগের নিকটে শুনিতে শুনিতে বৈদ্যদিগের মধ্যে কাহারও কাহারও অম্বষ্ঠত্বে বিশ্বাস সবে জন্মিতেছিল, কিন্তু বৈদ্যসাধারণ ঐ জাতি নাম তখনও অঙ্গীকার করে নাই। (৬) বঙ্গের ছত্রিশ জাতিও কোন কালে বৈদ্যকে অম্বষ্ঠ বলিয়া জানিত না। (৭) বৈদ্যের অম্বষ্ঠ নাম বাঙ্গালা ভাষায় কখনও ব্যবহৃত হয় নাই। (৮) কোনও প্রাচীন অভিধানে বৈদ্য ও অম্বষ্ঠ একার্থক বলা হয় নাই। (৯) একটা সমগ্র জাতি তাহার জাতিনাম একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিল, বা সমস্ত দেশবাসীর চক্ষে ধূলা দিয়া অম্বষ্ঠ নামটীর পরিবর্ত্তে একদিন বৈদ্য শব্দ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, ইহা কখনও সম্ভবপর নহে। (১০) বৈদ্যজাতির শাস্ত্রীয় ও সংস্কৃত নাম 'অম্বষ্ঠ' হইলে সংস্কৃত

ভাষায় লিখিত বৈদ্যকুলজী গ্রন্থগুলির নাম 'অম্বষ্ঠ কুলপঞ্জিকা' হইত, 'বৈদ্য-কুলপঞ্জিকা' হইত না। (১২) বাঙ্গালার রাজার জাতির এবং শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত সম্প্রদায়ের জাতীয় নাম অম্বষ্ঠ হইলে, লোকে কখনই উহা বিস্মৃত হইত না। 'হাম্ বৈদ্যের' গল্পের পরিবর্ত্তে 'হাম-অম্বষ্ঠ' শুনা যাইত, অম্বষ্ঠ বলিয়া পরিচয় দেওয়া শ্লাঘনীয় হইত, এবং (১২) ঐ শব্দ অন্ততঃ অপভ্রংশরূপে ভাষায় ও সাহিত্যে প্রচলিত থাকিত। এরূপ অবস্থায় এই অনুমান বোধ হয় অমূলক নহে যে, **বাঙ্গালার বৈদ্যজাতি মনূক্ত অম্বষ্ঠ জাতি নহে**; কিন্তু কোন সময়ে পণ্ডিতগণের বিদ্যাসহচরী অবিদ্যার প্রভাবে বৈদ্যজাতির উপর অম্বষ্ঠত্ব আরোপিত হইয়া রজতে শুক্তিভ্রমবৎ বৈদ্যজাতিতে অম্বষ্ঠত্বরূপ ভ্রম উৎপাদন করিয়াছে। বঙ্গীয় বৈদ্যজাতি যদি মনূক্ত অম্বষ্ঠ জাতি না হয়, এবং সমগ্র ভারতেও যদি অম্বষ্ঠ জাতি কুত্রাপি স্বরূপতঃ দৃষ্ট না হয়, তবে সেই অম্বষ্ঠ জাতি কোথায় গেল, তাহার কি হইল, এরূপ প্রশ্নের উত্তরের জন্য আমরা দায়ী নহি। তথাপি এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, ভারতে বর্ত্তমানকালে মূর্দ্ধাভিষিক্ত, সূত, মাগধ, বৈদেহক প্রভৃতি নানা জাতিকে যেমন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, অম্বষ্ঠ জাতিকেও তদ্রূপ খুঁজিয়া পাইবার উপায় নাই। হয় তো অম্বষ্ঠ বলিয়া কখন কোন জাতি ছিল না, ঐ নাম ও উৎপত্তিসূচক বৈশিষ্ট্য চিকিৎসাবৃত্তি-পর লোকদিগের উপর কোন এক সময়ে আরোপিত হইয়াছিল, অথবা সত্যই ঐরূপে উৎপন্ন এবং ঐ নামধারী কোন জাতি থাকিলেও, মূর্দ্ধাভিষিক্ত, সূত প্রভৃতি যেমন ব্রাহ্মণাদি জাতির মধ্যে অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া তাহার সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছে, অম্বষ্ঠ জাতিও সেইরূপ করিয়াছে। ইহাও বলা আবশ্যক যে, অম্বষ্ঠ জাতির আবির্ভাব সুদূর বঙ্গদেশ অপেক্ষা মনুর স্বদেশে অর্থাৎ পশ্চিমভারতে হওয়াই অধিক সম্ভব ছিল, এবং বৈদ্যেরা বঙ্গে আসিবার বহুপূর্ব্বে পশ্চিম ভারতেই অম্বষ্ঠদের তিরোভাব হইয়া

থাকিবে। দুই হাজার বৎসরের মধ্যে প্রাচীন ভারতে চিকিৎসাজীবী অম্বষ্ঠ জাতি ছিল বলিয়া কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে ঐ সময়ের পূর্ব্বে অম্বষ্ঠ জাতি তাহার জাতীয় সত্তা হারাইয়া ফেলিলে দশম শতাব্দীতে আদিশূরের নেতৃত্বে বঙ্গে আসিয়া দেখা দেয় কিরূপে ?

কিন্তু মূর্দ্ধাভিষিক্ত, অম্বষ্ঠ প্রভৃতি জাতিগুলির উৎপত্তি কে কবে দেখিতে গিয়াছে। মনু অম্বষ্ঠোৎপত্তির যে সংবাদ দিয়াছেন, তাহা সত্য হইলে, মনু স্বয়ং অম্বষ্ঠোৎপত্তির পরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু এ পক্ষে নানা দোষ আসিয়া পড়ে। মনু পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিলে, অম্বষ্ঠ সংবন্ধে বাক্যটীই পরে প্রক্ষিপ্ত অর্থাৎ জাল বলা হয়। আশা করি কালী বাবু এজন্য আমাকে নাস্তিক বলিবেন না। যাহা হউক, অম্বষ্ঠের উৎপত্তির পূর্ব্বে ও পরে বিশুদ্ধ (মুখ্য) ব্রাহ্মণেরা চিকিৎসা করিতেন, তাহা ঋগ্বেদে ও আয়ুর্ব্বেদে পাওয়া যায়। তবেই বৈদ্য জাতিকে সনাতন বৈদ্যকুলজ ব্রাহ্মণ না ভাবিয়া অম্বষ্ঠ বংশধর মনে করা লঘু পন্থা নহে।

কোন কোন পণ্ডিত বলেন যে, প্রাচীন অসবর্ণ বিবাহের ইতিহাসে তিনটী সুস্পষ্ট স্তর দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম স্তরে চারি বর্ণের স্ত্রীতে ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণ হইত; দ্বিতীয় স্তরে শূদ্রা স্ত্রী বাদ পড়িয়া গেল, কিন্তু ত্রিবর্ণীয়া দ্বিজা স্ত্রীতে ব্রাহ্মণের পুত্র বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ হইত; তৃতীয় স্তরে বৈশ্যাগর্ভজাত ও ক্ষত্রিয়া গর্ভজাত ব্রাহ্মণের পুত্রেরা অপসদ বা ঈষৎ নিন্দিত ব্রাহ্মণ বলিয়া বিদিত হইত (মনু ১০।১০)*, এবং

* কেহ বলেন, আরও একটী স্তর মধ্যে ছিল, ঐ সময়ে বৈশ্যাপুত্র বৈশ্য (মাতৃবর্ণ) হইত কিন্তু ক্ষত্রিয়া-পুত্র ব্রাহ্মণ হইত। কিন্তু ইহাকে টীকাকারদের অনুসরণ মাত্র মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। ক্ষত্রিয়কন্যা ও বৈশ্যকন্যা উভয়েই দ্বিজ কন্যা ও উভয়েই নামান্তে 'দেবী' শব্দ ধারণ করিতেন। ব্রাহ্মণ শর্ম্মান্ত নামে মন্ত্র প্রয়োগ পূর্ব্বক ইহাদিগকে বিবাহ করিলে, উভয়েই ব্রাহ্মণের গৃহিণী অর্থাৎ ব্রাহ্মণী হইত;

কেবল ব্রাহ্মণ কন্যার গর্ভজাত পুত্রই অনিন্দিত ব্রাহ্মণ বলিয়া সমাজে গৃহীত হইত (ঐ)। এইরূপ স্তরবিভাগ সত্য হইলে প্রথম ও দ্বিতীয় চালানে বৈশ্যাগর্ভজাত ব্রাহ্মণপুত্রেরা অনিন্দিত ব্রাহ্মণ বলিয়াই সমাজে গৃহীত হইয়াছিলেন। তবে তৃতীয় চালানের অম্বষ্ঠের স্কন্ধে যে দোষ অর্পণ করা হইয়াছে, তাহা কল্পিত বলিতে হানি কি ? (১৩) মনুর পৌত্র পুনর্ব্বসু প্রণীত চরক সংহিতায় অম্বষ্ঠের নাম গন্ধও নাই, কোন আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থেই অম্বষ্ঠের উল্লেখ নাই, চিকিৎসারও নিন্দা নাই, বরং ভূরি ভূরি প্রসংসা আছে। সুতরাং মনুর সময়ে চিকিৎসার নিন্দাও ছিল না, বৈশ্যাগর্ভজাতেরা অনিন্দিত ব্রাহ্মণও হইত। বর্ত্তমান আকারের মনুসংহিতা যখন রচিত হয়, তখনকার সমাজে অসবর্ণ বিবাহ অপ্রশস্ত বলিয়া গণ্য হওয়ায় তৎসূচক বাক্যও উহাতে প্রক্ষিপ্ত হয়। উহার বহু পরবর্ত্তী কালে বোধ হয় টীকাকার মেধাতিথির সময়ে চিকিৎসাবৃত্তির গৌরব ক্ষুণ্ণ হওয়ায় † চিকিৎসা বিক্রেতা বা চিকিৎসাজীবীর নিন্দাসূচক প্রাচীন শাস্ত্র বাক্যগুলিকে চিকিৎসার নিন্দাসূচক মনে করিয়া, চিকিৎসক ব্রাহ্মণেরা অসবর্ণ বিবাহ জাত নিকৃষ্ট ব্রাহ্মণ, অনেকটা এইরূপ বচন ঐ সংহিতার মধ্যে প্রবিষ্ট করা হইয়াছিল ('অম্বষ্ঠানাম্ চিকিৎসনম্')। সমাজে চিকিৎসা ও চিকিৎসক সম্বন্ধে কোন বিকৃত ধারণা না জন্মে, এ জন্য সাধু মহাত্মারা যে কিছু

তাহাদের গর্ভজাত পুত্র পিতৃপিণ্ডদায়ী ও পিতৃধনে অধিকারী হইত। মনু যে দ্বাদশ প্রকার পুত্রের কথা বলিয়াছেন, তাহাতে ঔরস, ক্ষেত্রজ, দত্তক, কৃত্রিম, কানীন, পৌনর্ভব, শৌদ্র প্রভৃতি দেখা যায়। ব্রাহ্মণের শূদ্রা গর্ভজাত পুত্র 'শৌদ্র' ; ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যাতে জাত পুত্র 'ঔরস'। নচেৎ অন্য নাম থাকিত। মনু, ৯।১৫৯—, ১৬০ ও ১৬৬

† এই গৌরবহানি অর্থগৃধ্নুতা বশতঃ হইয়াছিল। শাস্ত্রে চিকিৎসকের যে নিন্দা আছে, তাহা চিকিৎসাজীবী বা চিকিৎসা-বিক্রেতাকে লক্ষ্য করিয়া।

তাহা হইলেও বঙ্গদেশীয় বৈদ্যদিগের চিরন্তন উৎকৃষ্ট ও অনিন্দিত চিকিৎসা প্রণালী হইতেই বুঝা যায় যে, তাঁহারা অম্বষ্ঠ নহেন।

যাহাই হউক, শাস্ত্রে অম্বষ্ঠের এই নিন্দার ফলে, ভারতের উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ প্রদেশে চিকিৎসক ব্রাহ্মণগণ সাবধান হইয়া গিয়াছেন। তাঁহারা সনাতন বৈদ্যকুলজ ব্রাহ্মণ এবং তাহা বলিয়াই পরিচয় দেন। তাঁহারা বৈদ্যসম্প্রদায় রূপে সাধারণ ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় হইতে আপনাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া পৃথক্ একটী জাতির সৃষ্টি পূর্ব্বক 'অম্বষ্ঠ' নামের বিষয়ীভূত হন নাই! বাঙ্গালী স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণের কৃত অম্বষ্ঠত্বারোপ তাঁহারা ব্যর্থ করিয়াছেন। বাঙ্গালী বৈদ্যগণ রাজজাতি বলিয়া স্বাতন্ত্র্যভজনা করায় কান্যকুব্জীয় হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণগণ বাঙ্গালী সপ্তশতী ব্রাহ্মণদের সহিত মিলিত হইয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু বৈদ্যব্রাহ্মণ সম্প্রদায় দৃঢ়তার সহিত আপনাদের জাতীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াই চলিতেছিলেন। তখন শাস্ত্রের অভিপ্রায় অনুসারে 'বৈদ্য' শব্দ সাধারণ 'ব্রাহ্মণ' শব্দ হইতে অধিক গৌরবময় ছিল! পশ্চিমে এখনও সনাতন বৈদ্যকুলজ সারস্বত ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠতা সর্ব্বত্র স্বীকৃত। কিন্তু বাঙ্গালায় বল্লাল-লক্ষ্মণ কলহের ফলে বহুবৈদ্য নিরুপবীত হইয়া শূদ্রবৎ হইলে, অবশিষ্ট মুষ্টিমেয় বৈদ্যকে ঈর্ষ্যাপর ব্রাহ্মণেরা যা খুসী বলিত। এইরূপে 'ব্রাহ্মণ' বলিতে যখন বাঙ্গালাভাষায় কেবল পুরোহিত-শ্রেণীকেই বুঝাইতে লাগিল, তখন বর্ণসূচক ব্রাহ্মণ নাম জাতিনামে পর্য্যবসিত হইল। বৈদ্য শব্দও ধীরে-ধীরে জাতিসূচক হইয়া পড়িল। সেনরাজগণের সমসাময়িক মেনহাজের তবাকাত-ই-নসিরিতে 'বৈদ্য' শব্দ জাতি অর্থেই আছে। 'বৈদ্য'জাতি বা অম্বষ্ঠ-জাতির হীনতা সম্বন্ধে যাহা কিছু শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা বঙ্গীয় বৈদ্যজাতিকে লক্ষ্য করিয়া বাঙ্গালী ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা রচিত, ইহা

বেশ পরিষ্কার বুঝা যায়। উহা প্রকৃত শাস্ত্রোক্তি হইলে, মূর্দ্ধাভিষিক্ত বা মাহিষ্য সম্বন্ধেও শাস্ত্রে কিছু কিছু কথা থাকিত।

(১৬) বাঙ্গালী বৈদ্যের উৎপত্তি-কাহিনী নবদ্বীপের ত্রিকালদর্শী পণ্ডিতেরাই রচনা করিয়াছিলেন, উহা মনু বা বেদব্যাসের নহে। আমরা জিজ্ঞাসা করি, ২০ কুড়িখানি প্রধান স্মৃতির মধ্যে কেবল মনুর একটী শ্লোকে 'অম্বষ্ঠানাম্ চিকিৎসনম্' দেখা যায় কেন? আর কোনও স্মৃতিতে এরূপ কথা দেখা যায় না কেন? উশনার বাক্য বলিয়া যে বাক্যটী প্রসিদ্ধ আছে, তাহাতে অম্বষ্ঠের চারি প্রকার বৃত্তি দেখা যায়, কিন্তু চিকিৎসার কোনও উল্লেখই নাই! আপ্তের প্রকাশিত প্রসিদ্ধ স্মৃতি-সমুচ্চয় নামক বোম্বাই সংস্করণ হইতে বাক্য উদ্ধার করিয়া দেখাইতেছি—

উশনা বলিতেছেন—

'বৈশ্যায়াং বিধিনা বিপ্রাজ্জাতোঽম্বষ্ঠ উচ্যতে।
কৃষ্যাজীবো ভবেত্তস্য তথৈবাগ্নেয়নর্ত্তকঃ।
ধ্বজবিশ্রাবকা বাপি **অম্বষ্ঠা শস্ত্রজীবিনঃ**॥

উশনা, ৪৭ পৃষ্ঠা

অর্থাৎ, ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বিধি পূর্ব্বক বিবাহিত বৈশ্যকন্যাতে অম্বষ্ঠ জন্মগ্রহণ করে। সে জীবিকার জন্য কৃষি করে, অগ্নি পূজায় (?) নৃত্য করে, ধ্বজ বহন করে এবং শস্ত্রধারী হইয়া যুদ্ধ করে। [এস্থলে দুইটী পাঠান্তর আছে, 'আগ্নেয়জীবিকঃ' ও 'ধ্বজিনীজীবিকাঃ' তাহা হইতে কোনরূপ অগ্নিঘটিত কর্ম্মদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ ও সৈনিক বৃত্তি বুঝা যায়]

এ স্থলে **চিকিৎসার নাম-গন্ধ নাই কেন?** চিকিৎসাই যদি অম্বষ্ঠের প্রধান বৃত্তি হইত, তবে এস্থলে তাহার উল্লেখ নিশ্চয় থাকিত না কি? আমাদের মনে হয়, এ প্রসঙ্গে বৈদ্যপ্রবোধনী

যে ভুল করিয়াছেন, কালীবাবুও সেই ভুল করিয়াছেন। বৈদ্যপ্রবোধনীর প্রকৃত ভুল দেখাইবার ক্ষমতা কালীবাবুর নাই। কালীবাবু ঐ শ্লোক নিম্নলিখিত মত উদ্ধার করিয়া বাজে কথা কহিয়াছেন—

বৈশ্যায়াং বিধিনা বিপ্রাজ্জাতোঽম্বষ্ঠ উচ্যতে।
কৃষ্যাজীবো ভবেত্তস্য তথৈবাগ্নেয়বৃত্তিকঃ।
ধ্বজিনী জীবিকা চৈব চিকিৎসাশাস্ত্র-জীবকঃ॥

(বৈদ্য, পৃঃ ১১)

এস্থলে কালীবাবু 'পুনা-স্মৃতিসমুচ্চয় ৪৭ পৃষ্ঠা' বলিয়া এই বাক্যকে কিরূপে তুলিলেন? ধর্ম্মপ্রচার জাতিতত্ত্ববিবেক প্রভৃতি পুস্তকে এবং প্রবোধনীতে ইহা ভুল উঠান হইয়াছে। বঙ্গবাসীর সংস্করণে উহা একেবারেই নাই, সুতরাং আপদ্ চুকিয়াছে। একমাত্র পুনা স্মৃতি সমুচ্চয়ে উহা আছে, এবং 'আগ্নেয়-নর্ত্তকঃ' স্থলে 'আগ্নেয়জীবিকঃ' ও 'ধ্বজবিশ্রাবকাঃ স্থলে 'ধ্বজিনীজীবিকাঃ' এইরূপ পাঠান্তর অন্য পুথিতে আছে, তাহাও ফুটনোটে বলা হইয়াছে। সুতরাং আপ্তে মহোদয় সকল পাঠই দেখিয়াছিলেন, কিন্তু **'চিকিৎসাশাস্ত্র-জীবকঃ'** এই নয়নরঞ্জন পাঠ কুত্রাপি দেখেন নাই! উহা মূলেও নাই, ফুটনোটেও নাই!!

কালীবাবু অনুবাদে লিখিয়াছেন,—"কৃষি, আগ্নেয় (?) সেনাপত্য (?) ও **চিকিৎসা** তাহাদের বৃত্তি।

কাহারও মতে বৈদ্যগণ উশনাকথিত অম্বষ্ঠ নহে, কারণ তাহাদের কৃষি, আগ্নেয় (?) ও সেনাপত্য (?) বৃত্তি নাই। কোন জাতির যে কয়টী বৃত্তি শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট থাকে, তাহার সব গুলিই যে প্রচলিত থাকিতে হইবে, ইহার কোন অর্থ নাই। আর কোন কালেও যে বৈদ্যগণের দেশ ভেদে এই সকল বৃত্তি ছিল না, তাহার কোনও প্রমাণ নাই।"

জিজ্ঞাসা করি; মূলে 'চিকিৎসার' কথাই নাই, তবে চিকিৎসা লইয়া এ বিচার-বিতর্ক কি জন্য! কালীবাবু বলিতেছেন, কৃষি, আগ্নেয় বৃত্তি, সৈনিক বৃত্তি বৈদ্যের নাই বলিয়া যে বৈদ্য অম্বষ্ঠ নহে, তাহা নহে; আমরা বলি, বৈদ্যের প্রধান বৃত্তি চিকিৎসা অম্বষ্ঠে নাই এবং অম্বষ্ঠের কোন বৃত্তি কৃষি, অগ্নিকাণ্ড বা লাঠি-চালা বৈদ্যে নাই এই জন্যই বৈদ্য ও অম্বষ্ঠ সম্পূর্ণ পৃথক্ বস্তু, **বৈদ্য অম্বষ্ঠ নহে।**

মনুর মধ্যে প্রক্ষেপের কথায় এই জন্যই আরও বিশ্বাস হয়। অম্বষ্ঠের চিকিৎসা বৃত্তি থাকিলে বিস্তীর্ণ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে তাহার নাম একবার কুত্রাপি থাকিত না কি? আয়ুর্ব্বেদ পাঠে কে অধিকারী, সৎ-বৈদ্য কিরূপ লক্ষণযুক্ত, কাহাকে চিকিৎসক বলে, এ সকল প্রসঙ্গে অম্বষ্ঠের নামটী একটীবারও নাই কেন? আর যখন বৈদ্যের কথা উঠিল, তখন কোন পুরাণে ব্রাহ্মণের ভার্য্যাতে অশ্বিনীকুমার কর্তৃক, কোন পুরাণে বৈশ্যাতে ব্রাহ্মণ কর্তৃক বলাৎকার দ্বারা, কোন স্থানে বৈশ্যাতে শূদ্র কর্তৃক, কোন স্থানে ব্রাহ্মণ কর্তৃক বিবাহিত ক্ষত্রিয়াতে, কোন পুরাণে ব্রাহ্মণ কর্তৃক ক্ষত্রিয় পত্নীতে ব্যভিচার দ্বারা, কোন স্থানে বর্ণসঙ্কর কোন স্থানে শূদ্র এইরূপ ১৭ রকমের অসম্ভব কাহিনী জাল পুরাণ-উপপুরাণে ছড়াইয়া বিরাজ করিল! ঐ অংশগুলি যে জাল, তাহা প্রমাণ করিয়া দিবার উপায় আছে। কিন্তু উৎপত্তি বিষয়ে এই সকল বিবরণের মধ্যে ঘোরতর অসামঞ্জস্য থাকিলেও বাঙ্গালার দুষ্ট ব্রাহ্মণদের মনে একটা অদ্ভুত সামঞ্জস্য এই আছে যে, বঙ্গদেশীয় বৈদ্যগণ এই সকল গুলির সহিতই অভিন্ন! যাহাদের গালাগালি দেওয়াই উদ্দেশ্য তাহারা এক নিশ্বাসে শ্যালক, শ্যালকপুত্র, পৌত্র সকল রকম বলিয়াই গালি দেয়, সামঞ্জস্যের দিকে দৃক্‌পাত করে না। দুষ্ট বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ পুরাণ-উপপুরাণে বৈদ্যকে লক্ষ্য করিয়া সেইরূপ কাণ্ড করিয়াছে এবং

ঐরূপ একটী জাল বচন মনুর মধ্যেও ঢুকাইয়া দিয়াছে! ইহা জিজ্ঞাসু পাঠকগণকেই বলিলাম। কালীবাবুকে **আমরা মনুবাক্য প্রক্ষিপ্ত বলিতে চাহি না।** কারণ এরূপ বলিলে শাস্ত্র-বিশ্বাসী কালীবাবুর সহিত বিচারে অগ্রসর হওয়াই অসম্ভব হইতে পারে। এজন্য আমরা মন্বাদি-স্মৃতিবাক্যকে এবং অবিরোধি পুরাণবাক্যকে অবনতকন্ধরে মানিয়া লইব। কিন্তু স্মৃতিতে বা পুরাণে কুত্রাপি এমন কথা বলা হয় নাই যে, বঙ্গীয় বৈদ্যগণ বৈদ্যকুলজ ব্রাহ্মণ নহে, উহারা অম্বষ্ঠ। অতএব যে কথা কোন শাস্ত্রে নাই, যাহা বৈদ্য কুলাচার্য্যগণ স্বীকার করেন না, যাহা বৈদ্য পণ্ডিত-অপণ্ডিত কেহই বিশ্বাস করেন না, তাহা যে প্রতিপক্ষ বাঙ্গালী স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বৈদ্যসম্প্রদায়ের উপরে আরোপিত তাহাতে সন্দেহ নাই। মনু বলিয়াছেন, অম্বষ্ঠের চিকিৎসা বৃত্তি; বাঙ্গালার বৈদ্যসম্প্রদায়কেও চিকিৎসারত দেখা যাইতেছে; অতএব বাঙ্গালার 'বৈদ্যগণ অম্বষ্ঠ', কালীবাবু ও সত্যেন্দ্র বাবুর নাকে দড়ি দিয়া এইরূপ যুক্তিতর্কের পথে কাহারা টানিয়া লইয়া যাইতেছে?

শ্রীযুক্ত গোলাপ শাস্ত্রী, 'হিন্দু ল' নামক প্রসিদ্ধ পুস্তকে বলিয়াছেন, স্মৃতি বা পুরাণের মিশ্রজাতি নিচয়ের উৎপত্তি কাহিনী নিছক্ কল্পনা-প্রসূত। বৃত্তি অনুসারে এক একটী সম্প্রদায় উচ্চ-নীচ এক একটী জাতিতে পরিণত হইলে, তাহাদের স্বভাব পর্য্যালোচনা করিয়া মিশ্র উৎপত্তির কল্পিত বিবরণ রচিত হইয়াছিল; উদাহরণ যথা, অম্বষ্ঠ নামক জাতিকে (নামটী যেরূপেই লব্ধ হউক) একদিকে ব্রাহ্মণোচিত বিদ্যা ও চারিত্র্যোৎকর্ষ দ্বারা ভূষিত এবং অপরদিকে বৈশ্যবৎ অর্থোপার্জ্জনে রত দেখিয়া (Brahmanic learning and culture and trade with that) তাহাকে বাণিজ্যজীবী বৈশ্যের কন্যায় ব্রাহ্মণের ঔরসে

উৎপন্ন বলা হইয়াছে, কিন্তু ইহা কল্পনামাত্র (play of imagination, fancy), ইহার মূলে কোন সত্য নাই। *

কিন্তু কালীবাবুকে আমরা একথা শুনাইতে চাহি না। তাঁহাকে আমরা শুধু এই বলি যে, মনূক্তির সহিত বিরোধ বশতঃ যেমন অন্যান্য পুরাণাদির বিচিত্র অম্বষ্ঠোৎপত্তি কাহিনী মিথ্যা বলিয়া পরিত্যাজ্য, তদ্রূপ ঐ মনূক্ত অম্বষ্ঠ জাতির নিন্দিত চিকিৎসাই বৃত্তি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় বৈদ্যনামক অনিন্দিত চিকিৎসারত বঙ্গীয় সম্প্রদায় **মনুর প্রমাণেই অম্বষ্ঠজাতি নহে।** বঙ্গের বাহিরে আয়ুর্ব্বেদোপজীবী অম্বষ্ঠ পদবাচ্য দ্বিজজাতি নাই। দক্ষিণ ভারতে নাপিত অপেক্ষা হীন নিকৃষ্ট শূদ্রবর্ণীয় অম্বষ্ঠ দেখা যায়। বিহারে অম্বষ্ঠ-কায়স্থ আছে। সুতরাং মনুতে ও মনুশাসিত ভারত সমাজে যে অম্বষ্ঠ দেখা যায়, তাহার সহিত আয়ুর্ব্বেদগুরু বঙ্গীয় বৈদ্যগণের কোন সামঞ্জস্য না থাকায় তাহাদিগকে **কোনও ক্রমেই 'অম্বষ্ঠ' বলা যায় না।**

'অম্বষ্ঠানাম্ চিকিৎসনম্'—এটী মনুর একটী খাঁটি কথা, এইরূপ স্বীকার করিয়াই কালীবাবুর সহিত বিচার করিলাম, সুতরাং আশা করি তিনি কৃপা পূর্ব্বক আমার কথাগুলি শুনিবেন।

কিন্তু উশনার বাক্যে যখন অম্বষ্ঠের চারিটী বৃত্তির মধ্যে চিকিৎসার উল্লেখ নাই, তখন মনুস্মৃতিতে অম্বষ্ঠের চিকিৎসা সূচক বাক্য প্রক্ষিপ্ত বলা যাইতে পারে। এরূপ মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, মনু মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও মাহিষ্যের যেমন নাম করেন নাই, তেমন অম্বষ্ঠের নামও করেন নাই। মূর্দ্ধাভিষিক্তের ও মাহিষ্যের বৃত্তিনির্দ্দেশের যদি প্রয়োজন না হইয়াছিল, তবে অম্বষ্ঠেরও বৃত্তিনির্দ্দেশের প্রয়োজন হয় নাই। বাঙ্গালী

* যেরূপ মনে আছে সেইরূপ লিখিলাম, কথাগুলি ও ভাব এইরূপ। শাস্ত্রী মহাশয় ব্রাহ্মণ মহাশয়দিগের কথামত বঙ্গীয় বৈদ্যজাতিকে অম্বষ্ঠ মনে করিয়াই এইরূপ বলিয়াছেন।

ব্রাহ্মণদের ন্যায় মনু মহারাজেরও কি অম্বষ্ঠের জন্য নিদ্রার ব্যাঘাত হইতেছিল? মনুর যে স্থানে অম্বষ্ঠের বৃত্তি নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহা এই—

যে দ্বিজানাম্ অপসদা যে চাপধ্বংসজাঃ স্মৃতাঃ।
তে নিন্দিতৈর্ব্বর্ত্তয়েয়ুর্দ্বিজানামেব কর্ম্মভিঃ॥
সূতানাম্ অশ্বসারথ্যম্ অম্বষ্ঠানাম্ চিকিৎসনম্।
বৈদেহকানাং স্ত্রীকার্য্যং মাগধানাং বণিকপথঃ॥ ১০।৪৭
মৎস্যঘাতো নিষাদানাং ত্বষ্টিস্ত্বায়োগবস্য চ।
মেদান্ধ্রচুঞ্চুমদ্গূনা মারণ্যপশুহিংসনম্॥ ১০।৪৮ ইত্যাদি।

যেখানে প্রতিলোমজ বর্ণসঙ্করদিগের গায়ের গন্ধে টেঁকা ভার, যেখানে অন্য কোন দ্বিজজাতির মুখ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না, সেই কি অম্বষ্ঠের যোগ্য স্থান? বর্ণসঙ্কর, সঙ্করের সঙ্কর ও শূদ্রাপুত্রগণের মধ্যে দ্বিজ অম্বষ্ঠের আসন চোরা-গোপ্তা পাতিয়া গেল কে? মূর্দ্ধাভিষিক্ত, অম্বষ্ঠ, মাহিষ্য সকলেই দ্বিজগণের নিন্দিত কর্ম্মদ্বারা জীবিকা করিবে, ইহাই বিধি। কিন্তু ঐ বিধি দ্বারা যদি একদিকে মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও অপরদিকে মাহিষ্যের বৃত্তির পরিচয় পাইতে কোনও অসুবিধা না হয়, তবে অম্বষ্ঠের বেলা পৃথক্ নির্দ্দেশের কি প্রয়োজন ছিল? চিকিৎসা অতি পবিত্র কর্ম্ম, সেই পবিত্র চিকিৎসাকে (গবাশ্বাদির হউক, আর শূদ্রাদির হউক) নিন্দিত বলিয়া যে ঘোষণা করিতে পারে, সেই বাক্যটীকে প্রক্ষিপ্ত করিয়াছে! 'বঙ্গীয় বৈদ্যজাতির উৎপত্তির ইতিহাসে' উক্ত হইয়াছে—"বৃত্তির নিন্দা, বৃত্তিজীবীর নিন্দা ও জন্মাপবাদ সকলই নাকি যুগপৎ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল। সার রমেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয় বলেন, দশমাধ্যায়ের অতি বিস্তৃত জাত্যুৎপত্তির তালিকা দেখিলেই বুঝা যায় যে, তাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা—সাজান কথা মাত্র। একটী করিয়া জাতির উল্লেখ ও টকাটক্ অমুকে অমুকে

ইহার উৎপত্তি, এই বলিয়া চিরকালের মত দাগিয়া ৩৪ কুড়ি জাতির কিনারা করা বিচিত্র শক্তির পরিচয় বটে! যে যে কার্য্য বৃত্তিরূপে ইহাদিগকে দেওয়া হইয়াছিল, ইহাদের উৎপত্তির পূর্ব্বে সেই সেই কার্য্য কাহারা করিত? চণ্ডালোৎপত্তির আলোচনাপ্রসঙ্গে দত্ত মহাশয় বলিয়াছেন, বঙ্গে ১৩ লক্ষ ব্রাহ্মণ, কিন্তু ২৫ লক্ষ চণ্ডাল। মনুর মতানুসারে চণ্ডালগণ শূদ্রকর্তৃক ব্রাহ্মণীতে উৎপাদিত হইলে, এইরূপ বলিতে হয় যে, তদানীন্তন ব্রাহ্মণকন্যাদিগের কৃষ্ণকায়-শূদ্রপ্রীতি অত্যন্ত প্রবল ছিল এবং শূদ্রেরাও ব্রাহ্মণকন্যা পাইলে স্বজাতীয় কন্যা সংগ্রহ করিত না। আর এরূপ অবস্থায় ব্রাহ্মণের পক্ষেও সবর্ণা ভার্য্যা সংগ্রহ একরূপ অসাধ্য ব্যাপার ছিল বলিয়া বোধ হয়। এই জন্যই কি ব্রাহ্মণসংখ্যার তুলনায় চণ্ডালসংখ্যা তাহার দ্বিগুণ?

"বস্তুতঃ বাঙ্গালার চিকিৎসক ব্রাহ্মণ সম্পদায়কে ব্রাহ্মণসমাজে হেয় প্রতিপন্ন করিবার জন্যই একটা জন্মমূলক নিন্দার আরোপ করিয়া তাহাকে চিকিৎসাধিকার দান পরবর্ত্তী যুগের স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণের কীর্ত্তি। ব্রাহ্মণ কর্তৃক ক্ষত্রিয়াগর্ভে উৎপাদিত পুত্রের যদি জাতিনামের প্রয়োজন না হইয়াছিল, তবে বৈশ্যাগর্ভজাত সন্তানের কি অপরাধ যে তাহাকে একটী বিশেষ জাতিনাম দিয়া ব্রাহ্মণজাতি হইতে পৃথক করিবার চেষ্টা হয়? মনু নবম অধ্যায়ে দায়ভাগ প্রকরণে বারংবার ক্ষত্রিয়াপুত্র বৈশ্যাপুত্র শূদ্রাপুত্র বলিয়াছেন, কুত্রাপি মূর্দ্ধাভিষিক্ত, অম্বষ্ঠ প্রভৃতি সংজ্ঞা ব্যবহার করেন নাই (মনু ৯।১৫১ : ১৫৩)। ইহা হইতেও মনে হয় মনুর সময়ে ঔরস পুত্রদিগের ঐ সকল নাম সৃষ্ট হয় নাই। ঐগুলি পরবর্ত্তী কালের যোজনা। জালবচন প্রক্ষেপক নকল মহর্ষিরা আপনাদের গোত্র-গুলিকে বাঁচাইবার জন্যই কি ক্ষত্রিয়াগর্ভজাত সন্তানের অঙ্গে আঁচড় কাটিতে চাহেন নাই? আরও দ্রষ্টব্য এই যে কোন সংহিতা বা পুরাণে মূর্দ্ধাভিষিক্তের উৎপত্তিসূচক কোন গল্প-কথা দেখিতে পাওয়া যায় না।

অম্বষ্ঠের 'জ্যেষ্ঠ-সহোদর' এই মূর্দ্ধাভিষিক্তের কোন কিনারা না করিয়াই কনিষ্ঠ অম্বষ্ঠকে ঢাক-ঢোল পিটিয়া জাহির করিতে এই সকল মকল মহর্ষি বিশেষ তৎপর! মাহিষ্য, পারশব, মাগধ, বৈদেহক প্রভৃতি 'ছত্রিশ' জাতির মধ্যে কোন জাতির উৎপত্তির উপন্যাস কেহ কোথাও শুনিল না, কেবল অম্বষ্ঠের পালা লইয়াই আসর গুলজার! অপিচ, অম্বষ্ঠ ও তদীয় বিবিধ গোত্রের উৎপত্তিকাহিনী যে স্কন্দ পুরাণের স্কন্ধে আরোপ করা হইয়া থাকে সেই পুরাণ খানি তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও কোথাও কেহ ঐ অপূর্ব্ব বস্তু খুঁজিয়া পায় নাই! কোন বেদে পুরাণে যে কথা নাই, তাহা যে নিতান্তই অমূলক, তাহা তো অনায়াসে বুঝা যাইতেছে। ঐ কাহিনী বর্ণিত সেন, দাশ ইত্যাদি বংশের পরিচয়গুলি পাঠ করিলে বেশ বুঝা যায়, উহা বঙ্গীয় বৈদ্যজাতিকে লক্ষ্য করিয়াই কোন বঙ্গীয় পণ্ডিত কর্ত্তৃক রচিত হইয়া থাকিবে। বসন্তবাবুর মতে উহা সপ্তদশ খৃষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল। এই সকল বিষয় আলোচনা করিয়া আমরা এই সত্যে উপনীত হইয়াছি যে, বঙ্গীয় বৈদ্যজাতিতে অম্বষ্ঠত্ব-কল্পনা অবিদ্যানিবন্ধন অধ্যাসজনিত ভ্রম মাত্র, উহার সহিত প্রকৃত তথ্যের কোন সংশ্রব নাই। অম্বষ্ঠোৎপত্তির কল্পিত বিবরণকে বঙ্গীয় বৈদ্যজাতির উৎপত্তির বিবরণ বিবেচনা করিয়া, তাহার খণ্ডন বা প্রতিবাদের চেষ্টা স্বপ্নসর্পের দংশনে বিষচিকিৎসার আয়োজনের মত উপহাস্য।"

সত্যেন্দ্র বাবু নূতন আসরে নামিয়াছেন। তিনি কালীবাবুর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া লিখিয়াছেন—"১৫৭৫ শকাব্দে (১৬৫০ খৃষ্টাব্দে) সেনহাটী নিবাসী বৈদ্য রামকান্ত দাস কবিকণ্ঠহার বৈদ্যগণের অম্বষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়াছেন—।" (বৈদ্য—প্রতি, পৃঃ ৩৮) কালীবাবুর ধ্বজা ধরিলে কি এমনই অন্ধ হইয়া চলিতে হয়? 'ভগবান্‌ত চক্ষু

কর্ণ দিয়াছেন—' (পৃঃ ৩৯) তবে সত্য মিথ্যা বুঝিয়া দেখিবার অবসর হয় নাই কেন? কবিকণ্ঠহারের পুস্তক ছাপা হইয়াছে। তাঁহার কোন উক্তি হইতে নিজের কথা সপ্রমাণ করিতে পারিবেন কি? না পারিলে নিজের চক্ষু কর্ণের উপর অতিমাত্রায় আস্থা স্থাপন না করিয়া বৃদ্ধদিগের কথা একটু ভক্তি করিয়া শুনিলেই ত ভাল হয়! কণ্ঠহারে অম্বষ্ঠ শব্দই ব্যবহার হয় নাই! কণ্ঠহার এমন কথা কোনস্থলে বলেন নাই যে বৈদ্য ব্রাহ্মণবিবাহিত বৈশ্যার পুত্র। তিনি কোথাও বলেন নাই যে বৈদ্য একটা অনুলোমজাতি! তবে সত্যেন্দ্রবাবু কেন অসত্য প্রচারে ব্রতী হইয়াছেন? সত্যেন্দ্রবাবু ঐস্থানে পুনশ্চ বলিতেছেন, "আনুমানিক ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দে স্বয়ং বৈদ্য দুর্জ্জয় দাশ বৈদ্যজাতিকে বৈদ্যই বলিয়াছেন' অর্থাৎ ইনি বৈদ্যকে অম্বষ্ঠ বলেন নাই! তবে বৈদ্য প্রতিবোধনীর তৃতীয় পৃষ্ঠায় আমার সুহৃদ্বর কেন লিখিলেন—"১৩৪৭ খৃষ্টাব্দে কুলগ্রন্থকার চতুর্ভুজ, আনুমানিক ১৪০০ খৃষ্টাব্দে কুলগ্রন্থকার **দুর্জ্জয়** দাশ, ১৬৫৩ খৃষ্টাব্দ কুলগ্রন্থকার **কণ্ঠহার**...বৈদ্যজাতিকে অম্বষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন"? কি নিদারুণ মিথ্যা কথা! কুলজী সম্বন্ধে যিনি কখনও কিছু অনুসন্ধান করেন নাই, কুলজী পুস্তকগুলি যিনি চক্ষেও দেখেন নাই, কিছু না জানিয়া না শুনিয়া কলম ধরিতে গেলে তাঁহার এইরূপ দুর্দ্দশাই হইয়া থাকে। বন্ধুবর তৃতীয় পৃষ্ঠায় লিখিলেন, **সকল কুলগ্রন্থকারই বৈদ্যকে 'অম্বষ্ঠ' বলিয়াছেন,** ৩৮ পৃষ্ঠায় একটু চক্ষু ফুটিলে লিখিলেন "**দুর্জ্জয় দাশ বৈদ্য-জাতিকে বৈদ্যই বলিয়াছেন।**" পরে পুস্তক ছাপা হইলে নেত্র আর একটু উন্মীলিত হইলে যখন দেখিলেন কণ্ঠহারেও অম্বষ্ঠ-সম্বন্ধে কোন কথাই নাই, তখন তাড়াতাড়ি ক্রোড়পত্র বাহির করিয়া প্রচার করিলেন, **কণ্ঠহার বৈদ্যকে অম্বষ্ঠ বলেন**

নাই, কিন্তু তথাপি "তাহা বস্তুতঃ যথার্থই বটে"! (ক্রোড়পত্র পৃঃ ১) সত্যেন্দ্রবাবু বলিতেছেন, কণ্ঠহার বৈদ্যকে অম্বষ্ঠ না বলিলে কি হয়, 'কণ্ঠহার কায়ুগুপ্তের জামাতা হইতে (নরসিংহ হইতে) দশমপুরুষ' এবং 'জগন্নাথ কায়ুগুপ্ত হইতে একাদশ পুরুষ; অতএব কণ্ঠহারের সমসাময়িক জগন্নাথ গুপ্ত যখন তদীয় 'ভাবাবলী'তে বৈদ্যকে একস্থানে অম্বষ্ঠ বলিয়াছেন, তখন ও একই কথা! অর্থাৎ কণ্ঠহারই বৈদ্যকে অম্বষ্ঠ বলিয়াছেন! অর্থাৎ যে কথা সত্যেন্দ্রবাবু লিখিয়াছিলেন, তাহা ত অসত্য হইলই না, উপরন্তু তাঁহার সপক্ষে আর একটী নূতন সত্য আবিষ্কৃত হইল! অম্বষ্ঠত্ব পক্ষে অতিরিক্ত একজন কুলগ্রন্থকারের প্রমাণ লাভ হইল' (ক্রোড়পত্র, পৃঃ ২)! সত্যেন্দ্র বাবুর সত্য কথার দ্বারা পুনঃ পুনঃ প্রবঞ্চিত হইয়া এবারে তাঁহার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারিয়া ভাবাবলী খানি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিলাম ও দেখিয়া স্তম্ভিত হইলাম যে, উহারও কুত্রাপি 'অম্বষ্ঠ' শব্দ নাই! অনন্তর তাহার পরবর্ত্তী সংস্করণের আর একখানি ভাবাবলী সংগ্রহ করিলাম, উহা যাজন ব্রাহ্মণ চন্দ্রকান্ত হড় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। এই নবীন সংস্করণের ভাবাবলীতে দেখিলাম একটীমাত্র স্থানে, একেবারে শেষে, একটী নূতন শ্লোকে 'অম্বষ্ঠ' শব্দ আছে! নবীন সংস্করণের এই সংযোজিত শ্লোকটী প্রক্ষিপ্ত তাহা কি আর বলিয়া দিতে হইবে? যে "হড়" ব্রাহ্মণ এই সংস্করণের সম্পাদকতা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনিই অম্বষ্ঠ কথার আমদানী করিয়াছেন! ইহা ত সেদিনের কথা! আমরা সত্যেন্দ্রবাবুকে জিজ্ঞাসা করি, কুলজীর প্রামাণ্যে বৈদ্যকে অম্বষ্ঠ প্রমাণ করিবার চেষ্টা কি এই রূপেই ফলবতী হইবে? এই কি সত্যেন্দ্রবাবুর সত্যানুসন্ধান? সত্যেন্দ্রবাবু বলিয়াছেন, "তাঁহারা—(কুলপঞ্জিকাকারেরা) ব্রাহ্মণত্বের কোনও প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন

নাই" (পৃঃ ৩৮)। ইহা কালীবাবুরই অনুসরণে। কালীবাবুও (বৈদ্য পুস্তকের ৫ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন—"বৈদ্যগণের অনেক কুলজী গ্রন্থ আছে, তাহার একখানিও ব্রাহ্মণত্বের পরিপোষক নহে"। আমরা পূর্ব্বে চন্দ্রপ্রভা ও চতুর্ভুজ হইতে ব্রাহ্মণত্বের প্রমাণ দিয়াছি। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, এই দুই অম্বষ্ঠবর্ণ বৈশ্য মহোদয় আমাদিগকে দেখাইয়া দিন, তাঁহারা ঐ কুলজী গ্রন্থগুলিতে বৈদ্যের বৈশ্যবর্ণত্বের প্রসঙ্গ কোথায় পাইলেন অথবা ঐ কুলগ্রন্থগুলি বৈশ্যত্বের পরিপোষক কিরূপে হইল?

কালীবাবু শব্দকল্পদ্রুমের প্রামাণ্যে বঙ্গীয় বৈদ্যগণকে অম্বষ্ঠজাতি প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। শব্দকল্পদ্রুম আধুনিক গ্রন্থ। আমরা ইহার ও ভরতমল্লিকের সম্বন্ধে পূর্ব্বে (৪৮—৬৮ পৃষ্ঠায়) অনেক কথা বলিয়াছি। ইহাদের উক্তিকে প্রাচীন উক্তি বলা যায় না। কালী বাবু কোন প্রাচীন অভিধান হইতে অম্বষ্ঠ ও বৈদ্য যে একার্থক তাহা সপ্রমাণ করুন না। তাহা হইলে আমরা তাঁহার সকল কথা মানিয়া লইতে প্রস্তুত আছি। 'জাতিতত্ত্বে' কোন জালিয়াৎ যেমন বলিয়াছিল, "চিকিৎসকস্য অম্বষ্ঠস্য ইতি কুল্লূকঃ", কিন্তু কুল্লূকের টীকায় উহা নাই বলিলেও ক্ষমা প্রার্থনা করে নাই, সত্যেন্দ্র বাবু ও কালীবাবু বোধ হয় সেরূপ করিবেন না। অভিধানের প্রমাণ যদি দেখাইতে ইচ্ছা করেন তবে প্রকৃত প্রাচীন অভিধান দেখান। কোন কোন আধুনিক বাঙ্গালা অভিধানে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণেরা যাহা লিখিয়াছে, তাহাদের সহিত বিবাদে তাহাই প্রমাণ, এ বড় মন্দ বন্দোবস্ত নয়!

বৈদ্য ও অম্বষ্ঠ এক, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য কালীবাবু ও সত্যেন্দ্র বাবু কুলপঞ্জিকা ও অভিধান প্রমাণরূপে খাড়া করিয়াছিলেন। ইহা যে কেবল ধোঁকা ও ধাপ্পা, তাহা সকলেই দেখিতেছেন।

কালীচরণবাবু বৈদ্যকে অম্বষ্ঠ প্রমাণ করিবার জন্য বৃহদ্ধর্ম্ম-পুরাণের প্রমাণ তুলিয়াছেন তাহা ৩২—৪০ পৃষ্ঠায় আলোচিত হইয়াছে। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণের প্রমাণে তিনি এমনই আস্থাবান্ যে পাঠকবর্গকে যখনই অবসর হইয়াছে শুনাইয়াছেন। ঐ মত অনুসারে অম্বষ্ঠ ব্যভিচার জাত বর্ণসঙ্কর। কালীবাবু নিজের জাতিকে ইহা শুনাইয়াও তাহার বৈশ্যত্ব প্রতিপাদনের আশা করেন। সত্যেন্দ্র বাবু কালীবাবুকে সকল বিষয়েই সমর্থন করিয়াছেন, বৃহদ্ধর্ম্ম-পুরাণের 'অম্বষ্ঠ' সাজিতে তিনিও পশ্চাৎপদ নহেন!

কালীবাবু বলিয়াছেন—"ব্রাহ্মণগণই ঐ শাস্ত্রের (চিকিৎসা শাস্ত্রের) অধ্যয়ন অধ্যাপনা করিতেন। ক্রমে যখন অম্বষ্ঠজাতির উৎপত্তি হইল, তখন ঋষিগণ অম্বষ্ঠজাতির চিকিৎসাবৃত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়া "আয়ুর্ব্বেদং দদুস্তস্মৈ" আয়ুর্ব্বেদখানি তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিলেন। তদবধি ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক চিকিৎসা ব্যবসায় পরিত্যক্ত হইল" (!), অর্থাৎ কালীবাবুর মতে বৈদ্য-ব্রাহ্মণগণ চিকিৎসা করা ছাড়িয়া দিলেন এবং 'অম্বষ্ঠবর্ণ বৈশ্য'গণ চিকিৎসা করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহার বিশেষ আলোচনা ৩২—৪০ পৃষ্ঠায় করা হইয়াছে। এস্থলে এইটুকু মাত্র বলি যে, তাঁহার কথায় আমাদের এইরূপ প্রতীতি হয় যে, ভূ-ভারতে বৈদ্যব্রাহ্মণ আর নাই, বর্ত্তমানে যত চিকিৎসক যেখানে আছে (ভুঁইফোড়গুলি বাদে) সকলেই অম্বষ্ঠ,* অতএব পশ্চিম ভারতের চিকিৎসকগণও সকলেই 'অম্বষ্ঠবর্ণ'! কিন্তু পশ্চিম ভারতের 'অম্বষ্ঠবর্ণ''গণ দশদিন অশৌচ পালন করে ও শর্ম্মান্ত নাম ব্যবহার

* সত্যেন্দ্রবাবুর কথায়, 'সর্ব্বং বাক্যং সাবধারণম্ প্রসতি বাধে,' অর্থাৎ কেবল অম্বষ্ঠকেই আয়ুর্ব্বেদ দেওয়া হইয়াছিল, অন্য কাহাকেও নহে। ইংরাজিতেও 'For Ladies' বলিলে 'For Ladies only' বুঝিতে হয়।

করে কি করিয়া? বোধ হয় বৈশ্য নহে বলিয়া? তবে দাঁড়াইল এই, বাঙ্গালার বাহিরে 'অম্বষ্ঠবর্ণ'গণ ব্রাহ্মণ এবং বাঙ্গালার 'অম্বষ্ঠবর্ণ'গণ বৈশ্য! বাহবা-বাহবা! কালীবাবুর যুক্তি তর্কে সর্ব্বত্রই এইরূপ অদ্ভুত সামঞ্জস্য!

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে 'ঐ প্রসঙ্গে 'দদুঃ' পদের 'ত্যাগ করিলেন' অর্থ করিলে, কালীবাবুর সুবিধা হইবে না। অতএব আগামী সংস্করণে 'কিছু ছাড়িয়া দিলেন' এই অর্থ করিবেন, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ ও অম্বষ্ঠ দুই জাতিরই চিকিৎসাক্ষেত্রে অস্তিত্ব থাকিবে, এবং কালীবাবু সুবিধামত পশ্চিমের বৈদ্যকে "ব্রাহ্মণ' এবং বাঙ্গালার বৈদ্যকে 'অম্বষ্ঠবর্ণ বৈশ্য' বলিতে পারিবেন!

রঘুনন্দন অম্বষ্ঠের কথা বলিয়াছেন, কিন্তু **বাঙ্গালার বৈদ্যগণ যে অম্বষ্ঠ তাহা তিনি বলেন নাই।** কুল্লূকাদি টীকাকারগণ টীকা লিখিতে অম্বষ্ঠের নামে অনেক কথা কহিয়াছেন, **কিন্তু বঙ্গীয় বৈদ্য যে অম্বষ্ঠ তাহা বলেন নাই।** যাহা হউক, স্পষ্ট বাক্যে না বলিলেও বঙ্গীয় বৈদ্যদিগেরই প্রতি যে তাঁহাদের ইঙ্গিত ছিল, তাহা প্রাচীন কুলাচার্য্যগণ বুঝিয়াছিলেন, স্মৃতিতীর্থগণ বুঝিতেছিলেন এবং কালীবাবু ও সত্যেন্দ্রবাবু আজও তাহা বুঝিতেছেন। কুল্লুকের অবতারগণ জন্মান্তরীণ সংস্কারের বশে এই মহাসত্য প্রকাশ করিতেছেন যে, বৈদ্যশব্দের অর্থ 'কেবল অম্বষ্ঠ', অর্থাৎ অম্বষ্ঠজাতি ব্যতীত আর কাহাকেও বৈদ্যজাতি বলা যায় না (৪৪ পৃষ্ঠা)! সতেন্দ্রবাবু এক উদ্‌ভট শ্লোক অবলম্বনে একজন পশ্চিমা বৈদ্যের পরিচয় হইতে সপ্রমাণ করিতেছেন যে পশ্চিমের বৈদ্যগণও 'বৈশ্যবর্ণ অম্বষ্ঠ' বা 'পারিভাষিক বৈশ্য'!! শ্লোকটী এই—

ব্রাহ্মণ্যামভবদ্‌ বরাহমিহিরো জ্যোতির্বিদামগ্রণী
রাজা ভর্ত্তৃহরিশ্চ বিক্রমনৃপঃ ক্ষত্রাত্মজায়ামভূৎ।

বৈশ্যায়াম্ হরিচন্দ্র-বৈদ্যতিলকো জাতশ্চ শঙ্কুঃ কৃতী
শূদ্রায়ামমরঃ ষড়েব শবরস্বামিদ্বিজস্যাত্মজাঃ ॥

ইহা কাহার রচিত, কোন্ দেশে রচিত, কি উদ্দেশ্যে রচিত, তাহার উল্লেখ নাই। খুব সম্ভব যাহারা বঙ্গীয় বৈদ্যকে অম্বষ্ঠ মনে করে, এবং যে দেশে বৈদ্য-ব্রাহ্মণকে অম্বষ্ঠ বলিলে লাঞ্ছনার ভয় নাই, ইহা সেই দেশেরই রচিত। শ্লোকের অর্থ এই যে, শবরস্বামী চারিটী বর্ণ হইতে চারিটী ভার্য্যা গ্রহণ করেন, তন্মধ্যে বিপ্র কন্যাতে তাঁহার যে পুত্র হয়, তিনিই বরাহমিহির। ক্ষত্রিয়কন্যাতে যে দুই পুত্র হয়, তাহারা প্রসিদ্ধ বিক্রমাদিত্য ও ভর্ত্তৃহরি, বৈশ্যকন্যাতে হরিচন্দ্র ও শঙ্কু নামে দুইজন বৈদ্য জন্মেন এবং শূদ্রকন্যাতে অমরসিংহ উৎপন্ন হন। কোথায় শবরস্বামী এবং কোথায় মহারাজ বিক্রমাদিত্য প্রভৃতি ব্যক্তিগণ! বিভিন্ন জাতীয় এই ছয় জন ব্যক্তি এক শবরস্বামীর পুত্র, ইহা বড়ই আশ্চর্য্য গবেষণার ফল! ইহা আবার কলিযুগে! এরূপ অসম্ভব উদভট শ্লোকে আস্থা স্থাপন করিয়া সংসারে প্রকৃতিস্থ বলিয়া গণ্য হওয়া আরও আশ্চর্য্য !! সত্যেন্দ্র বাবু ইহাতে আস্থা স্থাপন করিতে ও পুস্তকে ইহা প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করিতে পারিয়াছেন, ইহা ততোধিক আশ্চর্য্য !!! ফলতঃ সত্যেন্দ্র বাবুর নিকটে বৈদ্যপ্রবোধনীর কথা ছাড়া আর সবই সত্য!

আমরা জানি, পশ্চিম প্রদেশে বৈদ্যজাতি বলিয়া কোন জাতি নাই। আয়ুর্ব্বেদপরায়ণ অম্বষ্ঠও নাই। তবে কে এইরূপ শ্লোক রচনা করিল? নিশ্চয়ই কোন পশ্চিমদেশীয় পণ্ডিত নহে। ইহার রচয়িতা যে বঙ্গদেশীয় কোন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বা ফরিদপুর অঞ্চলের কোন অম্বষ্ঠবর্ণ বৈশ্য, আমাদের এইরূপ সন্দেহ হয়। বিশেষতঃ শ্লোক রচয়িতা বিভিন্নকালের ও বিভিন্ন সমাজের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণকে একবাপের 'পেটে' জন্মাইবার যে অদ্ভুত কৌশল দেখাইয়াছেন, তাহা সাধারণ

লোকের পক্ষে সম্ভব নহে। কালীবাবু ও সত্যেন্দ্র বাবু দুই দেশ-ভাই এই অসাধারণ আবিষ্কারটীকে মাথায় লইয়া নৃত্য করুন; আমরা হরি-বোল দিই।

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ জাতির কুলপঞ্জিকা-কার কয়েকজন আধুনিক ব্রাহ্মণ তাঁহাদের প্রণীত কুলপঞ্জিকায় বৈদ্যরাজা আদিশূর ও বল্লালকে 'অম্বষ্ঠ' বলিয়াছেন। কিন্তু অপর বহু কুলপঞ্জিকায় অম্বষ্ঠ না বলিয়া বৈদ্যই বলা হইয়াছে। আমরা যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে প্রাচীন বৈদ্য ও অন্য জাতীয় কুলপঞ্জীমাত্রেই বৈদ্য শব্দ আছে। যে সকল কুলপঞ্জী অধুনাতন কালে লিখিত অথবা সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত বা পরিবর্দ্ধিত সেইরূপ কুলপঞ্জীতেই জিঘাংসুগণ অম্বষ্ঠ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি রঘুনন্দনাদির সুপরিস্ফুট ইঙ্গিত কুলাচার্য্যগণ না বুঝিয়াছিলেন, এমন নয়। এবং ধীরে ধীরে শতাব্দীর পর শতাব্দী যাইতে যাইতে বৈদ্যশব্দ স্থলে অম্বষ্ঠ শব্দ বসান হইতেছিল, ইহা নিশ্চিত। কারণ কোন বৈদ্যকুলপঞ্জীতেই যখন 'অম্বষ্ঠ' ছিল না, তখন অন্য কুলপঞ্জীতে সেনরাজগণকে বৈদ্য না বলিয়া অম্বষ্ঠ বলা হয় কি করিয়া? দানসাগর, অদ্ভুত সাগর, ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব প্রভৃতি সেনরাজগণের জীবিত কালে লিখিত পুস্তকে ও তাম্রশাসনে তাঁহাদের সুস্পষ্ট পরিচয় এই যে, তাঁহারা চন্দ্রবংশীয় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়বৎ রাজ্যপালন করিতেন। পাছে কেহ তাঁহাদিগকে ক্ষত্রিয় মনে করে, এই জন্য সাবধনতা সহকারে পৌরাণিক 'ব্রহ্মক্ষত্রিয়' নামের সহিত 'রাজন্যধর্ম্মাশ্রয়', 'ক্ষত্র-চারিত্র্যচর্য্য', 'ব্রহ্মবাদী', 'ক্ষ্মাপাল-নারায়ণ' প্রভৃতি বিশেষণ ব্যবহার করিয়াছেন, তথাপি 'তাঁহারা ক্ষত্রিয়ত্বের ভান করিতেন', অর্থাৎ, জাতিতে 'অম্বষ্ঠ' হইলেও 'ক্ষত্রিয়' পরিচয় দ্বারা জাতি ভাঁড়াইবার চেষ্টা করিতেন, এরূপ বলা অতীব অন্যায়।

মনু বলিয়াছেন 'অম্বষ্ঠানাম্ চিকিৎসনম্', সেনরাজগণের স্বজাতীয়েরাও চিকিৎসা করেন, অতএব সেন-রাজগণ অম্বষ্ঠ-ছিলেন', এইরূপ ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত করিয়া কোন কোন কুলাচার্য্য কুলগ্রন্থে সেন রাজগণকে অম্বষ্ঠ বলিয়া অসত্য কথাই বলিয়াছেন। এক্ষণে ঐ অসত্য কথাকে প্রমাণ করিয়া, যে হেতু সেনরাজগণ অম্বষ্ঠ, সেই হেতু তাঁহাদের স্বজাতীয়েরাও অম্বষ্ঠ এরূপ সিদ্ধান্ত চক্রাক্রাবে সেই একই ভ্রমের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করা মাত্র! কেহ বলিলেন "অম্বষ্ঠঃ ব্রহ্মপুত্রকঃ", তাহা শুনিয়া কেহ বুঝিলেন, তবে ত অম্বষ্ঠ ব্রহ্মপুত্রের সন্তান! সেই জন্যই কোন কোন কুলগ্রন্থে মহারাজ বল্লাল ব্রাহ্মণ বেশধারী ব্রহ্মপুত্র নদকর্ত্তৃক পরক্ষেত্রে উৎপাদিত ক্ষেত্রজ পুত্র! এইরূপ অসম্ভব গল্প কাহিনী লিখিয়া ব্রাহ্মণ কুলাচার্য্যগণ আপনাদের সংস্কৃতজ্ঞান, সাধারণ বিবেচনা বুদ্ধি ও প্রামাণিকতা প্রকাশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ ব্রহ্মপুত্র নদ বল্লালের উৎপাদক পিতা একথা যেমন অবিশ্বাস্য, তিনি জাতিতে অম্বষ্ঠ ছিলেন, এই উক্তিও তদ্রূপ অবিশ্বাস্য। সকল কুলজীতে এই কথা থাকিলে আমরা মাথা পাতিয়া লইতাম। কিন্তু বৈদ্য, ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদিগের যে সকল প্রাচীনকুলজীতে কোনরূপ পাঠ পরিবর্ত্তন হয় নাই, তাহাতে অম্বষ্ঠ শব্দ নাই, বৈদ্য শব্দই আছে, যথা—

(১) 'পুরা বৈদ্যকুলোদ্ভূত বল্লালেন মহীভুজা'—কবিকণ্ঠহার

(২) তত্রাসীৎ রামনামৈকো বৈদ্যো রাজা মহাবলী।
তৎপালিতা সা নগরী রামপালেতি বিশ্রুতা॥

বারেন্দ্র কুলপঞ্জী

(৩) "বৈদ্যবংশাবতংসোঽয়ং বল্লালো নৃপপুঙ্গবঃ"

(৪) "তদ্বংশে জনিতঃ শ্রীমান্ আদিশূরো মহীপতিঃ।
কান্যকুব্জেশ্বরস্যৈব সদ্বৈদ্যকুলসন্ততেঃ॥"

বিপ্রকুল কল্পলতা

(৫) "দাক্ষিণাত্যে বৈদ্যরাজশ্চৈকোঽশ্বপতিসেনকঃ।"

বিপ্রকুলকল্পলতা।

(৬) আসীৎ বৈদ্যো মহাবীর্য্যঃ শালবান্ নাম ভূপতিঃ।"

বিপ্রকুলকল্পলতা।

(৭) আসীৎ পুরা বৈদ্যবংশে লক্ষ্মীনারায়ণো নৃপঃ।—কুলপ্রদীপ

(৮) আসীৎ গৌড়ে মহারাজঃ আদিশূরঃ প্রতাপবান্।

সদ্বৈদ্যকুলসম্ভূতঃ আসমুদ্র-করগ্রহঃ॥

অপরিবর্ত্তিতপাঠ বৈদ্যকুলচন্দ্রিকা।

রাজা গণেশের নিকটে ব্রাহ্মণদিগের আবেদনপত্র ও তাঁহার প্রদত্ত আদেশপত্র হইতে আমরা বৈদ্য বিরুদ্ধে রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্রদিগের ভীষণ ষড়যন্ত্রের প্রমাণ পাই। কবে কোন্ সময়ে স্মার্ত্তশাসন ও রাজ-শাসনের মিলিত বজ্র বৈদ্যসমাজের উপর আপতিত হইয়াছিল, তাহা আমরা এখানে দেখিতে পাইতেছি। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এই ঘটনা ঘটে। কিন্তু তখন একস্থানের আচার ব্যবহার তৎক্ষণাৎ সর্ব্বস্থানে ছড়াইয়া পড়িবার সম্ভাবনা ছিল না, সকল ব্রাহ্মণও বৈদ্যের প্রতি জিঘাংসাবৃত্তি অবলম্বন করেন নাই, বৈদ্যদিগের চিকিৎসাবৃত্তিও তাহাদের কতকটা আত্মরক্ষায় সাহায্য করিয়াছিল। হিন্দু-মোল্লাদের উপদেশে অন্যান্য জাতিরা বৈদ্যকে নামাইয়া দেওয়ার সার্থকতা কিছুকাল হইল যেমন বুঝিয়াছে, পূর্ব্বে সেরূপ বুঝে নাই। একটা ইংরাজী পদ্য আছে—

"God and the doctor People alike adore :
The danger past, the are thought of no more"

স্মার্ত্তদের স্বভাব এই, বিপদ্‌গ্রস্ত হইলে তাহারা বৈদ্যের খুব পক্ষপাতী। কিন্তু বৈদ্যের সাহায্যে বিপদটী কাটিয়া গেলেই দলে মিশিয়া নিজমূর্ত্তি ধরে। যাহা হউক, অদ্যাবধি দেখিতেছি, বৈদ্য যে বিষয়ে পুরোহিতের নিতান্ত অধীন সেইটুকু ব্যতীত অন্য সকল বিষয়ে অবিকল ব্রাহ্মণাচার

ও ব্রাহ্মণযোগ্য মানসম্ভ্রম রক্ষা করিয়া চলিতে পারিয়াছে। ইহা তাঁহার আচার্য্যত্ব বা বৈদিক গুরুত্ব, শিষ্যকে সাবিত্রীদান, দশাহ জননাশৌচ, প্রতিগ্রহ, মহামহোপাধ্যায়াদি উপাধি ধারণ প্রসঙ্গে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। কিন্তু রাজাদেশ হইতে অতি প্রবল শাস্ত্রের আদেশ। সাধারণ লোকে জানে ব্রাহ্মণেরা যাহা বলেন, তাহাই শাস্ত্র, তাহাদের মুখনিঃসৃত বাণী অমান্য করিলে অধর্ম্ম হয়, মান্য করিলে শাস্ত্রাদেশ পালন জনিত পুণ্য হয়। এখনও গুরু-পুরোহিতের কথা বাঙ্গালী বিনা প্রতিবাদে পালন করিতে অভ্যস্ত! বৈদ্যসন্তানদেরও ঐ অবস্থা ছিল। এখনও যেমন স্বজাতীয় পণ্ডিত অপেক্ষা গুরু-পুরোহিতেরই মুখের দিকে অজ্ঞ বৈদ্যসন্তানগণ সদুপদেশের জন্য তাকাইয়া থাকেন, এবং তাহারা জাতির সর্ব্বনাশকর ও ঘোর অমর্য্যাদাকর কার্য্য করিতে উপদেশ দিলেও তাহাই সানন্দে পালন করেন, তখনও এইরূপ ছিল। নচেৎ চিরকাল স্বজাতীয় পণ্ডিতদের নেতৃত্বে চলিলে এ বিপদ হইত না। বৈদ্যপণ্ডিতগণ যাজকতাকে নিন্দিতবৃত্তি জানিয়া ত্যাগ করিয়াছিলেন, এখন সেই যাজকতার অভাবে তাঁহারা উপদেষ্টার পদ হারাইয়াছেন! বৈদ্যসমাজ যে দিকে চলিতে লাগিল বৈদ্যপণ্ডিতগণ অনিচ্ছাসত্ত্বেও সেই দিকে চলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এইরূপে সমস্ত জাতিটা বৈশ্যাচারী বা শূদ্রাচারী হইল! যাহারা ব্রাহ্মণের কথায় কোলের সন্তানকেও গঙ্গাসাগরে বিসর্জ্জন দিত, তাহারা যে তাহাদের উপদেশে অশৌচকালের ব্যতিক্রম করিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? ধর্ম্মরক্ষক পুরোহিত কখনও অন্যায় উপদেশ দিবেন না, এই বিশ্বাসে বৈদ্য যজমানেরা ক্রিয়াকর্ম্মে নামান্তে 'দাস' বা 'গুপ্ত' ব্যবহার এবং শূদ্রের মত বা বৈশ্যের মত অশৌচ পালন করিতে লাগিলেন! ক্রমে যখন উপবীতী বৈদ্যকেও ওঙ্কার উচ্চারণ করিতে বা শালগ্রামস্পর্শ করিতে নিষেধ করিতে লাগিলেন, আমাদের

শ্রাদ্ধ ও ভোগ দেওয়াইতে লাগিলেন, উপবীতসূত্র কোমরে রাখিবার উপদেশ দিতে লাগিলেন এবং আরও নানা কাণ্ড করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখনই বৈদ্যসমাজের চমক ভাঙ্গিল। তখন তাঁহারা বুঝিলেন, যাহাকে অতিমাত্রায় বিশ্বাসপূর্ব্বক ধর্ম্মধন রক্ষার ভার সমর্পণ করিয়াছিলেন। সে রক্ষণের পরিবর্ত্তে ভক্ষণের ব্যবস্থা করিয়াছে! অনেকে আমাদিগের নিকটে বৈদ্যদিগের অশৌচকাল পরিবর্ত্তনের সন তারিখ চাহিয়া থাকেন। কিন্তু ইহা ত ছিয়াত্তরের মন্বন্তরও নহে, আশ্বিনের ঝড়ও নহে, কতকুড়ি বৎসর পূর্ব্বে এই সামাজিক বিপ্লব ঘটিয়াছিল, তাহা কোন্ বুড়া হাত গণিয়া বলিবে? কোনও ব্রাহ্মণপণ্ডিত যখন পলাশীর যুদ্ধ সম্বন্ধেই কোন সংবাদ রাখেন না, কেমন করিয়া হিন্দু রাজত্ব গেল, মুসলমান আসিল, আবার মুসলমান গেল, ইংরাজ আসিল, এত বড় বড় ব্যাপারেরও কোন রেকর্ড যখন কোন গৃহে নাই, তখন ক্ষুদ্র বৈদ্যসমাজের উপবীতগত ও শৌচাদিগত বিপ্লবের ইতিহাস কোথাও লেখা থাকিবে, এ আশা কালীবাবু কেন করেন? যে সকল ব্রাহ্মণ বহু বিবাহ প্রথাকে ব্যবসায়ের চক্ষে দেখিতেন, তাঁহাদের বংশধরেরা কিছুকাল পরে বলিতে পারিবেন কি, কোন্ সনে কোন্ তারিখে তাঁহাদের কারবার অচল হইয়াছিল? বঙ্গের ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য কবে শূদ্র হইয়াছিল, তাহাই বা কে বলিবে? তবে আমরা মোটামুটি বলিতে পারি যে, রঘুনন্দন এদেশীয় ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে লক্ষ্য করিয়া, তাহারা পতিত হইয়াছে, একথা বলিয়াছেন। এই সকল জাতি বহুকাল পূর্ব্ব হইতে পতিত ও শূদ্রীভূত হইয়া থাকিলে একথা বলার কোন আবশ্যকতা হইত না। বৈদ্যেরা যে মাত্র কিছু কাল পূর্ব্বে পতিত হইয়াছিল, তাহার উল্লেখও রহিয়াছে রঘুনন্দনের স্মৃতিনিবন্ধে। তিনি বল্লালের স্মৃতিনিবন্ধ প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করায় ঐ সময়েও বৈদ্য বৈশ্য বা শূদ্র হয় নাই বুঝা যায়। বল্লাল-লক্ষ্মণ

কলহ প্রসঙ্গে মুলো পঞ্চাননও ঐ কথা বলিয়াছেন, মহারাজ রাজবল্লভের পণ্ডিতামন্ত্রণ-পত্রেও ঐ কথা লেখা আছে। বারেন্দ্র রাজা গণেশের আদেশপত্রও ঐ মর্ম্মে। তবে রাঢ়ীয় বৈদ্যের সামাজিক পতনের নির্ভুল সন্-তারিখ না পাওয়া গেলেও শতাব্দীটা নিশ্চয় পাওয়া যায়। বৈদ্য-সমাজের অশৌচগত বিভ্রাট ত একদিনে ঘটে নাই। পঞ্চদশ শতাব্দীতে রাজা গণেশের আদেশ ও রঘুনন্দনের শাসন যুগবৎ বৈদ্যসমাজের বিরুদ্ধে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল, ইহাই আমরা জানিতে পারি। রঘুনন্দনের শাসন তাঁহার মুদ্রিত নিবন্ধে আছে; রাজার শাসন তাম্রফলকাদির মত রাজদপ্তরেই রক্ষিত আছে। কোল্‌ব্রুক উহা তাঁহার 'রিচুয়ালস্ অব্ বেঙ্গল' নামক গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিতে ধরিয়া যান। এই রাজ-শাসনের কথা বৈদ্য ব্রাহ্মণসমিতির প্রতিষ্ঠার প্রায় ২০।২৫ বৎসর পূর্ব্বে আমরা শুনিয়াছিলাম। উহা একটী প্রাচীন রচনা, কোলব্রুক্ সাহেবের নিজের রচিত নহে। তবে অবিশ্বাসের কি কারণ আছে? কালীবাবু লিখিয়াছেন—"রাজা গণেশের জাতিপাত করার (?) প্রসঙ্গ অলীক ও অপ্রামাণ্য।" (বৈদ্য, পৃষ্ঠা ৬৫)। কালীবাবু বলিতে চাহেন এই যে, রাজা গণেশ কর্ত্তৃক বৈদ্যজাতির জাতিপাত করার প্রসঙ্গ অলীক ও অপ্রামাণ্য। কিন্তু কি জন্য অপ্রামাণ্য? ইহা ত আজ সহসা সৃষ্টি করা হয় নাই। ২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বে ইহা পাওয়া যায় এবং কিছুকাল পরেই 'চক্ষুদান' নামক একখান ক্ষুদ্র পুস্তকে উহা ছাপাইয়া মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় প্রমুখ বড় বড় প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকগণকে এবং ব্রাহ্মণপণ্ডিত-গণকে বিনামূল্যে ডাকযোগে প্রেরণ করা হইয়াছিল। এই ঘটনার পরে উহা 'ধন্বন্তরি' পত্রিকায় প্রকাশিত ও আলোচিত হয়। তদবধি 'বঙ্গীয় বৈদ্যজাতি', 'বৈদ্যতত্ত্ব-সংগ্রহ', 'বৈদ্য-প্রবোধনী' প্রভৃতি বিবিধ পুস্তকে উহা উদ্ধৃত করিয়া লোকের গোচরীভূত করা হয়।

১২ বৎসর পূর্ব্বে মনুসংহিতার প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ শ্রেণীর ছাত্রদিগের পাঠ্য নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় আমি মনুসংহিতার যে সংস্করণ প্রকাশিত করিতে থাকি, তাহাতে এ সকল কথা বিশদভাবে আলোচিত হয়। কুল্লূক অনুলোম বিবাহজাত জাতিদিগের সম্বন্ধে যে সকল ভ্রান্ত কথা বলিয়াছেন, * মদীয় পুস্তকে তাহার তীব্র প্রতিবাদ হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু ব্যক্তিরই সেদিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল, এবং কয়েক বৎসর পরেই মনুর ঐ অংশ পাঠ্য তালিকা হইতে অপসারিত করা হয়। মৎপ্রকাশিত মনুসংহিতার সংস্করণ বোধ হয় সকল কলেজেরই অধ্যাপকগণ দেখিয়া থাকিবেন। রাজা গণেশের আদেশপত্র-খানি উহাতে বড় বড় অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছিল। কলেজের অধ্যাপকমণ্ডলী ও ছাত্রগণ যে গণেশ-শাসনের কথা অবগত ছিলেন, যাহার সম্বন্ধে ধন্বন্তরি পত্রিকায় আলোচনা হওয়ায় বৈদ্যসমাজ ও অন্যান্য সমাজ উহা জানিবার অবসর পাইয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে প্রতিবাদ করিতে কেহ সাহস করেন নাই কেন? তিন বৎসর পূর্ব্বে যখন পণ্ডিত শ্যামাচরণ বিদ্যাবারিধি কাশী হইতে 'জাতিতত্ত্ব' নামক পুস্তক প্রকাশিত করিয়া ও বসুমতীতে প্রবন্ধ লিখিয়া বৈদ্যসম্প্রদায়কে অন্যায়ভাবে আক্রমণ করিতেছিলেন, তখনও তিনি বৈদ্য প্রবোধনীতে প্রকাশিত ঐ আদেশ পত্রের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নির্ব্বাক্ ছিলেন। প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকগণ জানিতেন উহা অতীব প্রমাণ্য কথা, উহার উপর কোন

*যথ, অনুলোমা দ্বিজা ভার্য্যা পতির ধর্ম্মপত্নী নহে কামপত্নী; তদীয় গর্ভজাত পুত্র ঔরস পুত্র নহে, ঐ পুত্র পিতৃবর্ণ নহে, পরন্তু অশ্বগর্দ্দভজাত অশ্বতরবৎ সঙ্কীর্ণ জাতি বিশেষ ইত্যাদি। পাঠক এইটুকু স্মরণ রাখিবেন যে, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রবাবু ও কালীবাবু কুল্লূকের এই সকল কথারই সমর্থন করেন। ইঁহাদের ন্যায় কুল্লূকানুসারী আর দ্বিতীয় নাই। ইঁহারা স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদিগকেও হার মানাইয়াছেন।

কথা চলিবে না। তাঁহাদের প্রমুখাৎ সকল ব্যাপার জানিয়া বিদ্যা-বারিধি প্রমুখ ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা ইহার বিরুদ্ধে কোন কথা কহেন নাই। কালীবাবুর কোন বন্ধু আমাদের জানাইয়াছিলেন, তিনি উহা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে ঐ নামের আংশিক মুদ্রিত পুস্তকে প্রাপ্ত হন নাই, তদুত্তরে তাঁহাকে জানান হয় যে উহা মুদ্রিত পুস্তক হইতে সংগৃহীত হয় নাই। যে বৃহৎ পাণ্ডুলিপি হইতে এক অংশ মাত্র মুদ্রিত করা হইয়াছিল, সেই পাণ্ডুলিপিই দ্রষ্টব্য।

আমাদের উক্তিকে অলীক ও অপ্রমাণ বলিবার সাহস কালীবাবুর ও সত্যেন্দ্রবাবুর হয় কিরূপে? সাক্ষ্যসাবুদ ভাল করিয়া না দেখিয়া সত্যকে অসত্য সাব্যস্ত করাই কি প্রশংসনীয়? সত্যেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন, "উহা (ঐ শাসন) পাঠ করিলে স্পষ্টই বোধ হয় যে, বৈদ্যগণের অম্বষ্ঠত্ব তখন অবিসংবাদিতরূপে স্বীকৃতই ছিল। এবং রাজা গণেশের পূর্ব্ববর্ত্তী বৈদ্যকুলপঞ্জিকাকার চতুর্ভুজ সেনও তাঁহার কুলপঞ্জিকায় বৈদ্যগণকে অম্বষ্ঠ ও বৈশ্যাচারী বলিয়া গিয়াছেন।" (পৃষ্ঠা ৪০) পুনশ্চ কালীবাবুর মতে সায় দিয়া বলিতেছেন, "চতুর্ভুজ ১৩৪৭ খৃঃ তাহার কুলপঞ্জিকা প্রণয়ন করেন..আর রাজা গণেশের রাজত্ব কাল ১৪০৯—১৪১৪। অতএব প্রবোধনীর ঐ উক্তি সর্ব্বথা অমূলক" (পৃঃ ৪১)। কালীবাবুও এই ভাবেই যুক্তি করিয়াছেন— "এ কথার (গণেশ-শাসনের) কোন মূল্য থাকিলে চতুর্ভুজ সেন ১৩৪৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার প্রণীত কুলচন্দ্রিকাগ্রন্থে বৈদ্যগণকে বৈশ্যাচারী অম্বষ্ঠ বলার কোন কারণ থাকিতে পারে না" *। কালীবাবু ও

* আমরাও বলি, এই চতুর্ভুজ বচনগুলি প্রক্ষিপ্ত। 'বৈদ্যকুলচন্দ্রিকা' এই নাম হইতেই জানা যায় চতুর্ভুজ বৈদ্যকে অম্বষ্ঠ বলিয়া জানিতেন না। উহার মধ্যে 'সত্যে বৈদ্যাঃ পিতুস্তুল্যাঃ' ইত্যাদি বচন পরবর্ত্তী কালের সন্নিবেশ। অন্যথা চতুর্ভুজ মতেই বৈদ্য জন্মতঃ ব্রাহ্মণ, ইহা প্রমাণিত হয়। 'বৈশ্যবৎ শৌচকর্ম্মাণি' ইত্যাদি

সত্যেন্দ্রবাবু একটু বিবেচনা করিলেই বুঝিতেন যে, রাজা গণেশের আদেশ একান্ত সত্য। কুল্লূক ও বাচস্পতি মিশ্র রাজা গণেশের সাহায্যে হিন্দু সমাজের আবশ্যক সংস্কার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, ইহা নিরপেক্ষ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়—জাতীয় ইতিহাসের ব্রাহ্মণকাণ্ডে লিখিয়াছেন। গণেশের উক্তি সত্য বলিয়াই কুলচন্দ্রিকার মধ্যে নিহিত স্কন্দপুরাণের নির্ম্মূল বচনাবলী **পরে প্রক্ষিপ্ত**। এ সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। বস্তুতঃ রাজা গণেশের শাসনে যখন রাঢ়ীয় বৈদ্যদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইতেছে যে, আজ হইতে ইহারা বৈশ্যাচারী হইবে, তখন চতুর্ভুজের কুলচন্দ্রিকায় "বৈশ্যবৎ শৌচকর্ম্মাণি নির্দ্দিষ্টানি মুনীশ্বরৈঃ। তেষামম্বষ্ঠজাতানাং যথাশাস্ত্রনিদর্শনাৎ।" অর্থাৎ মুনীশ্বরগণ কর্ত্তৃক যথাশাস্ত্র আলোচনা পূর্ব্বক সেই অম্বষ্ঠদিগের বৈশ্যবৎ শৌচকর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এরূপ স্বীকারোক্তি থাকিতেই পারে না। কালীবাবু বা সত্যেন্দ্রবাবু কি আমাদিগকে আসল কুলচন্দ্রিকার ঐরূপ উক্তি দেখাইতে পারেন? কখনই পারিবেন না। জাল কুলচন্দ্রিকার জাল বচন আমরা নিমেষের মধ্যে ধরাইয়া দিব। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সত্যেন্দ্রবাবুর উল্লিখিত ১৪০০ খৃষ্টাব্দের দুর্জ্জয় কুলপঞ্জিকায় বা ১৬৫৩ খৃষ্টাব্দের কণ্ঠহারে অম্বষ্ঠত্বের বিন্দু-বিসর্গও নাই, 'বৈশ্যবৎ' শৌচকর্ম্মের প্রতিও কোনরূপ ইঙ্গিত নাই। তবে তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী ১৩৪৭ খৃষ্টাব্দের কুলচন্দ্রিকায় বিপুল আড়ম্বরে অম্বষ্ঠত্ব খ্যাপন ও বৈশ্যবৎ শৌচকর্ম্মের কথা কিছুতেই থাকিতে পারে না। উহা মহারাজ রাজবল্লভের কোন পণ্ডিত তাঁহার সন্তোষবিধানার্থ রচনা করিয়া দিয়া থাকিবে। পাছে লোকে অবিশ্বাস করে এজন্য

বচন চতুর্ভুজে থাকিলে মহারাজ রাজবল্লভের আমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণ ব্যবস্থাপত্রে সে কথা

অবশ্য বলিতেন। অথবা বৈশ্যত্বসংবন্ধে ঐ ব্যবস্থা লইবারও প্রয়োজন হইত না!

ঐ শ্লোকগুলিকে স্কন্দপুরাণের বচন বলিয়া চালান হইয়া থাকে। কিন্তু পৃথিবীর কোন পুরাণেই ঐ সকল বচন নাই।

পরবর্ত্তী কুলাচার্য্যগণ পূর্ব্ব কুলাচার্যদিগের গ্রন্থাবলী সংগ্রহ করিয়া তাহার সাহায্যে গ্রন্থ রচনা করিতেন, স্বকপোলকল্পিত কথা লিখিতেন না। ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দে মহামহোপাধ্যায় ভরতমল্লিক 'চন্দ্রপ্রভা'নাম্নী কুলপঞ্জিকা রচনা করেন। ঐ সময়ে তিনি চায়ুপঞ্জী, সঞ্জয়পঞ্জী, কুলচন্দ্রিকা, কণ্ঠহার, দুর্জ্জয়পঞ্জী প্রভৃতি বৈদ্যদিগের সমস্ত কুলপঞ্জীই সংগ্রহ করিয়াছিলেন, ইহা একরূপ বলা যাইতে পারে। তবে তাঁহার বর্ণিত বৈদ্যোৎপত্তি কুলচন্দ্রিকার বিবরণ হইতে অন্যরূপ হয় কেন? ভরত মল্লিক বৈদ্যের জন্মতঃ ব্রাহ্মণবর্ণত্ব স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য কোথাও 'উত্তম বর্ণ', কোথাও 'বিপ্র ইব', কোথাও 'সকলের মাননীয়', কোথাও 'পিতৃতুল্য', কোথাও 'পিতৃবত্ত্বাৎ দ্বিজ' বলিয়াছেন। বৈদ্যেরা পতিত হইয়া বৈশ্যোপম সুতরাং বৈশ্যাচারী, কিন্তু সত্যযুগে অপতিত অবস্থায় পিতৃবৎ অর্থাৎ বিপ্রবৎ অতএব বিপ্রাচারী ছিলেন, ইহা তাঁহার গভীর বিশ্বাস। উৎপত্তির কথাটাও কুলচন্দ্রিকার গল্প হইতে সম্পূর্ণ নূতন। স্কন্দপুরাণের বলিয়া যে সকল বচন কুলচন্দ্রিকায় আছে বলা হয়, মহামহোপাধ্যায় ভরত মল্লিক সেগুলির সহিত আদৌ পরিচিত ছিলেন না। ইহা হইতেই সপ্রমাণ হয় যে, কুলচন্দ্রিকার বচন মিথ্যা এবং ভরতের বিবরণ অন্যত্র না থাকায় উহাও সর্ব্বৈব মিথ্যা। ঐ সকল পরস্পর বিরুদ্ধ উক্তির মধ্যে খাঁটী সত্য এই যে বৈদ্য জন্মতঃ ব্রাহ্মণ। কিন্তু তাই বলিয়া তদীয় রচনা গুলি একেবারে স্বকপোলকল্পিতও নহে। যে সকল ব্রাহ্মণ বৈদ্যের উপর অম্বষ্ঠত্ব আরোপ করিতেছিলেন, তাঁহারাই বৈদ্যের একটা উৎপত্তিকাহিনীও গুছাইয়া তুলিতেছিলেন। তাঁহাদের নিকটে শিশুকাল হইতে মহামহোপাধ্যায় যেরূপ শুনিয়া আসিতেছিলেন, বৈদ্য-উৎপত্তি সম্বন্ধে তাহাই প্রকৃত ঐতিহ্য বলিয়া

গ্রহণ করিয়াছিলেন। চন্দ্রপ্রভা ও কুলচন্দ্রিকার শ্লোকগুলি পাশাপাশি রাখিয়া পরীক্ষা করিলেই দেখা যাইবে, কুলচন্দ্রিকার বচনগুলি পরিপুষ্ট, গল্পটী বেশ সম্পূর্ণ। উহাতে গালবমুনি আছে, তাহার পিপাসা আছে, বৈশ্যকন্যা আছে, কুশপুত্তল আছে, অশ্বিনীকুমারের তিন কন্যা আছে, কুশপুত্তল ধন্বন্তরির বিবাহ আছে, তাঁহার ২৫ কন্যা আছে, ২৫ জামাই আছে এবং তাহা হইতে সেন-দাশাদি বৈদ্যবংশের উৎপত্তির কথা আছে! কিন্তু কুলচন্দ্রিকার প্রায় তিনশত বৎসর পরে লিখিত চন্দ্রপ্রভায় এ সকল কিছুই নাই, গালবও নাই, তাহার পিপাসাও নাই, বৈশ্যকন্যাও নাই, কুশপুত্তলও নাই ; যে ধন্বন্তরির কথা আছে, তিনি ক্ষীরোদ মন্থন জাত ধন্বন্তরি (ধন্বন্তরিবর্ণনা ২ঃ পৃঃ দ্রষ্টব্য) অর্থাৎ স্বয়ং নারায়ণ। তাঁহার এক মাত্র বিবাহ ২৫ কন্যা ও ২৫ জামাই নাই এবং জামাইদের বংশে বৈদ্যদিগের অদ্ভুত উৎপত্তিকথাও নাই। কুলচন্দ্রিকায় বর্ণিত ২৫টী জামাই ব্রাহ্মণ, কিন্তু কন্যা ২৫টী বৈশ্যকন্যা নহে। তাহাতে বৈশ্যের বা বৈশ্যার বিন্দুমাত্রও রক্ত নাই। অতএব কুলচন্দ্রিকার কথামতেও বৈদ্যগণ বৈশ্যাগর্ভসম্ভূত '**অম্বষ্ঠ**' ইহা সপ্রমাণ হইল না! (ভরতের কথায়ও তাহা হয় না!) এই সকল কারণে আমরা মনে করি ভরতের সময়ে যাহা অসম্পূর্ণ ছিল, ভরতের একশত বৎসর পরে যখন মহারাজ রাজবল্লভ পাঁতিদাতা ব্রাহ্মণদের কথায় ভুলিয়া অম্বষ্ঠত্ব ও বৈশ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন, তখন হইতে এই রচিত কথাগুলিও কুলচন্দ্রিকার মধ্যে নিহিত করিয়া পণ্ডিতমণ্ডলীকে দেখান হইত। কালীবাবু ও সত্যেন্দ্রবাবু যে কুলচন্দ্রিকা দেখিয়াছেন, তাহা কোথায় দেখিয়াছেন, এবং আমাদিগকে দেখাইতে পারেন কি না? না দেখাইতে পারিলে, তাঁহারা গণেশ-শাসনের যে গতি করিতে চাহেন, কুলচন্দ্রিকা-বচনেরও সেই গতি হইবে না কি?

রাজা গণেশ ১৪০৯ খৃষ্টাব্দে বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করেন,

রঘুনন্দন ঐ শতাব্দীর শেষভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। শ্রীমান্ কুল্লূক ও বাচস্পতি মিশ্র গণেশের সময়েই জীবিত ছিলেন। অতএব ঐ পঞ্চদশ শতাব্দীতে বৈদ্যবিরুদ্ধে অষ্টবজ্র সম্মিলিত হইয়াছিল দেখা যাইতেছে। একালের লোকে ইহা সহসা বিশ্বাস করিতে চাহেন না, কিন্তু সেকালে দলাদলি রেষারেষি, জাতে উঠা-উঠি, কৌলীন্যের আক্চা-আক্‌চি লইয়াই দেশের পুরুষশক্তি আপনাদের বিক্রমের পরিচয় দিত! রাষ্ট্রক্ষেত্রে যুদ্ধ-কলহ করিবার শক্তি না থাকায় ভীরুগণ অসি-যুদ্ধের সাধ মসী-যুদ্ধেই মিটাইত এবং এই যুদ্ধে ব্রাহ্মণেরাই ছিলেন মহারথী! একদল লোক বৈদ্যদিগকে অম্বষ্ঠ বলিয়া প্রচার করিতেছিলেন, অন্যদল টীকায় অম্বষ্ঠের 'শ্রাদ্ধ' করিতেছিলেন, একদল অম্বষ্ঠকে পতিত বলিতেছিলেন, এবং অন্য দল শূদ্রবৎ ক্রিয়াকর্ম্ম করাইতেছিলেন! কিন্তু এই আরোপ ও অনাচার একদিনের চেষ্টায় বা ষড়যন্ত্রে সম্ভব হয় নাই। বৈষ্ণবযুগে ও তৎপূর্ব্বে রাঢ়ের দিক্‌পালসদৃশ বৈদ্যপণ্ডিতগণের ব্রাহ্মণ-প্রসিদ্ধি ছিল, ইহা পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে। এতদবস্থায় শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে বৈদ্যকুল-গ্রন্থ কুলচন্দ্রিকায় বৈদ্যকর্ত্তৃক অম্বষ্ঠত্ব ও বৈশ্যত্ব স্বীকার নিতান্তই অসম্ভব ব্যাপার। সুতরাং এই তথাকথিত কুলচন্দ্রিকার বচন কিছুতেই আসল কুলচন্দ্রিকার বচন নহে, উহা পরবর্ত্তী কালে সেই সময়ে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল যে সময়ে বৈদ্য আপনার ব্রাহ্মণত্ব সত্য-যুগের ব্যাপার বলিয়া মনে করিত এবং অম্বষ্ঠত্ব ও বৈশ্যত্বের প্রতিই প্রীতি জাগাইয়া তুলিতে আরম্ভ প্রথম চেষ্টা করিত।

এটা খুবই সম্ভব যে মুশলমান রাজত্বের পর হিন্দু রাজত্বের পুনঃ-সূচনা হইলে, ব্রাহ্মণেরা হিন্দু সমাজের পুনর্গঠনের জন্য একটা চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু ঐ হিন্দু রাজত্ব স্থায়ী না হওয়ায় রাজাদেশ অনুসারে তৎক্ষণাৎ কোন কার্য্যও হয় নাই। ঐ সময়ে কুল্লূক মনুর টীকা লিখিতে গিয়া বলিয়াছেন, আমি কোন জাতির বিরুদ্ধে বিদ্বেষ, ঈর্ষ্যা বা ক্রোধের

বশবর্ত্তী না হইয়া এই টীকা লিখিয়াছি। ব্রাহ্মণ স্মৃতি-গ্রন্থের টীকা লিখিতে গিয়া একি কথা বলিলেন! ভূ-ভারতে এভাবে কেহ ত স্মৃতির টীকা আরম্ভ করে নাই! ইহা হইতেই তদনীন্তন বাঙ্গালার সামাজিক কলহ ও তৎপুষ্টি সাধনার্থ টীকাটিপ্পনী-রচনার চিত্র চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে! স্বব্যাখ্যার প্রামাণিকতা সম্বন্ধে লোকের বিশ্বাস উৎপাদনার্থ কুল্লূক বলিয়াছেন, আমি মুনিগণ প্রণীত **দশ সহস্র সাত শত** বিভিন্ন মনুটীকা পরীক্ষা পূর্ব্বক এই ব্যাখ্যায় অগ্রসর হইয়াছি! ইহা হইতেও তিনি যে সত্যবাদী সত্যেন্দ্র বাবুর উপযুক্ত গুরু তাহা আমরা জানিতে পারিতেছি! বস্তুতঃ বৈদ্যগণের বিরুদ্ধে সামাজিক কলহের নেতা ব্রাহ্মণ সমাজ তদীয় মনোভাব কোথাও গোপন করিতে পারে নাই। কি পুরাণে, কি টীকায়, কি কুলগ্রন্থে, কি রাজাদেশে সর্ব্বত্রই বৈদ্যনিগ্রহ জাজ্বল্যমান!

কালীবাবু এক স্থলে বলিয়াছেন—"রাজা গণেশ ত বাড়ী বাড়ী পাহারা দেন নাই, তাঁহারা নিজঘরে দশ দিন অশৌচ প্যলন করিয়া গোপনে পিতৃপুরুষের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া (?) করায় কি বাধা ছিল" (পৃঃ ৬৪)। কি উদ্ভট কল্পনা দেখুন! পিণ্ড গুলি কি বোমা যে গোপনে নির্ম্মিত হইয়া পিতৃপুরুষের উদ্দেশে গোপনে নিক্ষিপ্ত হইবে! সামাজিক শ্রাদ্ধ-ক্রিয়া গোপনে কিরূপে হইতে পারে, আমরা ত তাহা বুঝিতেই পারি না। কালীবাবু কি এইরূপেই শ্রাদ্ধের 'অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া' করিয়া থাকেন! অজ্ঞ যজমান পুরোহিতের সাহায্য ব্যতীত শ্রাদ্ধ কার্য্য করে কিরূপে? দু-দশ জন ব্রাহ্মণকেও ত ভোজন করাইতে হয়, না করিলে ক্রিয়াই সম্পূর্ণ হয় না। কালীবাবু ও সত্যেন্দ্র বাবু স্ব স্ব পুস্তকে স্ব স্ব পিতৃপুরুষের ও স্বজাতির 'অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার' যেরূপ সরল পথ দেখাইয়াছেন, এমন আর কেহ পারিবে না! এই দুই মহাত্মা জন্মভূমিকে ধন্য করিয়াছেন! মহারাজ রাজবল্লভ অম্বষ্ঠত্ব ও বৈশ্যবর্ণত্ব ঢাক-ঢোল পিটিয়া মানিয়া

লওয়ায় অনেক পূর্ব্ববঙ্গীয় বৈদ্য বিরক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা আপনাদিগকে সনাতন বৈদ্যকুলজ ব্রাহ্মণ বলিয়াই জানিতেন, পতিত রাঢ়ের বৈশ্যাচারকে আদর্শ বলিয়া মানিতে প্রস্তুত ছিলেন না এবং উপবীত লইতে হইলে ব্রাহ্মণবৎ ব্রাহ্মণাচারে লওয়াই উচিত মনে করিয়া মহারাজের এই কার্য্যে যোগদান করেন নাই। কালীবাবুর বৈবাহিক শ্রীযুক্ত রসিকলাল গুপ্তশর্ম্মা, বি-এল্ মহাশয় 'মহারাজ রাজবল্লভ সেন' নামক মহারাজের যে নানা তথ্যপূর্ণ সুবৃহৎ জীবনচরিত লিখিয়াছেন, তাহার একটী বৃহৎ অধ্যায়ে তিনি বৈদ্যগণকে ব্রাহ্মণ প্রতিপাদনপূর্ব্বক মহারাজের আভিজাত্য প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা ত ২৫ বৎসর পূর্ব্বের কথা। তখন কি কালীবাবু নিদ্রা যাইতেছিলেন? মহারাজের 'সেনগুপ্ত' স্বাক্ষর সংবলিত পত্রের যে চিত্র কালীবাবু বৈদ্যপুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণে দিয়াছেন এবং যাহা ঐ জীবনচরিতে সন্নিবেশিত হইয়াছে, বলিয়াছেন, নিপুণভাবে অন্বেষণ করিয়াও মহারাজের বংশধরদিগের কোনও দলিল বা পত্রে সেইরূপ 'সেনগুপ্ত' পাইবেন না। কালীবাবু মহারাজের কোনও পূর্ব্বপুরুষের নামে 'গুপ্ত' দেখাইতে পারিবেন না। কালীবাবু বলিতেছেন ঐ পত্র জীবনচরিতের প্রথম সংস্করণে আছে, দ্বিতীয় সংস্করণের ৪০৩ পৃষ্ঠাতেও লেখা রহিয়াছে—"রাজবল্লভের স্বাক্ষরযুক্ত যে দানপত্রের প্রতিলিপি **এই পুস্তকে** সন্নিবিষ্ট হইয়াছে—"। কিন্তু গেল কোথায়? প্রথম সংস্করণের পুস্তক আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই; দ্বিতীয় সংস্করণের নূতন পুরাতন বহু পুস্তকে অন্বেষণ করিয়াছি, কুত্রাপি পাই নাই। যাহা হউক, ঐ দানপত্র যে একেবারে অলীক তাহা আমরা বলিতে চাহি না। কিন্তু উহার 'গুপ্ত'-টা আধুনিক সংযোগ বলিয়াই সন্দেহ হয়।* মহারাজের বংশে কোন উর্দ্ধতন বা অধস্তন পুরুষ

* মহারাজ আর কোনও স্থানে 'সেনগুপ্ত' লিখিয়াছেন, কালীবাবু দেখাইতে পারেন? ৺কাশীধামে মহারাজ রাজবল্লভের যে বাটী আছে, তাহার গাত্রে লেখা

এ পর্য্যন্ত 'সেন গুপ্ত' বলিয়া পরিচয় দেন নাই। কালীবাবুও ইয়ুনি-ভার্সিটী সার্টিফিকেটে ও ক্যালেণ্ডারে, সরকারি কোর্টে এবং ব্যাঙ্কে, রসিদ ও দলিল পত্রে সর্ব্বত্রই 'কালীচরণ সেন' বলিয়া বিদিত। বৈদ্য পুস্তকের প্রথম সংস্করণেও তিনি 'কালীচরণ সেন'! তাঁহার জ্ঞাতিগণ সর্ব্বত্রই 'সেন'—তবে দ্বিতীয় সংস্করণের বৈদ্যপুস্তকে মাত্র এক বৎসর পূর্ব্বে তিনি আপনাকে 'সেনগুপ্ত' বানাইয়াছেন, ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে প্রদত্ত দান পত্রে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের নামে 'সেনগুপ্ত' ছিল, ইহা আমরা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। ঐ দান পত্র স্থিত 'গুপ্ত' অংশে কোন গুপ্তক্রিয়া অবশ্যই গুপ্ত আছে। আমরা নিতান্ত দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, কালীবাবুর অন্যান্য কোন কথা বিশ্বাসযোগ্য না হওয়ায় এক্ষেত্রেও তাঁহার কথা বিশ্বাসযোগ্য মনে করিতে পারিলাম না।

কালীবাবু যাহা বলেন, তাহার মাথামুণ্ডু কোন সঙ্গত অর্থই হয় না। ওকালতি চালে কেবল ধাপ্পা ও ধোঁকার দ্বারা তিনি বৈদ্য-সমাজের পণ্ডিত-চূড়ামণিগণকে পরাস্ত করিবেন ভাবিয়াছিলেন। কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এরূপ করিতে পারেন না। উকিল বাবু বলিতেছেন, অাচ্ছা মানিলাম, প্রাচীন বঙ্গসমাজে বৈদ্য ও ব্রাহ্মণ একসঙ্গে আহারাদি করিত, কিন্তু হঠাৎ রাজাজ্ঞায় এইরূপ আহারাদি একদিন বন্ধ হইয়া গেল এবং বৈদ্যগণ বৈশ্যাচারী হইয়া জাত্যন্তরিত হইলেন, এ কেমন ব্যাপার? "এরূপ অবস্থায় বংশাবলীর দ্বারা সম্বন্ধ নির্ণয়ের সম্ভাবনা থাকিত। শ্রীহট্ট প্রদেশে বহু পুরুষ পূর্ব্বে **কোন পরিবারের এক শাখা** মুসলমান হইয়া গিয়াছে, এক শাখা এখনও হিন্দু আছে। ইহাদের সম্বন্ধ এখনও কেহ বিস্মৃত হয় নাই। এবং বংশা-

আছে—'মহারাজ রাজবল্লভ সেন রাইরাইয়া সলার জঙ্গ বাহাদুর।" উহাতে 'গুপ্ত' নাই।

বলীর দ্বারা অদ্যাপি সম্বন্ধ নির্ণয় হইতেছে। বক্ষমান (?) বিষয়ে যাহারা বৈশ্যাচারে অপসারিত হইলেন, তাঁহাদের সহিত বংশাবলী দ্বারা অপর শাখার সম্বন্ধস্থাপনের উপায় থাকিত। কত সহস্র বৎসর হইল রাঢ় ও বঙ্গের বৈদ্যগণ বিভিন্ন হইয়াছেন, কিন্তু আজিও কুলজি গ্রন্থ দ্বারা সম্বন্ধ ও বংশ স্থির করার উপায় আছে। এ ভা:ব পর্য্যালোচনা করিলেও ঐ আজ্ঞাপত্র যে অলীক ও অসার তাহাই প্রমাণিত হয়।" (বৈদ্য, পৃঃ ৬৫—৬৬)

ভাল আপদেই পড়া গেছে। এক বংশের মধ্যে কেহ মুশলমান কি খ্রীষ্টান হইলে বংশাবলীর সাহায্যে তাহাদের অধস্তন পুরুষেরা আপনাদের পূর্ব্বপুরুষদের ভূতপূর্ব্ব সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে পারে। কিন্তু বিভিন্ন জাতির মধ্যে কুলগত সম্বন্ধ আসলে বিদ্যমান না থাকায় তাহারা একসঙ্গে আহার করুক, আর নাই করুক, জাত্যন্তরিত হউক আর নাই হউক, বংশাবলী কিরূপে তাহাদের সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া দিবে? বৈদ্য ও রাঢ়ী ব্রাহ্মণ অথবা বৈদ্য ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ নহে। তাহাদের মধ্যে বৈবাহিক আদান প্রদানও ছিল না, এ ক্ষেত্রে রাঢ়ী বা‌রেন্দ্র কুলজীর সাহায্যে অথবা বৈদ্য কুলজীর সাহায্যে রাঢ়ীতে ও বৈদ্যে অথবা বৈদ্যে ও বারেন্দ্রে সম্বন্ধ বাহির করিবার কথা পাগলের প্রলাপ বৈ আর কি বলিব? রাঢ়ী ও বঙ্গীয় বৈদ্যগণ এক সম্প্রদায়ের লোক, এজন্য পৃথক্ হওয়া সত্ত্বেও কুলজী তাহাদের সম্বন্ধ বলিয়া দেয়। শ্রীহট্টের ঐ মুশলমানটীও যে বংশ হইতে জাত্যন্তরিত হইয়াছিল, তাহার বংশাবলী সেই বংশটীকে দেখাইতে পারে, কিন্তু কালীবাবুর সঙ্গে ঐ মুশলমানটীর কোন কৌলিক সম্বন্ধ না থাকিলে, কোন্ বংশাবলী তাহা সপ্রমাণ করিবে? কালীবাবু নিজেই বলিতেছেন, "কত সহস্র বৎসর হইল রাঢ়ী ও বঙ্গীয় বৈদ্যেরা বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের সম্বন্ধ 'নির্ণয়ের উপায় আছে", অথচ এস্থলে চক্ষু

বুঝাইয়া আছেন। বৈদ্যসম্প্রদায়ের দুইটী সমাজের মধ্যে প্রচলিত বৈবাহিক আদান প্রদান বন্ধ হওয়াটা যে পদার্থ, বৈদ্যশ্রেণী ও যাজক-শ্রেণীর মধ্যে প্রচলিত পান ভোজন বন্ধ হওয়া কি সেই পদার্থ? বৈদ্যেরা কি রাঢ়ী-বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের জ্যেঠা-খুড়া বা মেসো-পিসে যে তাহাদের মধ্যে বংশাবলীর সাহায্যে সম্বন্ধ নির্ণয় হইবে? কিসের সম্বন্ধ? এই সকল উক্তি হইতে পরিষ্কার সপ্রমাণ হইতেছে যে, কালী-বাবুর মস্তিষ্ক-বিকৃতি হইয়াছে। অথবা অল্পবুদ্ধি পাঠককে যাহা তাহা বলিয়া বিচলিত করাই যাহার উদ্দেশ্য, সে এরূপ কথাই বা কেন না বলিবে? উকিলেরা মোকদ্দমা জিতিবার জন্য অনেক রকম চাল দিয়া থাকেন। না জানি, কালীবাবু এরূপ আরও কত কথা কহিয়া চারিদিকে বক্তৃতা করিতেছেন! 'শতং বদ মা লিখ' এই নীতি যদি তিনি অনুসরণ করিতেন তাহা হইলে আমরা তাঁহার এই অপূর্ব্ব যুক্তিটির বিরুদ্ধে বলিবার কোন সুযোগই আজ পাইতাম না!

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সত্যেন্দ্র বাবু না ভাবিয়া চিন্তিয়া কালীবাবুর অভিমতকেই সমর্থন করিতে অগ্রসর হইয়াছেন! রাজা গণেশের আদেশপত্রে যে সন-তারিখ লিখিত আছে, তাহার সহিত শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রদত্ত রাজা গণেশের সময়টার অনৈক্য দৃষ্ট হয়। ঐ অনৈক্যকে ফুটাইবার জন্য 'শাকে নেত্রাননযমবিধৌ' স্থলে সম্ভবমত অর্থ গ্রহণ না করিয়া অসম্ভবরূপে ১২২১২২ শাক করিয়াছেন! রাজা গণেশের রাজত্ব আরম্ভ ১৩২৯ শাকে (১৪০৭ খ্রীষ্টাব্দে)। এ দেশে ইতিহাস চর্চ্চার অভাব প্রসিদ্ধ। ঐতিহাসিকেরাও সকলে একমত নহেন। সুতরাং ঐ সময়টী অন্যান্য ঐতিহাসিকদিগের মতে আরও কিছু পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট হওয়ায়, তদনুসারে গণেশ শাসনের কথাটা অপ্রকৃত বলিয়া মনে হয় না। অতএব 'কালের অসামঞ্জস্য বশতঃ ঐ আজ্ঞাপত্রের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ আরও দৃঢ়ীভূত হয়'—সত্যেন্দ্র

বাবুর এই উক্তির কোনই মূল্য নাই। প্রাচীন রাজগণ সম্বন্ধে প্রাচীন কুলাচার্য্যেরা যে সময়ের উল্লেখ করিয়া থাকেন, তাহাও ত অবিশ্বাস্য, কিন্তু তাই বলিয়া সত্যেন্দ্রবাবু কি কুলাচার্য্যদিগের সমস্ত কথাই অবিশ্বাস করিবেন? বস্তুতঃ, সময়ের যদি কোন অসামঞ্জস্য থাকে, তজ্জন্য ঐ লিপির আদি লেখকই দায়ী, এবং উহা পরবর্ত্তী কালে আন্দাজে লেখা হইয়াছিল বলিয়া মার্জ্জনীয়! বৈদ্যপ্রবোধনী এই ভ্রমের জন্য দায়ী নহে, এবং যে ঘটনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহাও একেবারে অবিশ্বাস্য নহে। উহা জাল রচনা হইলে অন্ততঃ সন-তারিখ সম্বন্ধে কোন্ ভুল দেখা যাইত না! কোল্‌ব্রুকের বইখানির নামও থাকিত না!

কালীবাবুর এবং প্রসঙ্গতঃ তদীয় পৃষ্ঠপোষক সত্যেন্দ্রবাবুর মোটা মোটা বিষয়ে মোটা মোটা ভুলগুলি দেখাইয়া **বৈদ্য যে অম্বষ্ঠ নহে, তাহা দেখান হইল।**

বৈদ্য অম্বষ্ঠ নহে, ইহা **কালীবাবু ও সত্যেন্দ্রবাবুকে** অন্যরূপেও দেখান যায়। কালীবাবু ও সত্যেন্দ্রবাবুর মতে অম্বষ্ঠ বৈশ্যবর্ণীয়, কিন্তু (অম্বষ্ঠের বৈশ্যবর্ণত্বের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার পূর্ব্বে; আমরা শুধু এই বলিতে চাই যে,) **বৈদ্য বৈশ্যবর্ণীয় নহে, সুতরাং বৈদ্য অম্বষ্ঠ নহে।** বৈদ্য বৈশ্যবর্ণীয় নহে কেন? বৈদ্যের চিরন্তন আচার্য্যত্ব[১], দশাহ জননাশৌচ[২], কচিৎ দশাহে হাঁড়ী প্রভৃতি ফেলিয়া দেওয়া[৩], প্রতিগ্রহ[৪], ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ[৫], আয়ুর্ব্বেদের অধ্যাপনা[৬], স্মার্ত্তত্ব[৭], চৈতন্যদেবের পূর্ব্ব হইতে গুরুবৃত্তি[৮], গোস্বামী, ঠাকুর প্রভৃতি উপাধি ধারণ[৯], প্রাচীন বৈদ্যদিগের শর্ম্মান্তনাম ব্যবহার[১০], সেন রাজগণের ব্রাহ্মণ পরিচয়[১১], বৈদ্য বৈষ্ণব-কবিগণের ব্রাহ্মণ-পরিচয়[১২], রঘুনন্দন ও গণেশ কর্ত্তৃক পাণ্ডিত্য ঘোষণা[১৩], পাঁড়ে-মিশ্র-চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি উপাধি[১৪], মহামহোপাধ্যায়, সার্ব্বভৌম, বাচস্পতি প্রভৃতি উপাধির বিদ্যমানতা[১৫], বদ্দিবামুন এই প্রসিদ্ধি[১৬], অধিষ্ঠানে

পান-সুপারী-যজ্ঞোপবীত প্রভৃতি প্রাপ্তি[১৭], বোপদেবাদি প্রাচীন বৈদ্য-দিগের বৈদ্য ও ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রসিদ্ধি[১৮], ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রসিদ্ধ জয়দেবাদি কবিরাজদিগের গৃহে কবিকর্ণপুরাদি প্রসিদ্ধ বৈদ্যদিগের বিবাহ[১৯], উড়িষ্যাবাসী মিশ্র ব্রাহ্মণদিগের সহিত বৈদ্যদিগের বিবাহ[২০], বৈদ্যদিগের অনিন্দিত চিকিৎসা[২১], বৈদ্যগোত্রের নিজস্বত্ব[২২], ভারতবর্ষের সহিত সামঞ্জস্য[২৩], বঙ্গেতর ভারতবর্ষের সেনাদি উপাধিমান্ ব্রাহ্মণ ও আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাপর ব্রাহ্মণদিগের সহিত বঙ্গের বৈদ্যদিগের সাদৃশ্য[২৪], ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বের সাক্ষ্য[২৫], এই সমস্তই একবাক্যে সপ্রমাণ করিতেছে যে বৈদ্য ব্রাহ্মণবর্ণীয়।* সুতরাং কালীবাবু ও সত্যেন্দ্রবাবু যে বৈদ্যকে বৈশ্য-বর্ণীয় অম্বষ্ঠ বলেন, সে কথা একেবারেই মিথ্যা। বৈদ্য অম্বষ্ঠ ও নহে, বৈশ্যবর্ণীয়ও নহে।

বৈদ্য তবে কোন বর্ণীয়? বৈদ্য এই নাম আজকালের নহে। আবহমানকাল হইতে বৈদ্যদিগের 'বৈদ্য' নাম। শ্রুতির প্রমাণ, আয়ুর্ব্বেদের প্রমাণ অভিধানের প্রমাণ অর্থাৎ অভিধানগত বৈদ্য-লক্ষণের প্রমাণ ও অনিন্দিত চিকিৎসাবৃত্তির প্রমাণ হইতে জানা যায় যে, যে ব্রাহ্মণবংশ বৈদ্যবৃত্তিক হইয়া প্রাচীনতমকাল হইতে অদ্যাপি ভারতের সর্ব্বত্র আয়ুর্ব্বেদের অনুশীলন করিতেছে, বঙ্গদেশীয় বৈদ্যগণ সেই ব্রাহ্মণবংশের অন্যতম ধারা।

আমরা নানাদিক্ দিয়া সপ্রমাণ করিলাম যে কালীবাবু ও সত্যেন্দ্র বাবু বৈদ্য ও অম্বষ্ঠকে অভিন্ন প্রতিপন্ন করিবার জন্য যে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা নিতান্তই উপহাস্য। বঙ্গদেশীয় বৈদ্যব্রাহ্মণগণ ধন্বন্তরি, মুদ্গল, অঙ্গিরা, ভরদ্বাজ প্রভৃতি **ঋষিদের বংশে জাত সনাতন বৈদ্যকুলজ ব্রাহ্মণ**। এই জন্যই তাঁহারা বৈদ্য-

---

* ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫ চিহ্নিত স্থলে ৭৩ পৃষ্ঠা হইতে ১৩৫ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত দ্রষ্টব্য।

নামে প্রসিদ্ধ এবং শ্রেষ্ঠ চিকিৎসায় অধিকারী মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত। ইঁহারা অম্বষ্ঠ নহেন। অম্বষ্ঠ নামটী বৈদ্য সম্প্রদায়কে ভুল করিয়া দেওয়া হইয়াছে। উহা স্মার্ত্ত-ঠাকুরদের দয়ার দান। এমেরিকার আদিম অধিবাসীরা যেমন সাহেবদিগের ইচ্ছায় 'Indian', আমরাও তেমনই এক শ্রেণীর সাহেব বা প্রভুদের ইচ্ছায় 'অম্বষ্ঠ'! এমেরিকায় কোন কোন আদিম অধিবাসী এখন ঐ 'ইণ্ডিয়ান্' নামটাকে এমনই মজ্জাগত করিয়া ফেলিয়াছে, যে তাহারা ঐ নামেই পরিচয় দিতে ভালবাসে! শ্রীযুক্ত কালীবাবু এবং সত্যেন্দ্রবাবুও তদ্রূপ বাপ-দাদাদের জাতিনাম ভুলিয়া আপনাদিগকে 'অম্বষ্ঠ' মনে করিয়া আত্মপ্রসাদ পাইতেছেন। আজিমগঞ্জের এক ভদ্র লোক, এথ্‌নলজিতে বিষম পণ্ডিত, তিনি বলেন নানা জাতির মিশ্রণের ফলে বাঙ্গালী জাতির উৎপত্তি, সুতরাং বৈদ্যজাতিও তাহাই, কিন্তু তথাপি কালীবাবুর মতে সায় দিতে তিনি কিছু মাত্র পশ্চাৎপদ নহেন! স্বজাতিকে নানা-জাতির মিশ্রণে উৎপন্ন বলার সঙ্গে সঙ্গে "অম্বোষ্ঠ" (ঐ পুস্তকে এইরূপ বাণানই আছে) প্রতিপন্ন করা কিরূপ লম্বোষ্ঠের কাজ তাহা বোধ হয় না বলিলেও চলিবে!

পৃথিবীস্থ বিভিন্ন মনুষ্য জাতির মধ্যে যুগে যুগে যে সংমিশ্রণ হইয়াছে, বৈদ্যসমিতি তাহা অস্বীকার করে না। নিতান্ত মূর্খ ব্যতীত কেহই তাহা অস্বীকার করিবে না। তথাপি 'বিশুদ্ধ' ব্রাহ্মণ বা ইংরাজ শোণিত (Pure English blood) এর ন্যায় প্রত্যেক জাতিই নিজের শোণিত বিশুদ্ধ বলিয়া মনে করিতে পারে। যে মিশ্রণের ফলে হিন্দু-জাতির উৎপত্তি তাহা ঋষিরা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন; শূদ্রকন্যা, নাগকন্যা, গন্ধর্ব্বকন্যা, অপ্সরা, কিন্নরী এসকল দলে দলে আর্য্য জাতীয় বৈশ্য, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণগণ গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু তথাপি তাঁহাদের সনাতন চাতুর্ব্বর্ণ্য ক্ষুণ্ণ হয় নাই। শোণিতের বিশুদ্ধি অপেক্ষা গুণ,

কর্ম্ম, সংস্কার, অভিমান ও আচরণের দিকেই শাস্ত্রকারদিগের দৃষ্টি পতিত হইয়াছিল। যে জাতীয় লোক হউক না কেন, চারিবর্ণের মধ্যে একটীর অন্তর্গত তাহাকে হইতেই হইবে, তবে ত শাস্ত্রোক্ত বিধি ব্যবস্থা তাহার উপর প্রযুক্ত হইবে! এই জন্য হিন্দুজাতি সহস্র সহস্র জাতিতে বিভক্ত হইলেও চারিবর্ণের ব্যবস্থা অনুসারেই তাহাদের কার্য্য হইতেছে। প্রাচীনকাল হইতে প্রত্যেক জাতি নিজ জাতীয় বৃত্তি, চরিত্র, গুণোৎকর্ষ ও উপনয়নাদি সংস্কারের নিয়মানুসারে একটী না একটী বর্ণের মধ্যে স্থান পাইয়া শাস্ত্র-ব্যবস্থা মানিয়া চলিতেছে। হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে হইলে হিন্দুর বৈশিষ্ট্য বর্ণবিভাগ মানিতে হয় এবং তদনুসারে কার্য্য করিতে হয়। এথ্‌নলজির মতানুসারে মিশ্রণে মিশ্রণে সমস্ত জাতিই অল্পাধিক একাকার হইয়া গিয়াছে। আমরা এই বিজ্ঞান-সম্মত কথার প্রতিবাদ করি না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বৈদ্যজাতির 'অম্বোষ্ঠত্ব' স্বীকৃত হয় কিরূপে, তাহাই বুঝিতে পারি না। 'অম্বোষ্ঠত্ব' সমর্থন করা যদি সম্ভব হয়, তবে বৈদ্যপ্রবোধনীর প্রদর্শিত 'ব্রাহ্মণত্ব' সমর্থন করা এত অসম্ভব কেন হইল? ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতির জাতীয় নাম গুলি এখন সরাইয়া ফেলিয়া প্রধান চারি নামে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি ভাগে সমগ্র হিন্দুজাতিকে বিভক্ত করাই ত বিজ্ঞানের ও ধর্ম্মের অনুমোদিত। বৈদ্যসম্প্রদায় হিন্দু-শাস্ত্রে বিশ্বাসী হিন্দু। তাঁহারা নাস্তিক বা অহিন্দু নহেন। সুতরাং তাঁহাদিগকে শাস্ত্রোক্ত বর্ণনির্দ্দিষ্ট পথে চলিতে হইবে। সে পথ কোন্ পথ? বৈদ্যের ইতিহাস, শিক্ষা, দীক্ষা, লোকপ্রসিদ্ধি, সদাচার, পবিত্র বৃত্তি ও প্রতিষ্ঠা যে পথ দেখাইয়া দিতেছে সেই পথই তাহাদের একমাত্র পথ। যে পথে তাহাদের মহামহোপাধ্যায় পূর্ব্বপুরুষগণ (নিখিল ভারতে) চলিয়াছেন সেই পথই বৈদ্যের অনুসরণীয়। ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম, ব্রাহ্মণের কর্ম্ম, ব্রাহ্মণের আচারই বৈদ্যদিগের প্রার্থনীয় স্বধর্ম্ম। বৈদ্য ব্রাহ্মণবর্ণীয় এবং

শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, ইহা বৈদ্য মাত্রকেই স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য বৈদ্য-প্রবোধনীর সৃষ্টি। আশা করি বৈদ্যপ্রবোধনীর বিরুদ্ধে যাঁহারা লেখনী ধারণ করিয়াছেন, তাঁহারা আপনাদের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া নিরস্ত হইবেন। স্বজাতিদ্রোহিতা করিয়া আপনাদিগকে যে চির অপযশের ভাগী করিয়াছেন, তাহা হইতে রক্ষা পাইবার শ্লাঘ্য উপায় অচিরে অন্বেষণ করিবেন।

চতুর্থ অধ্যায়

অম্বষ্ঠ বৈশ্য বর্ণ নহে

অম্বষ্ঠজননী ও অম্বষ্ঠের ব্রাহ্মবর্ণত্ব স্বাভাবিক

জগতের তাবৎ কার্য্যই কোন না কোন নিয়মের বশবর্ত্তী। সমাজ সামাজিক বিধি-নিষেধাত্মক নিয়মাবলীর দ্বারা শাসিত। এই সকল নিয়ম প্রায়ই ঋষিপ্রণীত শাস্ত্রভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। হিন্দুর শাস্ত্রে বিবাহের যে বিধি দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে প্রতিলোম বিবাহ নিষিদ্ধ এবং দ্বিজের শূদ্রা বিবাহ নিন্দিত হইয়াছে; ব্রাহ্মণের পক্ষে ব্রাহ্মণকন্যাই সর্ব্বাগ্রে অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত; ক্ষত্রিয়কন্যা বা বৈশ্যকন্যা ক্রমশঃ অপ্রশস্ত, কিন্তু অবৈধ নহে। অপর দিক হইতে দেখিলে ব্রাহ্মণের পক্ষে শূদ্রা ভার্য্যা অত্যন্ত অপকৃষ্ট বলিয়া গর্হিত, বৈশ্যকন্যা গর্হিত নহে, অর্থাৎ প্রশস্ত, কিন্তু ক্ষত্রিয়কন্যা প্রশস্ততর এবং ব্রাহ্মণকন্যা প্রশস্ততম। সহজ ভাষায় বলিতে গেলে ব্রাহ্মণের শূদ্রা ভার্য্যা 'দাসী' পদবাচ্য হইত। সে ব্রাহ্মণ পতির সহধর্ম্মিণী বলিয়া গণ্য হইত না, কিন্তু অপর তিন বর্ণের

কন্যাই সহধর্ম্মিণী বা ধর্ম্মপত্নী বলিয়া গণ্য হইত এবং ব্রাহ্মণকন্যা তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা হইত। ক্ষত্রকন্যা ও বৈশ্যকন্যা পতির সহিত একত্বহেতু পতিকুলে জাতার ন্যায় হইয়া ব্রাহ্মণবর্ণ হইত, তাহাদের পুত্রও ব্রাহ্মণবর্ণ হইত। ব্রাহ্মণকন্যা ইহাদের মধ্যে গৌরবে শ্রেষ্ঠ, সুতরাং তাহার গর্ভজাত পুত্রেরও জন্মতঃ সমধিক উৎকর্ষ স্বীকৃত হইত, ক্ষত্রিয়কন্যার বা বৈশ্যকন্যার গর্ভজাত পুত্র কিঞ্চিৎ নিকৃষ্ট কিন্তু তথাপি ব্রাহ্মণবর্ণ বলিয়া স্বীকৃত হইত। তাহারা ব্রাহ্মণেতর বর্ণের দলপুষ্টি করিত না।

প্রাচীনযুগের এই বর্ণ পরিবর্ত্তনের কথায় বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিনটী বর্ণ মূলতঃ একই আর্য্য-জাতির গুণকর্ম্মানুসারিণী তিনটী শ্রেণী মাত্র। তাহারা গো-মেষ-মহিষাদির মত, অথবা নর-কিন্নর-রাক্ষসাদির মত সম্পূর্ণ পৃথক জাতীয় ছিল না। একই আর্য্য জাতির এই তিনটী শ্রেণী এক ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিত, একই শাস্ত্র মানিয়া চলিত, একই দেবতার উপাসনা করিত, পরস্পরের অন্ন ভোজন করিত, এবং নিম্নবর্ণের পুরুষ উচ্চবর্ণের কন্যাকে বিবাহ না করিতে পারিলেও উচ্চবর্ণের পুরুষেরা নিম্নবর্ণের কন্যাকে বিবাহ করিয়া তাহাদের সহিত মধুর বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইত। ঐরূপ বিবাহ করিলে ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণই হইত, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য হইত না। তখন ক্ষত্রকন্যা বা বৈশ্যকন্যা ব্রাহ্মণপতির গৃহে পাকাধিকারিণী ও যজ্ঞে সহধর্ম্মচারিণী হইতে পারিত এবং পতির ন্যায় 'তাদৃগ্‌গুণা' অর্থাৎ ব্রাহ্মণী হইয়া ব্রাহ্মণ পুত্রেরই জননী হইত। ইহাই ছিল প্রাচীন যুগের সহজ ও স্বাভাবিক নিয়ম। ইহাই ছিল শাস্ত্রবিধি। তৎকালে পতি ও পত্নী মাতা ও পিতা, পিতা ও পুত্রের মধ্যে কেহই বর্ণভেদ কল্পনা করিতে পারিত না।

আধুনিক কালে ঐ শ্রেণী তিনটীর মধ্যে ক্রমশঃ একটা দারুণ বিজাতীয় ভাব জাগিয়া উঠার ফলে অসবর্ণ বিবাহ বন্ধ হইয়াছে,

উচ্চবর্ণের লোকেরা শুধু যে নিম্নবর্ণের কন্যা গ্রহণ হইতে বিরত হইয়াছে তাহা নহে, অন্নগ্রহণও ত্যাগ করিয়াছে। এখন সমাজে কেবলমাত্র স্বজাতির গণ্ডীর মধ্যে সবর্ণ বিবাহকেই প্রচলিত দেখিয়া কোন কোন পণ্ডিত তাহাকেই একমাত্র সনাতন রীতি মনে করিয়া একটা মস্ত ভুল করেন। এই ভুলের জন্যই তাঁহারা প্রাচীন বিবাহ বিধির ব্যাখ্যাকালে (মনু-যাজ্ঞবল্ক্যের সময়েও) ব্রাহ্মণের বিবাহিত ক্ষত্রকন্যা ও বৈশ্যকন্যাকে পত্নী বলিতে চাহেন না, * কামস্ত্রী বলেন, তদুৎপন্ন সন্তানকেও ঔরস পুত্র না বলিয়া অবৈধ সন্তান বা বর্ণসঙ্কর বলিয়া থাকেন। কিন্তু আজকালের হিন্দুসমাজের পরিবর্ত্তিত মাপ-কাঠীতে বিচার করিয়া প্রাচীন যুগের বৈধ অনুলোম বিবাহকে অবৈধ মনে করা এবং তদুৎপন্ন মূর্দ্ধাভিষিক্ত, অম্বষ্ঠ ও মাহিষ্যকে অবৈধ পুত্র বা বর্ণসঙ্কর বলা মহাভ্রম। কুল্লূকাদি টীকাকারেরা মহাপণ্ডিত হইলেও শাস্ত্র ব্যাখ্যাকালে অসাবধানতা প্রযুক্ত এই ভ্রমের হস্ত হইতে নিস্তার লাভ করিতে পারেন নাই। জাতিগত বিদ্বেষও তাঁহাদিগকে অন্ধ করিয়াছিল। বৈদ্যপণ্ডিতগণ ঈদৃশ গর্হিত ব্যাখ্যার সুচিরকাল প্রতিবাদ করিয়া আসিতেছেন। কালীবাবু ও সত্যেন্দ্রবাবু তাহা দেখিয়াছেন, তথাপি দৈবদুর্ব্বিপাক বশতঃ সত্যতত্ত্ব তাঁহাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হয় নাই।

পতি-পত্নীর 'একত্ব' শাস্ত্রসিদ্ধ

প্রথম কথা

সত্যেন্দ্রবাবু বলিয়াছেন—"বিবাহদ্বারা গোত্রের একত্ব হয়, কিন্তু **বর্ণের একত্ব হয় না**"। (বৈ০ প্রতি০ পৃঃ ১২)

আমরা ইহা দণ্ডাপূপ ন্যায়ে বুঝাইতে চেষ্টা করিব। অপূপ-ঢাকা

* জাতিতত্ত্বে শ্যামাচরণ কবিরত্ন ও বৈদ্যপুস্তকে কালীবাবু এই ভুল কথা প্রচার করিয়াছেন।

দণ্ড ছুঁচায় খাইয়াছে বলিলে সঙ্গে সঙ্গে বুঝা যায়, সেই পাজী ছুঁচো অপূপও নিশ্চয় নিঃশেষ করিয়াছে। ঢাকা না তুলিলে ভিতরের জিনিষ যেখানে সরাইবার উপায় নাই, সেখানে ভিতরের জিনিষ সরিয়া গেলে, ঢাকা অবশ্যই সরান হইয়াছিল, বুঝা যায়। **অন্তরঙ্গ** গোত্র অধিকার করিতে গেলে অগ্রে **বহিরঙ্গ** বর্ণ এ ক্ষেত্রে দখল করিতেই হইবে, কারণ এই গোত্র তাহার পিতৃ-পিতামহাগত নিজস্ব গোত্র, ইহা বর্ণের সহিত সংস্রব রহিত ধার-করা পুরোহিতগোত্র নহে। ব্রাহ্মণের অসংস্কৃতা শূদ্রা ভার্য্যার বর্ণান্তরও হয় না, গোত্রান্তরও হয় না, কিন্তু মন্ত্রসংস্কৃতা ব্রাহ্মণপরিণীতা ক্ষত্রিয়কন্যা ও বৈশ্যকন্যা যে ব্রাহ্মণী হয় এবং ক্ষত্রিয়পরিণীতা মন্ত্রসংস্কৃতা বৈশ্যকন্যা যে ক্ষত্রবর্ণা হয়, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। এ বিষয়ে শাস্ত্র ও যুক্তি দেখাইতেছি। মহর্ষি লিখিত তদীয় সংহিতায় লিখিয়াছেন—

বিবাহে চৈব নির্ব্বৃত্তে চতুর্থেঽহনি রাত্রিষু।
একত্বং সা গতা ভর্ত্তুঃ **পিণ্ডে গোত্রে চ সূতকে** ॥২৬॥

এতদ্দ্বারা পতি-পত্নীর গোত্র, পিণ্ড ও অশৌচ এক হয় বলা হইল। বর্ণে একত্ব না হইলে এই তিনটী বিষয়েই **'যুগপৎ একত্ব'** হইতে পারে না। ভিন্নগোত্রা থাকিলে যেমন পতির সহিত ধর্ম্মাচরণে অধিকার হয় না, ভিন্নবর্ণা থাকিলেও সেইরূপ কোন অধিকারই হয় না। পত্নীত্বই হয় না, তার পত্নীর অধিকার কি? **'ভিন্নবর্ণা পত্নী'** সত্যেন্দ্রবাবুর উদ্দাম কল্পনা—উহা শাস্ত্রে ও ব্যবহারে সিদ্ধ নহে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বিবাহের পর নারী পতিকুলে জাতার ন্যায় হয়। এই জন্যই তখন তাহার পিতৃবর্ণ ও পিতৃগোত্র ঘুচিয়া যায়। এইজন্যই সঙ্গে সঙ্গে তাহার অশৌচে ও পিণ্ডে চিরস্থায়ী একত্ব হয়। ভিন্নবর্ণা থাকিলে পতির সহিত কোনরূপ একত্বই হইল না বলিতে হয়। গোত্রে, পিণ্ডে, অশৌচে তাহার কি 'একত্ব' হইবে, এবং কিরূপেই বা

হইবে, যদি বর্ণেই একত্ব না হইল? সত্যেন্দ্রবাবু এই শ্লোকটী পুস্তকের ১৩ পৃষ্ঠায় তুলিয়াছেন, কিন্তু মর্ম্ম গ্রহণ করিতে সমর্থ হন নাই। বৈদ্যব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, গোত্রে একত্বপ্রাপ্তি হেতু সেই গোত্র যেমন স্বামীর মৃত্যুর পর পরিবর্ত্তিত হয় না, অশৌচে একত্ব প্রাপ্তির পরও তাহার আর ব্যতিক্রম হয় না। কিন্তু **দাসীর** অর্থাৎ শূদ্রা ভার্য্যার পক্ষে এই পত্নীত্বলক্ষণ চিরস্থায়ি 'একত্ব' জন্মে না, দ্বিজসেবক শূদ্রের পক্ষে প্রভুর ন্যায় অশৌচ পালন করিবার বিধি থাকায়, সে তাহাই করে, এবং প্রভুর মৃত্যুর পর শাস্ত্রাদেশ অনুসারে পুনশ্চ শূদ্রবৎই অশৌচ পালন করিয়া থাকে। কিন্তু **দাসীর** পক্ষে যে ব্যবস্থা **পত্নীরও** প্রতি সেই ব্যবস্থা কথনই হইতে পারে না। বৈদ্যবিদ্বেষী পঞ্চাননের দুষ্ট স্মৃতি অনুবাদ পাঠ করিয়া যাঁহারা বিভ্রান্ত হইয়াছেন, তাঁহারা এই সহজ কথাটা বুঝিতে পারেন না। অনুলোমা পত্নীকে 'দাসী' মনে করিলে, তাহার কি প্রতিকার আছে? সত্যেন্দ্র-বাবু কি ভাবে প্রতারিত হইয়াছেন দেখাইতেছি।

বিষ্ণু সংহিতায় আছে—

'**পত্নীনাং দাসানাং** আনুলোম্যেন স্বামিনস্তুল্যম্ আশৌচম্'—
বিষ্ণু, ২২।১৮

'মৃতে স্বামিনি **আত্মীয়ম্**'—বিষ্ণু, ২২।১৯

এই দুইটী সূত্রের পঞ্চাননকৃত অনুবাদ এইরূপ—"হীনবর্ণের পত্নী এবং দাসবর্গের স্বামীর অশৌচে স্বামীর সমান অশৌচ হইবে। স্বামীর মৃত্যুর পর **নিজবর্ণানুরূপ** অশৌচ।" সত্যেন্দ্রবাবুও তাল রখিয়া বলিতেছেন "অনুলোমা পত্নী যদি স্বামীর সবর্ণাই হইয়াছিল, তবে স্বামীর মৃত্যুর পরেও স্বামিবর্ণীয় অশৌচই থাকিত, নিজবর্ণীয়া অশৌচ হইত না। 'দেখুন তাঁহার গোত্র ত স্বামীর মৃত্যুর পরেও পূর্ব্ববৎ স্বামি-গোত্রই থাকে, পিতৃগোত্র হয় না।" (বৈদ্য-প্রতি, পৃঃ ১৩)

সত্যেন্দ্রবাবু 'আত্মীয়' শব্দের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে না পারিয়া এই মর্ম্মান্তিক কথাগুলি বলিয়াছেন। সূত্র দুইটী পরীক্ষা করা যাউক। প্রথম সূত্রটী 'অনুলোমাসু মাতৃবর্ণাঃ'র ন্যায় সর্ব্ববিধ অনুলোমা ভার্য্যা ও দাস-দাসীর প্রতি প্রযোজ্য। সূত্রে 'দাসানাম্' আছে, (দাসাশ্চ দাস্যশ্চ দাসাঃ) এতদ্দ্বারা বিবাহিতা শূদ্রা ভার্য্যা, শূদ্র ভৃত্য এবং অনুলোম-ক্রমে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য পরিচারককেও বুঝাইতে পারে। সাধারণতঃ ব্রাহ্মণের পক্ষে 'অনুলোমা পত্নী ও দাস' অর্থ দুই অনুলোমা পত্নী (দ্বিজা) ও এক দাসী, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে এক অনুলোমা পত্নী ও এক দাসী এবং বৈশ্যের পক্ষে এক দাসী মাত্র, ইহারা সকলেই স্বামার জীবদ্দশায় স্বামিতুল্য (অর্থাৎ স্বামী যে বর্ণের সেই বর্ণের) অশৌচ পালন করিবে। অনুলোমা ভার্য্যাগণের মধ্যে পত্নীগণ স্বামীর সহিত পিণ্ডে, গোত্রে ও অশৌচে এরূপ একত্ব প্রাপ্ত হন, যাহা দাসীর পক্ষে অসম্ভব। অতএব স্বামীর জীবদ্দশায় ক্ষত্রিয়কন্যা ও বৈশ্যকন্যা ব্রাহ্মণ পতির সহিত একত্ব প্রাপ্ত হয় বলিয়াই 'স্বামিতুল্য' অশৌচ পালন করে, একত্ব না পাইয়াও দাস-দাসীগণ যে ভাবে করে, সে ভাবে নয়। দ্বিতীয় সূত্রে স্বামীর মৃত্যুর পর এই সকল নানাবিধ ব্যক্তি কিরূপ অশৌচ পালন করিবে, তাহাই এক কথায় পরিষ্কার-রূপে বুঝাইবার জন্য বলা হইয়াছে, "মৃতে স্বামিনি **আত্মীয়ম্**"। অর্থাৎ স্বামীর মৃত্যুর পরে ইহারা "**নিজ নিজ**" অশৌচ পালন করিবে। ক্ষত্রিয় পরিচারক ও পরিচারিকারা ক্ষত্রিয় আচারে, বৈশ্য পরিচারক ও পরিচারিকারা বৈশ্য আচারে, শূদ্র পরিচারক ও পরিচারিকারা শূদ্র আচারে অশৌচ পালন করিবে। ভার্য্যাগণের মধ্যেও পত্নীগণ পত্নীবৎ (ব্রাহ্মণের অনুলোমা পত্নীদ্বয় ব্রাহ্মণবৎ, ক্ষত্রিয়ের অনুলোমা পত্নী ক্ষত্রিয়বৎ) এবং দাসীগণ দাসীবৎ অশৌচ পালন করিবে। দুইটী বৈশ্যকন্যার মধ্যে একটীর যদি ব্রাহ্মণের সহিত ও অপরটীর ক্ষত্রিয়ের সহিত বিবাহ হইয়া থাকে,

তাহা হইলে ব্রাহ্মণের পত্নীর ব্রাহ্মণাচারই 'আত্মীয়' আচার; এবং ক্ষত্রিয়ের পত্নীর ক্ষত্রাচারই 'আত্মীয়' আচার হইবে। এস্থলে ঐ ভার্য্যা-সকলের পিতার প্রতি সত্যেন্দ্রবাবুর সস্নেহ দৃষ্টি পড়ে কেন? যে ক্ষত্রিয়কন্যা বা বৈশ্যকন্যা ৭০।৮০ বৎসর শতায়ু ব্রাহ্মণ পতির সহিত অবিকল ব্রাহ্মণাচারে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালন করিল, তাহার কোন্ আচার-'আত্মীয়'? পতির আচার না পিতার আচার? সে ত পিতৃগৃহের আচার ব্যবহারের সহিত কিছুমাত্র পরিচয় করিবার সুযোগই পায় নাই। অবিবাহিত অবস্থায় দ্বিজকন্যার সকল সংস্কারই শূদ্রবৎ অমন্ত্রক হয়, এজন্য তাহার পিতৃগৃহের ক্ষত্রিয়াচার বা বৈশ্যাচার তাহার 'আত্মীয়-আচার' একথাও বলা চলে না। পিতৃগৃহে তাহার যে নামমাত্র একটা গোত্র এবং বর্ণ থাকে, তাহা পরিচয়ার্থ মাত্র, শ্বশুরকুলে লব্ধ গোত্র ও দ্বিজত্বই তাহাকে সমাজে গৌরব দান করে। তাহাই তাহার 'আত্মীয়'।*

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র বাবু স্বীকার করিয়াছেন, যে স্বামীর মৃত্যুর পর ঐ পত্নীর স্বামিগোত্রই থাকিয়া যায়। তবে অশৌচের বেলা পরিবর্ত্তনের আশঙ্কা কেন? তাহার অপরিবর্ত্তনীয় 'আত্মীয়' গৃহাচার (শ্বশুরগৃহের আচার) পরিবর্ত্তিত হইবে না, ইহাই শাস্ত্র বলিতেছে, কিন্তু সত্যেন্দ্র বাবু বলিতেছেন, পরিবর্ত্তিত হইবে! শূদ্রা ভার্য্যা হইতে দ্বিজা ভার্য্যার পার্থক্য বুঝিতে না পারায় এইরূপ ভ্রম হইয়াছে। শূদ্রা ভার্য্যা আপন শূদ্রত্ব ঘুচাইতে পারে না। সে পতির গোত্র বা আচার পায় না, বর্ণ পায় না, কোন বিষয়েই তাহার বিবাহসিদ্ধ 'একত্ব' স্থাপিত হয় না, সে যে শূদ্রা সেই শূদ্রাই থাকে, শূদ্রত্বই তাহার নিজস্ব তাহার আত্মা বা

---

* দ্বিজগৃহে অনূঢ়া কন্যাদের (অনুপনীত বালকদিগের ন্যায়) নামমাত্র পিতৃবর্ণ। পরিণীত হইলে তবেই তাহাদের (উপনীত বালকদিগের ন্যায়) যথার্থ দ্বিজত্ব লাভ হয়। অনূঢ়া দ্বিজকন্যা ও অনুপনীত দ্বিজবালক শূদ্রবৎ বেদে অনধিকারী।

স্বরূপ। সে 'দেবী' নহে 'দাসী', স্বামীর জীবদ্দশায় তাহার বিপ্রবৎ অশৌচ 'বিপ্র-সেবকা' বলিয়া। বিপ্রসেবক ভৃত্যগণের বিপ্রবৎ অশৌচ হইতে পারে, ইহা শাস্ত্রেই নির্দিষ্ট আছে।

পূর্ব্বোদ্ধৃত বিষ্ণুবাক্যে ব্রাহ্মণের অনুলোমা ভার্য্যাদিগের মধ্যে দুইটী শ্রেণী ধরা হইয়াছে। দ্বিজা ভার্য্যাকে স্পষ্টবাক্যে 'পত্নী' বলা হইয়াছে শূদ্রা ভার্য্যাকে অর্থাৎ দাসীকে 'দাসানাম্' এই পদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রাখা হইয়াছে। ভার্য্যাগণ পতিসহ **যৌনসম্পর্ক হেতু** যে বর্ণীয় গণ্য হয়, সেই বর্ণীয় আচারই তাহাদের 'আত্মীয়' হয়। তাহারা পতির মৃত্যুর পরেও সেই সম্পর্ক অনুসারে (**কারণ, পতি-পত্নীর সম্পর্ক পতির মৃত্যুতেই ঘুচিয়া যায় না**) চিরকাল সর্ব্ববিধ গৃহাচার পালন করিবে, অশৌচাদিও তদ্রূপ হইবে। অতএব ক্ষত্রিয়কন্যা ও বৈশ্যকন্যা ব্রাহ্মণপতির সহিত **যৌনসম্পর্কে ব্রাহ্মণী**, এবং বৈশ্যকন্যা ক্ষত্রিয়ের সহিত যৌনসম্পর্কে ক্ষত্রিয়া হইলে, সেইরূপ অশৌচই যে তাহার পক্ষে চিরকাল পালনীয়, তাহা শাস্ত্রান্তরেও সুস্পষ্ট রহিয়াছে—

মৃতসূতকে **দাসীনাং পত্নীনাম্** চানুলোমিনাম্।
স্বামিতুল্যং ভবেচ্ছৌচং মৃতে স্বামিনি **যৌনিকম্** ॥—অত্রি, ৮৯

এস্থলে 'দাসী' ও 'পত্নী' সুস্পষ্ট বলা হইয়াছে। স্বামীর জীবদ্দশায় 'স্বামিতুল্য' অশৌচ সকল ভার্য্যারই হইবে, মরণান্তে 'যৌনিকম্'। 'যৌনিকম্' শব্দের অর্থ 'বৈবাহিক সম্বন্ধ হইতে প্রাপ্ত'; যৌন—'Resulting from marriage'—V, S. Apte; পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতিও সেই কথা বলিয়াছেন। অর্থাৎ বিবাহ হইতে যাহার যে আচার 'পাকা' হইয়াছে, সে সেই আচার অনুসরণ করিতে থাকিবে। দ্বিজকন্যা বিবাহতঃ পতিবর্ণা হওয়ায় পতির মৃত্যুর পরেও পতিবর্ণোচিত আচারে অধিকারিণী থাকিবে, কিন্তু শূদ্রার পক্ষে দ্বিজ-

পতির সহিত যৌনসম্পর্ক সত্বেও শূদ্রত্বই পাকা থাকায় সে শূদ্রবৎ অশৌচ পালন করিবে বুঝা যায়। বিষ্ণুসংহিতায় 'মৃতে স্বামিনি আত্মীয়ম্' বলিয়া যাহা প্রকাশ করা হইয়াছে, 'মৃতে স্বামি ন যৌনিকম্' বলিয়া অত্রিও সেই কথা প্রকাশ করিলেন। একটী শব্দ হইতেই আমরা বুঝিলাম যে, বৈধব্য অবস্থায় মূর্দ্ধভিষিক্তজননী ও অম্বষ্ঠজননী ব্রাহ্মণবৎ, মাহিষ্যজননী ক্ষত্রিয়বৎ এবং পারশব-উগ্র-করণ-জননীগণ শূদ্রবৎ অশৌচাদি পালন করিবে। ধর্ম্মপত্নী ও কামপত্নীর, দ্বিজা ভার্য্যা ও শূদ্রা ভার্য্যার পার্থক্য এইরূপেই রাখা হইয়াছে।

কালীবাবুর ধর্ম্মবুদ্ধি ও সাহস প্রশংসনীয়, নতুবা নিজেকে অম্বষ্ঠ ও অম্বষ্ঠজননীকে কামপত্নী বলা সহজ নয়! তিনি বিভ্রান্ত না হইলে আমরা আজ প্রচুর লাভবান্ হইতাম। সত্যেন্দ্রবাবুও যে ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন, তাহা মনে হয় না। কালীবাবু কুল্লূক ও পঞ্চাননের অনুগামী; আবার তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহাই সত্যেন্দ্রবাবুর শিরোধার্য্য। কালীবাবুর যে যে ছিদ্র অরক্ষিত আছে সত্যেন্দ্রবাবু তাহাই সুরক্ষিত করিবার জন্য আসরে নামিয়াছেন। তিনি মূর্দ্ধাভিষিক্তজননী ও অম্বষ্ঠজননীকে কিরূপে ধর্ম্মপত্নী বলিবেন? দ্বাদশ পৃষ্ঠায় তিনি ভান করিয়া বলিয়াছেন, বৈদ্যব্রাহ্মণগণ যদি অসবর্ণা পত্নীগণকে উপপত্নী বলেন, তবে তিনি নিরুপায়! আমরাও বলি, ধর্ম্মপত্না অর্থে তিনি যখন 'উপপত্নী' বুঝিয়াছেন, তখন তিনি সত্যই নিরুপায়! কালীবাবুর মতে অম্বষ্ঠজ-নী পতির ধর্ম্মপত্নী নহে, কিন্তু রত্যর্থ (বৈদ্য; পৃঃ ৭৮)। ইহা জাতিতত্ত্ব প্রণেতা শ্যামাচরণের অনুকরণে। শ্যামাচরণ লিখিয়াছেন—"অসবর্ণা স্ত্রীর সহিত ধর্ম্মাচরণ শাস্ত্রনিষিদ্ধ। এই জন্যই মনু এবং অন্যান্য সংহিতাকারগণও অসবর্ণা স্ত্রীর স্থলে, সর্ব্বত্রই **স্ত্রী** বা **ভার্য্যা** শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, কুত্রাপি '**পত্নী**' বলেন নাই; এবং দ্বিজাতিদিগের অসবর্ণা অনুলোমজাতা কন্যাকে বিবাহ করা বিষয়ে 'ধর্ম্মতঃ' না

বলিয়া 'কামতঃ' (মনু ৩।১২) বলিয়াছেন, মহাভারতেও (অনুশাসন ৪৭।৪) 'রতিমিচ্ছতঃ' আছে।"—জাতিতত্ত্ব, পৃঃ ৪৫

এইকথা গুলির প্রথমাংশ যে একেবারে মিথ্যা তাহা সকলেই পূর্ব্বোদ্ধৃত '**পত্নীনাং** দাসানাম্ আনুলোম্যেন' এবং '**পত্নীনাং** চানুলোমিনাম্' ইত্যাদি বাক্য হইতে বুঝিতে পারিয়াছেন। জ্ঞানাঞ্জন প্রথম ও দ্বিতীয় শলাকায় এই সকল মিথ্যা কথার বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছিল; কালীবাবু কি তাহা দেখেন নাই? না দেখিয়া থাকিলে প্রথম শলাকার ৫ ১২ পৃষ্ঠা ও দ্বিতীয় শলাকার ২৫-৩৯ পৃষ্ঠা দেখিতে অনুরোধ করি। ঐ দুই স্থলে সমস্ত জুয়াচুরি ধরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। আমরা বাহুল্য ভয়ে এস্থলে সংক্ষেপে দুই একটী কথা বলিব। প্রথমে গৃহ্যসূত্রের বৈদিক প্রমাণ দেখুন।—

তিস্রো ব্রাহ্মণস্য বর্ণানুপূর্ব্ব্যেণ ॥ ৯ ॥ দ্বে রাজন্যস্য ॥১০॥ একা বৈশ্যস্য ॥১১॥ সর্ব্বেষাং শূদ্রামপ্যেকে মন্ত্রবর্জ্জম্ ॥১২॥—পারস্কর।

হরিহর ভাষ্য—"একে ন মন্যন্তে শূদ্রাবিবাহম্। কুতঃ? শূদ্রায়া ধর্ম্মকার্য্যেষু অনধিকারাৎ। কুতো নাধিকার ইতি চেৎ—রামা রমণায়োপেয়তে ন ধর্ম্মায় কৃষ্ণজাতীয়াঃ" ইতি নিরুক্তকার-যাস্কাচার্য্যবচনাৎ।... তস্মাৎ শূদ্রাপরিণয়নম্ ভোগার্থম্।"

মহাভারতের যে শ্লোকের কথা পণ্ডিত শ্যামাচরণ বলিয়াছেন, তাহা এই—

চতস্রো বিহিতা ভার্য্যা ব্রাহ্মণস্য পিতামহ।
ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা শূদ্রা চ রতিমিচ্ছতঃ॥

অনু, ৪৬ বা ৪৭।৪

'ধর্ম্মপ্রজারত্যর্থো হি বিবাহঃ।' সুতরাং কেবল রতিসূচক 'রতিমিচ্ছতঃ' শূদ্রাপক্ষেই বুঝিতে হইবে, এবং ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যা এই তিন ভার্য্যা বা পত্নীর সহিত 'রতিমিচ্ছতঃ' এই অংশের কোন সম্পর্ক

নাই—কারণ ইহারা বংশবর্দ্ধন পুত্রও ধর্ম্মাচরণের জন্যও। ব্রাহ্মণ কন্যাকে বিবাহ রতীচ্ছাবশতঃ নহে, কিন্তু ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যা বিবাহ শূদ্রা-বিবাহের ন্যায় রতীচ্ছাবশতঃ, ইহা কেবল গায়ের জোরের কথা, শাস্ত্র এরূপ বলিতে পারে না। বিষ্ণু পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণ সবর্ণা স্ত্রীর অভাবে ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যা স্ত্রীর সহিত ধর্ম্মাচরণ করিবেন। কিন্তু শূদ্রা স্ত্রীর সহিত কখনও ধর্ম্মাচরণ করিবেন না, কারণ শূদ্রা স্ত্রী ধর্ম্মার্থ নহে, রত্যর্থ। পাঠক বাক্যগুলি দেখুন—

"সবর্ণাসু বহুভার্য্যাসু বিদ্যমানাসু জ্যেষ্ঠয়া সহ ধর্ম্মকার্য্যং কুর্য্যাৎ ॥১॥ মিশ্রাসু চ কনিষ্ঠয়াঽপি সমানবর্ণয়া ।২॥ অভাবে ত্বনন্তরয়ৈবাপদি চ ॥৩॥ নত্বেব দ্বিজঃ শূদ্রয়া ॥৪॥ দ্বিজস্য ভার্য্যা শূদ্রা তু ধর্ম্মার্থে ন ভবেৎ ক্বচিৎ। রত্যর্থমেব সা তস্য রাগান্ধস্য প্রকীর্ত্তিতা ॥৫॥" অর্থাৎ সবর্ণা পত্নী না থাকিলে অথবা পীড়াদি কারণে ধর্ম্মকার্য্যে তাহার অযোগ্যতা ঘটিলে অসবর্ণা দ্বিজা পত্নীর সহিত ধর্ম্মকার্য্য করিবে। কিন্তু দ্বিজ শূদ্রা ভার্য্যার সহিত কখনও ধর্ম্মকার্য্য করিবে না। শূদ্রা ভার্য্যা অমন্ত্রসংস্কৃত কামপত্নী; এজন্য শূদ্রা ভার্য্যার সহিত ধর্ম্মাচরণ যেমন নিষিদ্ধ হইয়াছে, ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যা ভার্য্যার সহিত তেমনই ধর্ম্মপত্নী বলিয়া ধর্ম্মাচরণে অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। ইহারা কামপত্নী হইলে ব্রাহ্মণগৃহী কিরূপে ইহাদের সহিত ধর্ম্মাচরণ করেন? আর কামপত্নী হওয়া সত্ত্বেও যদি ইহারা ধর্ম্মকার্য্যে অধিকারিণী হয়, তবে শূদ্রা ভার্য্যার কি অপরাধ? সেই বা কেন বাদ পড়ে? সত্য বটে সবর্ণা ভার্য্যা যোগ্যা থাকিতে অসবর্ণা ভার্য্যার সহিত ধর্ম্মাচরণ নিষিদ্ধ; কিন্তু সবর্ণা জ্যেষ্ঠা ভার্য্যা থাকিতেও সবর্ণা কনিষ্ঠার সহিত ধর্ম্মাচরণ তদ্রূপ নিষিদ্ধ। সুতরাং 'মধ্বভাবে গুড়ং দদ্যাৎ' এ কথাও এখানে বলিতে পারিতেছ না। বস্তুতঃ ইহারা ধর্ম্মপত্নী বলিয়াই ইহাদের সহিত ধর্ম্মাচরণ সম্ভব। পিতার অবর্ত্তমানে জ্যেষ্ঠ পুত্র সংসারের কর্ত্তা হয় বলিয়া অপর পুত্রেরা কি পুত্র নয়? এও তদ্রূপ।

এখন দেখা যাইতেছে, ব্রাহ্মণদের যে সকল পূর্ব্বপুরুষ ক্ষত্রিয়কন্যা বা বৈশ্যকন্যা বিবাহ করিয়া তাহাদের সহিত ধর্ম্মাচরণ করিয়াছেন, তাঁহারা কেহই অন্যায় করেন নাই, এবং এই জন্যই তাঁহাদের বংশে ঐ ক্ষত্রিয়কন্যা ও বৈশ্যকন্যাদিগের গর্ভে ব্রাহ্মণপুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু আজকালকার ব্রাহ্মণেরা এমন সুপুত্র যে আদি জননীকে 'কামস্ত্রী বলিতে লজ্জিত হয় না!

মনুকেও মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়াইবার জন্য আয়োজন করা হইয়াছে। মনু বলিয়াছেন—

সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি।
কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশো বরাঃ॥
শূদ্রৈব ভার্য্যা শূদ্রস্য সা চ স্বা চ বিশঃ স্মৃতে।
তে চ স্বা চৈব রাজ্ঞশ্চ তাশ্চ স্বা চাগ্রজন্মনঃ॥

—মনু, ৩।১২-১৩

'ইমাঃ স্যুঃ ক্রমশো বরাঃ' ও তাশ্চ স্বা চাগ্রজন্মনঃ' একত্র করিয়া এই অর্থ হইতেছে, ব্রাহ্মণের শূদ্রা, বৈশ্যা, ক্ষত্রিয়া ও ব্রাহ্মণী এই চারি ভার্য্যার মধ্যে ক্রমে ক্রমে উৎকর্ষ। অতএব প্রথম শ্লোকের অর্থ এই যে, বিবাহে সবর্ণাই 'অগ্রে প্রশস্তা' অর্থাৎ সর্ব্বাগ্রে প্রশংসনীয়, সর্ব্বোৎকৃষ্টা। যাঁহারা বিবাহ বিষয়ে স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়া নিজেচ্ছানুসারে চলিতে চাহেন, তাঁহাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে ব্রাহ্মণের পক্ষে শূদ্রাদি ভার্য্যার ক্রমিক উৎকর্ষ। শূদ্রা ভার্য্যা পত্নীর কার্য্য করিতে পারে না, এজন্য নিকৃষ্ট কামস্ত্রা। অন্য ভার্য্যা দ্বারা ধর্ম্মকার্য্য হইতে পারে, সুতরাং তাহারা ধর্ম্মপত্নী এবং উৎকৃষ্ট। তাহাদের মধ্যে আবার বৈশ্যকন্যা অপেক্ষা ক্ষত্রিয়কন্যা এবং ক্ষত্রিয়কন্যা অপেক্ষা ব্রাহ্মণকন্যা প্রশস্ততর। এখানে শূদ্রা ভার্য্যার নিকৃষ্টতমত্ব ও ব্রাহ্মণী ভার্য্যার উৎকৃষ্টতমত্বই সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। বিষ্ণুস্মৃতি

হইতে জানা যাইতেছে যে, শূদ্রা ভার্য্যাই রত্যর্থ, কদাচ ধর্ম্মার্থ নহে। অতএব বিষ্ণু, মনু ও ব্যাসের বাক্য হইতে জানা যাইতেছে যে ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যা ভার্য্যা পত্নীপদ-বাচ্য ও ধর্ম্মার্থ। অত্রি ও বিষ্ণু সেই জন্যই শূদ্রা ভার্য্যা হইতে পৃথক করিয়া "পত্নীনাং দাসানাং" ইত্যাদি ও "দাসীনাং পত্নীনাঞ্চানুলোমিনাম্" বলিয়াছেন।

দ্বিতীয় কথা।

এ বিষয়ে ব্যাসদেব ব্যাস সংহিতায় এইরূপ লিখিয়াছেন—

উঢ়ায়াং হি সবর্ণায়াম্ অন্যাম্ বা কামমুদ্বহেৎ।
তস্যামুৎপাদিতঃ পুত্রঃ ন স্ববর্ণাৎ প্রহীয়তে॥ ব্যাস, (২।১০)
পুণ্যস্মৃতিসমুচ্চয়

এখানে 'কামম্' শব্দ দেখিয়াই কামুকেরা কামগন্ধ অনুভব করিতে পারে, কিন্তু ব্যাসদেবও এস্থলে ভগবান্ মনুর ন্যায় ধর্ম্ম-কথাই কহিয়াছেন। 'কামম্' শব্দের দ্বারা অসবর্ণা বিবাহে অনুমতিই দেওয়া হইতেছে। এ কথা সামান্য সংস্কৃতজ্ঞেরাও বুঝিতে পারে। ভট্টোজি বলিয়াছেন—

"কামম্ স্বাচ্ছন্দ্যে"

অমর বলিয়াছেন—"কামম্ প্রকামং পর্য্যাপ্তং নিকামেষ্টং যথেপ্সিতং" মহেশ্বর বলিয়াছেন—'কামং প্রকামং পর্য্যাপ্তং নিকামং ইষ্টং যথেপ্সিতং ষট্কং যথেপ্সিতস্য' (বাচকম্)। 'অকামানুমতৌ কামম্' ইহাও সকলের জানা আছে। তবে 'কামম্' শব্দ হইতে রতির কথা কোথা হইতে আসে? মনুর 'কামতঃ' শব্দের অর্থ ব্যাসবাক্যের 'কামম্' এর প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া করিতে হইবে। ব্যাসদেব বলিতেছেন, "(প্রশস্ত) সবর্ণা বিবাহ অগ্রে করিয়া, যদি কেহ অসবর্ণা বিবাহ করিতে চাহে, তবে তাহাতে আমি 'না' বলিতেছি না। ঐ অসবর্ণাবিবাহ হইতে

উৎপন্নপুত্র উৎপাদকের বর্ণ হইতে হীন হয় না। ['প্র' উপসর্গের কোন অর্থ নাই, যেমন 'ত্রিভিরন্যঃ প্রবর্ত্ততে' মনু (৪।৯); এ স্থলে টীকাকার—বলিতেছেন, "প্রবর্ত্ততে। প্রশব্দঃ অনর্থকঃ। বর্ত্ততে ইত্যর্থঃ"; তদ্রূপ 'প্রজায়তে', প্রসূয়তে, মনু ১০।৩০ ইত্যাদি] বঙ্গবাসীর সংস্করণে 'সবর্ণাৎ' পাঠ আছে, অর্থ হয় 'সবর্ণ পুত্র হইতে হীন হয় না', অর্থাৎ সবর্ণই হয়। সত্যেন্দ্রবাবু এস্থলে 'প্র' শব্দের 'প্রকর্ষ' অর্থ বলপূর্ব্বক বাহির করিয়াছেন! সে পক্ষে 'বিশেষ হীন হয় না' বলিলে 'একটু হীন হয়' এমন ভাব প্রকাশ হইতে পারে বটে, কিন্তু তাই বলিয়া ব্রাহ্মণের পুত্র মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও অম্বষ্ঠ একেবারে বর্ণান্তরের সৃষ্টি করিয়া ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য হইতে যাইবে কেন? 'একটু হীনতা' ত সবর্ণ হওয়া সত্ত্বেও মাতৃকুলের ন্যূনতা বশতঃ সহজেই বোধগম্য হয়।

গোত্রভ্রংশের কথা বৃহস্পতিও বলিয়াছেন—

পাণিগ্রাহণিকা মন্ত্রাঃ পিতৃগোত্রাপহারকাঃ।
পতিগোত্রেণ কর্ত্তব্যা স্তস্যাঃ পিণ্ডোদকক্রিয়াঃ॥
আম্নায়ে স্মৃতিশাস্ত্রেষু লোকাচারে চ সর্ব্বথা।
শরীরার্দ্ধং স্মৃতা জায়া পুণ্যাপুণ্যফলে সমা॥

সত্যেন্দ্রবাবু কি বলিতে চাহেন যে, ভিন্নবর্ণা হইয়াও 'শরীরার্দ্ধম্', হওয়া যায়? ভিন্নবর্ণা হইয়াও 'পুণ্যাপুণ্যফলে' তুল্যাধিকারিণী হইবে?

শ্রুতি বলেন—

"এতাবানেব পুরুষো যজ্জায়াত্মা প্রজেতি চ।
বিপ্রাঃ প্রাহু স্তথা চৈতদ্ যো ভর্ত্তা সা স্মৃতাঙ্গনা॥"

অর্থাৎ, পুরুষ আপনাকে, পত্নীকে ও পুত্রকে লইয়া সম্পূর্ণ হয়; যে ভর্ত্তা সেই অঙ্গনা। [ইহা সূক্ষ্মরূপ একত্বের কথা] এখনও কি পত্নী পতির কেবল সগোত্রা হইল, সবর্ণা হইল না?

তৃতীয় কথা

অসবর্ণা দ্বিজা ভার্য্যার পতি-সাবর্ণ্য আমরা প্রকারন্তরেও সপ্রমাণ করিতে পারি। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের পুত্রগণ যেমন উপনয়নের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শূদ্রবৎ দ্বিজাধিকারে বঞ্চিত থাকে, ত্রিবর্ণীয় দ্বিজকন্যারাও বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শূদ্রবৎ বিবেচিত হয়। এই জন্য কন্যাদিগের বিবাহের পূর্ব্বে কোন সংস্কার কার্য্যেই মন্ত্রপ্রয়োগ হয় না শাস্ত্র বলিতেছে—

"শূদ্রেণ হি সমস্তাবৎ যাবৎ বেদে ন জায়তে" মনু ২।১৭২

উপনয়ন পর্য্যন্ত সকল দ্বিজপুত্রই শূদ্রবৎ।

অপিচ—

'ন বৈতাঃ কর্ণবেধান্তা মন্ত্রবর্জ্জং ক্রিয়াঃ স্ত্রিয়াঃ
বিবাহো মন্ত্রত স্তস্যাঃ শূদ্রস্যামন্ত্রতো দশ॥ ব্যাস ১।১৫—১৬

দ্বিজকন্যার বিবাহই উপনয়ন। সুতরাং তৎপূর্ব্বে শূদ্রবৎ অমন্ত্রক সংস্কার হইবে। বিবাহই দ্বিজকন্যার দ্বিতীয় জন্মসূচক সংস্কার। দ্বিজ-বালক উপনয়নের পরেই দ্বিজশব্দবাচ্য হয়, দ্বিজকন্যাও বিবাহের পর দ্বিজগৃহিণী হইয়া দ্বিজা হয়। দ্বিজ ভর্ত্তার সহিত একত্ব প্রাপ্তিই এই দ্বিজত্বে হেতু। ব্রাহ্মণাদির অনূঢ়া কন্যাকে লক্ষ্য করিয়া ব্রাহ্মণবর্ণা, ক্ষত্রিয়বর্ণা, বৈশ্যবর্ণা বলা হয় বটে, কিন্তু সে পিতৃবর্ণে পরিচয় দিবার উদ্দেশ্যে মাত্র। তখন তাহার পরমার্থতঃ কোনরূপ দ্বিজত্ব থাকে না।

তাই শাস্ত্র বলিতেছে—

বৈবাহিকো বিধিঃ স্ত্রীণাম্ সংস্কারো বৈদিকঃ স্মৃতঃ।
পতিসেবা গুরৌ বাসো গৃহার্থোঽগ্নিপরিক্রিয়া॥
এষ প্রোক্তো দ্বিজাতীনাম্ ঔপনায়নিকো বিধিঃ।
উৎপত্তিব্যঞ্জকঃ পুণ্যঃ"—মনু, ২।৬৭—৬৮

দ্বিজকন্যার বিবাহ সংস্কারই বৈদিক উপনয়ন সংস্কারবৎ দ্বিজত্ব-প্রাপক। বিবাহই দ্বিজকন্যাকে দ্বিজত্ব দান করে। তখন হইতে সে পতির ধর্ম্মকর্ম্মে সহচারিণী হয়। এখন প্রশ্ন হইতেছে এই যে, ব্রাহ্মণের ভার্য্যা বিবাহসিদ্ধ যে দ্বিজত্ব পাইতেছে, তাহা কীদৃশ দ্বিজত্ব? তাহা ব্রাহ্মণত্ব, না ক্ষত্রিয়ত্ব, না বৈশ্যত্ব? কিরূপে ইহা জানা যাইবে? ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণকন্যাকে বিবাহ করিলে সে কেন ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়, সে কি পিতার বর্ণ পাইয়া ব্রাহ্মণত্ব পায়, না পতির বর্ণ পাইয়া? যদি পতির বর্ণ পাইয়াই ব্রাহ্মণকন্যার ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে, তবে ক্ষত্রিয়কন্যা ও বৈশ্যকন্যাও যে পতির বর্ণ পাইয়া ব্রাহ্মণী হইবে, ইহাতে আর সন্দেহ কি?

চতুর্থ কথা

অপিচ, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণকন্যাকে বিবাহকালে শর্ম্মান্ত নামে ব্রাহ্মণোচিত মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক অগ্নিসাক্ষ্য করিয়া বিবিধ হোমানুষ্ঠান করিয়া যে বিবাহ করেন, তাহাতে ঐ শূদ্রতুল্য ব্রাহ্মণকন্যা মন্ত্রসংস্কৃত হইয়া ব্রাহ্মণের সহিত একত্ব প্রাপ্ত হইয়াই ব্রাহ্মণী হন। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়-কন্যাকে বিবাহ করিবার সময়ে ক্ষত্রিয় সাজিয়া বর্ম্মান্ত নামে কার্য্যারম্ভ করেন না, অবিকল ব্রাহ্মণাচারেই ঐ বিবাহ হইয়া থাকে। তবে ঐ বিবাহিত ক্ষত্রিয়কন্যাও পূর্ব্ববৎ মন্ত্রসংস্কৃতা হইয়া ব্রাহ্মণপতির সহিত কেবল পিণ্ড, গোত্র ও অশৌচে নয়, (যুতকীকরণ মন্ত্রদ্বারা) মনে-প্রাণে সূক্ষ্মভাবে একত্ব প্রাপ্ত হইয়া ব্রাহ্মণত্বরূপ দ্বিজত্বই লাভ করে! ঠিক ঐরূপেই ব্রাহ্মণ-পরিণীতা বৈশ্যকন্যাও ব্রাহ্মণত্বরূপ দ্বিজত্বই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়োচিত আচারে বর্ম্মান্ত নামে ক্ষত্রিয়কন্যাকে বিবাহদ্বারা যেমন ক্ষত্রিয়ত্বে উন্নীত করেন, বৈশ্যকন্যাকেও তদ্রূপ ক্ষত্রিয়ত্বে উন্নীত করেন, বৈশ্যত্বে নহে। বৈশ্য-পিতার বর্ণ ক্ষত্রিয়ের বাড়ীতে কোন্ পথে প্রবেশ করিবে?

দ্বিজকন্যার বিবাহের পূর্ব্বে শূদ্রবৎ ব্যবহার। প্রকৃতপক্ষে তখন তাহার কোন বর্ণনাম থাকে না। এই জন্যই সর্ব্বত্র গোত্র পরিবর্ত্তনের কথা আছে, বর্ণ পরিবর্ত্তনের কথা নাই। প্রথম দ্বিজবর্ণ বা দ্বিজত্ব সে বিবাহসংস্কাররূপ জন্ম হইতেই প্রাপ্ত হয় (উৎপত্তিব্যঞ্জকঃ পুণ্যঃ)। তবেই বুঝা গেল, ব্রাহ্মণ যাহাকে বিবাহ করিবে সে ব্রাহ্মণকন্যা, ক্ষত্রিয়কন্যা বা বৈশ্যকন্যা যাহাই হউক, ব্রাহ্মণের পত্নী হইয়া সে ব্রাহ্মণীই হয়। এ পক্ষে এক যাত্রায় পৃথক্ ফল হইবার কোন উপায় নাই।

পঞ্চম কথা

একথা অন্যরূপেও প্রমাণ করা যায়। মনু নবম অধ্যায়ে ১৫৮—১৬০ শ্লোকে দ্বাদশবিধ পুত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। কন্যাকালে যে পুত্র হয় তাহার নাম **কানীন**, গূঢ়ভাবে যে অন্য কর্ত্তৃক অন্যের স্ত্রীতে উৎপাদিত হয় সে **গূঢ়োৎপন্ন**, নিজক্ষেত্রে নিয়োগবিধিক্রমে পরের দ্বারা উৎপাদিত পুত্র ক্ষেত্রজ, ইত্যাদি দ্বাদশবিধ পুত্রের নাম আছে। * এস্থলে বিবাহিত ভার্য্যাতে স্বয়ং উৎপাদিত পুত্রের দুইটী নাম আছে, (১) **ঔরস** ও **শৌদ্র**। 'শৌদ্র' শব্দদ্বারা শূদ্রা স্ত্রীতে উৎপাদিত পুত্রগণকে বুঝান হইয়াছে। ইহাদের সম্বন্ধে মনু বলিয়াছেন, ইহারা 'অদায়াদ-বান্ধবাঃ' অর্থাৎ ইহারা পিতার গোত্র বা ধন পায় না [কারণ, শূদ্রা-বিবাহ অমন্ত্রক; উহাতে উৎপাদকের আত্মা জন্ম গ্রহণ করে না। সে ব্রাহ্মণ পিতার পুত্র হইলেও 'শব' তুল্য, এজন্য পারশব বলিয়াও খ্যাত।] তবেই সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, মূর্দ্ধাভিষিক্ত, অম্বষ্ঠ ও মাহিষ্য পিতার ঔরস পুত্র। "ঔরসো ধর্ম্মপত্নীজঃ", সুতরাং

---

* "ঔরসঃ ক্ষেত্রজশ্চৈব দত্তঃ কৃত্রিম এব চ।
গূঢ়োৎপন্নোঽপবিদ্ধশ্চ দায়াদা বান্ধবাশ্চ ষট্॥
কানীনশ্চ সহোঢশ্চ ক্রীতঃ পৌনর্ভবস্তথা।
স্বয়ংদত্তশ্চ শৌদ্রশ্চ ষড়দায়াদবান্ধবাঃ॥" ৯।১৫৯-১৬০॥

অম্বষ্ঠজননী ব্রাহ্মণের ধর্ম্মপত্নী, তাহা এ ভাবেও প্রমাণিত হইল। মনুও বলিয়াছেন—

স্বক্ষেত্রে সংস্কৃতায়াং তু স্বয়মুৎপাদয়েদ্ধি যম্।

তমৌরসং বিজানীয়াৎ পুত্রং প্রথমকল্পিতম্ ॥৯।১৬৬

নিজের মন্ত্রসংস্কৃতা স্ত্রীতে আপনাকর্ত্তৃক উৎপাদিত পুত্রই ঔরস পুত্র। ব্রাহ্মণের পক্ষে ব্রাহ্মণকন্যা, ক্ষত্রিয়কন্যা এবং ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ক্ষত্রিয়-কন্যা ও বৈশ্যকন্যা বৈধ ক্ষেত্র এবং ইঁহারাই মন্ত্রসংস্কৃতা হইয়া থাকেন (সুতরাং অসংস্কৃত 'শূদ্রা' ক্ষেত্র বাদ পড়িয়া গেল)। অতএব মূর্দ্ধাভি-ষিক্ত, অম্বষ্ঠ ও মাহিষ্য পিতার ঔরস পুত্র। যে ভার্য্যার পক্ষে যুতকীকরণ-মন্ত্রদ্বারা পতির সহিত একত্ব সিদ্ধ হয় না, গোত্রে ও পিণ্ডে পার্থক্য থাকে, সে পত্নীপদ বাচ্য হয় না, সে শূদ্রা ভার্য্যা বুঝিতে হইবে। তদন্যা বৈধ ভার্য্যা ধর্ম্মপত্নী। যে ধর্ম্মপত্নী সে ঔরসপুত্রের জননী। পতির সহিত তাহার সর্ব্বদা একত্ব। এই জন্যই মূর্দ্ধাভিষিক্ত পিতার সবর্ণ এবং মূর্দ্ধাভিষিক্ত সবর্ণ হওয়ায় অম্বষ্ঠও পিতৃসবর্ণ।

ষষ্ঠ কথা

অন্যরূপেও বুঝান যায়। অম্বষ্ঠ ঔরস পুত্র প্রমাণিত হইয়াছে। ঔরসপুত্র পিতার বর্ণ প্রাপ্ত হয়। পুত্র অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ পিতার বর্ণ প্রাপ্ত হওয়ায় তাহার গর্ভধারিণী যে মন্ত্র সংস্কৃতা হইয়া পতিসবর্ণা বা ব্রাহ্মণী হয়, ইহা নিশ্চিত। অন্যথা তদীয় গর্ভে ব্রাহ্মণের জন্মই অসম্ভব হয়।

সপ্তম কথা

মূর্দ্ধাভিষিক্ত-জননী ও অম্বষ্ঠ-জননীর ব্রাহ্মণবর্ণত্ব অন্যরূপেও বুঝা যায়। মনু ২।২১০ শ্লোকে বলিয়াছেন—

গুরুবৎ প্রতিপূজ্যাঃ স্যুঃ সবর্ণা গুরুযোষিতঃ।

অসবর্ণাস্তু সম্পূজ্যাঃ প্রত্যুত্থানাভিবাদনৈঃ ॥২।২১০

এস্থলে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারীরাও গুরুর অসবর্ণা পত্নীর অভিবাদন করিবে, বলা হইয়াছে। অভিবাদন শব্দের অর্থ 'পাদগ্রহণ'—'সমে তু পাদগ্রহণম্ অভিবাদন মিত্যুভে'—অমর। ভাগুরিও বলিয়াছেন—'উপসংগ্রহণঞ্চাপি প্রাহুঃ সন্তোঽভিবাদনম্'। বস্তুতঃ যে বন্দনা আশীর্ব্বাক্য উচ্চারণ করায় তাহাই অভিবাদন। শব্দকল্পদ্রুমে আছে—"অভিমুখীকরণায় বাদনম্ নামোচ্চারণপূর্ব্বকনমস্কারঃ। অভিবাদয়ে ভোঃ অমুকশর্ম্মা অহমিত্যে-বংরূপঃ। তত্র পাদস্পর্শপূর্ব্বকনমস্কারঃ।" সুতরাং অসবর্ণা ভার্য্যা যে সবর্ণা ভার্য্যা অপেক্ষা বর্ণে নিকৃষ্টাই থাকিয়া যাইতেন তাহা নহে। তিনি বিবাহের পরে ব্রাহ্মণের গৃহিণী হইয়া ব্রাহ্মণী হইতেন বলিয়াই ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারীর নমস্যা হইতেন, বৈশ্যবর্ণা বা ক্ষত্রিয়বর্ণা, কামস্ত্রী, কাম-পত্নী বা উপপত্নী বলিয়া গণ্য হইলে কখনই এইরূপে অভিবাদনযোগ্য বলিয়া কথিত হইতেন না। এস্থলে "অসবর্ণা" শব্দ আছে বলিয়া মন্ত্রতঃ সবর্ণত্ব প্রাপ্তি হয় নাই, ইহা বুঝাইতেছে না। উহা বিবাহের পূর্ব্বের জন্মগত বর্ণপার্থক্য দেখাইবার জন্যই ব্যবহৃত হইয়াছে, যেমন পত্নী পতির সহিত একগোত্রা হইলেও, আবশ্যক হইলে পিতার গোত্র বা বংশের নামে তাহার পরিচয় দেওয়া হয়। এরূপ না করিলে কোন বিবাহিত নারীরই পিতৃবংশের পরিচয় দেওয়া সম্ভব হয় না।

অষ্টম কথা

অম্বষ্ঠ ও অম্বষ্ঠজননীর ব্রাহ্মণত্ব অন্যরূপেও প্রমাণিত হয়। অম্বষ্ঠ পিতার গোত্রধারী, ইহা সত্যেন্দ্র বাবু স্বীকার করিয়াছেন (বৈ° প্রতি° পৃঃ ১২—১৩)। এই পিতৃগোত্র তাহার পিতার নিজস্ব গোত্র, কারণ অম্বষ্ঠের পিতা ব্রাহ্মণ; (এস্থলে আশ্বলায়ন বাক্য ও রঘুনন্দন বাক্য দেখিতে অনুরোধ করি; দ্বিতীয় শলাকা, পৃঃ ৫৫—৫৬)। যেহেতু অম্বষ্ঠের গোত্র পিতৃ-পিতামহাগত নিজস্ব গোত্র সেই হেতু অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ। কারণ

উপরেই বলা হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর কোন বর্ণের নিজস্ব গোত্র থাকা একেবারেই অসম্ভব।

কালীবাবু ও সত্যেন্দ্রবাবু বসুমতীর জাতিতত্ত্ব লেখকের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া স্বজাতিকে নিষ্ঠুরভাবে গালি দিয়াছেন। তাঁহারা যেরূপে পদে পদে শাস্ত্রবক্ষঃ ক্ষত-বিক্ষত করিয়াছেন, জাতি জননীকে যেরূপে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করিয়াছেন, যেরূপে ধর্ম্মের বিরুদ্ধে বদ্ধপরিকর হইয়া যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন, তাহা দেখিলে তাঁহারা প্রকৃতিস্থ আছেন বলিয়া কিছুতেই মনে হয় না। কি নিদারুণ মোহই না তাঁহাদিগকে গ্রাস করিয়াছে! সত্যেন্দ্রবাবুর পুস্তকের ভূমিকা লিখিয়াছেন কবিরাজ বাচস্পতি মহাশয়! তিনি অবশ্য লিখিয়াছেন, তাঁহার সংশয় আছে। কিন্তু সংশয় লইয়াই যখন বৈদ্যব্রাহ্মণসমিতির বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিয়াছেন, তখন সেই সংশয় আপনার ব্রাহ্মণত্ব সম্বন্ধেই। তিনি যখন স্বচ্ছন্দচিত্তে বলিতে পারিয়াছেন, "বৈদ্যজাতিতত্ত্বে আলোচিত ও সম্ভাবিত বহু সংশয়ের মীমাংসা এই গ্রন্থে (সত্যেন্দ্রবাবুর পুস্তকে) আছে। প্রকৃত জিজ্ঞাসু ব্যক্তি ইহাতে প্রচুর লাভবান্ হইবেন, সন্দেহ নাই"—তখন তিনি যে ঐ গ্রন্থ পাঠ করিয়া অনেক লাভবান্ হইয়াছেন এবং আপনার জাতির মিথ্যা কলঙ্কে পরম তৃপ্তি অনুভব করিয়াছেন, ইহা আমরা মনে করিতে পারি। তিনি কি এখনও বিশ্বাস করেন যে বৈদ্য অম্বষ্ঠ? অম্বষ্ঠ ঔরস পুত্র নহে? অম্বষ্ঠজননী পতিসবর্ণা হয় না? সে পতির কামস্ত্রী? অথবা 'কুমীর'দের ভাষায় সাধারণ বৈশ্যবর্ণীয়া উপপত্নী (কারণ, এস্থলে বিবাহই নাকি অসিদ্ধ!)?

অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণবর্ণ

এইবারে আমরা অম্বষ্ঠের ব্রাহ্মণত্ব সম্বন্ধে সুস্পষ্ট শাস্ত্রোক্তি দেখাইব। সঙ্গে সঙ্গে পাঠকগণ দেখিয়া যাইবেন কালীবাবু ও সত্যেন্দ্রবাবুর উদ্দাম

ব্যাখ্যা পদ্ধতি! ব্রাহ্মণ যে তিন দ্বিজ কন্যাকে বিবাহ করিতেন, তাহাদের মধ্যে জন্ম গৌরবে ব্রাহ্মণ কন্যা শ্রেষ্ঠ, ক্ষত্রকন্যা দ্বিতীয়, বৈশ্যকন্যা তৃতীয়। এজন্য তাহাদিগের গর্ভজাত তিন পুত্র জন্মগৌরবে সমান না হইলেও বর্ণে সমান হইতে বাধা ছিল না। কালীবাবু ও সত্যেন্দ্রবাবু ইহাদের মধ্যে যে তারতম্য দেখিতে চাহেন, সে তারতম্য মহাভারতে ভীষ্মদেব পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। ঐ তারতম্য সত্ত্বেও তাহারা একবর্ণ, অর্থাৎ তাহারা সকলেই পিতার বর্ণ পায়।

প্রথম প্রমাণ

ব্যাসদেব স্বপ্রণীত সংহিতায় এইরূপ বলিয়াছেন—

উঢ়ায়াং হি সবর্ণায়াম্ অন্যাং বা কামমুদ্বহেৎ।

তস্যামুৎপাদিতঃ পুত্রঃ **ন সবর্ণাৎ প্রহীয়তে** ॥ ব্যস ২।১০

ইহা পূর্ব্বে ১৯০ পৃষ্ঠায় আলোচিত হইয়াছে। এস্থলে ব্রাহ্মণের ঔরসে ক্ষত্রকন্যার বা বৈশ্যকন্যার গর্ভে জাত মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও অম্বষ্ঠ সবর্ণ পুত্র হইতে (বর্ণে) হীন হয় না, বলা হইয়াছে। আপ্তের বোম্বাই সংস্করণে 'স্ববর্ণাৎ' আছে। এতদ্দ্বারা আরও সুন্দর অর্থ হইতেছে। মূর্দ্ধাভিষিক্ত, অম্বষ্ঠ ও মাহিষ্য উৎপাদকের স্বীয় বর্ণ হইতে হীন হয় না, অর্থাৎ উৎপাদকের বর্ণ হইতে নীচে যায় না, অর্থাৎ উৎপাদকের বর্ণই প্রাপ্ত হয়। ['প্র' উপসর্গের এস্থলে কোনই অর্থ নাই। সত্যেন্দ্রবাবুর কল্পিত 'প্রকর্ষ' অর্থ স্বীকার করিলেও পুত্রের পিতৃসবর্ণ না হইবার কোনও ভয় থাকে না]।

এস্থলে কালীবাবু বলিয়াছেন, "সেই অসবর্ণা স্ত্রীজাত সন্তানগণ **কিঞ্চিৎ** হীন হইবে" (বৈদ্য, পৃঃ ৭৭), কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে 'কিঞ্চিৎ হীন হইবে' বলিয়াই অম্বষ্ঠকে প্রথম দুই বর্ণের মধ্যে কোনটীতেই স্থান না দিয়া একেবারে গরিষ্ঠ **বৈশ্যবর্ণে** বসাইয়া

দিলেন! 'নয়' কে 'হয়' করার কৌশলে, যে হীন হয় না, তাহাকে এতদূর হীন করিয়া তবে ছাড়িলেন! অম্বষ্ঠের প্রথম বর্ণে স্থান হইল না, দ্বিতীয় বর্ণেও স্থান হইল না, একেবারে তৃতীয় বর্ণে স্থান পাইয়া— 'কিঞ্চিৎ হীন' কেমন হইল, পাঠকগণ দেখিলেন ত? এইরূপ শাস্ত্র-ব্যাখ্যা 'কাক অশ্বের উপরে বসিয়া বেদানা খায়' ইত্যাদির মত ভাঁড়ের মুখেই শোভা পায়। কালীবাবুর নেহাৎ মতিচ্ছন্নতা না হইলে শাস্ত্রব্যাখ্যায় অগ্রসর হইবেন কেন? কিন্তু সত্যেন্দ্রবাবু যে উকিল মহাশয়ের ব্রিফ্ লইয়াছেন, তাহার হেতু কি কোনরূপ কুটুম্বিতা? সত্যেন্দ্রবাবু বলিতেছেন—

"পিতৃসবর্ণ হইতে বেশী হীন হয় না, অর্থাৎ অল্পহীন হয়।" এই কথা বলিয়াই তাহাকে বর্ণান্তরিত বা জাত্যন্তরিত করিয়া দিয়েছেন—"এইরূপ সন্তানের কার্য্যাদি মাতৃবৎ" (পৃঃ ১৮)!

সংহিতাকার কি 'মাতৃবৎ' কথাটী জানিতেন না? অ-সবর্ণা পত্নীর গর্ভজাত পুত্র কোন্ বর্ণীয় হইবে, এই সংশয়ের মীমাংসায় তিনি শূদ্রাগর্ভজাত পুত্রকে বাদ দিয়া বলিতেছেন, মূর্দ্ধাভিষিক্ত, অম্বষ্ঠ ও মাহিষ্য সবর্ণার গর্ভজাত সবর্ণ পুত্র হইতে বর্ণে হীন হয় না বা বর্ণসাম্য-সত্ত্বেও একটু হীন হয়। এস্থলে বর্ণ-নির্ণয় লইয়া কথা; বর্ণ-নির্ণয় হইলে তবে তাহার কীদৃশ সংস্কার, ক্রিয়াকর্ম্ম ইত্যাদি বুঝা যাইবে। সংহিতা-কারও সেই জন্য সুস্পষ্টভাবে বলিতেছেন যে, ঐ পুত্র সবর্ণার গর্ভজাত সবর্ণ পুত্র হইতে হীন হয় না, অর্থাৎ সবর্ণই হয়। সবর্ণার পুত্র হইতে সামাজিক মর্য্যাদায় কিছু হীন হয় হউক, বর্ণে হীন হয় না।

কালীবাবু ও সত্যেন্দ্রবাবুর শাস্ত্রব্যাখ্যায় অভূতপূর্ব্ব সামঞ্জস্য দেখিতে পাইবেন। এই দৃষ্টান্তেই 'ন প্রহীয়তে'র অর্থ 'প্রহীয়তে' করিয়া মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও অম্বষ্ঠ মাতৃবর্ণ সাব্যস্ত হইয়াছে! কিন্তু বোধায়ন-গৌতম-কৌটিল্য নাকি মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও মাহিষ্যকে পিতার সবর্ণ বলিয়াছেন,

তাই তাহাদিগের ভাগ্য নাগরদোলায় চড়িয়া একবার নীচে নামিবে ও একবার উপরে উঠিবে; আর অম্বষ্ঠের ভাগ্য নট্-নড়ং-চড়ং হইয়া মাতৃবর্ণেই বজ্রবৎ আঁটিয়া থাকিবে! 'অনন্তর-সন্তানের (মূর্দ্ধাভিষিক্তের) ভাগ্যের হ্রাস-বৃদ্ধির সহিত একান্তরগণের (অম্বষ্ঠগণের) বিশেষ কোনও সম্বন্ধ নাই'! (বৈ০ প্রতি০ পৃঃ ৩০) আবার প্রবোধ দিয়া বলিতেছেন, ইহাতে অম্বষ্ঠগণের 'বিচলিত হওয়া উচিত নহে'! স্মৃতিতে হ্রাসবৃদ্ধির কথা উপভোগ্য বটে! আজ মূর্দ্ধাভিষিক্ত মাতৃবৎ, কাল পিতৃবৎ, আজ শ্রাদ্ধাদি ক্ষত্রিয়াচারে করিবে, কাল ব্রাহ্মণাচারে করিবে, কিন্তু অম্বষ্ঠের সে জ্বালা নাই! সে সর্ব্বদাই মাতৃবৎ, অর্থাৎ বৈশ্যবৎ কার্য্য করিবে, ইহাতে বিচলিত হইবার কি আছে? শাস্ত্র বলিল মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও অম্বষ্ঠের এক গতি—সত্যেন্দ্রবাবু বলিলেন উহাদের 'ভিন্ন গতি'! বাচস্পতি মহাশয় বলিলেন, আহা, কি পাণ্ডিত্য!

দ্বিতীয় প্রমাণ

ব্যাসদেব বলিতেছেন—

তিস্রো ভার্য্যা ব্রাহ্মণস্য দ্বে ভার্য্যে ক্ষত্রিয়স্য চ।
বৈশ্যঃ স্বজাত্যাং বিন্দেত তাস্বপত্যং সমং ভবেৎ॥

মহা, অনু, ৪৪ অঃ, ১১ শ্লো।

এই শ্লোকে মন্ত্রসংস্কৃতা পত্নীতে উৎপাদিত পুত্র যে পিতৃবর্ণ প্রাপ্ত হয়, তাহাই স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে। ব্রাহ্মণের তিন দ্বিজা পত্নী হইতে পারে, তিন পত্নীর গর্ভজাত অপত্যই পিতৃবর্ণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ। ক্ষত্রিয়ের দুই পত্নী হইতে পারে, ঐ দুই পত্নীতে উৎপাদিত পুত্রই পিতার বর্ণ প্রাপ্ত হয়। বৈশ্যের একটীমাত্র পত্নী, তাহার গর্ভজাত পুত্র পিতৃবর্ণ হইবে। পত্নীজাত সকল অপত্যই 'পিতৃসম' বলা হইল।

এস্থলে কালীবাবু বলিতেছেন, 'সম' শব্দের অর্থ 'সমান' নয়,

'সদৃশ' (বৈদ্য, পৃঃ ৭৯) অর্থাৎ ভিন্ন, অর্থাৎ মাতৃবর্ণীয় ! সত্যেন্দ্রবাবু উহার সমর্থন করিয়া বলিতেছেন -

তাহারা (ব্রাহ্মণকন্যা, ক্ষত্রিয়কন্যা ও বৈশ্যকন্যার গর্ভজাত পুত্রেরা) **"পরস্পর সম অর্থাৎ সদৃশ, কিন্তু মোটের উপর ভিন্ন"** (বৈ॰ প্রতি॰ ২১)। শাস্ত্র অপত্যগণকে পিতার 'সমান' বলিয়া তাহাদের বর্ণ-নির্ণয় করিয়া দিল, সত্যেন্দ্রবাবু তাহা ব্যর্থ করিয়া বিদ্যা প্রকাশ করিলেন ! 'অপত্যম্' একবচন রহিয়াছে, ইহা হইতেই বুঝা উচিত ছিল যে, এখানে পৈতাওয়ালা বলিয়াই ঐ সন্তানেরা সকলে সমান অর্থাৎ "ষট্‌সুতাঃ দ্বিজধর্ম্মিণঃ" এই কথা বলা হইতেছে না, প্রত্যেক দ্বিজা কন্যাকে ধরিয়া তাহার পুত্র কি অবস্থায় কোন্ বর্ণ হইবে তাহাই বলা হইতেছে। বৈশ্যকন্যা ব্রাহ্মণপত্নী হইলে তাহার অপত্য ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের পত্নী হইলে তদুৎপন্ন অপত্য ক্ষত্রিয়, বৈশ্যপত্নী হইলে তদুৎপন্ন অপত্য বৈশ্য। প্রত্যেক অপত্যটী পিতার সম অর্থাৎ পিতৃবর্ণীয়। সত্যেন্দ্রবাবু কৃত অর্থে ব্রাহ্মণের পুত্র, ক্ষত্রিয়ের পুত্র, বৈশ্যের পুত্র সব সম অর্থাৎ সমান - পৈতা আছে বলিয়া ! তবে শূদ্রার পুত্রকেই বা ছাড়িয়া দেওয়া হয় কেন, তাহারাও ত বাবা' বলিয়া ডাকে ? সত্যেন্দ্রবাবুর ব্যাখ্যার দোষ এই যে, তাঁহার অভিপ্রেত অর্থ প্রকাশ করিতে হইলে 'তাসু অপত্যানি সমানি' বলা নিতান্ত আবশ্যক ছিল ! দ্বিতীয়তঃ ছয় পুত্র দ্বিজ হইলে কি হইল ? কে কোন্ বর্ণীয় দ্বিজ ; তাহা ত জানা গেল না ! এইরূপে 'সম' শব্দের Same, সমান বা 'অভিন্ন' এই অর্থের পরিবর্ত্তে সকলকে বোকা বানাইয়া স্বেচ্ছামত 'সদৃশ' অর্থ করিয়া পরে বলিতেছেন 'ভিন্ন' অর্থাৎ অসম ! আজ হইতে দুইটী জিনিষের দৈর্ঘ্য বা ভার 'সমান' বলিলে তাহারা ছোট-বড় ও ভারী-হাল্কা বুঝিতে হইবে ! এই জন্যই কালীবাবু ও সত্যেন্দ্রবাবুর শাস্ত্রজ্ঞান সমান বলিলেও সত্যেন্দ্রবাবু বেশী

বুদ্ধিমান্ বুঝা যাইতেছে! নিজের জাতির উপর অম্বষ্ঠত্ব আরোপ করাই এক মহাপাপ, তাহার উপর আবার এইরূপ পাপিষ্ঠ ব্যাখ্যা!

তৃতীয় প্রমাণ।

মহাভারতের পরিষ্কার উক্তি কি ভাবে নষ্ট করা হইয়াছে, তাহাও পাঠক দেখুন—

ব্রাহ্মণ্যাং ব্রাহ্মণাজ্জাতো ব্রাহ্মণঃ স্যাৎ ন সংশয়ঃ।
ক্ষত্রিয়ায়াং তথৈব স্যাৎ বৈশ্যায়ামপি চৈব হি॥
কস্মাত্তু বিষমং ভাগং ভজেরন্ নৃপসত্তম।
যতস্তু ত্রিসৃণাং পুত্রা ত্ত্রয়োক্তা ব্রাহ্মণা ইতি॥

মহা, অনু ৪৭, ২৮ শ্লো।

ইহার পূর্ব্বে ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছেন যে ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়া-পুত্র ও বৈশ্যাপুত্র ব্রাহ্মণ। যুধিষ্ঠির নিজের সংশয় মিটাইবার জন্য জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তিন পুত্রই যদি ব্রাহ্মণ, তবে তাহাদের পিতৃধনে কম-বেশী অধিকার কেন? ভীষ্ম বুঝাইয়া দিলেন, সকলেই ব্রাহ্মণ বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণের তিন পত্নীর মধ্যে বংশ গৌরব অনুসারে তারতম্য আছে ত, সেই জন্যই এই পার্থক্য, [মাতামহের গৌরব অনুসারে বর্ত্তমান কালেও সামাজিক গৌরবের তারতম্য হয়]। মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও অম্বষ্ঠ যদি ব্রাহ্মণ না হইবে, তবে ভীষ্মদেব ও যুধিষ্ঠির তিন তিন বার তাহাদিগকে "ব্রাহ্মণ" বলিবেন কেন? ভীষ্ম কি এতই ভাষাজ্ঞানহীন ছিলেন যে ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণে পার্থক্য জানিতেন না? তিনি শরশয্যায় শয়ন করিয়া অন্তিম অবস্থায় যুধিষ্ঠিরের সহিত হেঁয়ালি করিতেছিলেন? যখন যুধিষ্ঠির উহাদের পার্থক্য কি জানিবার জন্য প্রশ্ন করিলেন, তখনও ত পরিষ্কার করিয়া বলিতে পারিতেন, 'ব্রাহ্মণ' শব্দ ব্রাহ্মণ অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই; অথবা ক্ষত্রিয়াপুত্র ও বৈশ্যাপুত্র যথার্থ ব্রাহ্মণ নয়, উহারা মাতৃবর্ণ, সেই জন্যই ভাগের তারতম্য! যুধিষ্ঠিরের মনে ধোঁকা জন্মাইবার কি

প্রয়োজন ছিল, আর সেই ধোঁকা কতযুগ ধোঁকাই রহিয়া গেল, এবং চিরকাল ঐরূপ থাকিয়া যাইত যদি জাতিতত্ত্ব-লেখক ও তাঁহার শিষ্যদ্বয় ঐ হেঁয়ালির উত্তর দিতে আজ অগ্রসর না হইতেন! কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, যুধিষ্ঠিরের সকল সন্দেহ যে ভীষ্মের কথাতেই অন্তর্হিত হইয়াছিল, সেই কথাতেই তোমার আমার ও সকলের সন্দেহই ঘুচিয়া যাওয়া উচিত ছিল না কি? ভীষ্মদেব ত বলিলেন না যে, ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্যাগর্ভ-জাত পুত্র বৈশ্যবর্ণ, ক্ষত্রিয়ার পুত্র ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণকন্যার পুত্র ব্রাহ্মণ, সেইজন্য এইরূপ অল্পাধিক ধনবিভাগ! ঐরূপ অর্থ অভিপ্রেত হইলে ভীষ্মদেব ঐরূপই বলিতেন। তিনি সকলকে ব্রাহ্মণ বলিয়া তাহাদের মাতা-মহের কুলগৌরব অনুসারেই দায়ভাগের তারতম্য এ কথা বলায় যুধিষ্ঠির কি মূর্দ্ধাভিষিক্তকে ক্ষত্রিয়বর্ণ ও অম্বষ্ঠকে বৈশ্যবর্ণ বলিয়া বুঝিলেন? আবার ইহাও বুঝিলেন যে, মূর্দ্ধভিষিক্তের অমাবস্যা-পূর্ণিমা বা 'হ্রাস-বৃদ্ধি' আছে, কিন্তু অম্বষ্ঠের তাহা নাই? তাহার চিরকালই অমাবস্যা?

কালীবাবু বলিয়াছেন, এস্থলে 'ব্রাহ্মণ' শব্দ দ্বিজাতি অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে (বৈদ্য, ৮৩)। পুনশ্চ বলিয়াছেন—"ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যা গর্ভ সম্ভূত সন্তান দ্বিজাতি বলিয়া 'ব্রাহ্মণ' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন" (পৃঃ ৮৩), অর্থাৎ মূর্দ্ধাভিভিষিক্ত ও অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ না হইলেও তাহাদের গলায় যজ্ঞোপবীত আছে বলিয়াই ভীষ্মদেব তাহাদিগকে 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া-ছেন! সত্যেন্দ্রবাবুরও ঐ মত! তিনি বলিতেছেন—"এ ব্রাহ্মণ শব্দের অর্থ দ্বিজ ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না"। (বৈঃ প্রাঃ পৃষ্ঠা ১৭) পুনশ্চ—"বৈশ্য যেরূপ ব্রাহ্মণ, অম্বষ্ঠ ও সেইরূপ ব্রাহ্মণ"! (পৃঃ ১৭) আহা, সত্যেন্দ্রবাবু ও কালীবাবু দীর্ঘজীবী হউন, নহিলে এরূপ শাস্ত্রব্যাখ্যা আমরা কাহার কাছে শুনিব? পাঠক 'ফলতঃ যথার্থই' বুঝিলেন কি যে, 'ব্রাহ্মণ' শব্দের অর্থ অম্বষ্ঠ পক্ষে 'বৈশ্য', মূর্দ্ধাভিষিক্ত পক্ষে 'ক্ষত্রিয়' এবং ব্রাহ্মণ কন্যার পুত্র পক্ষে 'ব্রাহ্মণ' ?

জাতিতত্ত্বের লেখকই এই ভাবে শাস্ত্র ব্যাখ্যার পথ দেখাইয়াছে! ইহারা তাহাই সমর্থন করিতেছেন। এইরূপ পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যার আর একটী উদাহরণ দেখাই।

চতুর্থ প্রমাণ।

'বৈদ্যবর্ণ-বিনির্ণয়' নামক মহাগ্রন্থে ৪০ বৎসর পূর্ব্বে ব্যাস সংহিতার একটী বচন এইরূপ দেওয়া হইয়াছে—

'বিপ্রবৎ বিপ্রবিন্নাসু ক্ষত্রবিন্নাসু ক্ষত্রবৎ।
জাতঃ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত বৈশ্যবিন্নাসু বৈশ্যবৎ।
বিপ্রক্ষত্রিয়বৈশ্যেভ্য স্তুতঃ শূদ্রাসু শূদ্রবৎ॥ ব্যাস, ১।৭-৮

ইহার সুপরিস্ফুট অর্থ এই যে, বিপ্রের পরিণীতা দ্বিজকন্যাগুলিতে (অর্থাৎ বিপ্রকন্যা, ক্ষত্রিয়কন্যা ও বৈশ্যকন্যাতে) জাত ব্যক্তি বিপ্রবৎ কার্য্য করিবে, অর্থাৎ বিপ্রবর্ণ হইবে; ক্ষত্রিয়-পরিণীতা দ্বিজকন্যাতে (অর্থাৎ ক্ষত্রিয়কন্যাতে ও বৈশ্যকন্যাতে) জাত ব্যক্তি ক্ষত্রিয়বৎ কার্য্য করিবে অর্থাৎ ক্ষত্রিয়বর্ণ হইবে; বৈশ্যপরিণীতা স্ত্রীতে অর্থাৎ বৈশ্য-কন্যাতে উৎপন্ন পুত্র বৈশ্যবৎ কার্য্য করিবে, অর্থাৎ বৈশ্যবর্ণ হইবে। [কারণ, বর্ণানুসারেই ধর্ম্মনির্ণয় হয়, অন্যথা নহে। 'বর্ণত্বাৎ ধর্ম্মমর্হতি', ইহা ব্যাস পূর্ব্বেই বলিয়াছেন]। কিন্তু বিপ্র, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য হইতে শূদ্রাতে উৎপাদিত পুত্র শূদ্রবৎ কার্য্য করিবে, অর্থাৎ শূদ্রবর্ণ হইবে (শূদ্রাবিবাহে দ্বিজপত্নীত্ব-ঘটক মন্ত্র প্রযুক্ত হইত না, এজন্য শূদ্রার দ্বিজপত্নীত্ব সিদ্ধ না হওয়ায় এইরূপ বলা হইয়াছে)। এই প্রাচীন বচন ব্যাসের অন্যান্য বচনের সহিত সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং ইহাতে সবর্ণা ও অনুলোমাক্রমে জাত যতপ্রকার পুত্র হইতে পারে, সকলেরই ধর্ম্ম নির্ণয় করা হইয়াছে। কিন্তু এই স্পষ্ট বচনটীকে নষ্ট করিবার অভি-প্রায়ে ভট্টপল্লীর পঞ্চানন পণ্ডিত (এখন ইনি মহামহোপাধ্যায় হইয়া-

ছেন) বঙ্গবাসীর প্রকাশিত ব্যাসসংহিতায় উহা কিরূপে পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন এবং ঐ পরিবর্ত্তিত পাঠেরও কি জঘন্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন, দেখুন—

'বিপ্রবৎ বিপ্রবিন্নাসু ক্ষত্রবিন্নাসু **বিপ্রবৎ**।
জাতঃ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত **ততঃ শূদ্রাসু শূদ্রবৎ**॥
বৈশ্যাসু বিপ্রক্ষত্রাভ্যাং ততঃ শূদ্রাসু শূদ্রবৎ।'

এই অদ্ভুত পাঠের যদি কিছু অর্থ হয়, তাহা এই—বিপ্রের তিন বর্ণীয়া স্ত্রীতে জাত পুত্রগণ বিপ্রবৎ ক্রিয়াকর্ম্ম করিবে, ঐরূপ ক্ষত্রিয়ের স্ত্রীতে জাত পুত্রগণ **বিপ্রবৎ** ক্রিয়াকর্ম্ম করিবে (!) শূদ্রাতে উৎপন্ন পুত্রেরা শূদ্রবৎ ক্রিয়াকর্ম্ম করিবে। বিপ্র ও ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ্যাতে ও শূদ্রাতে উৎপন্ন পুত্রগণ **শূদ্রবৎ** ক্রিয়াকর্ম্ম করিবে। পাঠক এ স্থলে ক্ষত্রিয়ের ঔরসে জাত পুত্রকে বিপ্রবর্ণ এবং বৈশ্যার গর্ভজাত পুত্রকে (অম্বষ্ঠকে) শূদ্রবর্ণ বলা হইয়াছে দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারিতেছেন যে পাঠটী নিতান্তই বিকৃত করা হইয়াছে! বঙ্গবাসীর পণ্ডিত মহাশয় এই বিকৃত পাঠ মুদ্রিত করিয়া উহার এইরূপ বিচিত্র অনুবাদ করিয়াছেন,—"ব্রাহ্মণ কর্তৃক বিধিপূর্ব্বক বিবাহিতা যে ব্রাহ্মণকন্যা তাহাকে '**বিপ্রবিন্না**' কহে। বিপ্রবিন্না পত্নীতে জাত সন্তানের জাতকর্ম্মাদি সংস্কার ব্রাহ্মণের মত করিবে; ক্ষত্রবিন্না পত্নীতে [ব্রাহ্মণ কর্তৃক বিবাহিতা ক্ষত্রকন্যাকে '**ক্ষত্রবিন্না**' বলে (!)] জাত সন্তানের জাতকর্ম্মাদি সংস্কার ক্ষত্রিয় জাতির ন্যায় করিবে (মূলে '**বিপ্রবৎ**' আছে! একেত 'ক্ষত্রবিন্না' শব্দের অর্থ শুনিলেই চমকাইয়া উঠিতে হয়, তদুপরি 'বিপ্রবৎ' এর অনুবাদে 'ক্ষত্রবৎ' শুনিলে আর জ্ঞান থাকে না!); ব্রাহ্মণ কর্তৃক বিবাহিতা শূদ্রকন্যাতে জাত সন্তানের জাতকর্ম্মাদি শূদ্রের ন্যায় করিবে। কিংবা ক্ষত্রিয় কর্তৃক বিবাহিতা বৈশ্যকন্যাতে জাত সন্তানের সংস্কার বৈশ্য জাতির মত

করিবে (মূলে আছে 'শূদ্রবৎ', 'শূদ্রবৎ' শব্দের অর্থ হইল বৈশ্যবৎ!) এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় কিংবা বৈশ্যকর্ত্তৃক বিবাহিতা শূদ্রকন্যাতে জাত সন্তানের জাতকর্ম্মাদি সংস্কার শূদ্রজাতির মত করিবে"—ঊনবিংশতি সং, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৩৬ শাল। এইরূপ উন্মত্ত প্রলাপ হইল শাস্ত্রের অনুবাদ! পণ্ডিত মহাশয়ের অনন্ত কীর্ত্তি! ইনি পূর্ব্বোদ্ধৃত "উঢ়ায়াং হি সবর্ণায়াম্ অন্যাম্ বা কামমুদ্বহেৎ। তস্যামুৎপাদিতঃ পুত্রঃ ন সবর্ণাৎ প্রহীয়তে॥" এই শ্লোকেরও পণ্ডিতের মত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার ব্যাখ্যা এই—"সবর্ণা বিবাহ করিয়া ইচ্ছা হইলে অন্যবর্ণীয়াকেও বিবাহ করিতে পারে। তাহা হইলে **পূর্ব্বপরিণীতা সবর্ণা স্ত্রীর গর্ভসম্ভূত পুত্র অসবর্ণ হইবে না।**" (ঊনবিংশতি সংহিতা, দ্বিতীয় সং, পৃঃ ৩৯৩)! বৈদ্যব্রাহ্মণ শাস্ত্রালোচনা ত্যাগ করায় শাস্ত্র ও ধর্ম্মের যে এইরূপ দুর্গতি হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? দুঃখ এই কালীবাবু মূর্খ নহেন, সত্যেন্দ্রবাবুও অসংস্কৃতজ্ঞ নহেন, কিন্তু তথাপি শাস্ত্র-মর্ম্ম বুঝিতে এমন শোচনীয় অক্ষমতা কেন? সত্যেন্দ্রবাবু গর্ব্বভরে বলিয়াছেন, তিনি কাহারও 'দোহাই' মানিতে প্রস্তুত নহেন, "শাস্ত্র রহিয়াছেন, ভগবান্ আমাদিগকে চক্ষুকর্ণ দিয়াছেন" ইত্যাদি (পৃঃ ৩৯ ফুটনোট)। এই ভগবদ্দত্ত চক্ষু দ্বারা তিনি জীবানন্দের সংস্করণ শুক্রনীতিতে দেখিয়াছেন, শেষ পংক্তিটী 'বৈশ্যাসু বিপ্রক্ষত্রাভ্যাং ততঃ শূদ্রাসু শূদ্রবৎ" এইরূপ আছে, সুতরাং প্রাচীন পাঠ পরিত্যাগ করিয়া তাহাই গ্রহণ করিয়াছেন! নিজেই বলিতেছেন, "উল্লিখিত দুইটী শ্লোকের পাঠ সম্বন্ধে বহু অত্যাচার অবিচার চলিয়াছে," আবার নিজেই সেই অত্যাচার ও অবিচারের বৃদ্ধি করিতেছেন! সত্যেন্দ্রবাবুর অর্থ অনুসারে ব্রাহ্মণের বিবাহিতা কেবলমাত্র ব্রাহ্মণকন্যাই 'বিপ্রবিন্না' (অর্থটী কতদূর সঙ্কুচিত হইল তাহা দ্রষ্টব্য); ক্ষত্রিয়ের বিবাহিতা কেবলমাত্র ক্ষত্রকন্যাই ক্ষত্রবিন্না (এস্থলেও

অর্থ সঙ্কুচিত করা হইল) এবং বৈশ্যবিবাহিতা বৈশ্যকন্যাই বৈশ্যবিন্না। ইহাদের গর্ভজাত সন্তান যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য হয়।" কিন্তু ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক পরিণীতা বৈশ্যা স্ত্রীতে জাতসন্তান কর্ম্মসমূহ বৈশ্যবৎ করিবেন। এবং [যে কোনও জাতি কর্ত্তৃক পরিণীতা] শূদ্রা স্ত্রীতে জাত সন্তান কর্ম্মসমূহ শূদ্রবৎ করিবেন।" (বৈদ্য০ প্রতি০ পৃঃ ২০)। কিন্তু এস্থলে ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক ক্ষত্রিয় কন্যাতে উৎপাদিত মূর্দ্ধাভিষিক্তের কোন কথাই ত বলা হইল না! সে বেচারী কিরূপ 'কর্ম্মসমূহ' করিবে? অন্য দোষের কথা না তুলিলেও এই দোষহেতু ঐ পাঠ যে বিকৃত তাহা বুঝা যায়।

কালীবাবু বঙ্গবাসীর অনুসরণ করিয়া ব্রাহ্মণবিবাহিত ক্ষত্রিয়কন্যাকে ক্ষত্রবিন্না (!) অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন, এবং 'ক্ষত্রবিন্নাসু বিপ্রবৎ' স্থলে 'ক্ষত্রবিন্নাসু ক্ষত্রবৎ' পাঠ লেখায় বঙ্গবাসীর কৃত 'বিপ্রবৎ' শব্দের ব্যাখ্যায় 'ক্ষত্রবৎ' অনুবাদ করিতে হয় না! ইহা দ্বারা মূর্দ্ধাভিষিক্ত যে ক্ষত্রিয়বর্ণ, তাহা বলা হইল। কিন্তু অবশিষ্ট অংশে অবিকল বঙ্গবাসীর মতই ভ্রম করিয়াছেন। আমরা কালীবাবুর প্রদত্ত পাঠ ও অনুবাদ উদ্ধার করিয়া দিতেছি—

বিপ্রবদ্ বিপ্রবিন্নাসু ক্ষত্রবিন্নাসু ক্ষত্রবৎ।
জাতকর্ম্মানি কুর্ব্বীত ততঃ শূদ্রাসু শূদ্রবৎ।
বৈশ্যাসু বিপ্রক্ষত্রাভ্যাং ততঃ শূদ্রাসু শূদ্রবৎ।

(বৈদ্য, পৃঃ ৭৪)

শেষ পংক্তির অনুবাদে লিখিতেছেন—"ব্রাহ্মণ কিংবা ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক বিবাহিতা বৈশ্যকন্যাতে জাত সন্তানের জাতকর্ম্মাদি সংস্কার বৈশ্য-জাতির মত করিবে"। পাঠক দেখুন **এই অনুবাদ বঙ্গবাসীর অনুবাদের সহিত বর্ণে বর্ণে মিলিয়া যাইতেছে।** এস্থলেও মূলে 'বৈশ্যবৎ' বলিয়া কথাই নাই, আছে

'শূদ্রবৎ', অথচ 'শূদ্রবৎ' শব্দের অর্থ করিতেছেন 'বৈশ্যবৎ'। নির্ব্বোধ ছেলেরা পরীক্ষাক্ষেত্রে অপরের নির্ব্বোধ উক্তির কপি করিয়া যেরূপ ধরা পড়ে এবং দণ্ডিত হয়, কালীবাবুও সেইরূপ করিয়া ধরা পড়িয়াছেন! আইনজ্ঞ কালীবাবু কখনই নিজেকে এই দায় হইতে বাঁচাইতে পারিবেন না। এক্ষণে আমরা তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাঁহার কি দণ্ড হওয়া উচিত? আমাদের বিবেচনায় বৈদ্যব্রাহ্মণসমিতির কথা মানিয়া তাহার সভ্য হওয়াই এক্ষণে তাঁহার পক্ষে একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত। রায় বাহাদুর গবর্ণমেণ্টের বড় উকিল শ্রীযুক্ত ধর্ম্মভূষণ কালীচরণ সেন, বি-এল্ মহাশয়ের কিছুমাত্র শাস্ত্রজ্ঞান বা সংস্কৃত জ্ঞান নাই, তাহা ইহা হইতেই সপ্রমাণ হইল। স্বজাতির সহিত কলহ করিবার মত বুদ্ধি আছে, কিন্তু পুরোহিতশ্রেণীর কোন দুষ্ট ব্রাহ্মণ একটা প্রকাণ্ড ধর্ম্ম-বিক্ষোভক অসত্য কথা বলিলে তাহা সত্য কি অসত্য, শুদ্ধ কি অশুদ্ধ তাহা বুঝিয়া দেখিবার মত শুভ বুদ্ধি তাঁহার কই? কালীবাবুর প্রদত্ত পাঠে 'বৈশ্যবিন্নাসু' পদও নাই, পদার্থও নাই! বৈশ্যরা বোধ হয় তাহার মতে বিবাহ করিত না? "তত্রঃ শূদ্রাসু শূদ্রবৎ" দুইবার রহিয়াছে, এরূপ বাক্য যে দোষযুক্ত তাহা বলিয়া দিতে হয় না। এই শ্লোকে 'বৈশ্যবৎ' শব্দ কোথাও নাই, অথচ ব্রাহ্মণের ও ক্ষত্রিয়ের বিবাহিত বৈশ্যকন্যাতে জাত সন্তানের জাতকর্ম্মাদি সংস্কার বৈশ্যের মত হইবে, ইহা অদ্ভুত গবেষণা দ্বারা জানিয়াছেন! সমস্ত বচনটী নিপুণভাবে পরীক্ষা করিয়াও ক্ষত্রিয় যে ক্ষত্রিয়কন্যাকে বিবাহ করিত, অথবা রাজকুমারদের যে রাজনন্দিনীদিগের সহিত বিবাহ হইত, তাহার কোন লক্ষণ কোথাও দেখিতে পাইলাম না! বৈশ্যদিগেরও স্বজাতির মধ্যে বিবাহ হইত না! সিপাহীরা হয় বণিক্-কন্যা নয় শূদ্রকন্যা বিবাহ করিত। এই সকল দোষ হেতু কালীবাবুর ধৃত বচন ও তাহার অনুবাদ যে অতীব অশ্রদ্ধেয় তাহা বুঝা গেল।

কিন্তু প্রবোধনীর পাঠও এস্থলে বিশুদ্ধ নহে। প্রবোধনীর শেষ পংক্তিতে আছে—"বিপ্রক্ষত্রিয়বৈশ্যেভ্যঃ শূদ্রবিন্নাসু শূদ্রবৎ" কিন্তু বিপ্র-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য হইতে শূদ্রাতে জাত পুত্রের কর্ম্ম শূদ্রবৎ হইবে, এই অর্থ অভিপ্রেত হইলে 'শূদ্রবিন্নাসু' (শূদ্রবিন্না=শূদ্রপরিণীতা স্ত্রী !) কি জন্য ? এই সকল কারণে আমরা যে প্রাচীন পাঠ 'বৈশ্যবর্ণ-বিনির্ণয়' গ্রন্থ হইতে দিয়াছি, তাহাই একমাত্র সমীচীন পাঠ বলিয়া গণ্য করা উচিত।

জ্ঞানাঞ্জন-গ্রন্থাবলীর দ্বিতীয় শলাকায় এ সমস্ত বিষয় সুন্দরভাবে মীমাংসিত হইয়াছে। এ বিষয়ে শেষ কথা এই বলি যে, পুস্তকে যে পাঠই থাকুক না কেন, 'বিপ্রবৎ বিপ্রবিন্নাসু' এ অংশ সর্ব্বত্রই ঠিক আছে। উহাই আমাদের প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট। 'বিপ্র-বিবাহিত স্ত্রী-সকলে যাহারা জন্মিবে তাহারা বিপ্রবৎ কার্য্য করিবে,—ইহাই ঐ অংশের সুস্পষ্ট অর্থ। ঐ স্ত্রীসকলের মধ্যে ক্ষত্রকন্যা ও বৈশ্যকন্যার থাকা খুবই স্বাভাবিক। যে ব্যাসদেবের মহাভারতে 'ত্রাস্বপত্যং সমং ভবেৎ' রহিয়াছে, ভীষ্মমুখে সমগ্র ভারতের শাসনবাক্যরূপে যিনি সেই কথাই প্রকাশ করিয়াছেন, স্মৃতি সংহিতায় 'ন সবর্ণাৎ প্রহীয়তে' বলিয়া যিনি সেই কথার পুনরুক্তি করিয়াছেন, এস্থলেও তাহাই বলা হইয়াছে। এই বাক্যের পাঠবিকৃতি ও অর্থাশুদ্ধির চেষ্টা অন্যান্য বচনগুলির প্রতি আক্রমণের অনুরূপই হইয়াছে।

পঞ্চম প্রমাণ

যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—

"সবর্ণেভ্যঃ সবর্ণাসু জায়ন্তে বৈ সজাতয়ঃ।
অনিন্দ্যেষু বিবাহেষু পুত্রাঃ সন্তানবর্দ্ধনাঃ॥" ১।৯০

(সবর্ণাতেই সজাতি জন্মে; অসবর্ণাতে সজাতি হয় না, কিন্তু অনিন্দ্য অসবর্ণ বিবাহে সন্তানবর্দ্ধন অর্থাৎ গোত্রবর্দ্ধন সবর্ণ পুত্র হয়।)

বিপ্রান্মূর্দ্ধাভিষিক্তো হি ক্ষত্রিয়ায়াং, বিশঃ স্ত্রিয়াম্।
অম্বষ্ঠঃ শূদ্র্যাং নিষাদো জাতঃ পারশবোপি বা ॥ ৯১
বৈশ্যশূদ্র্যোস্তু রাজন্যান্মাহিষ্যোগ্রৌ সুতৌ স্মৃতৌ।
বৈশ্যাত্তু করণঃ শূদ্র্যাং বিন্নাস্বেষ বিধিঃ স্মৃতঃ ॥ ৯২

(ইহারা দ্বিজা ও শূদ্রা ভার্য্যাতে অনিন্দ্য ও নিন্দ্য দ্বিবিধ অনুলোম বিবাহ দ্বারা উৎপন্ন ; প্রতিলোমজদিগের তুলনায় ইহারা সকলেই 'সৎ' ।)

ব্রাহ্মণ্যাং ক্ষত্রিয়াৎ সুতো বৈশ্যাৎ বৈদেহক স্তথা।
শূদ্রাৎ জাতস্তু চাণ্ডালঃ সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতঃ ॥ ৯৩
ক্ষত্রিয়া মাগধং বৈশ্যাৎ, শূদ্রাৎ ক্ষত্তারম্ এব তু।
শূদ্রাৎ আয়োগবং বৈশ্যা জনয়ামাস বৈ সুতম্ ॥ ৯৪

(ইহারা প্রতিলোমজ পুত্র ; সর্ব্ববিধ অনুলোমজ পুত্রের তুলনায় ইহারা 'অসৎ')।

মাহিষ্যেণ করণ্যাং তু রথকারঃ প্রজায়তে।

(ইহা এক প্রকার অনুলোমজের সহিত অন্যপ্রকার অনুলোমজের অনুলোম মিশ্রণ)।

অসৎ সন্তস্তু বিজ্ঞেয়া প্রতিলোমানুলোমজাঃ ॥ ৯৫

ব্যাখ্যা,—শেষ পংক্তিতে বলা হইয়াছে প্রতিলোমজেরা অসৎ পুত্র ; অনুলোমজেরা সৎ পুত্র। পূর্ব্বে সৎ পুত্রের উল্লেখ করিয়া পরে অসৎ পুত্রের উল্লেখ করা হইয়াছে। অতএব ৯৩,৯৪ শ্লোকে যে প্রতিলোমজ সন্তানদিগের নাম দেখা যাইতেছে, তাহা অসৎ পুত্রদিগেরই তালিকা। ইহারা অবৈধ বলিয়াই অসৎ। অতএব তদূর্দ্ধে ৯০।৯১ ৯২ শ্লোকে যে বৈধ বিবাহজাত পুত্রদের কথা আছে তাহারা অসৎ নহে। অতএব অনুলোমজ পুত্রেরাও 'অসৎ' নহে, ইহা বুঝা গেল। কিন্তু, শুধু অসৎ নহে বলিলে, সৎ ও অসতের মাঝামাঝি বুঝাইতেও পারে।

পাছে এরূপ বুঝায়, এজন্য শেষ পংক্তিতে 'অসৎসন্তু' এই স্থলে অনুলোমজগণকেই লক্ষ্য করিয়া 'সৎ' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

অতএব ১। ব্রাহ্মণ+ক্ষত্রিয়কন্যা—মূর্দ্ধাভিষিক্ত

২। ব্রাহ্মণ+বৈশ্যকন্যা—অম্বষ্ঠ

৩। ক্ষত্রিয়+বৈশ্যকন্যা—মাহিষ্য

এবং

৪। ব্রাহ্মণ+শূদ্রকন্যা—পারশব।

৫। ক্ষত্রিয়+শূদ্রকন্যা—উগ্র।

৬। বৈশ্য+শূদ্রকন্যা—করণ।

এই ছয় পুত্রই প্রতিলোমজ অসতের তুলনায় সৎ হইল। বৈধ বলিয়াই ইহাদিগকে 'সৎ' বলা হইল। কিন্তু এই ছয় পুত্র 'সৎ' হইলেও ১।২।৩ সংখ্যক পুত্রের তুলনায় ১।৫৬ সংখ্যক পুত্র নিন্দনীয়। মহর্ষি তাহা ১।৫৬ শ্লোকে বলিয়াছেন—

যদুচ্যতে দ্বিজাতীনাং শূদ্রাদ্দারোপসংগ্রহঃ।

ন তন্মম মতং যস্মাৎ তত্রাত্মা জায়তে স্বয়ম্ ॥ ৫৬

জায়াতে নিজের আত্মা জাত হয়। শূদ্রাতে তাহা হয় না, শূদ্রাপুত্র মাতৃবর্ণ হয়, অতএব শূদ্রাপুত্র আমার অভিমত নহে, অর্থাৎ (ভাল বলিয়া) অনুমোদিত নহে। অতএব শূদ্রাবিবাহ অনিন্দ্য বিবাহ নহে। মন্বাদিও শূদ্রাবিবাহকে নিন্দনীয় বলিয়াছেন। উহা দ্বিজের পাতিত্যের কারণ (মনু ৩।১৪-১৯)। 'ধর্ম্মপ্রজারত্যর্থো হি বিবাহঃ। শূদ্রাবিবাহস্তু রত্যর্থমেব। ন ধর্ম্মার্থম্, ন চ পুত্রার্থম্।' অতএব শূদ্রাবিবাহ ব্যতীত অপর অনুলোমবিবাহ অনিন্দ্য। ৯০ শ্লোকে 'অনিন্দ্যেষু বিবাহেষু' এই বহুবচনটীও দ্রষ্টব্য।

অনুলোম দ্বিজকন্যা বিবাহ যখন অনিন্দ্য, তখন তাহাতে অনিন্দ্য পিতৃবর্ণ পুত্রই জন্মে (৯০ শ্লোকের দ্বিতীয় পংক্তি)।

অতএব মূর্দ্ধাভিষিক্ত, অম্বষ্ঠ ও মাহিষ্য পিতৃবর্ণ। তবে সবর্ণার গর্ভজাত পুত্র হইতে তাহাদের পার্থক্য কি? তাহাই ৯০ শ্লোকের প্রথম পংক্তিতে বলা হইয়াছে—

"সবর্ণেভ্যঃ সবর্ণাসু জায়ন্তে বৈ সজাতয়ঃ"

অর্থাৎ, সবর্ণ হইতে সবর্ণাস্ত্রীতে 'সজাতি' অর্থাৎ **পিতার সজাতি** পুত্র উৎপন্ন হয়। অনুলোম বিবাহে পিতার 'সজাতি' পুত্র হয় না বটে, কিন্তু **সবর্ণ** পুত্র হইতে বাধা নাই। এই জন্যই তাহাদের মূর্দ্ধাভিষিক্ত, অম্বষ্ঠ ও মাহিষ্য এই তিন পৃথক্ জাতিনাম। সবর্ণ হইতে **কেবল** সবর্ণাতেই যদি সবর্ণ সন্তান হইত, তাহা হইলে ঋষি স্বচ্ছন্দে বলিতে পারিতেন—'সবর্ণেভ্যঃ সবর্ণাসু জায়ন্তে বৈ **সবর্ণা** হি"। বস্তুতঃ যাজ্ঞবল্ক্য বচনের অর্থ এই যে, মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও অম্বষ্ঠ পিতার সবর্ণ, অর্থাৎ ব্রাহ্মণবর্ণ বটে, ব্রাহ্মণাচারেই তাহাদের জাতকর্ম্মাদি সংস্কার হইবে, কিন্তু পিতার সজাতি অর্থাৎ সমশ্রেণীর হইবে না। ব্রাহ্মণকন্যার গর্ভে যে পুত্র জন্মে সেই পিতার সজাতি হয়। তবেই যেমন শূদ্রবর্ণের মধ্যে অসংখ্য জাতি বিদ্যমান রহিয়াছে, সেইরূপ ব্রাহ্মণবর্ণের মধ্যেও তিনটী জাতি পাওয়া যাইতেছে, একটী মুখ্য ব্রাহ্মণ জাতি, অপর দুইটী মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও অম্বষ্ঠ।

[বলা বাহুল্য, ভারতে এক কালে অনুলোম বিবাহের বহুল প্রচলন বশতঃ বর্ত্তমানে মুখ্য ব্রাহ্মণজাতি বলিয়া পৃথক্ জাতি নাই। ইহা গোত্রগুলির ইতিহাস হইতেই জানা যায়। বর্ত্তমান ব্রাহ্মণজাতি ঐ তিনটী জাতির সম্মিলনেই গঠিত। মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণবর্ণ বলিয়া তাহাদের মিশ্রণে ব্রাহ্মণ্যের কোনরূপ হানি হয় নাই। ঐ মিশ্র-জাতিই এখন ভারতে 'ব্রাহ্মণ জাতি' নামে বিদিত]।

যাজ্ঞবল্ক্যের মতানুসারে অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ হইল। সুতরাং মনুরও যে তাহাই মত, তাহা অনুমানে বুঝা যাইতেছে। অনুসন্ধিৎসু

পাঠককে এ সম্বন্ধে জ্ঞানাঞ্জন-গ্রন্থাবলীর দ্বিতীয় শলাকা দেখিতে বলি।

কালীবাবু ও সত্যেন্দ্র বাবু 'অম্বষ্ঠের বর্ণ নির্ণয়' প্রসঙ্গে যে সকল ধর্ম্মবিরুদ্ধ ও ন্যায়বিরুদ্ধ কথা শাস্ত্রার্থ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, ইতঃপূর্ব্বে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিয়াছি। ইহারা পদে পদে কুল্লূকের অনুসরণ করিয়াছেন। যে কুল্লূক অম্বষ্ঠকে 'বিজাতীয়মৈথুনসম্ভবত্বেন অশ্বতরবৎ' পর্য্যন্ত বলিয়াছেন, মনুর ৯।১৬৩ শ্লোক ব্যাখ্যা কালে মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও অম্বষ্ঠকে ঔরস পুত্র বলেন নাই, অম্বষ্ঠজননীকে ধর্ম্মপত্নী বলেন নাই, যাঁহার মতে অম্বষ্ঠ সঙ্কীর্ণ জাতিবিশেষ, তাহার কৃত মনুব্যাখ্যাই কালীবাবু ও সত্যেন্দ্র বাবুর আদরণীয় ও অনুসরণীয়!

ষষ্ঠ প্রমাণ

বর্ণনির্ণায়ক প্রসিদ্ধ মনু-বচনটী এই—

সর্ব্ব বর্ণেষু তুল্যাসু পত্নীষ্বক্ষতযোনিষু।
আনুলোম্যেন সম্ভূতা জাত্যা জ্ঞেয়াস্ত এব তে॥ ১০।৫

এ স্থলে সবর্ণা ও অনুলোমা সর্ব্বপ্রকার 'পত্নী'র গর্ভজাত পুত্রদিগের বর্ণ নির্ণয় হইবে, ইহা সকলেই আশা করিতে পারে। কিন্তু কুল্লূক প্রভৃতি বলিয়াছেন, এস্থলে 'আনুলোম্য' অর্থ এইরূপ, ব্রাহ্মণ+ব্রাহ্মণী; ক্ষত্রিয়+ক্ষত্রিয়া; বৈশ্য+বৈশ্যা, শূদ্র+শূদ্রা! তাই কালীবাবুও কুল্লূকদিগের ভাষায় বলিতেছেন, "**এখানে আনুলোম্য শব্দের অর্থ 'যথাক্রমে',** ব্রাহ্মণেন ব্রাহ্মণ্যাং, ক্ষত্রিয়েণ ক্ষত্রিয়ায়াম্ ইত্যনুক্রমেণ" (বৈদ্য, পৃঃ ৭১)। সত্যেন্দ্রবাবুও ঐ শ্লোকের অর্থ করিতেছেন—"সকল বর্ণেই তুল্যবর্ণীয়া স্ত্রীর গর্ভে **অনুলোম দ্বারা উৎপন্ন সন্তান—ব্রাহ্মণ+ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়**

+ক্ষত্রিয়া, বৈশ্য+বৈশ্যা এবং শূদ্র+শূদ্রা তাহাই অর্থাৎ পিতৃজাতীয়।” (বৈদ্য প্রতি—পৃঃ ৪)

এমন সুন্দর ‘অনুলোমজ সন্তান’ কেহ দেখিয়াছেন না শুনিয়াছেন? সমগ্র স্মৃতি, টীকা, টিপ্পনী, ও সমগ্র সাহিত্য পড়িয়া আছে, ‘অনুলোম সন্তানের’ এইরূপ বিপর্য্যয় ব্যাখ্যা কোন স্থান হইতে কালাবাবু ও সত্যেন্দ্রবাবু দেখাইয়া ইহার সমর্থন করিতে পারেন কি? যে উদাহরণ গুলি তাঁহারা দিয়াছেন, তাহা ত সকলই **সবর্ণা** বিবাহের উদাহরণ। তদুৎপন্ন সন্তান ত সবর্ণার সন্তান! মনুর কি সহসা এমনই মোহ বা ভাষাজ্ঞানের অভাব হইয়াছিল, যে ‘সবর্ণ’ ও ‘অনুলোম’ শব্দের অর্থ-পার্থক্য ভুলিয়া গিয়াছিলেন? সবর্ণার সন্তানকে বুঝাইতে ‘আনুলোম্যেন সম্ভূতাঃ’ কিজন্য? ‘সবর্ণের ঔরসে সবর্ণার গর্ভে সবর্ণ সন্তান হয়’, ইহা বুঝাইতে ত কোনও **ক্রমেরই** প্রয়োজন নাই! তবে ‘যথাক্রমে’ বলায় কি ক্রম বলা হইল? ‘আনুলোম্যেন সম্ভূতাঃ’ এ স্থলে ব্যবহার না করিলেও ত অর্থবোধের পক্ষে কোন অসুবিধা হইত না। শ্রোতাকে বা পাঠককে বিভ্রান্ত করিবার জন্যই কি মনু ইচ্ছাপূর্ব্বক এই কথাটী ঢুকাইয়াছেন? ভৃগু কি তাহা সংশোধন করিতে ভুলিয়া গেলেন? ঋষিরা কি চিরকাল উহাকে ব্যাসকূট মনে করিয়া ছাড়িয়া দিয়া গিয়াছেন? বস্তুতঃ বৈধ বিবাহ যখন মাত্র দুই প্রকার—সবর্ণা-বিবাহ ও অনুলোমা-বিবাহ, তখন বৈধসন্তানও দুইপ্রকার—সবর্ণার সন্তান ও অনুলোমার সন্তান। কিন্তু মনু সবর্ণার সন্তানকে বুঝাইতেই ‘**আনুলোম্যেন** সম্ভূতাঃ’ বলিয়াছেন, ইহা কি অবিকৃতমস্তিষ্ক কেহ বলিতে পারে? পারিভাষিক শব্দের এমন দুর্গতি কেহ কোথাও দেখিয়াছেন কি? ‘জরায়ুজ ও অণ্ডজ’ বলিলে, যে শুধু অণ্ডজকেই বুঝিতে চায়, তাহার বুদ্ধিটাও তুরগাণ্ডতুল্য বলিয়াই লোকের আশঙ্কা হয় না কি? সত্যেন্দ্রবাবু সগর্ব্বে বলিতেছেন—

"বৈদ্য-ব্রাহ্মণগণ ঐ শ্লোকের এইরূপ অনুবাদ করেন, 'সকল বর্ণে অক্ষতযোনি **তুল্যবর্ণীয়া** পত্নীর গর্ভে উৎপন্ন সন্তানগণ এবং **আনুলোম্য** দ্বারা উৎপন্ন সন্তানগণ জাতিতে তাহাই (অর্থাৎ পিতার সহিত এক)। 'এবং' শব্দটী যোগ করিবার অধিকার তাঁহাদের নাই। তথাপি ঐ শব্দ যোগ করিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।" (বৈদ্য প্রতি—পৃঃ ৫)

বৈদ্যব্রাহ্মণগণ 'এবং' শব্দ যোগ করিয়াছেন, বড় অন্যায় করিয়াছেন! আর সত্যেন্দ্রবাবু কুল্লূকের মত 'আনুলোম্য' শব্দটী একেবারে মুছিয়া ফেলিতে চাহেন, সেটী খুব ন্যায়সঙ্গত! একটী 'চ' উহ্য হইলে যদি সকলদিকে সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যাখ্যা হয়, তবে তাহাতে কি আপত্তি হইতে পারে? মনুর শ্লোক ব্যাখ্যায় কত স্থলে কত কি উহ্য করিতে হয়, আর এ স্থলে যাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, তাহা অস্বীকার করিয়া শ্লোকটীকে অন্যায়রূপে নষ্ট করিতে হইবে? মনুর সপ্তম অধ্যায়ে ১৭শ শ্লোকে 'স রাজা পুরুষো দণ্ডঃ' এই স্থলে একটা 'চ' না আনিলে কোন অর্থ ই হয় না। ইহার অনুবাদে 'সেই দণ্ডই পুরুষ রাজা না করিয়া 'সেই দণ্ডই রাজা, (এবং) সেই দণ্ডই পুরুষ' সত্যেন্দ্র বাবু নিজের মনু সংস্করণে কিরূপে করিয়াছেন? অন্বয়ে "স দণ্ডঃ রাজা পুরুষঃ [চ]' এইরূপ 'চ' অর্থাৎ 'এবং' যোগ করিয়াছেন কেন? বিদ্যাবাগীশ সত্যেন্দ্রবাবু বহু স্থলে মনুসংহিতায় কোন পুঁথিতে পাঠান্তর দেখিতে না পাইলেও বলিয়াছেন, এই স্থলে এইরূপ পাঠ হওয়া সঙ্গত; যথা, কুল্লূকটীকা, মনু, ৭.৩৭ 'Hence a চ is wanting', ৭।৫৫ 'কিমু রাজ্যং সুখোদয়ম্' স্থলে লিখিয়াছেন, 'For কিমু all read কিং তু (সব পুঁথিতে মূল শ্লোকে 'কিং তু' আছে), but কিমু is clearly the reading of Narada and Gobindaraj (নারদ এবং গোবিন্দরাজ 'কিন্তু' স্থলে কিমু ধরিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন). So it seems that

the reading was already doubtful. May it be কিং নু ?"
এই 'কিং নু' মনুর কোন পুঁথিতেই নাই, কোন টীকাতেও উহা ধরা হয় নাই, ইহা সত্যেন্দ্র বাবুর suggestion! তবে বৈশ্যব্রাহ্মণ-সমিতি একটা 'চ' উহ্য করিয়া কি অন্যায় করিল? একটা লিখিতপঠিত 'চ'-এর যদি এতই আবশ্যকতা ছিল, তবে উহ্য না করিয়া—

"আনুলোম্যে চ সম্ভূতাঃ জাত্যা জ্ঞেয়া স্তু এব তে"

এইরূপ করিয়া লইলেই ত তাঁহার প্রাণ শীতল হইত! তাহা হইলে শ্লোকটীর প্রথম পংক্তিতে 'তুল্যা' বলায় যেমন সবর্ণাকে বুঝাইত, * দ্বিতীয় পংক্তিতে 'আনুলোম্য' বলায়ও তেমনই অসবর্ণা পত্নীদের কথা বলা হইত। বস্তুতঃ এস্থলে 'চ' উহ্য করিবার কোন আবশ্যকতা নাই, বৈশ্য-ব্রাহ্মণগণও তাহা করেন নাই, তবে অর্থ পরিস্ফুট করিয়া লিখিবার অভিপ্রায়ে বঙ্গানুবাদে 'এবং' ব্যবহার করিয়া থাকিবেন। শ্লোকটীর অন্বয়ে 'আনুলোম্যেন তুল্যাসু' এইরূপ করিলে 'চ' উহ্য করিবার প্রয়োজন হয় না। সত্যেন্দ্রবাবু 'তুল্যা' অর্থে 'তুল্যবর্ণীয়া' বলিয়া সমানবর্ণা নারীদিগকে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু অন্যত্র 'তুল্য'-অর্থক 'সদৃশ' লইয়া কত খেলা খেলিয়াছেন, তাহা বিস্মৃত হন কিরূপে? 'সম' শব্দের অর্থও 'সদৃশ' বা 'তুল্য' করিয়া 'ভিন্ন' করিতে পারিয়াছেন, আর এখানে 'তুল্যা' অর্থে দ্বিজধর্ম্মা সবর্ণা ও অনুলোমাদিগকে গ্রহণ করা হয় না কেন? আমরা বিরোধিদের কৃত দ্বিজত্ব-সাধর্ম্ম্যে 'তুল্যত্ব' ধরিয়া ১। ব্রাহ্মণ+ব্রাহ্মণকন্যা ২। ব্রাহ্মণ+ক্ষত্রিয়কন্যা ৩। ব্রাহ্মণ+বৈশ্যকন্যা এইরূপ স্বচ্ছন্দে বুঝিতে পারি। ব্রাহ্মণের এই তিনবর্ণীয়া পত্নীকে অনুলোমক্রমে উল্লেখ করিতে হইলে ১।২।৩

* এ বিষয়ে আমরা সত্যেন্দ্র বাবুর সহিত একমত। সত্যেন্দ্রবাবু বলিয়াছেন, "মনূক্ত 'তুল্যাসু পত্নীষু' এবং যাজ্ঞবল্ক্যোক্ত সবর্ণাসু (=সমানবর্ণীয়াসু পত্নীষু) নিশ্চয়ই একই কথা।" (পৃঃ ৯)

বলিতে হয় এবং প্রতিলোমক্রমে উল্লেখ করিতে হইলে ৩।২।১ বলিতে হয়। অতএব ১।২।৩ ইহাই অনুলোম বা স্বাভাবিক ক্রম। এই অনুলোম-তুল্যত্ব ক্ষত্রিয়ের পক্ষে কমিয়া দুইপ্রকার হইয়াছে যথা, ক্ষত্রিয় +ক্ষত্রিয়কন্যা ও বৈশ্য+বৈশ্যকন্যা এবং বৈশ্যপক্ষে তাহা বৈশ্য+ বৈশ্যকন্যা অর্থাৎ একটীমাত্র তুল্যত্বে পর্য্যবসিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ+ ব্রাহ্মণকন্যা, ক্ষত্রিয়+ক্ষত্রিয়কন্যা এবং বৈশ্য+বৈশ্যকন্যার মধ্যে বর্ণগত যথার্থ আনুলোম্য না থাকিলেও বয়সে আনুলোম্য বিগুমান থাকে, কুল-বিগ্যা-ধন প্রভৃতিতেও বিজ্ঞেরা আনুলোম্যই রক্ষা করেন। অতএব উহাদের তুল্যত্বের মধ্যেও বেশ আনুলোম্য বিগুমান রহিয়াছে। কিন্তু আমরা বর্ণানুলোম্যের প্রসঙ্গে এভাবে আনুলোম্য দেখাইতে চাহি না। আমরা বলি, সত্যেন্দ্রবাবু ও কালীবাবু বৈশ্য+বৈশ্যাকে অনুলোম বিবাহ বলিয়াছেন, আমরা তাহার অনুমোদন করি, কারণ এখানে পত্নী হইতে পারে এমন অনুলোমা কন্যা নাই। কিন্তু ক্ষত্রিয় পক্ষে যখন ক্ষত্রিয়+ক্ষত্রিয়া বলিয়াই উঁহারা চুপ করেন, তখন আমরা বলি, ইহা অন্যায়, কারণ এখানে আর একটী অনুলোমা নারী আছে, যে পত্নী হইবার উপযুক্ত। এই নারীতে অর্থাৎ বৈশ্যকন্যাতে যথার্থ আনুলোম্য বিগুমান, সুতরাং তাহাকে ছাড়িয়া দিলে, 'আনুলোম্য' শব্দের অর্থেরই ব্যাঘাত হইবে। কুল্লুক ও তদীয় ভক্তদ্বয় যখন ব্রাহ্মণ পক্ষে কেবল ব্রাহ্মণ+ব্রাহ্মণকন্যাকে দেখাইয়া অনুলোম বিবাহের তালিকা পূর্ণ করেন, তখনই আমরা তাঁহাদের দুরভিসন্ধি পরিষ্কার-রূপে বুঝিতে পারি! কারণ ব্রাহ্মণের প্রকৃত আনুলোমা ক্ষত্রিয়কন্যা ও বৈশ্যকন্যাতেই বিগুমান! তাঁহারা যে সবর্ণা বিবাহকেই অনুলোম বিবাহ বলিয়া চালাইতে চাহেন, তাহা এই সময়েই ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ক্ষত্রিয়+ক্ষত্রিয়া, বৈশ্য+বৈশ্যা, এই ব্যবস্থা হইতে বুঝিতে পারা যায়।

কুল্লূক ও কুল্লূকভক্তদিগের ব্রাহ্মণ+ব্রাহ্মণকন্যা, ক্ষত্রিয়+ক্ষত্রিয়-কন্যা, বৈশ্য+বৈশ্যকন্যা আমাদের ব্যবস্থার মধ্যেই আছে, অথচ আমরা 'আনুলোম্য' শব্দের অর্থ নষ্ট করিলাম না, সুতরাং তাঁহারা আমাদের ব্যাখ্যা লইতে কিছুমাত্র আপত্তি করিতে পারেন না।

এ স্থলে পত্নীষু'ও রহিয়াছে। শূদ্রা কোন দ্বিজের পত্নীপদবাচ্য হয় না, অতএব অনুলোমা পত্নীদের মধ্যে শূদ্রা গৃহীত হইবে না।

এক্ষণে সত্যেন্দ্রবাবু ও কালীবাবু ধীরচিত্তে ভাবিয়া দেখুন—বৈশ্য ব্রাহ্মণদের কৃত অর্থই ঠিক কি না! যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত এই ব্যাখ্যার কোন বিরোধ নাই।* এই ব্যাখ্যায় 'সমং' অর্থ 'অসমং' করিতে হয় নাই, 'ন প্রহীয়তে' অর্থ 'হীয়তে' করিতে হয় নাই, 'ব্রাহ্মণ" অর্থ 'বৈশ্য' করিতে হয় নাই, 'আনুলোম্য' অর্থও 'সাবর্ণ্য' করিতে হইল না! বিদ্যাবাগীশ মহাশয় ও ধর্ম্মভূষণ মহাশয়, পূর্ব্বদিক্‌কে পশ্চিম দিক প্রমাণ করিতে গিয়া উত্তর, দক্ষিণ, ঈশান, অগ্নি, নৈঋত, বায়ু, এমন কি ঊর্দ্ধ-অধঃ পর্য্যন্ত বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিয়াছেন! কৃতিত্ব বটে! আর স্বজাতির প্রতি যে "ধর্ম্মের দোহাই" তাহাও সুসঙ্গত বটে! বাচস্পতি মহাশয় শেষে এইরূপ ব্যাখ্যায় 'সংশয়ের মীমাংসা' পাইয়া 'লাভবান্' হইলেন !!

ফলতঃ ১০।৫ শ্লোকে মনু এইরূপ বলিয়াছেন—

তুল্যা পত্নী {
ব্রাহ্মণ+ব্রাহ্মণকন্যা=ব্রাহ্মণ
ক্ষত্রিয়+ক্ষত্রিয়কন্যা=ক্ষত্রিয়
বৈশ্য+বৈশ্যকন্যা=বৈশ্য
শূদ্র+শূদ্রকন্যা=শূদ্র

অনুলোমা পত্নী {
ব্রাহ্মণ+ক্ষত্রিয়কন্যা=ব্রাহ্মণ
ব্রাহ্মণ+বৈশ্যকন্যা=ব্রাহ্মণ
ক্ষত্রিয়+বৈশ্যকন্যা=ক্ষত্রিয়

'পত্নী'র কথা বলা হইয়াছে, সুতরাং অনুলোমা শূদ্রা ভার্য্যার কথা উঠিল না।

মনু তৃতীয়াধ্যায়ে বিবাহ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

সবর্ণা ভার্য্যা 'অগ্রে প্রশস্ত' অর্থাৎ প্রশস্ততমা, অনুলোম ভার্য্যাগণ পরে পরে নিকৃষ্ট। অতএব ব্রাহ্মণের চারি ভার্য্যার মধ্যে শূদ্রা ভার্য্যা সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। বিষ্ণু হইতে দেখান হইয়াছে যে, শূদ্রা ভার্য্যা রত্যর্থ, ধর্ম্মার্থ নহে মনুও বলিতেছেন,—

হীনজাতিস্ত্রিয়ং মোহাৎ উদ্বহন্তো দ্বিজাতয়ঃ।
কুল ন্যেব নয়ন্ত্যাশু সসন্তানানি শূদ্রতাম্॥ ৩।১৫

দ্বিজাতিগণ (অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য) হীনজাতীয় (অর্থাৎ শূদ্রজাতীয়) স্ত্রীকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিলে স্ব স্ব বংশকে শূদ্রকুলে পরিণত করেন [কারণ শূদ্রাগর্ভজ পুত্র শূদ্রই হয়]।

মনুও প্রতিলোম বিবাহ স্বীকার করেন নাই। অবৈধ প্রতিলোম সংযোগে উচ্চবর্ণীয়া দ্বিজা নারীর নারীত্বই অপধ্বস্ত হয়। এই অপধ্বংস হইতে জাত পুত্রগণ সকলেই শূদ্রবৎ—

'শূদ্রাণাং তু সধর্ম্মাণঃ সর্ব্বেঽপধ্বংসজাঃ স্মৃতাঃ॥ মনু. ১০।৪১

প্রতিলোমজগণ যাজ্ঞবল্ক্যের অসৎ পুত্র। সর্ব্বপ্রকার অনুলোমজগণই বৈধ; কিন্তু শূদ্রা বিবাহের অপ্রশস্ততারূপ নিন্দা থাকায়, দ্বিজের পক্ষে দ্বিজা বিবাহই অনিন্দ্য। এই অনিন্দ্য বিবাহের মধ্যে সবর্ণা-বিবাহ প্রশস্ততম। সুতরাং যাজ্ঞবল্ক্যের বচন অনুসারে যেমন 'অনিন্দ্যেষু বিবাহেষু পুত্রাঃ সন্তানবর্দ্ধনাঃ', মনু বচনেও দেখিতেছি, 'আনুলোম্যেন সম্ভূতাঃ জাত্যা জ্ঞেয়া স্ত এব তে'। 'জাত্যা জ্ঞেয়াঃ তে এব তে' ইহার অর্থ 'জাত্যা জন্মন' তে পুত্রাঃ তদ্বর্ণীয়া এব' অর্থাৎ অনিন্দ্য অনুলোমজ পুত্রগণ পিতার সবর্ণ বা সন্তানবর্দ্ধন হয়, ইহা পাওয়া গেল। সবর্ণাতে জাত পুত্রও পিতার সবর্ণ হয় বলা হইয়াছে। কিন্তু এই দুই

শ্রেণীর সবর্ণ সন্তানের মধ্যে পার্থক্য কি? যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, সবর্ণাতে 'সজাতি' পুত্র হয়, অর্থাৎ পিতার সমশ্রেণীর পুত্র হয় [এই জন্যই সবর্ণা ভার্য্যা প্রশস্ততমা] এবং অনিন্দ্য অনুলোমজ পুত্রগণ পিতার সন্তানবর্দ্ধন হয় বটে (ব্রাহ্মণ পিতার বংশধারাকে ব্রাহ্মণত্ব ভ্রষ্ট না করিয়া বিচিত্র, পরিপুষ্ট ও বহুধা প্রবর্ত্তিত করে; শূদ্রা-পুত্রদিগের দ্বারা তাহা হয় না), কিন্তু পিতার সমশ্রেণীর হয় না, এই পার্থক্য।

১০।৫ শ্লোকে সবর্ণা ও অনুলোমা সকল পত্নীতে জাত পুত্রগণ সবর্ণ, ইহাই মাত্র বলা হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কিনা তাহা বলা হয় নাই। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্যের যে অভিমত অন্যান্য মহর্ষিদেরও তাদৃশ অভিমত ছিল, এবং মনুসংহিতাকার ইহা অবগত ছিলেন বলিয়া পরবর্ত্তী শ্লোকে 'আহুঃ' অর্থাৎ মহর্ষিরা এরূপ বলেন বলিয়া নিজের মতও যে তাহাই, তাহা ১০।৬ শ্লোকে বলিতেছেন—

স্ত্রীষ্বনন্তরজাতাসু দ্বিজৈরুৎপাদিতান্ সুতান্।
সদৃশানেব তানাহু র্মাতৃদোষবিগর্হিতান্॥

['দ্বিজৈঃ' এস্থলে বহুবচন আছে, সুতরাং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য তিন শ্রেণীর দ্বিজ পাওয়া গেল। 'সুতান্' এস্থলেও বহুবচন রহিয়াছে, অতএব পুত্রও দু'য়ের অধিক হওয়া চাই।]

'অনন্তরজাতা' এতদ্দ্বারা অব্যবহিতানন্তরা বুঝিলে,

ব্রাহ্মণ + ক্ষত্রিয়া = মূর্দ্ধাভিষিক্ত
ক্ষত্রিয় + বৈশ্যা = মাহিষ্য
বৈশ্য + শূদ্রা — করণ

এই তিনের প্রতীতি হয়। 'ষট্ সুতাঃ দ্বিজধর্ম্মিণঃ' বলায় (শূদ্র বলিয়া) করণকে ছাড়িয়া দিলে চলিবে না, কারণ তাহা হইলে সংখ্যা

পাঁচটী হইয়া যাইবে ! অথচ মহান্ অনর্থ এই হয় যে, ব্রাহ্মণ + বৈশ্যা = অম্বষ্ঠ দ্বিজের তালিকা হইতেই বাদ পড়ে ! দ্বিজ কর্ত্তৃক দ্বিজাতে উৎপাদিত পুত্র অদ্বিজ হইয়া যায়, এবং দ্বিজ কর্ত্তৃক শূদ্রাতে উৎপাদিত 'দ্বিজ' হইয়া পড়ে ! অতএব 'অনন্তরা' শব্দের অর্থ অব্যবহিতানন্তরা, একান্তরা ও দ্ব্যন্তরা। এই তিন অর্থ লইয়া সকল পুত্রকেই অল্পাধিক পিতৃসদৃশ কল্পনা করা ভাল। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে 'দ্বিজৈঃ' ও 'সুতান' উভয়ত্রই বহুবচন আছে। ইহারা প্রত্যেকেই ভিন্ন জাতীয় ! তন্মধ্যে মূর্দ্ধাভিষিক্ত, অম্বষ্ঠ ও মাহিষ্য **দ্বিজ এবং পিতৃসদৃশ হইয়া** ৫ম শ্লোকের বলে **পিতৃবর্ণ** হইবে। করণ, উগ্র ও পারশব অদ্বিজ হইয়াও অনেকটা পিতৃসদৃশ হওয়ায় শূদ্রবর্ণের মধ্যে তাহাদের পরে-পরে গৌরবের তারতম্য হইবে। পারশব শ্রেষ্ঠ, উগ্র তদপেক্ষা ন্যূনতর, করণ ন্যূনতম। ধার্ম্মিক বিদুর শূদ্রবর্ণ হইয়াও বিপ্রস্বভাব হইয়াছিলেন।

কেহ কেহ বলেন, এই শ্লোকে 'স্ত্রীষু' থাকায় 'অপত্নীকে বুঝাইতেছে এবং 'মাতৃদোষ' এই উক্তি হইতে ঐ সন্দেহ দূরীভূত হয়। এই মতানুসারে পঞ্চম শ্লোকে বিবাহিত পত্নীতে জাত পুত্রদের কথা বলা হইয়া গিয়াছে এবং স্ত্রীষনন্তরজাতাসু ইত্যাদি শ্লোকে অবৈধ পুত্রদিগের কথা বলা হইয়াছে। মনু নবম অধ্যায়ে দ্বাদশ প্রকার পুত্রের কথা বলিয়াছেন, তন্মধ্যে ঔরস ও শৌদ্র বলিতেই সর্ব্বপ্রকার সবর্ণাজাত ও অনুলোমা-জাত পুত্রকেই বুঝায়। কিন্তু কানীন, সহোঢ়, পৌনর্ভব ইত্যাদির বর্ণনির্ণয় কিরূপে হয় ? তাহাদের কীদৃশ সংস্কার ? এই জন্যই ষষ্ঠ শ্লোকের অবতারণা। ইহারা যথার্থই গুরুতর মাতৃদোষে দুষ্ট। মহাভারতে দেখা যায়—

কানীনাধ্যূঢ়জৌ বাপি বিজ্ঞেয়ৌ পুত্রকিল্বিষৌ।
তাবপি স্বাবিব সুতৌ সংস্কার্য্যাবিতি নিশ্চয়ঃ ॥

কানীন ও সহোঢ় পুত্রেরও ঔরস পুত্রের ন্যায় সংস্কার হইবে। অতএব মনুও ষষ্ঠ শ্লোকে সেই কথা বলিয়াছেন, ইহা এই পক্ষের কথা।

যাহা হউক, উভয় মতানুসারেই—

ব্রাহ্মণ + ক্ষত্রিয়া = মূর্দ্ধাভিষিক্ত (ব্রাহ্মণবর্ণ)

ব্রাহ্মণ + বৈশ্যা = অম্বষ্ঠ (ব্রাহ্মণবর্ণ)

ক্ষত্রিয় + বৈশ্যা — মাহিষ্য (ক্ষত্রবর্ণ)

এই তিন্ পুত্র পিতৃসবর্ণ হইলেও (মাতার ন্যূনতা অথবা দোষ হেতু) পিতার সমশ্রেণীর হইবে না, তৎ'সদৃশ' অন্য শ্রেণীর সৃষ্টি করিবে। ভিন্ন বস্তুর মধ্যে অনেকটা অভিন্নতার আভাসকেই সাদৃশ্য বলে। ব্রাহ্মণ সন্তানদের ঐ তিনটী শ্রেণী একবর্ণান্তর্গত বলিয়া অভিন্নও বটে, এবং বিভিন্ন শ্রেণীর বলিয়া ভিন্নও বটে। এইরূপে মূর্দ্ধাভিষিক্ত অম্বষ্ঠ ও মাহিষ্য পিতৃবর্ণ বটে, কিন্তু পিতৃজাতি নহে। যাজ্ঞবল্ক্যও তাহাই বলিয়াছেন।

পরবর্ত্তী শ্লোক—

অনন্তরাসু জাতানাম্ বিধিরেষ সনাতনঃ।

দ্ব্যেকান্তরাসু জাতানাম্ ধর্ম্মং বিদ্যাৎ ইমম্ বিধিম্॥ ৭॥

কুল্লুক বলিয়াছেন, এই শ্লোকের প্রথমপংক্তি পূর্ব্ববর্ত্তী ১০।৬ শ্লোককে লক্ষ্য করিয়া এবং দ্বিতীয় পংক্তি অষ্টম শ্লোককে লক্ষ্য করিয়া। সত্যেন্দ্রবাবু ও কালীবাবুও কুল্লুকের মতাবলম্বী। জাতিতত্ত্বের লেখক বলেন দ্বিতীয় পংক্তি ষষ্ঠ শ্লোকের প্রতি লক্ষ্য করিয়া লেখা হইলে, 'ইমম্' স্থলে 'এনম্' হইত। ইহা এক পক্ষের কথা।

অপর পক্ষ বলেন, ঐ শ্লোকের দুইটী পংক্তি ষষ্ঠ শ্লোককেই লক্ষ্য করিতেছে। আর্ষ ভাষায় লৌকিক ব্যাকরণের বিধি নিষেধ অতদূর বলবৎ নহে। 'ইমম্' থাকিলেও ষষ্ঠ শ্লোককে লক্ষ্য করিতে বাধা নাই।

ইহারা বলেন দ্বিতীয় পংক্তি ৮ম শ্লোককে লক্ষ্য করিতে পারে না, কারণ ঐ শ্লোকে কোন 'বিধি' নাই। ৮ম শ্লোকটী যদি এমন হইত—

"ব্রাহ্মণাৎ বৈশ্যকন্যায়াম্ ব্রাহ্মণো নাম জায়তে।
শূদ্রস্তু শূদ্রকন্যায়াং যঃ পারশব উচ্যতে ॥ ১০,৮

তাহা হইলে 'ইমম্' অর্থে সত্যই 'বক্ষ্যমাণম্' হইত। আমরা বলি, প্রথম পক্ষের ব্যবস্থা গ্রহণ করিলে (ব্রাহ্মণ+ক্ষত্রিয়া=মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও (ক্ষত্রিয়+বৈশ্যকন্যা=) মাহিষ্যের সঙ্গে সঙ্গে (বৈশ্য+শূদ্রা=) করণও দ্বিজ হইয়া যায়! 'সুতান্' বহুবচন থাকায়, করণকে পরিত্যাগ করা চলে না। করণ দ্বিজ হইলে উৎকৃষ্টতর বীজ-প্রসূত উগ্র ও পারশবও দ্বিজ হইয়া যায়! কিন্তু "ষট্ সুতাঃ দ্বিজধর্ম্মিণঃ"—ছয়ের অধিক দ্বিজ জাতি নাই! অথচ ঐ শ্লোকের মধ্যে অম্বষ্ঠকেও চাই-ই!

দ্বিতীয় পক্ষে অর্থাৎ শ্লোকের দুই পংক্তিই ষষ্ঠ শ্লোকের প্রতি লক্ষ্য করিয়া লেখা হইয়াছে এইমত অনুসারে, ঐ শ্লোকের বলেই পারশব, উগ্র, করণ এই তিন শূদ্রাপুত্র দ্বিজ হইয়া যায়! সুতরাং 'ষট্ সুতাঃ দ্বিজধর্ম্মিণঃ' স্থলে দ্বিজধর্ম্মা ৯টী পুত্র দেখা দেয়! তবে কি এ পক্ষও সঙ্গত নয়?

আমরা বলি ৭ম শ্লোকটী সমগ্রই ষষ্ঠ শ্লোকের পূরক! ষষ্ঠ শ্লোকে 'স্ত্রী' শব্দ থাকায় শূদ্রা ভার্য্যাকে বুঝাইতে কষ্ট নাই। স্ত্রী, দ্বিজ ও সুত তিনটী শব্দই বহুবচনে আছে, এবং পুত্র 'সবর্ণ' হয় বা পিতৃবর্ণ হয় এমন কোন কথা নাই, 'সদৃশ' অর্থাৎ সাদৃশ্যযুক্ত হয়, বলা হইয়াছে মাত্র। এই সাদৃশ্য দ্বিজ হইলেও থাকিতে পারে, দ্বিজ না হইলেও থাকিতে পারে। সদৃশ দ্বিজ বলিলে পিতৃবর্ণ হইবে। সদৃশ অদ্বিজ বলিলে ব্রাহ্মণের পারশব, ক্ষত্রিয়ের উগ্র ও বৈশ্যের করণ বুঝিতে হইবে।

পিতার সহিত পুত্রের সাদৃশ্য থাকিবেই তবে কম আর বেশী। মাতা দ্বিজকন্যা হইলে ঐ সাদৃশ্য তাহাকে পিতৃবর্ণ করে (পঞ্চম শ্লোক);

কিন্তু মাতা শূদ্রা হইলে পুত্র পিতৃবর্ণ হয় না (ইহাও প্রকারান্তরে পঞ্চম শ্লোকে বলা হইয়াছে), কিন্তু পিতার সহিত যৎকিঞ্চিৎ সাদৃশ্য থাকে। এই সাদৃশ্য থাকে বলিয়াই সপ্তম যুগে ঐ শূদ্র অবিকল পিতৃবর্ণ হয় (১০।৬৪)। এই সাদৃশ্য থাকে বলিয়াই, গুণ দেখাইতে পারিলে পারশবাদি শূদ্রগণও দ্বিজ বলিয়া গণ্য হইতে পারিত (৯।২৩)।

৮ম শ্লোকে (ব্রাহ্মণ + বৈশ্যকন্যা =) পিতৃবর্ণীয় জাতিবিশেষের নাম অম্বষ্ঠ বলা হইয়াছে।

মনুর ১০ম শ্লোক পর্য্যন্ত অনুলোমজ পুত্রগণের নাম বলা হইয়াছে। ইহাদের সংখ্যা—৬ ছয়।

১১।১২।১৩ এই তিন শ্লোকে প্রতিলোমসংসর্গে যে পুত্রগণের জন্ম হয় তাহাদের নাম দেওয়া হইয়াছে। ইহাদের সংখ্যাও—৬ ছয়।

১৪শ শ্লোকে এই দ্বাদশবিধ সন্তানকে এক কথায় 'অনন্তর পুত্র' বলা হয়। অনুলোমজ পুত্র সহজ-সরলভাবে অনন্তরজ, প্রতিলোমজ পুত্র অস্বাভাবিক ও বিপরীতভাবে অনন্তরজ। যথা—

পুত্রা যেঽনন্তরস্ত্রীজা ক্রমেণোক্তা দ্বিজন্মনাম্।
তাননন্তরনাম্নস্তু মাতৃ দোষাৎ প্রচক্ষতে॥

অর্থ, উচ্চবর্ণ দ্বিজাতির দ্বারা নিম্নবর্ণা স্ত্রীতে উৎপাদিত (মূর্দ্ধাভিষিক্ত, অম্বষ্ঠ, মাহিষ্য, নিষাদ, উগ্র, করণ নামক) যে পুত্রগণের কথা মনু বলিয়াছেন, তাহাদিগকে এককথায় 'অনন্তরনামা' বলা হয়। 'অনুলোমজ' বলিলেও এই অর্থই প্রকাশিত হয়। অথবা শুধু অনুলোমজ পুত্র কেন, প্রতিলোমজ পুত্রগণকেও এই শব্দের দ্বারা বুঝান যাইতে পারে। এইরূপে দ্বিজাতিদিগের অনন্তরা স্ত্রীতে নিম্নবর্ণীয় পুরুষ দ্বারা (আয়োগব, ক্ষত্তৃ, চণ্ডাল, মাগধ, বৈদেহক, সূত নামক) যে সকল পুত্র উৎপাদিত হয়, মনুর উপদেশ মতে তাহাদিগকেও 'অনন্তরনামা' বলা চলে।

ফলতঃ;

'অনুলোম-পুত্র' বলিলে মাত্র ছয় পুত্র বুঝায়—৬

'প্রতিলোম-পুত্র' বলিলেও মাত্র ছয় পুত্র বুঝায়—৬

কিন্তু 'অনন্তর' পুত্র বলিলে এই দ্বাদশবিধ পুত্রকেই বুঝায়। সাধারণতঃ অনুলোমজদিগকে পরিচয় দিবার কালেই 'অনন্তর' পুত্র বলা হয়। মাতৃনামে ক্ষত্রিয়াপুত্র, বৈশ্যাপুত্র, শূদ্রাপুত্র ইত্যাদিও বলা চলে। 'সত্যভামাং বদেৎ ভামাং, ভীমসেনং ভীমং তথা' এই নিয়ম অনুসারে আরও সংক্ষিপ্ত করিতে হইলে তার্ক্ষ্যকে 'ত', বাসুকিকে 'ব', বলার মত, মূর্দ্ধাভিষিক্তকে ক্ষত্রিয়াপুত্র বা ক্ষত্রিয়, অম্বষ্ঠকে বৈশ্যাপুত্র বা বৈশ্য বলিলেও তাহা দোষাবহ হইবে না। উহা তাহার বর্ণ-পরিচায়ক হইবে না, কিন্তু ক্ষত্রিয়ের দৌহিত্র, বৈশ্যের দৌহিত্র—এইরূপ অর্থ প্রকাশ করিয়া ঝটিতি শ্রেণীগত পরিচয়টুকু মাত্র দিবে। ঐরূপে পরিচয় দিবার ক্ষমতা যখন মনুর বচন হইতে পাওয়া যাইতেছে, তখন তাহাতে কোন দোষ নাই। কিন্তু ক্ষত্রিয়াপুত্র, বৈশ্যাপুত্র ইত্যাদি বলা হয় বলিয়া যদি তাহাদিগকে 'মাতৃবর্ণ' মনে করা হয়, তবে সেটা মহা ভ্রম হইবে। বৌধায়নের "তাসু পুত্রাঃ সবর্ণানন্তরাসু **সবর্ণাঃ**" জাজ্বল্যমান থাকিতে মূর্দ্ধাভিষিক্তপ্রভৃতির মাতৃবর্ণত্ব কিছুতেই সিদ্ধ হইবে না। অপি চ, মনুর ঐরূপ অভিপ্রায় থাকিলে তিনি স্বচ্ছন্দে বলিতে পারিতেন, "তান্ **অনন্তরবর্ণাংস্তু** তু মাতৃদোষাৎ প্রচক্ষতে"! মনুর ভাষাজ্ঞান অবশ্যই হঠাৎ কমিয়া যায় নাই। কিন্তু এই স্ফুটার্থ শ্লোকে সত্যেন্দ্রবাবু ও কালীবাবু অনুলোমজপুত্রগণের মাতৃবর্ণত্ব খ্যাপনের সন্ধান পাইয়াছেন! 'কামী স্বতাং পশ্যতি'!

কালীবাবু বৈদ্যপুস্তকের ৭০—৮৮ পৃষ্ঠায় এবং সত্যেন্দ্রবাবু 'অম্বষ্ঠের বর্ণ নির্ণয়' অধ্যায়ে ঘোর ঘটা করিয়া বৈদ্যপ্রবোধনীকে আক্রমণ করিয়াছেন, সেই জন্য প্রত্যুত্তরেও এতগুলি কথা বলিতে হইল।

অতঃপর মনুর বাক্যার্থ বুঝিতে বোধ হয় আর তাঁহাদের সংশয় হইবে না। এক্ষণে মনুর অন্যান্য দুই চারিটী শ্লোকের আলোচনা করিব—

(১) সজাতিজানন্তরজাঃ ষট্‌ সুতা দ্বিজধর্ম্মিণঃ।

শূদ্রাণাং তু সধর্ম্মাণঃ সর্ব্বেঽপধ্বংসজাঃ স্মৃতাঃ ॥ ১০।৪১

এস্থলে মূর্দ্ধাভিষিক্ত, অম্বষ্ঠ ও মাহিষ্য এই তিনটী অনুলোমজ জাতিকে দ্বিজধর্ম্মী বলা হইয়াছে। দ্বিজের সবর্ণাগর্ভজাত সন্তান দ্বিজধর্ম্মী ত আছেই, তাহা ছাড়া এই ত্রিবিধ সন্তানও দ্বিজধর্ম্মী। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণ কন্যাতে জাতপুত্র যেমন দ্বিজধর্ম্মী অর্থাৎ দ্বিজ, মূর্দ্ধাভিষিক্ত, অম্বষ্ঠ এবং মাহিষ্যও তদ্রূপ দ্বিজধর্ম্মী অর্থাৎ দ্বিজ। কিন্তু কে কোন্ বর্ণীয় দ্বিজের ধর্ম্ম পাইয়া দ্বিজধর্ম্মী হয়, এই সংশয়ে নিজের সহজ বিবেচনা বুদ্ধির সহিত নিম্ন বাক্যটী মিলাইয়া লউন—

(২) যথা ত্রয়াণাং বর্ণানাং দ্বয়োরাত্মাস্য জায়তে।

আনন্তর্য্যাৎ স্বযোন্যাং চ তথা বাহ্যেষ্বপি ক্রমাৎ ॥ ১০।২৮

অর্থ, (ক) যেমন তিন বর্ণের মধ্যে (আনন্তর্য্যাৎ দ্বয়োঃ) অনুলোমক্রমে দুই বর্ণে অর্থাৎ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবর্ণে এবং (স্বযোন্যাং চ) নিজের জাতি যে বর্ণে উৎপন্ন হয় সেই বর্ণে অর্থাৎ ব্রাহ্মণবর্ণে ব্রাহ্মণের **আত্মাই** জন্মগ্রহণ করে, ইত্যাদি।

দ্বিতীয় পংক্তিতে 'চ' স্থানে 'তু' পাঠান্তর আছে। তৎপক্ষে অর্থ—

(খ) তিনবর্ণের মধ্যে (আনন্তর্য্যাৎ দ্বয়োঃ) অনুলোমক্রমে দুই বর্ণে (স্বযোন্যাং তু), কিন্তু ঐ দুই বর্ণ স্বযোনি হওয়া চাই, অর্থাৎ যে দুই বর্ণের সহিত যৌনসম্পর্ক শাস্ত্র বিহিত (এতদ্বারা শূদ্র বাদ পড়িল; শূদ্রবর্ণে ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হয় না; শূদ্র ব্রাহ্মণের স্বযোনি নয়) সেই দুই বর্ণে অর্থাৎ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বর্ণে ব্রাহ্মণের আত্মাই জন্ম গ্রহণ করে। ব্রাহ্মণের আত্মা অবশ্যই ব্রাহ্মণ, সে ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য হইতে পারে না। অতএব মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ। তবেই বুঝা যাইতেছে

যে, মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ পিতার ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া দ্বিজধর্ম্মী হইতেছে। [মহামহোপাধ্যায় ভরতমল্লিক 'পিতৃবত্ত্বাৎ দ্বিজঃ' বলিয়া এই কথাই বলিয়াছেন। মনু ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে ব্রাহ্মণের 'স্ব-যোনি' বলায় যাজ্ঞবল্ক্যের 'সন্তান-বর্দ্ধন' শব্দটী মনে পড়ে। পিতার সজাতি হউক, আর নাই হউক, উহারা পিতার সবর্ণ বটে।]

আর একটী শ্লোক দেখুন—

(৩) সুবীজং চৈব সুক্ষেত্রে জাতং সম্পদ্যতে যথা।
তথার্য্যাৎ জাত আর্য্যায়াং সর্ব্বং সংস্কারম্ অর্হতি ॥১০।৬৯

ভাল বীজ ভাল ক্ষেত্রে ভাল ফসলই উৎপন্ন করে। তদ্রূপ আর্য, আর্য্যাতে (প্রতিলোমক্ষেত্র ও শূদ্রক্ষেত্র বাদে শাস্ত্রানুমোদিত সবর্ণা ও অনুলোমা পত্নীতে) ভাল পুত্র অর্থাৎ পিতৃবর্ণীয় পুত্রই উৎপন্ন করে এবং সে সেই জন্য সমস্ত পিতৃবর্ণীয় সংস্কারই প্রাপ্ত হয়। সুক্ষেত্রে সুপুষ্ট ধান্য, গোধূম বা আম্রবীজ বপন করিলে ধান্য, গোধূম বা আম্রই জন্মে, ধুলি-বালু-কঙ্কর-ইষ্টক জন্মে না, তাই উপমা মুখে মনু বুঝাইয়া দিতেছেন, সুক্ষেত্রে সুবীজ হইতে যেমন পুনশ্চ বীজ রাখার উপযুক্ত সুপুষ্ট শস্য ও ফল উৎপন্ন হয়, কোনরূপে নিকৃষ্ট হয় না, বীজের গৌরব সম্পূর্ণ রক্ষিত হয়, তদ্রূপ সবর্ণা বা অনুলোমা দ্বিজা ভার্য্যাতে দ্বিজ জনকের সবর্ণ পুত্রই জন্ম গ্রহণ করে, সে পুত্র কদাচ হীনবর্ণ হয় না। সবর্ণা ভার্য্যা অনুলোমা অপেক্ষা প্রশস্ত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, এজন্য সবর্ণার পুত্র উৎকৃষ্টতম হইবে, কিন্তু অনুলোম দ্বিজা ভার্য্যাও নিন্দিত নহে পরন্তু সুক্ষেত্র। সুতরাং তাহাদের গর্ভজাত পুত্রের মাতামহের কুলগৌরব অনুসারে একটু অপকর্ষ থাকিলেও 'ব্রাহ্মণানাং জ্ঞানতো জ্যৈষ্ঠ্যম্' ব্রাহ্মণদিগের জ্ঞানানুসারেই পূজ্যাপূজ্যতা, এই নিয়ম অনুসারে ব্রাহ্মণ সমাজে শ্রেষ্ঠ আসন অধিকারও তাহার পক্ষে সম্ভব।

আচ্ছা, অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ হইলে এ শ্লোকটীর কি হইবে?—

(৪) পুত্রা যেঽনন্তরস্ত্রীজাঃ ক্রমেণোক্তা দ্বিজন্মনাম্।
তাননন্তরনাম্নস্তু মাতৃদোষাৎ প্রচক্ষতে ॥১০।১৪

ইহার অর্থ, দ্বিজগণের অনন্তরবর্ণীয়া স্ত্রীতে জাত যে সমস্ত পুত্রের কথা উপরে বলিয়াছি, তাহাদিগকে এক কথায় **অনন্তর** পুত্র বলা যাইতে পারে। বলিবার আবশ্যকতাও আছে, কারণ মনু ব্রাহ্মণ +ক্ষত্রিয়া, ক্ষত্রিয়+বৈশ্যা ও বৈশ্য+শূদ্রা হইতে যে সকল পুত্র জন্মে, **তাহাদের পৃথক্ নামকরণ করেন নাই।** অথচ দায়ভাগাদির সময়ে ইহাদের নাম অবশ্য দরকার, তাহা না হইলে ইহাদের সম্বন্ধে কথা কহাই চলে না। এই জন্য সবর্ণা-গর্ভজাত পুত্র হইতে তাহাদিগকে সহজে পৃথক্ করিয়া বুঝাইবার জন্য এই সাধারণ নামটী মনু তাহাদিগকে দিয়া বলিতেছেন যে, অনন্তর স্ত্রীতে জাত বলিয়া সকলকেই 'অনন্তর' পুত্র বলা যায়। অন্যান্য স্মৃতিতে মূর্দ্ধাভিষিক্ত, মাহিষ্য, করণ এই নামগুলির দ্বারা ঐ সংজ্ঞাটীকে আরও সুব্যক্ত করা হইয়াছে। কোন কোন স্মৃতিতে মূর্দ্ধাভিষিক্তাদি নামের পরিবর্ত্তে দায়ভাগ স্থলে 'ক্ষত্রিয়া-পুত্র', 'বৈশ্যা-পুত্র', 'শূদ্রা-পুত্র' বলা হইয়াছে। 'অনন্তরনাম্নঃ' পদটী দ্বিতীয়ার বহুবচন হইতে পারে, এ পক্ষে উহা 'তান্' পদের বিশেষণ, আবার উহাকে ল্যব্‌লোপে পঞ্চমীও করা যাইতে পারে. অর্থ হইবে 'অনন্তরম্ নাম আশ্রিত্য'। 'অনন্তর' এই সংজ্ঞা ব্যবহার করিয়া এক যোগে 'অনন্তর পুত্র' অথবা অনন্তরা মাতার নামানুসারে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া ক্ষত্রিয়া-পুত্র, বৈশ্যা-পুত্র, শূদ্রা-পুত্র ইত্যাদি বলা চলিবে। কিন্তু তাই বলিয়া তাহারা মাতৃবর্ণ হইবে, এ আশঙ্কা নিতান্ত অমূলক। পূর্ব্বেই বলিয়াছি মনু স্বচ্ছন্দে বলিতে পারিতেন—'তান্ অনন্তর-বর্ণান্ তু মাতৃদোষাৎ প্রচক্ষতে'। এই শ্লোক যদি বর্ণনির্ণায়ক হইত, তাহা হইলে মনু পরিষ্কার ভাষা ব্যবহার না করিয়া এরূপ অন্যার্থবোধক হেঁয়ালীর ভাষা ব্যবহার করিতেন না; বিশেষতঃ ঐ স্থলে যে কেবল

অনুলোমজ সন্তানদের কথা বলা হইয়াছে, তাহা নহে। প্রতিলোমজ সন্তানদের কথাও বলা হইয়াছে। সত্যেন্দ্রবাবু বলিয়াছেন, 'উক্তাঃ ময়া মন্থনা'। কিন্তু ঠিক অব্যবহিত পূর্ব্ব (১০।১৩) শ্লোকে প্রতিলোমজাত সন্তানদের কথাই বলা হইয়াছে, এবং অনুলোমে যেমন অনন্তর, একান্তর প্রভৃতি বলা যায়, প্রতিলোম পক্ষেও তদ্রূপ অনন্তর, একান্তর প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার হইতে পারে, তাহাও বলিয়াছেন। তবে মনু ১০।১৪ শ্লোকে যে কেবল অনুলোমজদিগেরই লক্ষ্য করিতেছেন, তাহা নহে। সত্যেন্দ্র বাবু ইহা দেখিয়াও দেখেন না কেন? বস্তুতঃ বর্ণ নির্ণয় করাই যদি ১০।১৪ শ্লোকের উদ্দেশ্য হয়, তবে মূর্দ্ধাভিষিক্ত ক্ষত্রিয়বর্ণ ও অম্বষ্ঠ বৈশ্য-বর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ১০।৪১ শ্লোককে ব্যর্থ করিয়া চণ্ডাল ব্রাহ্মণবর্ণ, সূত ব্রাহ্মণবর্ণ, বৈদেহক ব্রাহ্মণবর্ণ, ক্ষত্তৃ ক্ষত্রিয়বর্ণ, মাগধ ক্ষত্রিয়বর্ণ এবং আয়োগব বৈশ্যবর্ণ হইয়া পড়ে !! অতএব অনন্তরা, একান্তরা, দ্ব্যন্তরা স্ত্রীতে উৎপন্ন বলিয়া ঐ স্ত্রীর পৈতৃক বর্ণই তদীয় সন্তানের বর্ণ হইবে; কিন্তু ইহা মনুর অভিপ্রেত নহে।

অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ হইলে অম্বষ্ঠকন্যাও ব্রাহ্মণকন্যা, তবে মনু কেন বলিলেন, ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক অম্বষ্ঠকন্যাতে উৎপাদিত পুত্র 'আভীর'?

(৫) ব্রাহ্মণাৎ উগ্রকন্যায়াম্ আবৃতো নাম জায়তে।
আভীরোঽম্বষ্ঠকন্যায়াম্ আয়োগব্যাং তু ধিগ্বণঃ ॥১০।১৫

* 'অনন্তরনামা' হইবে, এই বিধান বলেই অনুলোমজ পুত্রগণকে 'অনন্তর পুত্র' 'অনন্তর সন্তান' বলা যাইতে পারে। মনু এই পরিভাষা না করিয়া দিলে আমাদিগের পক্ষে বিলক্ষণ অসুবিধা হইত। সত্যেন্দ্রবাবু এই পরিভাষা স্বীকার করেন না, অথচ 'অনন্তরার পুত্র' অর্থে ব্যবহারের সময় বেশ অম্লানবদনে ব্যবহার করিয়াছেন। যথা, পৃঃ ১৩—'বৌধায়ন এবং অপর কেহ কেহ 'অনন্তর পুত্র'কে পিতৃ সবর্ণ বলিয়াছেন'; পৃঃ ১৫—"অনন্তর পুত্রগণ পিতার সবর্ণ", "অনন্তর সন্তানের ভাগ্যের হ্রাসবৃদ্ধির সহিত'—পৃঃ ৩০ ইত্যাদি।

এস্থলে তিনরূপ মীমাংসা হইতে পারে—

(ক) ইহা অবৈধ সংযোগে উৎপন্ন পুত্র পক্ষে। [প্রতিলোমজ আয়োগবের কন্যাকে বিবাহ করা সম্ভব নহে। এজন্য তৎসহ উল্লিখিত উগ্রকন্যাকে ও অম্বষ্ঠকন্যাকেও বিবাহ করার কথা এস্থলে বলা হয় নাই। ব্রাহ্মণ কর্তৃক চৌর্য্যক্রমে ক্ষত্রিয়াতে বা বৈশ্যাতে উৎপাদিত পুত্রের পৃথক্ নাম অন্য সংহিতায় পাওয়া যায়। সুতরাং ইহাতে বিস্ময়ের কারণ নাই। ব্রাহ্মণ যথাবিধি অম্বষ্ঠকন্যাকে বিবাহ করিলে, তাহার পুত্র ব্রাহ্মণবর্ণই হইত, কারণ, সহজ বুদ্ধিতেও অম্বষ্ঠ অপেক্ষা তাহার ব্রাহ্মণ্যের দাবী অধিক বুঝা যায়!]

(খ) এই 'আভীর' ব্রাহ্মণবর্ণীয় কোন প্রাচীন জাতি। ইহা অধুনা আভীর নামে প্রসিদ্ধ গোপজাতি নহে।

(গ) আয়োগবী অর্থাৎ শূদ্র কর্তৃক বৈশ্যাতে উৎপাদিত আয়োগবের কন্যা এবং উগ্রকন্যার পার্শ্বে ক্ষত্তৃকন্যা, চণ্ডালকন্যা, করণকন্যা বা পারশবের কন্যার উল্লেখই মানায়। দ্বিজ অম্বষ্ঠের কন্যাকে এরূপ ভাবে উল্লেখ করা নিতান্তই অসঙ্গত। অম্বষ্ঠকন্যার এ স্থানই নয়। এ যেন কে প্রক্ষিপ্ত করিয়াছে! আয়োগব-কন্যাকে বিবাহ করা যায় না, তথাপি সে এবং তাহার ন্যায় অন্যেরাও কি ব্রাহ্মণের লোলুপ দৃষ্টি হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিত না? কিন্তু প্রক্ষিপ্ত বলিবার বিশেষ কারণ নিম্নে রহিয়াছে। ১৬ ও ১৭ সংখ্যক শ্লোকে যাহা আছে, তাহা অবিকল ১১ ১২ ও ১৩ শ্লোকে আছে। কেন এরূপ হইল? একই বস্তু দুইবার লেখা হয় কেন? কোন্ শ্লোকগুলি প্রক্ষিপ্ত? একটু দেখিলেই বুঝা যাইবে? মনু তিন প্রকার অপসদ পুত্রের কথা বলিয়াছেন, ১০ম শ্লোকে এক প্রকার, ১৬শ শ্লোকে দ্বিতীয় প্রকার এবং ১৭শ শ্লোকে তৃতীয় প্রকার। এজন্য বিবেচনা হয় যে ১০ম শ্লোকের পরেই ১৬শ ও ১৭শ শ্লোক ছিল এবং মধ্যবর্ত্তী ১১।১২।১৩।১৪।১৫ শ্লোক প্রক্ষিপ্ত। যাহা হউক, একথা বলিয়া

আমরা সত্যেন্দ্র বাবুর বা কালীবাবুর উদ্বেগ-অশান্তি বাড়াইতে চাহি না। এটুকু তাঁহাদের জন্য লিখিত নহে! তাঁহারা (ক) ও (খ) চিহ্নিত পক্ষ দুইটী আশ্রয় করিলেই সুখী হইব।

মনু, যাজ্ঞবল্ক্য ও ব্যাস—এই সংহিতাত্রয় হইতে মন্বাদির অভিপ্রায় সুব্যক্ত করা হইয়াছে। ইহাই প্রাচীন ও সনাতন শাস্ত্রসিদ্ধান্ত। পরবর্ত্তী যুগে সমুদ্র-যাত্রা, ক্ষেত্রজ-পুত্রোৎপাদন, অশ্বমেধ প্রভৃতি যেমন অবৈধ পরিগণিত হইয়াছিল, অসবর্ণ বিবাহও তদ্রূপ প্রশংসার কেন্দ্র হইতে সরিতে সরিতে কালক্রমে প্রশস্ত কার্য্যাবলীর গণ্ডী ছড়াইয়া বাহিরে চলিয়া যাওয়ায় সমাজে অচল ও অবৈধ গণ্য হইয়াছিল। তাহার সাক্ষ্য অমরকোষের উক্তি। অমরকোষে অম্বষ্ঠকে বর্ণসঙ্কর অর্থাৎ অবৈধ পুত্র ও শূদ্র বর্ণ বলা হইয়াছে। অমরের ন্যায় অর্ব্বাচীন কোন কোন পুরাণ বা স্মৃতিতে এটা-ওটার সম্বন্ধে প্রাচীন ব্যবস্থার পরিবর্ত্তে তদানীন্তন লোক-ব্যবহার অনুযায়ী উক্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে। সেগুলিকে যেমন মন্বাদির প্রদত্ত ব্যবস্থা বলা যাইতে পারে না, অম্বষ্ঠ সম্বন্ধেও তদীয় মন্তব্যকে তদ্রূপ বলা যায় না। এই জন্যই শাস্ত্রে আছে—

"মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতি র্ন প্রশস্যতে।"

মনুর বিপরীত-বাদিনী কোন স্মৃতিই প্রশস্ত প্রমাণ বলিয়া গণ্য নহে। কারণ—

"বেদার্থোপনিবদ্ধত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতম্"

প্রাচীন স্মৃতি বলিয়া মনুতেই বেদের অভিপ্রেত অর্থ সম্যক্‌রূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে; উহাতেই বেদানুকূল ধর্ম্ম ও সদাচার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। উত্তর কালের স্মৃতিতে বৈদিক সদাচারের কালোচিত পরিবর্ত্তন প্রায় দেখা যায়। কিন্তু বেদানুমোদিত ব্যবস্থা জানিতে হইলে বেদ-বিশ্বাসী সনাতনমার্গীদিগকে মনু এবং মনুর অবিরোধী শাস্ত্রবাক্যেরই শরণাপন্ন হইতে হয়। অতএব সেদিনকার অগ্নিপুরাণ ও বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর

যে বলিয়াছেন "আনুলোম্যেন বর্ণানাং জাতিঃ মাতৃসমা স্মৃতা" (বৈঃ প্রতিঃ ক্রোড়পত্র), তাহা মনু বা বেদের বিরুদ্ধ বলিয়াই অশ্রদ্ধেয়। অথবা যদি পুরাণের গৌরব রক্ষা করিতে হয় তবে উহাকে অন্যরূপে ব্যাখ্যা করিতে হয়। তাহা আমরা বিষ্ণুর বচন ব্যাখ্যাকালে দেখাইব। চাণক্য তদানীন্তনকালে জাত অম্বষ্ঠকে পিতার অসবর্ণ দেখিয়া, হয় সমসাময়িক অমরের ন্যায় মন্বাদির বিরুদ্ধ কথা কহিয়াছেন, অথবা বলিতে হয় নঞ্ শব্দ অল্পার্থে ব্যবহার করিয়া মূর্দ্ধাভিষিক্ত অপেক্ষা সবর্ণ অম্বষ্ঠের সাধারণ অপকর্ষের কথাই বলিয়াছেন। মন্বাদির সময়ে অম্বষ্ঠ পিতার স্বশ্রেণীর না হইলেও পিতার সবর্ণ হইত। কিন্তু চাণক্যের সময়ে অম্বষ্ঠ পিতার সবর্ণ বলিয়া গণ্য না হওয়ায় তিনি তাহাকে 'অসবর্ণ' বলিয়াছেন এবং অমর আরও পরিষ্কার করিয়া বর্ণসঙ্কর ও শূদ্র বলিয়াছেন। বস্তুতঃ অমরের অভিধান বা চাণক্যের (কৌটিল্যের) অর্থশাস্ত্র তৎকালের জন্যই লিখিত এবং তৎ সময়ের বিধি-ব্যবস্থার দ্বারা প্রভাবিত। উহা হইতে আর্যযুগের আচার ব্যবহার কিরূপ ছিল, বা আর্যযুগে অম্বষ্ঠের সামাজিক প্রতিষ্ঠা কিরূপ ছিল, তাহা জানা যায় না।

বস্তুতঃ কালীবাবু ও সত্যেন্দ্রবাবু শাস্ত্রমর্ম্ম বুঝিতে গিয়া আপনাদের চক্ষু-কর্ণ ও বুদ্ধিবৃত্তির অস্তিত্বের কোনরূপ প্রমাণ দেন নাই! সত্যেন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন—"পণ্ডিত মহাশয়ের (যাজন-ব্রাহ্মণের) হয় ত সেরূপ শাস্ত্রালোচনা নাই, অথবা স্মৃতিশাস্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা নাই। অথবা, স্মৃতির অন্যান্য বিষয় আলোচনা করিলেও ঠিক এই বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা নাই। কাজেই তিনি সদুত্তর দিতে পারেন না। আমরা মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতকেও এ সম্বন্ধে অজ্ঞ দেখিয়াছি। ঐ মহামহোপাধ্যায় যদি স্মৃতি শাস্ত্রের পণ্ডিত না হইয়া অন্য কোনও শাস্ত্রের পণ্ডিত হন, তবে ত একথা অধিকতর সত্য।" (বৈঃ-প্রতিঃ, পৃঃ ।৹)

অন্যত্র লিখিয়াছেন—"গঙ্গাধর যাহা বলিবেন বা করিবেন তাহাই

যে নিশ্চয়ই অভ্রান্ত তাহা আমি স্বীকার করি না। শাস্ত্র রহিয়াছেন, ভগবান্ আমাদিগকে চক্ষু কর্ণ দিয়াছেন। আমরা নিজেরাও সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া তত্ত্ব নির্ণয় করিতে অধিকারী" (পৃঃ ৩৯)

দুঃখের বিষয় এই যে, সর্ব্বত্রই স্বজাতীয় পণ্ডিতদের প্রতি এইরূপ একটা দারুণ অবজ্ঞা ও যে সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে 'অজ্ঞ' বলিয়া certificate দিয়াছেন, তাহাদেরই পদাবলেহিতা ব্যতীত সত্যেন্দ্রবাবু ও কালীবাবুর পুস্তকে সত্যপ্রিয়তা বা প্রকৃত অনুসন্ধিৎসা কোথাও দেখিতে পাই না, এবং চক্ষু কর্ণ আছে বলিয়া ঘোষণা করিলেও আমরা সত্যেন্দ্রবাবুর কথায় সন্দিহান হইয়া পড়ি। পদে পদে ঐ 'অজ্ঞ পণ্ডিত মহাশয়'দিগের দ্বারা চালিত হইয়া কালীবাবু ও সত্যেন্দ্রবাবু বৈদ্যকে অম্বষ্ঠ জাতি মনে করিয়াছেন এবং অজ্ঞপণ্ডিতদের কেহ কেহ অম্বষ্ঠকে অনুগ্রহ করিয়া মাতৃবর্ণ বলেন বলিয়া অম্বষ্ঠকে মাতৃবর্ণও বলিয়াছেন! চাণক্য ব্যবহার শাস্ত্রে অম্বষ্ঠকে পিতার অসবর্ণ বলিয়াছেন, তাহা সত্যেন্দ্রবাবুর অতীব মনঃপূত হইয়াছে, এবং কোন কোন পণ্ডিত মহাশয় অমর-কোষের প্রামাণ্যে অম্বষ্ঠকে বর্ণসঙ্কর বলেন বলিয়া তাহাও গা-সওয়া করিয়া লইয়াছেন। ফলে কালীবাবুর ও সত্যেন্দ্র বাবুর খিচূড়ী-সিদ্ধান্ত এই যে, অম্বষ্ঠের মাতা কামপত্নী, অম্বষ্ঠ সঙ্কীর্ণ জাতি, মাতৃবর্ণ, এবং 'পারিভাষিক বৈশ্য' বা 'অম্বষ্ঠবর্ণ বৈশ্য' (বৈদ্য পৃঃ ২৮, ৭৮ ; বৈঃ প্রতিঃ ৪১ ইত্যাদি) ভট্টপল্লীর পঞ্চানন, জাতিতত্ত্বের শ্যামাচরণ ও ঐ জাতীয় অন্যান্য ব্যক্তিদিগের মতে মূর্দ্ধাভিষিক্ত ব্রাহ্মণ, কিন্তু অম্বষ্ঠ বৈশ্য! কিন্তু এমতে বিষ্ণুর 'অনুলোমাসু মাতৃবর্ণাঃ' ও অগ্নি-পুরাণের 'আনুলোম্যেন বর্ণানাং জাতি র্মাতৃসমা স্মৃতা' এই বচনের কি দশা হইবে? কেবলমাত্র বৈদ্যব্রাহ্মণ সমিতির ব্যাখ্যা অনুসারেই মূর্দ্ধাভিষিক্ত মাতৃবর্ণ হইয়াও ব্রাহ্মণ হইতে পারে। কিন্তু তাহা কালীবাবু ও সত্যেন্দ্র বাবুর অগ্রাহ্য, কারণ তাহা দ্বারা অম্বষ্ঠেরও ব্রাহ্মণত্ব স্বীকৃত হইয়া

পড়ে! এই জন্য তাঁহাদের সম্মুখে দুই সেট শাস্ত্র বাক্য—এক সেট অনুসারে মূর্দ্ধাভিষিক্ত ব্রাহ্মণ, অপর সেট অনুসারে মাতৃবর্ণ অর্থাৎ ক্ষত্রিয়! এই অসামঞ্জস্য দূর করিতে না পারিয়া সত্যেন্দ্রবাবু উভয় বাক্যকেই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। ফলে মূর্দ্ধাভিষিক্ত কখনও ব্রাহ্মণ কখনও ক্ষত্রিয়; মাহিষ্য কখনও ক্ষত্রিয় কখনও বৈশ্য, করণ কখনও বৈশ্য কখনও শূদ্র, ইহাই সত্যেন্দ্র বাবুর অপূর্ব্ব শাস্ত্র সিদ্ধান্ত! সমাজে তাহারা আজ পিতৃবৎ শ্রাদ্ধাদি করিবে, কাল মাতামহবৎ করিবে! কিন্তু অম্বষ্ঠের ভাগ্য সেরূপ নহে! সত্যেন্দ্রবাবু বলিতেছেন—"অনন্তর সন্তানের (মূর্দ্ধাভিষিক্ত, মাহিষ্য ও করণের) ভাগ্যের হ্রাস বৃদ্ধির সহিত একান্তরগণের (যথা, অম্বষ্ঠের) বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই" (বৈঃ-প্রতিঃ পৃঃ ৩০)!!

সপ্তম প্রমাণ

সত্যেন্দ্রবাবুর মতে গৌতম ও বৌধায়ন ঋষি তাঁহার সপক্ষ। এক্ষণে আমরা এই ঋষিবাক্যগুলিকে পরীক্ষা করিব। সত্যেন্দ্র বাবুর কথায় গৌতম ও বৌধায়নের মতে মূর্দ্ধাভিষিক্ত ব্রাহ্মণবর্ণ কিন্তু অম্বষ্ঠ বৈশ্যবর্ণ! আমরা মনু-যাজ্ঞবল্ক্য-ব্যাসের কথা ছাড়িয়া দিতেছি, কিন্তু বিষ্ণুর সহিতই কি এই অভিনব সিদ্ধান্তের সামঞ্জস্য আছে? বিষ্ণু বলিয়াছেন—

'অনুলোমাসু মাতৃবর্ণাঃ' বৈঃ-প্রতিঃ পৃঃ ১১)

সত্যেন্দ্রবাবু ও কালীবাবুর মতে বিষ্ণুই ঠিক কথা এবং স্পষ্ট কথা বলিয়াছেন, উহা এই যে অনুলোমজাতেরা মাতৃবর্ণ। কিন্তু তাহা হইলে গৌতম ও বৌধায়ন টিকে কি করিয়া?

আমরা বলি আমরা মনু, যাজ্ঞবল্ক্য ও ব্যাস বচনের যে স্বাভাবিক সহজ ও সরল অর্থ করিয়াছি, তাহার সহিত বিষ্ণু বাক্যের কোনই বিরোধ নাই। গৌতম ও বৌধায়নের বিচার পরে হইবে।

আমাদের প্রতিপক্ষগণ অনুলোমজ সন্তানকে মাতৃবর্ণ বলিতে চাহেন। বিষ্ণুর "অনুলোমাসু মাতৃবর্ণাঃ"ই তাঁহাদের ব্রহ্মাস্ত্র! কিন্তু এই বচনকে যদি মানা যায় তবে মূর্দ্ধাভিষিক্তকে মাতৃবর্ণ না বলিয়া পিতৃবর্ণ কেন বলা হয়? শ্রীযুক্ত কৌটিল্য মহাশয়ই বা বিষ্ণুর বিরুদ্ধে দাঁড়ান কোন্ সাহসে? কৌটিল্যের সম্মুখে অগ্নিবচনও যে একেবারেই নিস্তেজ! বৃহদ্ধর্ম্মোত্তরের মুখেও বুঝি কোন প্রশ্নোত্তর নাই! ব্যাস-সংহিতায় অম্বষ্ঠ ও মূর্দ্ধাভিষিক্তের এক যাত্রায় একরূপ ফলের কথাই দেখা যায়, মনু এবং যাজ্ঞবল্ক্যও তাহাই বলিয়াছেন, **বিষ্ণুও বলিয়াছেন, এক যাত্রায় ভিন্ন ফল হইবে না,** তবে সত্যেন্দ্রবাবু মূর্দ্ধাভিষিক্তকে পিতার ঔরস পুত্র ও অম্বষ্ঠকে অবৈধ পুত্র কেন বলেন? মূর্দ্ধাভিষিক্তজননী ধর্ম্মপত্নী এবং অম্বষ্ঠজননী ঔরস পুত্রের জননী ও ধর্ম্মপত্নী হইলেও কামপত্নী, ইহাই কি সত্যেন্দ্র বাবুর অপূর্ব্ব শাস্ত্রসিদ্ধান্ত?

মন্বাদির সহিত বিষ্ণুবচনের যে কোন বিরোধ নাই, তাহা আমরা দেখাইতেছি। বিষ্ণুবচনে মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও অম্বষ্ঠকে মাতৃবর্ণ বলা হইয়াছে, মাতামহবর্ণ বলা হয় নাই। পতিপত্নীর মধ্যে বর্ণগত পার্থক্য বিদ্যমান থাকে না। এজন্য বিবাহস্থলে 'মাতৃবর্ণ' হইতেই 'পিতৃবর্ণ' অর্থ পাওয়া যাইতেছে। প্রশ্ন হইতে পারে, তবে এস্থলে 'পিতৃবর্ণ' বলা হয় নাই কেন? তাহার উত্তর এই যে, ব্রাহ্মণের বিবাহিতা শূদ্রকন্যা শূদ্রই থাকে। তাহার পুত্র মাতৃবর্ণ অর্থাৎ শূদ্রই হয়, পিতৃবর্ণ বা ব্রাহ্মণ হয় না। [ক্ষেত্রজ পুত্রও মাতৃবর্ণ হয়। এইরূপে দেখা যাইতেছে যে, সর্ব্বপ্রকার বৈধ পুত্রকেই মাতৃবর্ণ বলা যাইতে পারে। বিষ্ণুর বাক্যটী সূত্রাকারে সংক্ষেপে লেখা হইয়াছে। সূত্র রচনার উদ্দেশ্যই এই যে অল্প কথায় বহু অর্থ সুপ্রকাশিত হয়।] সুতরাং বিষ্ণুবাক্য মনু-যাজ্ঞবল্ক্য ও ব্যাসের অনুসরণ করিতেছে, বিরোধিতা করিতেছে না। এই প্রসঙ্গে

সত্যেন্দ্রবাবু ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক রাক্ষসীতে উৎপাদিত পুত্র (রাবণ) রাক্ষস হইয়াছিল, এই প্রমাণে বৈধ অনুলোম বিবাহোৎপন্ন পুত্রকে অবৈধ কানীনাদির শ্রেণীভুক্ত করিয়া মাতৃবর্ণ ঠিক করিয়াছেন! বস্তুতঃ সত্যেন্দ্রবাবু যে অদ্ভুত কথা শাস্ত্র প্রমাণ বলিয়া তুলিয়াছেন তাহা দেখিয়া হাস্য সম্বরণ করা দুঃসাধ্য। তিনি বলিয়াছেন—"মাতামহস্য দোষেণ রাক্ষসোঽভূদ্দশাননঃ" (বৈ৹ প্রতি৹ পৃঃ ৩৹), কিন্তু এরূপ কথা হিড়িম্বা-পুত্র ঘটোৎকচের মুখেই শোভা পায়! উৎপাদকের সহিত মাতার হিড়িম্বা অপেক্ষা নিকটতর সম্পর্ক থাকিলে ঐরূপ শাস্ত্র বাক্য কেহই মুখে আনিতে পারিবে না!

যে ব্যাখ্যা প্রণালী আর্য্যশাস্ত্রের অবিরোধী এবং পৃথিবীর তাবৎ মনুষ্যসমাজের হৃদ্য, যাহা আর্য্যশাস্ত্রেই সুস্পষ্ট অভিব্যক্ত, আমরা তাহার অনুসরণ করিয়াই বিষ্ণুবাক্যের আপাত-বিরোধের মীমাংসা করিলাম। অগ্নিপুরাণ ও বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরের কথা যাহা সত্যেন্দ্রবাবু ক্রোড়পত্রে লিখিয়াছেন, তাহাও বিষ্ণুর অনুগামী হওয়ায় মীমাংসিত হইল। এক্ষণে মনু-যাজ্ঞবল্ক্য-ব্যাস-বিষ্ণুর বিরুদ্ধে কে দণ্ডায়মান হইবে?

সত্যেন্দ্রবাবু জানিয়া শুনিয়া 'অজ্ঞ পণ্ডিত মহাশয়'দিগের অন্ধ অনুসরণ করিতে গিয়া মোহগর্ত্তে এমন ডুবিয়াছেন যে তাঁহাকে তোলাই দায়। এতদবস্থায় যে কৌটিল্য-বচন তাঁহার নয়নপথের পথিক হইয়াছে তাহাকেই তিনি অনুলোমজ পুত্রের বর্ণনির্ণয়ে জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ মনে করিতেছেন! তাহাকে বজায় রাখিয়া অপর শাস্ত্রের ব্যাখ্যায় অগ্রসর হওয়ায় কৌটিল্য অপেক্ষা অধিকতর কুটিলতা দেখাইতে হইয়াছে! ব্যাসের বচনগুলিকে কৌটিল্যের অনুকূল দেখাইতে গিয়া 'সম' বা 'সমান' অর্থ করিতে হইয়াছে 'অসমান, 'ব্রাহ্মণ' অর্থ বলিতে হইয়াছে 'বৈশ্য', 'না'র অর্থ করিতে হইয়াছে 'হাঁ', 'অনুলোম' অর্থ করা হইয়াছে 'সবর্ণ', 'সবর্ণ' অর্থ করিতে হইয়াছে 'অসবর্ণ'!

সার্কাসের খেলওয়াড়দিগের মত এমন ঘন ঘন ডিগ্‌বাজি খাওয়া অপেক্ষা বৈশ্যব্রাহ্মণ-সমিতির কৃত অর্থের অনুসরণ করিলে, তাঁহাকে বিদ্বৎসমাজে আজ হাস্যাস্পদ হইতে হইত না। তিনি সংস্কৃতজ্ঞ এবং পণ্ডিত ইহা সকলেই স্বীকার করে, কিন্তু সত্যের সহিত বিরোধিতা করিতে গিয়াই আজ তাঁহার এই দুর্গতি। সত্যকে পরাজয় করিয়া সত্যেন্দ্র নাম সার্থক হয় না, অসত্যকে পরিহার করিতে পারিলেই তিনি সার্থকনামা হইবেন।

পাঠক দেখিবেন, আমরা কুত্রাপি কোন শব্দের অর্থ লইয়া অনর্থের সৃষ্টি করি নাই, সর্ব্বত্রই সহজ সরল ভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যাখ্যা দ্বারা শাস্ত্রার্থ প্রকাশ করিয়াছি।

আমাদের কৃত অর্থে মনু-যাজ্ঞবল্ক্য-ব্যাস-বিষ্ণুর বিরোধ নাই। সুতরাং বিষ্ণুর অনুগামী অগ্নিপুরাণ ও বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরের সহিতও বিরোধ নাই। সত্যেন্দ্রবাবু ও কালীবাবু যেমন বিষ্ণুবাক্যের প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করিতে পারেন নাই, কোন প্রাচীন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতও হয়ত তদ্রূপ না পারিয়া অগ্নিপুরাণে ও বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ঐ সকল লিখিয়া থাকিবেন, কিন্তু আমরা উহাদের গৌরব রক্ষা করিয়া সামঞ্জস্য দেখাইলাম। সুতরাং স্মৃতিবাক্যের অর্থ যে তাহাতে উল্টাইয়া যাইবে না, ইহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। এক্ষণে গৌতম ও বৌধায়নের আলোচনা করিলেই হয়।

অষ্টম প্রমাণ

গৌতম বলিয়াছেন, 'অনুলোমানন্তরৈকান্তরদ্ব্যন্তরাসু জাতাঃ সবর্ণাম্বষ্ঠোগ্রনিষাদদৌষ্মন্তপারশবাঃ—৪অঃ (বৈ° প্রতি° ক্রোড়পত্র)। এই সূত্রে সবর্ণা ভার্য্যার কথাই নাই। সম্ভবতঃ সবর্ণা ভার্য্যার সন্তান সবর্ণ হইবে ধরিয়া লইয়া অসবর্ণা ভার্য্যাদিগের সন্তান কীদৃশ হইবে, তাহাই এস্থলে বলা হইয়াছে। কিন্তু চারি বর্ণের চারি সবর্ণা ভার্য্যাকে ছাড়িয়া দিলে, অনুলোমা ছয়টী মাত্র ভার্য্যা অবশিষ্ট থাকে, যথা—

(১) ব্রাহ্মণ+ক্ষত্রিয়া

(২) ব্রাহ্মণ+বৈশ্যা

(৩) ব্রাহ্মণ+শূদ্রা

(৪) ক্ষত্রিয়+বৈশ্যা

(৫) ক্ষত্রিয়+শূদ্রা

(৬) বৈশ্য+শূদ্রা

ইহাদের মধ্যে সূত্রমর্ম্মানুসারে (বৈশ্য+শূদ্রা=) করণ পিতৃবর্ণ বা বৈশ্য! অপিচ (১) (৪) ও (৬) পিতার 'সবর্ণ' বলিয়া বাদ গেলে অবশিষ্ট তিনটি মাত্র রহিতেছে—(২), (৩) ও (৫)। কিন্তু গৌতমসূত্রে ঐ তিনটী নামের পরিবর্ত্তে **পাঁচটী** নাম রহিয়াছে, অতএব সমস্ত বচনটীই অশ্রদ্ধেয় হইয়া পড়িতেছে। তদুপরি 'নিষাদ' ও 'পারশব' মনুর মতে একই শ্রেণীর নাম। তবে ঐ দুইটী নামই সূত্র মধ্যে কি জন্য উল্লিখিত হইয়াছে, 'দৌষ্মন্ত'ই বা কে—তাহা বুঝা মনুষ্য বুদ্ধির অতীত! কেহ কেহ বলেন, 'অম্বষ্ঠ', 'উগ্র' প্রভৃতি যেমন জাতিবিশেষের নাম, ব্রাহ্মণ+ক্ষত্রিয়া হইতে জাত পুত্রের নামও তদ্রূপ 'সবর্ণ' বা 'সুবর্ণ' হইতে পারে। 'সুবর্ণ' এই নাম স্মৃত্যন্তরে দেখিতে পাওয়া যায়, সুতরাং এই মত একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। বিষ্ণুসংহিতার 'সবর্ণ' শব্দের ন্যায় গৌতমের 'সবর্ণ' শব্দ সমানবর্ণত্বের বাচক নহে, উহা সুবর্ণ-শব্দেরই বিকৃতি, ইহা বলিলে সত্যেন্দ্রবাবুর অপেক্ষা অধিক জবরদস্তিও হয় না, অথচ ঐ সংখ্যাধিক্যের একটা কিনারা হইয়া যায়, যথা—

ব্রাহ্মণ+ক্ষত্রিয়া=সবর্ণ বা সুবর্ণ
ব্রাহ্মণ+বৈশ্যা=অম্বষ্ঠ
ব্রাহ্মণ+শূদ্রা=নিষাদ
ক্ষত্রিয়+বৈশ্যা=দৌষ্মন্ত (অন্যত্র মাহিষ্য)
ক্ষত্রিয়+শূদ্রা=উগ্র
বৈশ্য+শূদ্রা=পারশব (প্রকৃত সংজ্ঞা 'করণ')

অতএব বলিতে হয় এই সূত্রে কোনও পুত্রের বর্ণের কথা হয় নাই। সবর্ণ বা সুবর্ণ একটা নাম মাত্র। ইহাদের বর্ণ কেমন করিয়া জানা যাইবে? অবশ্য মনু-যাজ্ঞবল্ক্য-ব্যাস-বিষ্ণুর বচন অনুসারে। অতএব অম্বষ্ঠের ব্রাহ্মণবর্ণত্বের কোন হানি হইল না। এরূপ অর্থ না করিতে চাহিলে, অনন্তর পুত্র 'করণ' বৈশ্যবর্ণ হইবে এবং সূত্রে আপত্তিজনক সংখ্যাধিক্য হইতে সূত্রটীই মাটী হইয়া যাইবে।

নবম প্রমাণ

সত্যেন্দ্রবাবুর গৌতম বাক্য মনু-যাজ্ঞবল্ক্য-ব্যাস-বিষ্ণুর বিরোধী হইল না। এক্ষণে অবশিষ্ট বৌধায়ন বাক্য। বৌধায়ন বলিতেছেন—

"তাসু সবর্ণান্তরাসু সবর্ণাঃ। একান্তরদ্ব্যন্তরাসু অম্বষ্ঠোগ্রনিষাদাঃ।"

সত্যেন্দ্রবাবু বলেন, ইহার প্রকৃত অর্থ এই যে সবর্ণাতে এবং অব্যবহিত অনন্তরাতে জাত পুত্র (**করণও**) পিতার সুবর্ণ। একান্তরা ও দ্ব্যন্তরা স্ত্রীতে যাহারা জন্মে তাহাদের নাম যথাক্রমে অম্বষ্ঠ, উগ্র, নিষাদ। অতএব অম্বষ্ঠ পিতৃসবর্ণ নহে।

আমরা বলি অম্বষ্ঠ পিতৃসবর্ণ নহে, এ কথা সূত্রে নাই! সকল শাস্ত্রেরই ত সুমীমাংসা হইয়া গিয়াছে, সকল শাস্ত্রই একবাক্যে বলিতেছে অম্বষ্ঠ পিতৃসবর্ণ। এই মতের বিরুদ্ধে বৌধায়নকে আশ্রয় করিয়াছ, কিন্তু বৌধায়ন অম্বষ্ঠকে কোন্ বর্ণ বলিলেন? উগ্র নিষাদেরই বা কোন্ বর্ণ? তোমার ব্যাখ্যা অনুসারে বৌধায়ন বর্ণ সম্বন্ধে একেবারে নির্ব্বাক্, অথচ বলিবে বৌধায়নের মতে উহারা 'মাতৃবর্ণ'?

আমরা বৌধায়নবাক্যের এইরূপ অর্থ করি—

সবর্ণা এবং অনন্তরা অর্থাৎ অব্যবহিতানন্তরা, একান্তরা ও দ্ব্যন্তরা— সকল স্ত্রীতে জাত সন্তান 'সবর্ণ' হয়। তন্মধ্যে অনন্তরা স্ত্রীতে জাত সন্তানদের পৃথক নামের প্রয়োজন হয় না, (কারণ তাহারা প্রায়

পিতার জাতিতে বা শ্রেণীতে মিশিয়া যাইত), একান্তরাতে জাত পুত্রের নাম অম্বষ্ঠ ও উগ্র এবং দ্ব্যন্তরাতে জাত পুত্রের নাম নিষাদ। দুইটী সূত্র পরস্পর হইতে পৃথক। প্রথমটীতে সকলের 'বর্ণ কি তাহা বলা হইল, দ্বিতীয়টীতে তাহাদের নাম কি তাহাই বলা হইল। এমন মনে করিতে হইবে না যে, প্রথমটীতে সবর্ণা ও অব্যবহিতানন্তরাতে জাত পুত্রেরই কথা হইয়াছে, এবং সেই জন্য অবশিষ্ট পুত্রদের কথা দ্বিতীয় সূত্রে বলা হইয়াছে। সত্যেন্দ্রবাবু এই ভুল করিয়া মনুর সহিত বিরোধ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং বাক্য দুইটীকে নিস্ফল করিয়াছেন।

এস্থলে আমরা অনন্তরা শব্দের অর্থ অব্যবহিতানন্তরা, একান্তরা ও দ্ব্যন্তরা করিতে চাই। সত্যেন্দ্রবাবু বৈ০ প্রতি০ ৯ পৃষ্ঠায় 'পুত্রা যেঽনন্তরস্ত্রীজাঃ' (মনু ১০।১৪) স্থলে ঐরূপ অর্থ স্বীকার করিয়াছেন। মনুর ১০।৪১ শ্লোকে 'সজাতিজানন্তরজাঃ' স্থলেও ঐ অর্থ অনেকটা সুপ্রকাশ। সুতরাং আমরা কোন উদ্ভট অর্থ করিলাম না। এরূপ অর্থ কুল্লূকাদিও অনুমোদন করিয়াছেন। অতএব বৌধায়ন-বাক্যের এইরূপ অর্থ হইতেছে —

ব্রাহ্মণের পরিণীতা ব্রাহ্মণকন্যা, ক্ষত্রিয়কন্যা, বৈশ্যকন্যা ও শূদ্র-কন্যার গর্ভজাত পুত্র পিতার সবর্ণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ। এস্থলে শূদ্রা-পুত্র পারশব ব্রাহ্মণ হইতেছে তদ্রূপ উগ্র ক্ষত্রিয় হইতেছে এবং করণ বৈশ্য হইতেছে। করণ, উগ্র ও পারশবের দ্বিজত্ব মনুবিরুদ্ধ। সুতরাং এই বাক্য ত্যাজ্য। বস্তুতঃ ইহা অতীব প্রাচীন মত। 'মাতা ভস্ত্রা পিতুঃ পুত্রঃ যেন জাতঃ স এব সঃ'—এই প্রাচীন নিয়ম যে সময়ে প্রচলিত ছিল, যে সময়ে ব্রাহ্মণ মাত্রেই বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রের ন্যায় তেজস্বী ছিলেন, সেই সময়ে এরূপ হইতে পারিত। যাহা হউক, সত্যেন্দ্র বাবু এ অর্থে কোন আপত্তি করিতে পারেন না। কারণ 'অনন্তরা' শব্দের তাঁহার কৃত অর্থেই বৈশ্য-শূদ্রাসম্ভূত করণ বৈশ্যবর্ণ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে!

বৈশ্যের পক্ষে শূদ্রা গর্ভে যদি দ্বিজপুত্র উৎপাদন সম্ভব হয়, তবে ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণের পক্ষে তাহা আদৌ অস্বাভাবিক নহে। সুতরাং সত্যেন্দ্রবাবুর কোন আপত্তি এস্থলে খাটিতে পারে না। ঐ সকল পুত্রের নাম কি? সত্যেন্দ্র বাবু বৌধায়ন হইতে উদ্ধার করিতেছেন।

"ব্রাহ্মণাৎ ক্ষত্রিয়ায়াং ব্রাহ্মণঃ, ('ক্ষত্রিয়ঃ' নহে) বৈশ্যায়াম্ অম্বষ্ঠঃ, শূদ্রায়াং নিষাদঃ।" ১।১৮।১৬।৪ (বৈদ্যপ্রবোধনী পৃষ্ঠা ১৩)

অব্যবহিত অনন্তরাতে জাত পুত্রের নাম বৌধায়নে নাই। কিন্তু অন্য স্মৃতি হইতে তাহা পাওয়া যায়। ঐ পৃথক্ জাতি নাম মূর্দ্ধাভিষিক্ত সত্ত্বেও তাহারা পিতৃসবর্ণ হয়। তবে অম্বষ্ঠ, নিষাদ ও উগ্র পক্ষে সেরূপ হওয়া অসঙ্গত নহে। পৃথক্ জাতি নাম আছে বলিয়া তাহাদের পিতৃ-সবর্ণত্বের কোন হানি হইতে পারে না।

আমাদের ব্যাখ্যানুসারে বৌধায়নসূত্রে মূর্দ্ধাভিষিক্ত, মাহিষ্য, করণ, অম্বষ্ঠ, উগ্র, নিষাদ সকলেরই বর্ণ-নির্ণয় হইয়াছে। সত্যেন্দ্র বাবুর মতানুসারে কেবলমাত্র অব্যবহিতানন্তরা পুত্র মূর্দ্ধাভিষিক্ত, মাহিষ্য ও করণকে পিতৃবর্ণ বলা হইয়া থাকিলে, অম্বষ্ঠ-উগ্র-নিষাদ সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় না! ইহা অতীব গুরুতর দোষ। অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ বর্ণ না বৈশ্যবর্ণ? উগ্র ক্ষত্রিয়বর্ণ না শূদ্রবর্ণ? নিষাদ ব্রাহ্মণবর্ণ না শূদ্রবর্ণ? এ প্রশ্নগুলির উত্তর কোথায়?

অতএব দেখা যাইতেছে, অম্বষ্ঠের ব্রাহ্মণত্বের পক্ষে বৌধায়নবাক্য প্রতিকূল ত নহেই বরং অনুকূল। মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, ব্যাস, বিষ্ণু, অগ্নি-পুরাণ, বৃহদ্ধর্ম্মোত্তর যে দিকে রায় দিয়াছেন বৌধায়নকেও সেই দিকেই রায় দিতে হইল। তবে সত্যেন্দ্রবাবুর সকল authorityই যখন অম্বষ্ঠকে ব্রাহ্মণ বলিতেছে, তখন এক কৌটিল্যের সাক্ষ্যই কি এই সমস্ত প্রমাণ হইতে অধিক প্রামাণিক হইবে? কৌটিল্য চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী চাণক্য। তিনি ঋষি নহেন। তাঁহার প্রণীত 'অর্থশাস্ত্র স্মৃতি-

সংহিতা নহে। অমরের উক্তির ন্যায় চাণক্যের উক্তিকে আমরা অশ্রদ্ধেয় বিবেচনা করি। রাগদ্বেষের বশীভূত চাণক্য তদানীন্তন রাজ-কার্য্যের সুবিধার জন্য কতকগুলি আইন-কানুন প্রস্তুত করিয়া থাকিবেন। ঐ সকল আইন কানুনের মধ্যে কতক বা প্রাচীন মতের অনুকূল, কতক বা প্রতিকূল হওয়া সম্ভব। তিনি বলিয়াছেন—

'ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাম্ অনন্তরাঃ পুত্রাঃ সবর্ণাঃ।
একান্তরাঃ অসবর্ণাঃ।'

ইহার চরম উত্তর আমরা এই অধ্যায়ের শেষ ভাগে সন্নিবেশিত করিয়াছি। এস্থলে শুধু এইটুকু বলিতে চাই যে, মন্বাদি-বিরুদ্ধ বলিয়া চাণক্য-বাক্যকে একেবারে পরিত্যাগ করা অপেক্ষা 'অসবর্ণা' স্থলে অল্পার্থে নঞ্‌ প্রয়োগ স্বীকার করিয়া অম্বষ্ঠ পিতৃসবর্ণ হইলেও, মূর্দ্ধাভি-ষিক্ত অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ন্যূনতা-বিশিষ্ট, এইরূপ অর্থ দ্বারা স্মৃতিবিরোধ পরিহারপূর্ব্বক তাহার গৌরব রক্ষা করাই উচিত (যেমন 'অনুদরী কন্যা' বলিলে উদর নাই এমন কন্যা নহে, কিন্তু 'অল্প উদর-বিশিষ্টা কন্যা' বুঝায়)। সত্যেন্দ্রবাবু এবিষয়ে ভাবিয়া দেখিবেন। তাঁহার কৌটিল্যের মান রক্ষার ভার তাঁহারই হস্তে রহিল।

রঘুনন্দনের স্মৃতিনিবন্ধের ন্যায় কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে স্বাধীনতার যথেষ্ট অবসর ছিল। রঘুনন্দন যেমন স্বেচ্ছায়, এখন বৈশ্য জাতি পতিত হইয়াছে, ক্ষত্রিয় জাতি পতিত হইয়াছে, অম্বষ্ঠ জাতি পতিত হইয়াছে বলিয়াছিলেন, কৌটিল্যও তদ্রূপ বলিতে পারিতেন। কিন্তু স্মৃতিবিরোধী বলিয়া আমরা রঘুনন্দনের কথা যেমন অগ্রাহ্য করি, ব্যবহার শাস্ত্রকেও তদ্রূপ করিতে কোন বাধা নাই। প্রাচীন যুগের ব্যবহারের কথা জানিতে হইলে প্রাচীন স্মৃতি অনুসন্ধান করিতে হয়, অর্ব্বাচীন রঘুনন্দন ও কৌটিল্য হইতে প্রাচীন ব্যবহার জানিবার আশা করা উচিত নহে। অমরকোষ অম্বষ্ঠকে সঙ্কীর্ণ ও শূদ্র বলিয়াছেন বলিয়া স্মার্ত্তযুগের অম্বষ্ঠ-

সত্যই জন্মতঃ সঙ্কীর্ণ ও শূদ্র হইবে কি ? যদি না হয়, তবে কৌটিল্যের কথাতেও অম্বষ্ঠ সত্যই পিতার অসবর্ণ হইবে না।

অম্বষ্ঠ সম্বন্ধে শাস্ত্রপ্রসঙ্গ এত দূরে শেষ হইল। যাহাতে শাস্ত্রমর্ম্মে কাহারও অণুমাত্র সন্দেহ না থাকে, এজন্য সমস্ত কথা বিশদভাবে বলিতে হইয়াছে এবং কোন কোন কথা আবশ্যক-বোধে একাধিকবার বলিতে হইয়াছে। আশা করি, সত্যেন্দ্রবাবু ও কালীবাবু বুঝিতে পারিয়াছেন যে, **অম্বষ্ঠ জন্মতঃ ব্রাহ্মণ-বর্ণই বটে, বৈশ্য-বর্ণ নহে।**

সত্যসঙ্কল্পের কথা

মন্ত্রদ্রষ্টা ও শাস্ত্রকর্ত্তা জগন্মান্য ঋষিগণ বেদাদিতে যেরূপ বৈদিক বিবাহবিধি দেখিয়াছিলেন, স্মৃত্যাদি শাস্ত্রেও জনসাধারণের জন্য তদ্রূপ বিধানই দিয়াছিলেন এবং সমাজের আদর্শস্থানীয় হইয়া নিজেরাও তাহাই পালন করিয়াছিলেন। সমাজের জন্য এক প্রকার বিধান এবং নিজেদের জন্য অন্য প্রকার বিধান তাঁহারা করেন নাই। বেদস্মৃতি এবং সদাচার পরিপালনপূর্ব্বক তাঁহারা নিজেদের আদর্শেই আর্য্য সমাজ গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। আর্য্য নরনারীবৃন্দ তাঁহাদিগেরই পদাঙ্ক অনুসরণ পূর্ব্বক তাঁহাদেরই বিধান মানিয়া চলিত।

মহাভারত পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ভৃগুপুত্র মহামুনি চ্যবন রাজা শর্য্যাতির কন্যা সুকন্যাকে বিবাহ করেন। সুকন্যার গর্ভে চ্যবনের ঔরস পুত্র প্রমতির জন্ম হয়। মহর্ষি ঋচীক গাধিরাজ-কন্যা সত্যবতীকে ধর্ম্মপত্নীরূপে গ্রহণ করেন এবং তদীয় গর্ভে মহর্ষি জমদগ্নির উৎপত্তি হয়। মহর্ষি জমদগ্নি রাজা প্রসেনজিতের কন্যা রেণুকাকে বিবাহ করেন, তদীয় ঔরসে ব্রাহ্মণ পরশুরামের জন্ম হয়। কিন্তু কেবল ভৃগু-বংশেই 'রাজার জামাই' হইবার ঝোঁকটা যে বেশী ছিল, তাহা নহে।

রামায়ণে দৃষ্ট হয়, রাজা দশরথের কন্যা শান্তাকে বিভাণ্ডক মুনির পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ বিবাহ করেন। ইহা উত্তরচরিত গ্রন্থেও লিখিত আছে। এই ঋষ্যশৃঙ্গের পত্নী শান্তা অগস্ত্যপত্নী লোপামুদ্রা ও বশিষ্ঠপত্নী অরুন্ধতীর ন্যায় যশস্বিনী বলিয়া মহাভারতে বর্ণিত হইয়াছেন। ঐ মহাভারতে আমরা আরও দেখিতে পাই, মহামুনি অগস্ত্য ইক্ষ্বাকুবংশীয় নিমি রাজার কন্যাকে বিবাহ করেন। মহর্ষি অঙ্গিরা রাজা মরুত্তের কন্যাকে বিবাহ করেন। মহর্ষি হিরণ্যহস্ত মহারাজ মদিরাশ্বের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। মহর্ষি কৌৎস রাজর্ষি ভগীরথের কন্যা হংসীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। অগস্ত্য বংশরক্ষাকল্পে পিতৃগণ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া বিদর্ভরাজনন্দিনী লোপামুদ্রাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন এবং তদীয় গর্ভে উৎপাদিত সন্তান হইতেই পিতৃলোকের সদগতি হয়। মহামুনি শক্তি বৈশ্য চিত্রমুখের কন্যা অদৃশ্যন্তীকে বিবাহ করেন, (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, ২।৯) তাঁহার গর্ভে পরাশর জন্মগ্রহণ করেন।

চ্যবন, ঋচীক ও জমদগ্নির পুত্রেরা ব্রাহ্মণ না হইলে ঔর্ব্ব চ্যবন-ভার্গব-জামদগ্ন্য-আপ্নুবৎ প্রবর উল্লেখ করিয়া যাঁহারা গোত্র পরিচয় দিয়া থাকেন, অর্থাৎ বাৎস্য, সাবর্ণ, মৌদ্গল্য, সৌপায়ন গোত্রের ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণ হইতে পারেন না। জমদগ্নিগোত্রের ব্রাহ্মণেরা জমদগ্নি-ঔর্ব্ব-বশিষ্ঠ প্রবর উল্লেখ করেন, সুতরাং তাঁহারাও ব্রাহ্মণ হইতে পারেন না শক্তি ও পরাশর গোত্রের ব্রাহ্মণেরাও ব্রাহ্মণ হইতে পারেন না! অগস্ত্য গোত্রের ব্রাহ্মণদেরও ব্রাহ্মণ-পরিচয় দেওয়া অসম্ভব হইয়া পড়ে! বস্তুতঃ এই সকল উদাহরণ হইতেই সুস্পষ্টরূপে বুঝা যায় যে, মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও অম্বষ্ঠ—ব্রাহ্মণ বর্ণ। শাস্ত্রবিধি যে কথা বলিয়াছে, দৃষ্টান্ত তাহারই সমর্থন করিতেছে।

কিন্তু কালীবাবু বলিতেছেন, "ঋষিগণ মন্ত্রদ্রষ্টা ছিলেন, তাঁহাদের সঙ্কল্প সত্যে পরিণত করিবার ক্ষমতা ছিল। কাজেই এই সকল দৃষ্টান্ত

অম্বষ্ঠের ব্রাহ্মণত্বের পরিপোষক নহে। **মন্বাদি কোন স্মৃতি** অনুলোম জাতির মাতৃসবর্ণতা লাভ ভিন্ন পিতৃসবর্ণতা লাভের বিধি নির্দ্দেশ করেন নাই।" [বৈশ্য, পৃষ্ঠা ৫৪ (ঙ)] অর্থাৎ, এই সকল বিবাহ হইতে জাত অনুলোমজ সন্তানের ব্রাহ্মণ হইবার কথা ছিল না, তবে যে তাহারা সমাজে ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য হইয়াছিল, তাহার কারণ তাহারা ঋষিদের সামাজিক 'আর্ষ প্রয়োগ'! কালীবাবু বলিতেছেন, 'মন্বাদি কোন স্মৃতি' অনুলোমজ সন্তানের পিতৃবর্ণ প্রাপ্তির কথা বলে নাই! ইহা যে কত দূর **মিথ্যা কথা**, তাহা পাঠকবর্গ দেখিতে পাইতেছেন। কিন্তু কালীবাবুর অপরাধ ক্ষমার্হ, কারণ এ সব কথা আমরা যাজন-ব্রাহ্মণদের মুখে বহুবার শুনিয়াছি এবং এখানে যাহা মুদ্রিত দেখিতেছি, তাহাও তাহাদেরই কথা!

কালীবাবু পুনশ্চ বলিতেছেন, "যেখানে ঋষির সঙ্কল্প নাই, সেখানে ঋষির ঔরসে জন্মলাভ করিলেও মাতৃবর্ণই প্রাপ্ত হইয়া থাকে, দৃষ্টান্ত ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুর। যেখানে ঋষি ও তাহার সঙ্কল্প নাই, সেখানে সাধারণ নিয়মের ব্যত্যয় হয় না।" অর্থাৎ সাধারণ ব্রাহ্মণের ঔরসে ক্ষত্রিয়াতে যে সকল পুত্র জন্মিত, তাহারা ক্ষত্রিয় হইত এবং মাহিষ্যরাও বৈশ্য হইত! কুল্লূক বলিয়াছেন, অনুলোমজ পুত্র মাতৃবর্ণীয় আচারবিশিষ্ট হয়, সুতরাং তাহা মানিয়া চলা ভিন্ন কুল্লূকভক্ত কালীবাবুর অন্য উপায় নাই। যদি কোথাও কেহ পিতৃবর্ণ হয়, বুঝিতে হইবে, সে উৎপাদকের তপঃপ্রভাবে বা সত্যসঙ্কল্পের বলে! এতদ্দ্বারা তিনি ইহাই বলিতে চাহেন যে, স্মৃতির বিধানগুলি যখন ঔরস পুত্রের মাতৃবর্ণত্বেরই (!) ব্যবস্থা করিয়াছে, তখন তাহার পিতৃবর্ণ-প্রাপ্তি একটা অভাবনীয় অলৌকিক ব্যাপার—এমন কি উহা মহাদেবের 'কালকূট পানের' মত ঋষিদিগকেই সাজে! [পৃঃ ৫৪ (ক)] অনুলোমজ সন্তানের মাতৃবর্ণত্বের প্রমাণকল্পে কালীবাবু উদাহরণ দিয়াছেন, **ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু, বিদুর**!

ইহারা যে কেহই ব্যাসের পত্নীতে জাত ঔরস পুত্র নহে, পরন্তু বিচিত্রবীর্য্যের **ক্ষেত্রজ** পুত্র, এবং ক্ষেত্রজ পুত্র বলিয়াই ক্ষেত্রস্বামার বর্ণ বা মাতৃবর্ণ পাইয়াছে, (মনু ৯।১৫৯) তাহা কালীবাবুর বোধে আসে নাই! আসামে কি ঔরস-ক্ষেত্রজে প্রভেদ নাই?

বস্তুতঃ সত্যসঙ্কল্পের কথা আমরাও স্থল বিশেষে অস্বীকার করি না। যখন দেখি সকল বিধি-বিধান বা জাগতিক নিয়মের বিরুদ্ধে কোন এক অলৌকিক ঘটনা ঘটিল, তখনই আমরা সত্যসংকল্প ঋষির তপঃপ্রভাবকে ঐ ঘটনার অলৌকিক হেতু বলিয়া গণনা করি। যখন দেখি শুকী, হরিণী বা মৎসীর গর্ভে, কুশপুত্তলে বা কুম্ভে ব্রহ্মর্ষি ব্রাহ্মণ-পুত্র জন্মগ্রহণ করিতেছে, তখন সত্যসংকল্পের কথা অবশ্য স্বীকার্য্য। কিন্তু সাধারণ শাস্ত্রবিধি দ্বারা বা জাগতিক নিয়মানুসারে যে কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ অনায়াসে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে, সে স্থলে ঋষির তপঃপ্রভাব ও সত্যসংকল্পের কথা তুলা ঋষির, শাস্ত্রের, জাগতিক শৃঙ্খলার ও সহজ বুদ্ধির অবমাননা করা মাত্র! বস্তুতঃ বিধিস্থলে বিধিকে অনাদর করিয়া সত্যসংকল্পকে বলবৎ করিলে ব্রাহ্মণকন্যার গর্ভেও ব্রাহ্মণের জন্ম সত্যসংকল্প বশতঃই বলিতে হয়! সত্যেন্দ্রবাবু শ্রীযুক্ত কালীবাবুকে এই সংকল্পের দায়েও পৃষ্ঠপোষণ করিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করেন নাই! কিন্তু পূর্ব্বদিক্‌কে পশ্চিমদিক্ সপ্রমাণ করিতে হইলে অবশিষ্ট সাতটী দিক্‌কেও মিথ্যা নাম দিতে হয়, অথচ পূর্ব্বদিক্ যে পূর্ব্বদিক সেই পূর্ব্বদিকই থাকে! সত্যেন্দ্রবাবু লিখিতেছেন—

"ঋষিগণ সর্ব্ববিষয়েই অদ্ভুতকর্ম্মা হরিণীগর্ভে ঋষ্যশৃঙ্গের এবং শুকীগর্ভে শুকদেবের জন্ম সকলেই অবগত আছেন অগস্ত্য ঋষির কথা স্মরণ করুন · সমুদ্রকে এক গণ্ডূষে শোষণ করিয়াছিলেন, বিন্ধ্যপর্ব্বতের দর্প চূর্ণ করিয়াছিলেন···লোপামুদ্রার **জন্মদাতাও একরূপ**

তিনি স্বয়ম্...লোপামুদ্রার গর্ভ ছিল পূর্ণ ৭ বৎসর (১০ মাস নহে); তুমি তাহার কোন্ বিষয়ের অনুকরণ করিতে পার ?"

প্রশ্নের উত্তরে বলিতে হয়, অলৌলিক কর্ম্ম ব্যতীত প্রত্যেক লৌকিক কর্ম্মেই স্বচ্ছন্দে তাঁহার অনুকরণ করিতে পারি। কিন্তু অনুলোমজা দ্বিজা ভার্য্যা কি হরিণী, শুকী না কুম্ভ ? শাস্ত্র কি বলিয়াছে, "হরিণ্যাং ব্রাহ্মণাৎ জাতঃ ব্রাহ্মণঃ স্যাৎ ন সংশয়ঃ। শুক্যাং চৈব তথা জাতঃ কুম্ভ-যোনৌ তথৈব চ ॥" ? আর সত্যই কি অগস্ত্য আপন কন্যাকে বিবাহ করিবেন বলিয়া লোপামুদ্রাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, না রাজকন্যাকে বিবাহ করিবেন বলিয়া তাহাকে রাজার ঘরে সৃষ্টি করিয়াছিলেন ? সত্যেন্দ্রবাবু সত্য করিয়া বলুন, জগৎসংসার লোপামুদ্রাকে কাহার কন্যা বলিয়া জানিত ? সীতা যেমন জনকের কন্যা, দ্রৌপদী যেমন পঞ্চাল-রাজকন্যা, লোপামুদ্রাও তদ্রূপ বিদর্ভরাজনন্দিনী এবং ক্ষত্রিয়া ছিলেন। যৌবনপ্রাপ্তা লোপামুদ্রা কি অগস্ত্যগোত্রা ও অগস্ত্যের কন্যা বলিয়া ঋষির হস্তে পত্নীরূপে সমর্পিত হইয়াছিলেন, না বিদর্ভকন্যা ও ক্ষত্রিয়া বলিয়া ? লোপামুদ্রার জন্মবিবরণ এইরূপ উক্ত হইয়াছে—অগস্ত্য একদিন একটী গর্ত্তে অধোমুখ অবস্থায় লম্বমান কতকগুলি পুরুষকে দেখিয়া প্রশ্ন করিলে তাঁহারা বলিলেন, আমরা তোমারই পূর্ব্বপুরুষ, তুমি বিবাহ কর নাই, অনপত্যতা বশতঃ পিণ্ডলোপ হইবে, এই আশঙ্কায় আমরা মরিতেছি। আমাদের মুক্ত করিতে হইলে তোমাকে দারপরিগ্রহ করিতে হইবে।" অনন্তর অগস্ত্য নিজের উপযুক্ত স্ত্রী কোথাও না দেখিতে পাইয়া সকল প্রাণিবর্গ হইতে সৌন্দর্য্য আহরণ পূর্ব্বক একটী উত্তমা স্ত্রী সৃষ্টি করিলেন এবং তাহা বিদর্ভরাজকে অর্পণ করিলেন—

স তাং বিদর্ভরাজস্য পুত্রার্থং তপ্যত স্তপঃ।
নির্ম্মিতা মাত্মনোঽর্থায় মুনিঃ প্রাদান্মহাতপাঃ ॥ ২১
সা তত্র জজ্ঞে সুভগা বিদ্যুৎ সৌদামিনী যথা।

বিভ্রাজমানা বপুষা ব্যবর্দ্ধত শুভাননা ॥ ২২
জাতমাত্রাং তু তাং দৃষ্ট্বা বৈদর্ভঃ পৃথিবীপতিঃ।
প্রহর্ষেণ দ্বিজাতিভ্যো ন্যবেদয়ত ভারত ॥ ২৩
অভ্যানন্দত (?) তাং সর্ব্বে ব্রাহ্মণা বসুধাধিপঃ।
লোপামুদ্রেতি তস্যাশ্চ চক্রিরে নাম তে দ্বিজাঃ ॥ ২৪

*　　*　　*　　*

*　　*　　*　　*

বৈদর্ভীং তু তথা যুক্তাং যুবতীং প্রেক্ষ্য বৈ পিতা।
মনসা চিন্তয়ামাস কস্মৈ দদ্যামিমাং সুতাম্ ॥ ৩০,বন, ৯৬অ

কন্যা রাজগৃহে ক্রমে যৌবন প্রাপ্ত হইল। এই সময়ে অগস্ত্য আসিয়া বিবাহের জন্য কন্যাকে প্রার্থনা করিলেন। রাজার তাহা পছন্দ হইল না—

এবমুক্তঃ স মুনিনা মহীপালো বিচেতনঃ।
প্রত্যাখ্যানায় চাশক্তঃ প্রদাতুঞ্চৈব নৈচ্ছত ॥ ৩,৯৭অ

রাজা মহিষকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি করি, ঋষিকে অসন্তুষ্ট করিলে বোধ হয় সকলকেই ভস্মসাৎ হইতে হইবে। এখন উপায় কি ? রাজ্ঞী হাঁ-না কিছুই বলিতে সাহস করিলেন না—

তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা রাজ্ঞী নোবাচ কিঞ্চন। ৫

অনন্তর লোপামুদ্রা পিতা-মাতাকে কাতর দেখিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন—

'ন মৎকৃতে মহীপাল পীড়ামভ্যেতুমর্হসি।
প্রযচ্ছ মামগস্ত্যায় ত্রাহ্যাত্মানং ময়া পিতঃ ॥ ৬

অনন্তর রাজা যথাবিধি কন্যাকে অগস্ত্যের হস্তে সম্প্রদান করিলেন—

দুহিতুর্ব্বচনাৎ রাজা সোঽগস্ত্যায় মহাত্মনে।
লোপামুদ্রাং ততঃ প্রাদাৎ বিধিপূর্ব্বং বিশাম্পতে ॥ ৭

নীলকণ্ঠও আদিপূর্ব্বে, ৮১ অধ্যায়ে বলিয়াছেন—"ক্ষত্রিয়ব্রহ্মকন্যাসু লোপামুদ্রাদিষু ব্রাহ্মণানামুৎপত্তিদর্শনাৎ"! তবে লোপামুদ্রাকে 'অক্ষত্রিয়' বলা সহজ হইল না! কালীবাবু ও সত্যেন্দ্রবাবুর অভিপ্রায় এই যে প্রথমে উহাকে ক্ষত্রিয় নহে বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যাইবে, যদি নিতান্তই তাহা অসম্ভব হইয়া পড়ে, তবে তখন তাহাকে সত্যসঙ্কল্পের উদাহরণ বলিলেই চলিবে! সত্যেন্দ্রবাবুর মতে ব্রাহ্মণের পক্ষে ক্ষত্রকন্যা ও বৈশ্যকন্যা 'বিযোনি'। ব্রাহ্মণবেশী অর্জ্জুন লক্ষ্যবেধপূর্ব্বক এইরূপ 'বিযোনি' দ্রৌপদীকে লাভ করিলে ব্রাহ্মণেরা প্রশংসা করিতে লাগলেন (মহাভারত, আদি, ১৮৮অ)!—

'স তামুপাদায় বিজিত্য রঙ্গে দ্বিজাতিভি স্তৈ রভিপূজ্যমানঃ।
রঙ্গান্নিরক্রামদচিন্ত্যকর্ম্মা পত্ন্যা তয়া চাপ্যনুগম্যমানঃ॥' ২৮॥

সুবচনীর কথাতে ও ঠাকুরমায়ের গল্পের ঝুলিতে এইরূপ ব্রাহ্মণ পুত্রকে অর্দ্ধেক রাজ্য ও রাজকন্যা দানের কথা দেখিতে পাই। এ সকলই কি 'বিযোনি', এবং এই সকল বিযোনিতে যে ব্রাহ্মণ পুত্র জন্মে, তাহাতে 'প্রমাণং হ্যত্র বৈ তপঃ'? ক্ষত্রিয়কন্যা ও বৈশ্যকন্যার গর্ভে ব্রাহ্মণের জন্ম বিশ্বামিত্রের দ্বিতীয় ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির ন্যায় এমনই একটা অলৌকিক কাণ্ড! সত্যেন্দ্রবাবুর কুশাগ্রীয়ধী কৌটিল্যই ত বলিয়াছেন—

"ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাম্ অনন্তরাঃ পুত্রাঃ সবর্ণাঃ॥'

বৌধায়নও বলিয়াছেন

"তাসু পুত্রাঃ সবর্ণানন্তরাসু সবর্ণাঃ।"

"ব্রাহ্মণাৎ ক্ষত্রিয়ায়াং ব্রাহ্মণঃ।"

গৌতম ও তাহাই বলিয়াছেন। তবে 'বিযোনি'তে দস্তুর মত শাস্ত্রমতেই ত ব্রাহ্মণ-পিতার সবর্ণ বা ব্রাহ্মণবর্ণীয় পুত্র উৎপন্ন হইতেছে দেখিতেছি। তবে তপোবলের প্রসঙ্গ কোথায়? যাহা মনু-যাজ্ঞবল্ক্য-ব্যাস-বিষ্ণু বৌধায়ন-গৌতম-কৌটিল্যের মতে দেশের "আইন' বলিয়া

স্বীকৃত হইতেছে, তাহাতে অলৌকিকত্বের অবসর কোথায়? অনেক অ-ঋষির পক্ষে যে ঐ আইনের প্রদত্ত ব্যবস্থা অপেক্ষা আরও ব্যাপক ভাবে কার্য্য হইতে দেখা গিয়াছে! সত্যযুগ হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত ইহার নিদর্শনের অভাব নাই। অনেক কুলীন পরিবার 'বুদ্ধিমতী' পিতামহীদের সহজ বুদ্ধির জন্যই যে বহ্বপত্যশালী হইয়া শোভা পাইয়াছিল, ইহা কে না জানে? রামচন্দ্রের পুত্র কুশ নাগকন্যা কুমুদ্বতীকে বিবাহ করেন। তাহার গর্ভে জাত অতিথিইই রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অতিথি কিরূপে ক্ষত্রিয় হইল? তাহার বংশে 'সূর্য্য-বংশীয় ক্ষত্রিয়' বলিয়া কেহ বা পরিচয় না দিয়াছে? নাগের কন্যা কোন্ বর্ণ? নাগেরা কি উপবীতধারী বেদাধ্যায়ী ক্ষত্রিয়? কুশেরও কি সত্যসঙ্কল্প ছিল? শকুন্তলা কি ক্ষত্রিয়া ছিল? যদি না ছিল, তবে তাহার পুত্র কিরূপে ক্ষত্রিয় হইল? দুষ্মন্তও কি একজন মস্ত ঋষি ছিলেন? বস্তুতঃ "ভস্ত্রা মাতা পিতুঃ পুত্রঃ যেন জাতঃ স এব সঃ" (মহাভারত, আদি, ৭৪অ, ১১০ ও বিষ্ণু) এই সনাতন ও সাধারণ নিয়মকে শ্রেণীবিশেষের তপঃপ্রভাবের অধীন করিতে চেষ্টা করায় মনুষ্যসমাজেরই অবমাননা করা হইয়াছে। সত্যেন্দ্রবাবু বিযোনিতে অর্থাৎ ব্রাহ্মণকন্যা ভিন্ন অন্যাতে ব্রাহ্মণ জন্মিতে শুনিয়া চমকিত হইয়াছেন, যেন ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি জাতি গো-মেষ-মহিষাদির ন্যায় পৃথক জাতীয় জীব! গাভীর গর্ভে যেমন মেষ-শাবকের উৎপত্তি হইতে পারে না, ক্ষত্রিয়ার গর্ভে তেমনই ব্রাহ্মণের জন্ম অসম্ভব! তাঁহারা একবারও ভাবেন না যে, প্রাচীনকালে কত শূদ্র পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিল, কত বৈশ্য, কত ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিল, তাহার ভূরি ভূরি নিদর্শন রহিয়াছে।*

* প্রথম বর্ষের বসুধারায় 'ভারতের প্রাচীন লোকব্যবহার' সম্বন্ধে ধারাবাহিক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। পণ্ডিত উমেশ চন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের জাতিতত্ত্ব বারিধি, মল্লিখিত 'ব্রাহ্মণ জাতির ইতিহাস' অথবা ৺পিতৃদেব প্রণীত 'বৈদ্যবর্ণ-বিনির্ণয়' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। পণ্ডিত দিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত 'জাতিভেদ' পুস্তকেও এ সম্বন্ধে অনেক কথা আছে।

তাঁহারা নূতন নূতন ব্রাহ্মণ-গোত্র বা ব্রাহ্মণ-বংশধারা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, সুতরাং নামে মাত্র ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাহা নহে। ব্রাহ্মণের গুণ ও কর্ম্ম থাকায় পাকা ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য যে একই আর্য্য জাতির তিনটী শ্রেণীমাত্র এবং উচ্চ শ্রেণীর পুরুষ নিম্ন শ্রেণীর কন্যাকে বিবাহ করিলে, সেই কন্যা যে উচ্চ শ্রেণীতে উন্নীতা হইত, ইহা সত্যেন্দ্রবাবু ও কালীবাবু বুঝেন না বলিয়াই পদে পদে এত গলদ হইয়াছে। এই বিবাহ প্রথা কালক্রমে বিলুপ্ত হইয়াছে। তপঃক্ষীণ কলিতে ক্রমশঃ যাহা বিযোনি বলিয়া গণ্য হইয়া সমাজে অচল হইতেছিল, তপঃ প্রভাবসম্পন্ন সত্য ত্রেতা-দ্বাপরে তাহা স্বযোনিই ছিল। তাৎকালিক লোকের গুণোৎকর্ষ এবং সামাজিক আবশ্যকতা, এই দুই দিক দেখিয়া সমাজরক্ষণ প্রয়াসী ঋষিগণ কর্ত্তৃক যে সকল বৈবাহিক বিধি-ব্যবস্থা প্রণয়ন করা হইয়াছিল, সেই বিধি ব্যবস্থা অনুসারেই মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও অম্বষ্ঠ পিতৃবর্ণ পাইয়া ব্রাহ্মণ হইত, কুত্রাপি পারশবও ব্রাহ্মণ হইত! পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অপ্সরা ও দাসীতে এমন কি শুকী, হরিণী, কুম্ভ, কুশপুত্তলে, যে ঋষিজন্মের কথা শুনিতে পাওয়া যায় তাহাতেই উৎপাদকদিগের তপঃপ্রভাব চরিতার্থ হইত এবং বৈধপত্নীতে উৎপন্ন পুত্র বিধি অনুসারেই পিতৃবর্ণীয় হইত। ঐ সময়ে সামাজিক প্রয়োজনীয়তা হেতু কেহই সন্তানকে অপলাপ করিত না। পিতা কর্ত্তৃক গৃহীত হইলেই সন্তান গূঢ়োৎপাদিত পুত্রের ন্যায় পিতৃবর্ণীয় হইত। কিন্তু আজকাল তাহা হয় না কেন? তাহার উত্তর এই, তপঃপ্রধান যুগে যে নিয়মে কার্য্য হইত, তপোহীন যুগে সে নিয়মে কখনই হইতে পারে না। এজন্য তপঃপ্রধান যুগের অসবর্ণ বিবাহ আজকাল একেবারেই অপ্রচলিত হইয়াছে। অতএব পুরাকালে ব্রাহ্মণ পরিণীতা ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যার গর্ভে জাত পুত্র ব্রাহ্মণ হইবে, এই নিয়ম তদানীন্তন যুগের তপঃপ্রভাবের আধিক্য বশতঃই প্রচলিত ছিল, অথবা

আজ যাহা 'বিযোনি' বলিয়া গণ্য তাহাতে প্রাচীন যুগের তপঃ প্রভাব হেতুই পিতৃসবর্ণ পুত্র উৎপন্ন হইত। ইহা কেবল পরাশর-ব্যাসের কথা নহে, ইহা তপঃ প্রধান যুগের সকল ব্রাহ্মণের কথা। এজন্য তপের অভাবই যে বর্ত্তমান যুগের পরিবর্ত্তিত ব্যবস্থার হেতু, তাহা অনায়াসেই বুঝা যায়। অতএব পুরাকালে অনন্তর-পুত্র পিতার তপঃপ্রভাবে পিতৃবর্ণ হইত বলিলে সত্যসঙ্কল্পের কথা উঠিতেই পারে না। সত্যেন্দ্র-বাবু উহা না বুঝিয়া প্রবোধনীর লেখককে অভিসম্পাত দিয়াছেন! তিনি শিক্ষিত ব্যক্তি, শিক্ষার অনুরূপ কার্য্যই করিয়াছেন, ইহাতে আমাদের বলিবার কিছুই নাই। তিনি ও তাঁহার বন্ধুরা আপনাদের দোষ বুঝিতে পারিলে নিশ্চিতই অনুতপ্ত হইবেন এবং সমিতির সভ্য হইয়া কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবেন।

কালীবাবু অপেক্ষা সত্যেন্দ্রবাবুর অপরাধ অধিক। কারণ কালী-বাবুর ধারণা মূর্দ্ধাভিষিক্তজননী ও অম্বষ্ঠজননী ব্রাহ্মণের কামপত্নী এবং পুত্রেরা মাতৃবর্ণ, পিতৃবর্ণ নহে। ঋষিরা যে স্পষ্ট বাক্যে অনন্তরার পুত্রকে 'সবর্ণ' ও 'ব্রাহ্মণ' বলিয়াছেন, ইহা তাঁহার জ্ঞানগোচর ছিল না। কিন্তু সত্যেন্দ্রবাবু এই সকল ঋষিবাক্যের সংবাদ রাখেন। জানিয়া শুনিয়া যে ইচ্ছাপূর্ব্বক শাস্ত্রার্থ কলুষিত করে, তাহার পাপ নিশ্চয়ই গুরুতর। সুতরাং অভিসম্পাতটা কাহার প্রাপ্য পাঠকবর্গ তাহা ভাবিয়া দেখিবেন। কিন্তু বৈশ্যব্রাহ্মণ-সমিতি সত্যরূপী নারায়ণের নিকটে সত্যেন্দ্রবাবু ও কালীবাবুর অপরাধ মার্জ্জনা ভিক্ষা চাহিতেছে।

আমরা এই অধ্যায়ের শেষ ভাগে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। সত্যেন্দ্রবাবু অম্বষ্ঠকে বৈশ্য সপ্রমাণ করিবার জন্য কি কি অপরাধ করিয়াছেন দেখা যাউক—

(১) অম্বষ্ঠের ঔরস পুত্রত্ব স্বীকার করেন নাই!

(২) অম্বষ্ঠজননীর ধর্ম্মপত্নীত্ব স্বীকার করেন নাই!

(৩) পতি ও সংস্কৃতা পত্নীর একবর্ণত্ব স্বীকার করেন নাই !

(৪) সংস্কৃতা পত্নীতে জাত পুত্রের পিতৃবর্ণত্ব স্বীকার করেন নাই !

(৫) যুতকীকরণমন্ত্রের প্রামাণ্য স্বীকার করেন নাই !

(৬) নিজস্বগোত্রের প্রামাণ্য স্বীকার করেন নাই !

(৭) মনুর ২।২১০ অনুসারে অম্বষ্ঠজননী ব্রাহ্মণ-ব্রহ্মচারীর প্রণম্যা, অতএব ব্রাহ্মণী এই প্রমাণ স্বীকার করেন নাই !

(৮) ঊঢ়ায়াং হি সবর্ণায়াম্ অন্যাম্ বা কামমুদ্বহেৎ।

তস্যামুৎপাদিতঃ পুত্রঃ ন **সবর্ণাৎ প্রহীয়তে** ॥ ব্যাস ২।১০

বৌধায়নাদির ন্যায় এই সবর্ণত্ব-বিধায়ক বাক্য স্বীকার করেন নাই ! "হীন হয় না' স্থলে অর্থ করিয়াছেন 'হীন হয়' !

(৯) 'তাস্বপত্যং **সমম্ ভবেৎ**'—মহা, অনু, ৪৪অ, ১১ শ্লোক। এই প্রমাণ স্বীকার করেন নাই ! 'সমম্' অর্থ করিয়াছেন 'ভিন্নম্' !

(১০) ব্রাহ্মণ্যাং ব্রাহ্মণাজ্জাতো ব্রাহ্মণঃ স্যাৎ ন সংশয়ঃ।

ক্ষত্রিয়ায়াং তথৈব স্যাৎ **বৈশ্যায়ামপি** চৈবহি ॥

যতস্ত তিসৃণাং পুত্রা স্বয়োক্তা **ব্রাহ্মণা** ইতি ॥—

মহা, অনু ৪৭, ২৮ শ্লো

এই প্রমাণ স্বীকার করেন নাই ! 'বৈশ্যায়ামপি ব্রাহ্মণঃ' অর্থ করিয়াছেন "বৈশ্যাতে বৈশ্য উৎপন্ন হয়" !

(১১) '**বিপ্রবৎ** বিপ্রবিন্নাসু'—ইত্যাদি ব্যাস, ১।৭-৮

এই প্রমাণও স্বীকার করেন নাই ! নানা কৌশলে উহা নষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছেন !

(১২) '**অনিন্দ্যেষু** বিবাহেষু পুত্রাঃ সন্তানবর্দ্ধনাঃ'—১।৯০

যাজ্ঞবল্ক্যের এই প্রমাণটীতে সবর্ণা-বিবাহই একমাত্র অনিন্দ্য বিবাহ বলিয়া ইহা নষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছেন !

(১৩) সর্ব্ববর্ণেষু তুল্যাসু পত্নীষক্ষতযোনিষু।
আনুলোম্যেন সম্ভূতাঃ জাত্যা জ্ঞেয়া স্ত এবতে ॥ মনু, ১০।৫
এই প্রসিদ্ধ মনু বচনে 'অনুলোম' শব্দের অর্থ করিয়াছেন 'সবর্ণ'!

(১৪) বৌধায়ন ও গৌতম বচনে 'সবর্ণাঃ শব্দের অর্থ করিয়াছেন, 'অসবর্ণাঃ'! 'ক্ষত্রিয়ায়াং ব্রাহ্মণঃ' অর্থ ব্রাহ্মণের পত্নী ক্ষত্রিয় তে ক্ষাত্রয় জন্মে!

(১৫) কৌটিল্য বচনে 'সবর্ণাঃ' শব্দের অর্থ 'অসবর্ণাঃ', কিন্তু 'অসবর্ণাঃ' শব্দের অর্থ 'অসবর্ণাঃ' ঠিক আছে!

এক্ষণে শেষ দুইটী বিষয়ের একটু আলোচনা করিব। সত্যেন্দ্রবাবু ১৩টী ডিগ্‌বাজী খাইয়া ষোল কলা পূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে গৌতম, বৌধায়ন ও কোটিল্যকে ধরিয়া পড়িলেন। প্রথমে গৌতম ও বৌধায়নের বচন দুইটী লইয়াই বেশ একটু মুস্কিলে পড়িলেন, কারণ এই দুই ঋষিই অনন্তরা স্ত্রীতে জাত পুত্রকে 'সবর্ণ' বলিয়াছেন! 'সবর্ণাসু' অর্থাৎ সবর্ণাতে যেমন সবর্ণ জন্মে, অনন্তরাসু (অনন্তরা ভার্য্যাতে) তেমনই সবর্ণ পুত্র জন্মে, অতএব সবর্ণ শব্দে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। এজন্য সত্যেন্দ্রবাবুকে বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইয়াছে—

"বৌধায়ন (এবং অপর কেহ কেহ) 'অনন্তর' পুত্রকে পিতৃসবর্ণ বলিয়াছেন। এজন্য ব্রাহ্মণ+ক্ষত্রিয়ার সন্তান মূর্দ্ধাভিষিক্ত তাঁহাদের মতে **পিতৃনামা**" অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বলিয়া বিদিত (বৈ॰ প্রতি॰ পৃঃ ১৩)।

এই যে ঋষিমত সত্যেন্দ্রবাবু * অনন্যোপায় হইয়া বুঝিয়াছেন, ইহাই

* সত্যেন্দ্রবাবু এ স্থলে 'অনন্তর' শব্দটীকে নিশ্চয় পারিভাষিক সংজ্ঞারূপে ব্যবহার করিয়াছেন। অন্যথা 'অনন্তর পুত্র' এই শব্দের কোন অর্থই হয় না! ইহা পরিভাষা না হইলে inverted commaর মধ্যে ব্যবহৃত হইত না। মনুর ১০।১৪ শ্লোকে 'অনন্তর' শব্দের এইরূপ ব্যবহার আমিই তাঁহাকে দেখাইয়া দিই। আমার কৃত মনুর ব্যাখ্যা প্রাণে প্রাণে গাঁথিয়া না গেলে কলম দিয়া তাহা কি সহজে বাহির হইত? সত্যেন্দ্রবাবু ডাক-যোগে আমার নিকট হইতে ঐ শ্লোকের সংস্কৃত অর্থ দুইবার সংগ্রহ করেন।

মহাভারতের ও ব্যাসসংহিতার সুস্পষ্ট উক্তি হইতে বুঝিতে কি কিছু কষ্ট হইতেছিল? পূর্ব্বোক্ত ব্যাস বাক্যানুসারে মূর্দ্ধাভিষিক্ত পিতৃবর্ণ হইলে 'সমম্' অর্থ 'ভিন্ন' করিতে হয় না, 'ব্রাহ্মণ' অর্থ বৈশ্য করিতে হয় না, 'ন প্রহীয়তে' অর্থ 'হীয়তে' করিতে হয় না অনুলোম' অর্থ 'সবর্ণ' করিতে হয় না! কিন্তু বিপদ্ এই যে, মূর্দ্ধাভিষিক্তকে ব্রাহ্মণ বলিয়া মানিলেই—ঐ 'সমম্' শব্দের বলে অম্বষ্ঠও যে ব্রাহ্মণ হইবে! মূর্দ্ধাভিষিক্ত ব্রাহ্মণ হইলে 'ব্রাহ্মণ' শব্দের বলেই অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ হইবে! এ ত সহ্য হয় না! আমরা 'ব্রহ্মবীর্য্য-সম্ভূত' পারিভাষিক বৈশ্য,• আমাদের কিনা ব্রাহ্মণবর্ণ হইতে হইবে! আমাদিগকে '**হেয় চিকিৎসক**' হইতে হইবে! কুমীরদের সঙ্গে বিবাদ করিতে হইবে! কেমন গোলামের মত পা চাটিতেছি, তাহাও বন্ধ হইবে! হায়! হায়!

অতঃপর অনেক ভাবিয়া কি লিখিয়াছেন দেখুন—

"মূর্দ্ধাভিষিক্তের পক্ষে শাস্ত্রীয় **মতদ্বৈধ** (অর্থাৎ কাহারও মতে **ব্রাহ্মণত্ব**, কাহারাও মতে ক্ষত্রিয়ত্ব ') থাকিলেও অম্বষ্ঠের পক্ষে তাহাতে কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। বস্তুতঃ মূর্দ্ধাভিষিক্তের **ব্রাহ্মণত্বখ্যাপন তাঁহার** প্রশংসা মাত্র (অর্থাৎ ব্রাহ্মণ না হইলেও শাস্ত্রে মিছামিছি তাহাকে ব্রাহ্মণ বলা হইয়াছে!) অর্থাৎ তিনি ব্রাহ্মণের অতি নিকটবর্ত্তী—প্রায় ব্রাহ্মণ। কিন্তু তাঁহার সংস্কার মনু বচনানুসারে (১০।১৪) **ক্ষত্রিয়ের ন্যায় হইবে!**" বৈ᠁ প্রতি• পৃষ্ঠা ১৪)।

ইহার উপর টীকা অনাবশ্যক। গৌতম ও বৌধায়ন 'সবর্ণ ও 'ব্রাহ্মণ' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। নিজের বঙ্গানুবাদে অনন্তর-পুত্রকে 'পিতৃনামা' বলিয়াছেন, কিন্তু ইহা সত্ত্বেও যদি সে ক্ষত্রিয় অর্থাৎ 'মাতৃনামা' ও 'মাতৃ-বর্ণ' হয়, তবে ত সত্যেন্দ্রবাবুর সহিত কথা কহাই বিপদ্! এরূপ লোকে 'বন্ধু' বলিলে শত্রু বুঝিবে, "আলিঙ্গন' চাহিলে প্রহার করিবে, 'ভ্রাতা' বলিলে অন্য কোন সম্বন্ধ বুঝিবে!

মহাভারতের বাক্যে সুস্পষ্ট 'ব্রাহ্মণ' শব্দ থাকিলেও যখন তাহার অর্থে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য করা হইয়াছে, তখন আমাদের আর কোন আশাই নাই। তথাপি 'ব্রাহ্মণের সবর্ণ' শব্দ হইতে কি অনির্ব্বচনীয় উপায়ে 'ক্ষত্রিয়' অর্থ হইল, তাহা বিদ্যাবাগীশ মহাশয় বুঝাইয়া দিয়াছেন, আমরাও জলের মত বুঝিয়াছি। বিদ্যাবাগীশ মহাশয় বলিয়াছেন, মূর্দ্ধাভিষিক্ত=(ব্রাহ্মণ) পিতার সবর্ণ=প্রায় ব্রাহ্মণ=ব্রাহ্মণের নিকটবর্ত্তী=অব্রাহ্মণ=ক্ষত্রিয়! আমরা বিদ্যাবাগীশ মহাশয়কে 'সবর্ণ' বলিয়া জানি, কিন্তু এই অভিনব ব্যাখ্যা আমাদিগকেই নিতান্তই উদ্বিগ্ন করে।

আবার মজা দেখুন, গৌতম-বৌধায়নের ঐ 'অনন্তরা' শব্দটা কেবল অব্যবহিতানন্তরাকে (!) বুঝাইতেছে মনে করায় একান্তরা-জাত অম্বষ্ঠ পিতার সবর্ণ হইতে পাইল না, এজন্য খুসী কত! অনন্তরাতে জাত পুত্র যেমন 'সবর্ণ' একান্তরাতে জাত পুত্র তদ্রূপ 'অসবর্ণ', ইহা ত তাঁহারা বলেন নাই। তবে কি তাহাদের বর্ণ নির্ণয় করিতে ঐ দুই ঋষি ভুলিয়া গেলেন? তবে 'অম্বষ্ঠ' পিতার 'অসবর্ণ এ অর্থ কোথা হইতে আসে? ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, কি শূদ্র এ কথা কে বলিয়া দিবে? আর কিছু না বলা সত্বেও যদি অম্বষ্ঠ মাতৃবর্ণ হয়, তবে মূর্দ্ধাভিষিক্ত সম্বন্ধেও কিছু না বলিলেই চলিত! কিছু না বলিলেও যদি একান্তরা পুত্র অম্বষ্ঠ মাতৃবর্ণ হয়, এবং পিতৃ-সবর্ণ বলা সত্বেও যদি অনন্তরা-পুত্র (মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও মাহিষ্য) মাতৃবর্ণ হয়, তবে ইহা আর কাহারও দুরদৃষ্টের ফলে নয়, অম্বষ্ঠেরই কপাল গুণে! অম্বষ্ঠকে 'ঘাল' করিবার জন্যই এই ভাবে ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যা নিতান্ত প্রয়োজন! এই কার্য্য এ যাবৎ আমাদের ধর্ম্মরক্ষকগণই নিপুণতার সহিত করিতেছিলেন—সম্প্রতি সত্যেন্দ্রবাবু ও কালীবাবু এই গৌরবকর কার্য্যে যোগদান করিয়া স্বজাতির মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন।

এইবারে কৌটিল্যের প্রমাণ। চন্দ্রগুপ্তের সময়ে কৌটিল্য বা চাণক্য একখানি অর্থশাস্ত্র লেখেন। তাহাতে লেখা আছে—

"ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং **অনন্তরাঃ** পুত্রাঃ সবর্ণাঃ। একান্তরাঃ অসবর্ণাঃ" (বৈ০ প্রতি০ পৃষ্ঠা ১৪—১৫)

পাঠক লক্ষ্য করিবেন, এখানে কৌটিল্যও মনুর (১০।১৪ শ্লোকের) অনুসরণ করিয়া 'অনন্তর' ও 'একান্তর' শব্দ পারিভাষিক ভাবে ব্যবহার করিতেছেন। যাহা হউক, ১০।১৪ শ্লোকে much-vaunted বর্ণ-নির্ণয়ের কোন কথা নাই, ইহা সত্যেন্দ্র-গুরু কৌটিল্য স্বীকার করিতেছেন। (পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য) কারণ, অন্যথা মনুর বিরুদ্ধ কথা কহিয়া 'কুশাগ্রীয়ধী' চাণক্য অনন্তরা-পুত্রকে '**পিতার সবর্ণ**' (পিতৃনামা) কিরূপে বলেন? মনুর বিরুদ্ধ বলিয়া তাঁহার বাক্য একবার অশ্রদ্ধেয় বিবেচিত হইলে, পুনশ্চ একান্তরা-পুত্রের অসবর্ণত্ব ঐ অশ্রদ্ধেয় সূত্রের দ্বারাই সিদ্ধ হইতে পারে না! ঐ বাক্য একেবারেই অগ্রাহ্য! এই অনিবার্য্য ধ্বংস হইতে কৌটিল্য বচনকে বাঁচাইতে গিয়া 'কুশাগ্রীয়ধী' সত্যেন্দ্রবাবু সূত্রে 'অনন্তর' পুত্রগণকে 'পিতার সবর্ণ' বলা হইলেও তাহার অর্থ করিতেছেন 'মাতার সবর্ণ', অর্থাৎ পিতার অর্থ মাতা, আর ব্রাহ্মণপক্ষে ঐ মাতা ক্ষত্রিয়া, সুতরাং মিটিল আকাঙ্ক্ষা! কিন্তু আবার গোল করিয়াছে কৌটিল্য বাক্যের পরবর্ত্তী অংশ! এস্থলে "একান্তরাঃ অসবর্ণাঃ" পূর্ব্বের যুক্তি অনুসারে "মাতার অসবর্ণাঃ" এরূপ অর্থ হইলে অম্বষ্ঠ ত আর বৈশ্য হয় না! একি আঘাত! কিন্তু সত্যেন্দ্রবাবু ঐ দিকে দৃক্‌পাত করেন নাই। সত্যেন্দ্রবাবুর মতে 'অনন্তরাঃ পুত্রাঃ সবর্ণাঃ' এবং 'একান্তরাঃ অসবর্ণাঃ' র অর্থ এইরূপ—অনন্তর পুত্রগণ **মাতার** সবর্ণ, এবং একান্তর পুত্র **পিতার** অসবর্ণ!!

আমাদের কৃত মনুবাক্যের ব্যাখ্যা গ্রহণ করিলে, কৌটিল্য-বাক্যের প্রথমাংশে কোন শাস্ত্রীয় বিরোধ থাকে না, কিন্তু দ্বিতীয়াংশে

বিরোধ থাকে। এই বিরোধিতা বশতঃ ঐ অংশ একেবারেই ত্যাজ্য। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, একই বাক্য হইতে অম্বষ্ঠের বৈশ্যত্ব প্রতিপাদনার্থ 'অসবর্ণ' শব্দটুকু কুড়াইব, আর মূর্দ্ধাভিষিক্তের ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদনের ভয়ে 'সবর্ণ' শব্দটুকু উড়াইব, ইহা হইতেই পারে না।

অতএব কৌটিল্য বাক্য অমরকোষের বাক্যের ন্যায় ত্যাজ্য। অমরের বাক্য সম্বন্ধে কালীবাবু বলিয়াছেন—

"অমর কোষ প্রণয়নকালে ঐ দেশবাসী অম্বষ্ঠ শূদ্রবর্গের মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। অমর বলিয়াছেন, 'অম্বষ্ঠো বৈশ্যাদ্বিজন্মনোঃ'। টীকাকারও লিখিয়াছেন, "বৈশ্যায়াং ব্রাহ্মণাৎ জাতঃ অম্বষ্ঠঃ চিকিৎসা-বৃত্তি"ঃ। কিন্তু তা হইলে কি হইবে? শূদ্রের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে, কাজেই অমর কোষ (?) শূদ্রবর্গের মধ্যে স্থান পাইয়াছে।" (বৈদ্য, পৃঃ ১০০)

কালীবাবু বলিতে চাহিতেছেন, অমরসিংহের সময়ে অম্বষ্ঠগণ পতিত হইয়া শূদ্রাচারী হইয়াছিল, এজন্য অম্বষ্ঠকে শূদ্র বলা হইয়াছে। আমরাও বলি অমরের প্রায় সমকালীন চাণক্যও ঐ জন্যই অম্বষ্ঠকে পিতার অসবর্ণ বলিয়াছেন, উহা প্রকৃত স্মৃতিমত নহে। এখন কালীবাবু ও সত্যেন্দ্রবাবু বুঝা-পড়া করুন। মহাত্মা শঙ্কর বলিয়াছেন—

'স্মৃতিবলেন গর্জ্জমানঃ প্রতিবাদী স্মৃতিবলেনৈব নিরসনীয়ঃ' অর্থাৎ স্মৃতিবাক্যের প্রতিবাদ প্রবলতর স্মৃতিবাক্য দ্বারাই করিতে হয়। কিন্তু যে নাস্তিক চাণক্য শ্লোককে সহায় করিয়া স্মৃতিকে আক্রমণ করে, তাহার গর্জ্জন কি উপায়ে নিরস্ত হইবে?

সকল স্মৃতি একবাক্যে বলিতেছে, মূর্দ্ধাভিষিক্ত যেমন পিতৃসবর্ণ অম্বষ্ঠও তদ্রূপ পিতৃসবর্ণ। ইহা আমরা বিশদভাবে বুঝাইয়াছি। অতঃপর মূর্দ্ধাভিষিক্তের ও অম্বষ্ঠের পিতৃসবর্ণত্বে কোন বিশিষ্ট ঋষির সত্যসংকল্প যে কারণ নহে, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। এক্ষণে

সত্যেন্দ্রবাবু ও কালীবাবু একথা বুঝিলেই আমাদের শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

পঞ্চম অধ্যায়

মন্দ'নং গুণবর্দ্ধনম্

তৃতীয় অধ্যায়ে প্রমাণিত হইয়াছে যে বঙ্গীয় বৈদ্যসম্প্রদায় মুখ্য ব্রাহ্মণ, অম্বষ্ঠ নহেন। এতবস্থায় চতুর্থ অধ্যায়ে অম্বষ্ঠের বর্ণ-নির্ণয় লইয়া যে সকল কথা বলা হইয়াছে, তাহা না বলিলেও চলিত। বৈদ্যব্রাহ্মণ-সমিতির বর্ত্তমান সভাপতি শ্রীযুক্ত বৈদ্যরত্ন যোগীন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, এম্-এ মহাশয় তদীয় বৈদ্যতত্ত্ব নামক সংক্ষিপ্ত ও সার-গর্ভ পুস্তকে যথার্থই বলিয়াছেন—

"বৈদ্য কোন্ বর্ণ; এই প্রশ্নের উত্তরে আপনাদিগকে জানাই-তেছি যে আপনারা **ব্রাহ্মণবর্ণ**। যিনি যে গোত্র বলিয়া পরিচয় দেন, তিনি সেই গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষির **সাক্ষাৎ বংশধর**। আপনারা উত্তরাধিকার সূত্রে ঋষিদের নিকট হইতে আয়ুর্ব্বেদ পাইয়াছেন।

"চিকিৎসাবৃত্তি বলিলেই উহা নিন্দিত নহে। আপনারা **অনিন্দিত** চিকিৎসাবৃত্তিক ব্রাহ্মণদের বংশধর। বৈদ্যশব্দের মুখ্য অর্থ বিদ্বান্। এই অর্থে আপনারা 'বৈদ্য',* চিকিৎসক অর্থেও 'বৈদ্য'। কারণ আপনারা (বিদ্বচ্ছ্রেষ্ঠ) চিকিৎসকদিগেরই বংশধর।

* এখনও ভারতে বৈদ্যই একমাত্র সম্প্রদায় যাহাদের মধ্যে নিরক্ষর পূর্ণবয়স্ক পুরুষ প্রায় নাই, এবং এখনও চিকিৎসাশাস্ত্র বৈদ্যদিগেরই কুলাগত বিজ্ঞান।

ভারতের সর্ব্বত্র ব্রাহ্মণবর্ণের অন্তর্গত ঋষিদের বংশধর যে সব বৈদ্য আছেন, আপনারা তাঁহাদেরই জাতি। বাঙ্গালায় চরকের সনাতন বৈদ্যকুলজ ব্রাহ্মণেরা একটী স্বতন্ত্র জাতিতে পরিণত হইয়াছে। অন্যত্র কোথাও তাহা হয় নাই। আর কৌটিল্য, নীলকণ্ঠ, মেধাতিথি, কুল্লুক ভট্ট, রঘুনন্দন প্রভৃতি কি লিখিয়াছেন না লিখিয়াছেন তাহার সমালোচনা করিয়া আপনাদিগকে সময় নষ্ট কারতে হইবে না। অনন্তর, একান্তর ও দ্ব্যন্তর শব্দের অর্থ নিয়া আর তর্ক বিতর্ক করিতে হইবে না।"

মোহমুদ্গরে এ সম্বন্ধে শেষ কথা বলা হইল। বৈদ্য ও বৈদ্য-প্রতিবোধনীর ভ্রম প্রদর্শনার্থই এই পুস্তক লিখিত হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় অম্বষ্ঠত্ববিশ্বাসী কালীবাবু ও সত্যেন্দ্রবাবুর সকল কথার উত্তর ইহাতে দিতে হইয়াছে। তাঁহাদের মূল প্রতিপাদ্য এই যে, (১) বৈদ্যসম্প্রদায় অম্বষ্ঠ হইতে অভিন্ন এবং (২) অম্বষ্ঠ বৈশ্য-বর্ণীয়। সুতরাং এই দুইটী বিষয়ের উপর আমাদিগকেও এত কথা বলিতে হইল। নচেৎ ঘরের পয়সা খরচ করিয়া প্রেস্‌ওয়ালা ও কাগজওয়ালাকে প্রতিপালন করা আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে। গৃহ-কলহে লোকে এইরূপেই সর্ব্বস্বান্ত হয়, অপর লোকে মজা দেখে। আশা করি এ বিষয়ে আর লেখা-লেখি না করিয়া আমরা বন্ধুভাবে মিলিত হইয়া মতের আদান-প্রদান করিয়া পরস্পরকে বুঝিতে চেষ্টা করিব। সত্যেন্দ্রবাবু আমাদিগকে নাস্তিক, উচ্ছৃঙ্খল ও কচুরিখেকো বলিলে তাঁহার কিছু লাভ নাই। আমরাও ধূমধাম করিয়া জবাব লিখিলে আমাদের মান বাড়িবে না। যে যাহা আছেন তাহাই থাকিবেন। তবে বৃথা মনোমালিন্যের সৃষ্টি কেন?

এই অধ্যায়ে অনেক কথা পুনর্ব্বার আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু

ইহা পিষ্টপেষণের ন্যায় অর্থশূন্য নহে। কালীবাবু বা সত্যেন্দ্রবাবুকে 'নিষ্পেষিত' করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, প্রকৃত বন্ধুর ন্যায় তাঁহাদের মোহ-নিষ্পেষণই আমাদের উদ্দেশ্য। আমাদের বিশ্বাস, আমাদের বাক্যে কোথাও কটুতা থাকিলে তাঁহারা তাহা মার্জ্জনা করিবেন, ব্যক্তিগতভাবে তাঁহারা আমাদের পরম বন্ধু, এবং আমাদের যত কিছু আক্রোশ তাঁহাদের হৃদ্‌গত ঐ বন্ধুত্ব-বিঘটক ভ্রান্ত ধারণাগুলির প্রতি। আমরা তাঁহাদের ভ্রমগুলিকে একেবারে দূরীভূত করিতে চাই। সেই জন্যই এই অধ্যায়ের আরম্ভ। কথাই আছে, 'মর্দ্দনং গুণবর্দ্ধনম্'। নিম্নে সহ্য মত মর্দ্দন করা গেল।

(১) 'বৈদ্যগণ অম্বষ্ঠবর্ণ'—বৈদ্য, পৃষ্ঠা ১২

বৈদ্য বলিতেছেন, "এক্ষণে আমাদিগকে দেখিতে হইবে, বৈদ্য কোন্ বর্ণ, ব্রাহ্মণ কি অম্বষ্ঠ" (পৃঃ ৩)। প্রথম সংস্করণের পুস্তকে ৭৫ পৃষ্ঠায় ছিল—'বৈদ্যগণ অম্বষ্ঠবর্ণ; একতর ব্রাহ্মণ নহে।' এরূপ বর্ণজ্ঞান-হীন বৈদ্যের সহিত শাস্ত্রীয় বিচারে অগ্রসর হওয়াও মহাপাপ। দ্বিতীয় শলাকার অজ্ঞাত লেখক ইহার জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত করিবার চেষ্টা করিয়াও সফলকাম হন নাই। তাই দেখিতেছি দ্বিতীয় সংস্করণ বৈদ্যের ১১৫ পৃষ্ঠায় "বৈদ্যগণ অম্বষ্ঠ (বৈশ্য) বর্ণ" এবং ১২ পৃষ্ঠায় 'অম্বষ্ঠবর্ণ' এখনও জাজ্বল্যমান রহিয়াছে! এত বয়সেও যে বৈদ্যের বর্ণজ্ঞান বাল্য-বয়সের সীমা অতিক্রম করিল না, সে মহামহোপাধ্যায় বৈদ্য পণ্ডিতগণের সহিত বিচারে অগ্রসর হয় কোন্ সাহসে? 'বিপ্রবৎ বিপ্রবিন্নান্' ইত্যাদি স্থলেও আমরা এই বৈদ্যের সংস্কৃত জ্ঞানের পরিচয় পাইয়াছি (পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য)। কিন্তু 'অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম'—সাক্ষর হওয়া বড় সহজ নয়!

(২) 'বরাবর ১৫ দিন অশৌচ'—পৃষ্ঠা ২

শ্রীযুক্ত কালীবাবু বৈদ্যপুস্তকের ১—২ পৃষ্ঠায় বৈষ্ণবযুগ হইতে আরম্ভ

করিয়া বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত, অর্থাৎ সুদীর্ঘ পঞ্চশত বৎসরের মধ্যে বৈদ্যসমাজে কোন পণ্ডিত বৈদ্যই হৃদয়ে ব্রাহ্মণ্যের অভিমান পোষণ করিতেন না, ইহা প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিয়া তাঁহার মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে আমাদিগকে সন্দিহান করিয়া তুলিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি মহামহোপাধ্যায় দ্বারকানাথ কবিরত্ন পর্য্যন্ত কতকগুলি প্রাচীন বৈদ্য পণ্ডিতের নাম উল্লেখপূর্ব্বক লিখিয়াছেন—"এই সকল শাস্ত্রজ্ঞ মহা মহা পণ্ডিতগণ কেহই কখনও সেন শর্ম্মা বা দাশশর্ম্মা প্রভৃতি উপাধি গ্রহণ করেন নাই, এবং বরাবরই ১৫ দিন অশৌচ পালন করিতেন।"

শ্রীযুক্ত কালীবাবু ইহা দ্বারা বৈদ্য সমাজকে এই কথা বুঝাইতে চাহেন যে, যে হেতু তাঁহারা ১৫ দিন অশৌচ পালন করিতেন, সেই হেতু তাঁহাদের সকলের এই বিশ্বাস ছিল যে, বৈদ্যগণ 'জন্মতঃ বৈশ্যবর্ণ' এবং বৈশ্যাচারই তাহাদের স্বধর্ম্ম! আমরা পূর্ব্বেই এ কথা বলিয়াছি যে, ঐ তালিকার মধ্যে উল্লিখিত অশেষ শাস্ত্রদর্শী ৺ মহামহোপাধ্যায় দ্বারকানাথ সেন কবিরত্ন মহাশয় বৈদ্যজাতিকে ব্রাহ্মণবর্ণীয় বলিয়াই চিরকাল বিশ্বাস করিতেন এবং তৎসম্বন্ধে পুস্তক লিখিয়া ও মৌখিক উপদেশ দিয়া বৈদ্যগণকে ব্রাহ্মণ্যে উদ্বোধিত করিবার চেষ্টা করিতেন। আমরা ইহাও বলিয়াছি যে, মহামহোপাধ্যায় দ্বারকানাথের পূর্ব্ববর্ত্তী বা সমসাময়িক বহু 'মহা মহা পণ্ডিত' যাঁহারা আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়াই জানিতেন, তাঁহাদের নাম ঐ তালিকা হইতে ইচ্ছাপূর্ব্বক বাদ দেওয়া হইয়াছে! মহামহোপাধ্যায় দ্বারকানাথ যে বৈদ্যের ব্রাহ্মণ্য সম্বন্ধে পুস্তক লিখিয়াছিলেন, তাহা কালীবাবুর জানা ছিল না, সেই জন্যই তিনি মহামহোপাধ্যায়কে নিজের পক্ষে টানিয়া দল ভারী করিয়াছেন! কিন্তু আচার্য্য গঙ্গাধর, পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমৎ পরমহংস কৃষ্ণানন্দস্বামী, বেদাচার্য্য উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, পণ্ডিত প্যারীমোহন, কবিরাজ গোপীচন্দ্র, প্রভৃতি ভাস্করতুল্য প্রতিভাসম্পন্ন বৈদ্যপণ্ডিতগণকে সযত্নে ও সুকৌশলে

বাদ দিয়াছেন, কারণ কালীবাবু জানেন যে, তাঁহারা যে কেবল বৈদ্যের ব্রাহ্মণ্যে বিশ্বাস করিতেন তাহা নয়, স্বজাতির হৃদয়ে ঐ ধর্ম্মবিশ্বাস বদ্ধমূল রাখিবার জন্য গভীর গবেষণা পূর্ব্বক প্রত্যেকেই এক এক খানি পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন।* যে সময়ে মুদ্রাযন্ত্রের অভাবে কোন পুস্তকই তাদৃশ সুলভ ছিল না, সে সময়ে হাতের লেখা পুঁথি ঘাঁটিয়া পাঠ উদ্ধার পূর্ব্বক প্রতিপক্ষের সম্মুখীন হওয়া ও স্বমতের প্রতিষ্ঠা করা কিরূপ ক্লেশসাধ্য ব্যাপার ছিল, তাহা আজকাল অনেকে কল্পনা করিতেও পারেন না। বিদ্যাসাগর মহাশয় দিবারাত্র সংস্কৃত কলেজের পাঠাগারে পুঁথির স্তূপের মধ্যে বসিয়া যে সকল প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া বিপক্ষ দলকে চমৎকৃত করিতেন, সে সকল প্রমাণ আজকাল যে কেহ পাঁচ সিকা মাত্র ব্যয়ে স্মৃতিসংহিতা গুলি ক্রয় করিয়া দু' এক ঘণ্টা পাতা উল্টাইলেই বাহির করিতে পারে! আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী বৈদ্য-পণ্ডিতগণ যে সময়ে পুস্তক লিখিয়াছিলেন, সে সময়ে সবেমাত্র দুই এক খানি করিয়া সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রিত হইতেছে। স্বজাতির গৌরবরক্ষার্থ তাঁহাদের সেই অসাধারণ শ্রমসহিষ্ণুতা ও অলৌকিক অধ্যবসায়ের কথা স্মরণ করিলে শ্রদ্ধাভক্তিভরে তাঁহাদের চরণোদ্দেশে মস্তক নত হয়। ইঁহারা চাপে পড়িয়া বৈশ্যাচার পালন করিয়া থাকিলেও বৈদ্যের পক্ষে তাহা যে প্রকৃত সদাচার নহে, তাহাই ত প্রত্যেককে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা জানিতেন ব্রাহ্মণাচারই বৈদ্যের প্রকৃত স্বধর্ম্ম, বৈশ্যাচার স্বধর্ম্ম নহে। তাঁহাদের অন্তরের বাসনা এই ছিল যে, তাঁহারা স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণের অত্যাচারে বৈশ্যাচার পালন করিতে বাধ্য

* পণ্ডিত প্যারীমোহনের 'বৈদ্যবর্ণ বিনির্ণয়' ৬০০ পৃষ্ঠারও অধিক, ইহা চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে রচিত হয়। পণ্ডিত উমেশ চন্দ্রের 'জাতিতত্ত্ব বারিধি' ৭০০ পৃষ্ঠারও অধিক, কবিরাজ গোপীচন্দ্রের 'বৈদ্য পুরাবৃত্ত' প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠা ব্যাপী; কবিরাজ গঙ্গাধরের প্রমাদভঞ্জনী নাম্নী মনুটীকা প্রায় সহস্র পৃষ্ঠাব্যাপী ইত্যাদি।

হইলেও, তাঁহাদের ভাবী বংশধরেরা একদিন ঐ পাপ মুছিয়া ফেলিবে! আজ আমরা তাঁহাদের সাধনার সাফল্য প্রত্যক্ষ করিতেছি! অৰ্দ্ধ সহস্র বর্ষব্যাপী সুদীর্ঘকালে বৈদ্য পণ্ডিতগণ 'বরাবরই ১৫ দিন অশৌচ পালন করিতেন' ত্রিকালজ্ঞ কালীবাবু ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন. কিন্তু স্বজাতির অধঃপতন প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহারা যে দুর্ব্বিষহ যাতনা অনুভব করিতেন, তাহা ত তাঁহার মানস চক্ষে প্রতিভাত হয় নাই! আমরা মহামহোপাধ্যায় ভরতমল্লিকের প্রসঙ্গে একথা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি। মহামহোপাধ্যায় আপনার জাতিকে জন্মতঃ 'বর্ণোত্তম', 'বিপ্রবৎ', "স্বগোত্রভাক্' বলিয়াছেন। তিনি স্পষ্ট বাক্যে বলিয়াছেন যে বৈদ্যের বৈশ্যাচার তাহার জন্মসিদ্ধ আচার বা সদাচার নহে। কালীবাবু বৈশ্যত্ব ও শূদ্রত্বের প্রতিবাদকারী এই মহামহোপাধ্যায় ভরত মল্লিককেও নিজের তালিকাভুক্ত করিয়াছেন! স্বজাতিকে বঞ্চনা করিবার এতই কি প্রয়োজন হইয়াছে, যে মিথ্যা বাক্যদ্বারা জগৎ সংসারকে ঢাকিবার চেষ্টা? তর্কের খাতিরে যদিই স্বীকার করা যায় যে, মহামহোপাধ্যায় ভরত মল্লিক প্রমুখ বৈদ্যগণ শর্ম্মাশব্দ ব্যবহার করেন নাই, বা ১৫ দিন অশৌচ পালন করিয়াছেন, কিন্তু তাই বলিয়া বৈদ্যগণ কি 'জন্মতঃ বৈশ্যবর্ণ' হইয়া গেল? তবে মহারাজ রাজবল্লভের পূর্ব্বপুরুষগণ কয়েক পুরুষ শূদ্রাচার পালন করিয়াছিলেন বলিয়া বৈদ্যগণ জন্মতঃ শূদ্রও ত হইতে পারে? শূদ্রাচারই ত বৈদ্যের স্বধর্ম্ম হইতে পারে? কালীচরণ বাবু যখন শূদ্রত্ব স্বীকার করিতে ইচ্ছুক নহেন, তখন বৈশ্যত্বের প্রতিই বা তাঁহার এমন অহেতুক প্রেম কিসের জন্য?

প্রবীণ উকিলেরা বিপক্ষের উত্তম উত্তম সাক্ষীকে হস্তগত করিতে যেমন পটু, বিপক্ষের সাক্ষীকে ডাক্ না দিয়াই কৌশলক্রমে 'গরহাজির' প্রতিপন্ন করাইতেও তেমনই মজবুত। কালীবাবুও এক দিকে দ্বিজ রামপ্রসাদ ও আচার্য্য গঙ্গাধর প্রমুখ বৈদ্য পণ্ডিতগণকে 'গরহাজির'

দেখাইয়াছেন এবং অন্যদিকে মহামহোপাধ্যায় ভরত মল্লিক, মহামহোপাধ্যায় দ্বারকানাথ প্রভৃতিকে জবরদস্তি পূর্ব্বক মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়াইয়াছেন। ইদানীন্তন কালের বিস্তীর্ণ কুলগ্রন্থ-প্রণেতা শ্যামলাল মুন্সী ও পরিব্রাজক শ্রীমৎ পরমহংস শ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামী মহাশয়কেও তাঁহার স্মরণ হয় নাই! কালীবাবুর তালিকায় মহামহোপাধ্যায় শ্রীপতি দত্ত প্রভৃতি পণ্ডিতগণের নাম আছে. কিন্তু ইহারা 'নামান্তে শর্ম্মা ব্যবহার করিতেন না এবং বরাবরই ১৫ দিন অশৌচ পালন করিতেন.' ইহা কালীবাবুকে কে বলিল? তাঁহারা যে গঙ্গাধরাদির ন্যায় বৈদ্যের ব্রাহ্মণ্যে বিশ্বাসী ছিলেন না, তাহাই বা কালীবাবুকে কে বলিল? গঙ্গাধরাদি পণ্ডিতগণ স্ব স্ব স্বাধীন মতের অনুসরণ করিয়া সহসা এক দিন অব্রাহ্মণ বৈদ্যকে বঙ্গ সমাজে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত করিয়াছিলেন, কালীবাবু এরূপ ভাবেন কেন? মহামহোপাধ্যায় ভরত মল্লিকের উক্তি হইতেই কি ইহা সপ্রমাণ হয় না যে, নিখিল বৈদ্যজাতির ইহাই দৃঢ়প্রত্যয় ছিল যে, তাঁহারা 'জন্মতঃ ব্রাহ্মণ বর্ণ'? তবে প্রাচীনেরা 'শর্ম্মা লিখিতেন না' এবং 'বরাবরই ১৫ দিন অশৌচ করিতেন' এ কথা ত নিতান্তই মিথ্যা কথা! বৈদ্যব্রাহ্মণ-সমিতির মত হইতে প্রাচীনদিগের মতের এইটুকু মাত্র প্রভেদ ছিল যে, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ স্মার্ত্তারোপিত অম্বষ্ঠত্বকে অগ্রাহ্য করিতে পারেন নাই। কিন্তু এই মিথ্যারোপিত অম্বষ্ঠত্বকে স্বীকার করিলেও পূর্ব্বপুরুষগণ স্বজাতির ব্রাহ্মণ্যে কোনও দিন সন্দিহান হন নাই। বস্তুতঃ ব্রাহ্মণ্যে বিশ্বাস চিরকাল জাগরূক ছিল বলিয়াই তাঁহারা ব্রাহ্মণত্ব প্রতিপাদক পুস্তকাবলী লিখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং সমাজও তাঁহাদের বাণীকে ধর্ম্মোপদেশজ্ঞানে শিরোধার্য্য করিয়াছিল।

প্রাচীন বৈদ্যপণ্ডিতগণের নামান্তে 'শর্ম্মা' শব্দ না লিখিবার কারণ এই যে, প্রাচীনযুগে ঐরূপ রীতি অনুসৃত হইত না, যথা কালিদাস,

শ্রীহর্ষ, ভারবি, বোপদেব, জয়দেব ইত্যাদি। ইহারা কেহই নামান্তে 'শর্ম্মা' শব্দ ব্যবহার করেন নাই। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাদের ব্রাহ্মণ্যে কেহ সন্দেহ করে কি? তবে ভূরি ভূরি সংস্কৃত গ্রন্থ-রচয়িতা, মহা-মহোপাধ্যায় উপাধিধারী বৈদ্যের পক্ষে 'শর্ম্মা' শব্দের অভাব হেতু সে সন্দেহ জাগিয়া উঠে কেন? বিরুদ্ধ ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় এরূপ বলিলে তাহার কারণ বুঝা যায়, কিন্তু কালীবাবু এমন কথা বলেন কি জন্য? সন্দেহ হ'লেও, সকল দিক দেখিয়া benefit of doubt দেওয়াও কি অসঙ্গত? প্রাচীন বৈদ্যপণ্ডিতগণ কি কুত্রাপি আপনাদিগকে 'সেনগুপ্ত' 'দাশগুপ্ত' বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন? তবে তাঁহারা যে কালীবাবুর সপক্ষে ছিলেন, এবং ১৫ দিন অশৌচ পালন করিতেন, এমন জোর সিদ্ধান্ত কালীবাবু কিরূপে করিলেন? কালীবাবু কোন প্রাচীন বৈদ্যপণ্ডিতের নামান্তে 'গুপ্ত' উপাধি দেখাইতে পারেন নাই, কিন্তু তথাপি সকলের মনে ধোঁকা জন্মাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ বলিতেছেন, "বৈদ্যগণ **চিরকাল গুপ্ত উপাধি** ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন" (পৃঃ ১১২), "**কেহ কখনও শর্ম্মা লেখেন নাই**" (পৃঃ ৩৮)*, "**বরাবরই ১৩ দিন অশৌচ** পালন করিতেন" (পৃঃ ৩), "বৈদ্যগণ **বরাবরই গুপ্ত** উপাধি লিখিয়া আসিতেছেন" (পৃঃ ৩৮)। ত্রিকালজ্ঞ সাজিয়া এমন লোকবঞ্চনা করিবার সাহস অতি অল্প লোকেরই দেখা যায়।

(৩) '**বরাবরই গুপ্ত উপাধি**'—পৃঃ ৩৮

আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, কালীবাবু মাত্র একবৎসর হইল, গুপ্ত সেবা আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহার জ্ঞাতি-দায়াদগণ সকলেই

* প্রাচীন বৈদ্যদিগের নামান্তে 'শর্ম্মা' ব্যবহারের নিদর্শন আমরা কিছু পূর্ব্বে দিয়াছি।

নামান্তে মাত্র 'সেন' পদবী ব্যবহার করেন, কেহই 'সেনগুপ্ত' ব্যবহার করেন না। ইহাই তাঁহাদের আবহমান-কালাগত কুলাচার। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পুরাতন বর্ষপঞ্জী ও প্রাচীন দলিল পত্রাদি দেখিলেই বুঝা যায় যে 'সেন', 'দাশ' প্রভৃতি উপাধিতে 'গুপ্ত' সংযোগের রীতি ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে ছিল না। বস্তুতঃ কি আধুনিক কি প্রাচীন কোনও বৈষয়িক কাগজ পত্রে যেমন কোনও বৈদ্যের জাতি নাম অম্বষ্ঠ' দেখা যায় না, সর্ব্বত্রই 'বৈদ্য নাম বর্ত্তমান, তদ্রূপ দুই পুরুষ পূর্ব্বে বৈশ্যত্ববাচক 'গুপ্ত' উপাধিও কোন বৈদ্য ব্যবহার করিতেন না। মহামহোপাধ্যায় ভরত মল্লিক ও মহারাজ রাজবল্লভ অম্বষ্ঠত্ব প্রচার করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু 'গুপ্ত' উপাধির প্রচার করেন নাই। ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে সমাজে সহসা গুপ্ত-প্রীতি আবির্ভূত হইলেও, সর্ব্ব সাধারণে এখনও উহা গ্রহণ করেন নাই। কোন কুলগ্রন্থেই 'সেন', 'দাশ', 'দত্ত' ইত্যাদির পর 'গুপ্ত' পদটী সংযুক্ত দেখা যায় না। 'গুপ্ত' পদবীর আধুনিকত্ব সম্বন্ধে বৈদ্য-প্রবো-ধনীতে এইরূপ লেখা হইয়াছে—

"গুপ্তান্ত নাম ব্যবহার নিতান্ত আধুনিক, অতএব ইহা অবশ্য বর্জ্জনীয়" (বৈদ্যপ্রবোধনী পৃঃ ৩৩) "গত ৫০ বৎসরের মধ্যে কত বৈদ্য প্রথমে দাসগুপ্ত লিখিতে আরম্ভ করেন, এবং শেষে এখন আসল পদবী 'দাশ' ছাড়িয়া কেবল 'গুপ্ত' লিখিতেছেন। ইহা কি লজ্জার বিষয় নহে ?" (বৈদ্যপ্রবোধনী পৃঃ ৩৪)।

কালাবাবু ইহার বিরুদ্ধে লিখিয়াছেন,—"বৈদ্যগণ মাত্র ৫০।৬০ বৎসর হইতে 'গুপ্ত' পদবী গ্রহণ করিতেছেন, একথা যে মিথ্যা, তাহা দেখাইবার জন্য মহারাজ রাজবল্লভের দানপত্রের প্রতিলিপি দেওয়া হইল। এই দান পত্রে তিনি বাঃ ১১৬৫ সনে স্বহস্তে 'শ্রীরাজবল্লভ সেন গুপ্তস্য' লিখিয়াছিলেন। বিক্রমপুরের অশেষ-শাস্ত্রদর্শী যশস্বী ৺ভগবানচন্দ্র দাসগুপ্ত কবিরাজ মহাশয় ঢাকা নগরীতে বহুকাল

সুখ্যাতির সহিত কবিরাজি করিয়া বিগত ১৩২২ সনে ৮৭ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি শ্রীমন্মাধব নিদানের মনোরমা-টীকাতে এইভাবে আত্মপরিচয় দিয়াছেন, 'শ্রীরূপচন্দ্র-দাসগুপ্তাত্মজ—শ্রীভগবান্‌চন্দ্র-দাসগুপ্ত-কৃতায়াং মনোরমা-পঞ্জিকায়াং।' ইহা দ্বারাও আমরা ৫০।৬০ বৎসর মাত্র গুপ্ত লিখিতেছি—এই অসার উক্তি নিরাকৃত হইতেছে।" (বৈদ্য, পৃঃ ৯)

কালীবাবুর প্রদত্ত গুপ্তান্ত নামের উদাহরণ-সংখ্যা বহুবচনে পঁহুছিল না! যে দুইটী নাম তিনি দিয়াছেন, তাহার একটী মহারাজ রাজবল্লভের স্বহস্তলিখিত স্বাক্ষর—'শ্রীরাজবল্লভ সেনগুপ্তস্য'। আমরা স্পষ্টই বলিতেছি, কালীবাবুর সত্যবাদিতার প্রমাণ যেরূপ পদে পদে পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে ইহা বিশ্বাস করিতে আমাদের প্রবৃত্তি হয় না। ইহার সম্বন্ধে পূর্ব্বে আমরা বিশেষ রূপে বলিয়াছি। মহারাজের ৺কাশীধামস্থিত প্রাসাদেও 'রাজবল্লভ সেন'ই উৎকীর্ণ আছে, 'সেনগুপ্ত' নাই! অন্য প্রমাণ ভগবানচন্দ্র দাস কবিরাজ মহাশয়ের কৃত মনোরমা পঞ্জিকায় আছে। শ্রীযুক্ত ভগবান্‌ দাস বাঙ্গালা ১৩২২ সনে ৮৭ বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন; তাহা হইলে তাঁহার জন্ম বৎসর (১৩২২—৮৭=) ১২৩৫ সন। কিন্তু তিনি কত সনে তাঁহার নিদান টীকা শেষ করেন, তাহা কালীবাবু বলেন নাই। অর্দ্ধেক বয়সের পূর্ব্বে অর্থাৎ চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে অর্থাৎ (১২৩৫+৪০=) ১২৭৫ সনে টীকা লেখা শেষ হইয়া থাকিলেও সে ত ঠিক (১৩৩৫—১২৭৫=) ৬০ বৎসরেরই কথা! তবে এই জাতীয় উদাহরণের দ্বারা প্রবোধনীর উক্তির অসারত্ব কিরূপে সপ্রমাণ হইল, এবং কিরূপেই বা তাহা নিরাকৃত হইল? ৫০।৬০ বৎসর ত বেশী দিনের কথা নয়, তবে কালীবাবু এই সামান্য কালের পূর্ব্ববর্ত্তী ২০।২৫টা উদাহরণ টকাটক্‌ দিয়া ফেলিলেন না কেন? তাহা হইলেই ত প্রবোধনী

-হার মানিত! তবেই দেখা যাইতেছে যে, নিজের ঘরের আমদানি 'রাজবল্লভের দানপত্র' ব্যতীত তাঁহার ঝুলিতে আর কোন প্রমাণ নাই!

এমন নিঃসম্বল হইয়াও কালীবাবু যেরূপ চতুরতার সহিত কথার বাণিজ্য চালাইয়াছেন, তাহাতে সত্যই অবাক্ হইতে হয়। যথেষ্ট প্রাবীণ্য না থাকিলে এরূপ ক্ষমতা হয় না! কিন্তু নিজের জাতি লইয়া সজাতিদিগের সহিত এমন মোকদ্দমা চালান কেন? শাস্ত্রকার সত্যই বলিয়াছেন, 'নাস্তি মোহসমো রিপুঃ'।

(৪) **'কুলজী গ্রন্থ ব্রাহ্মণত্বের পরিপোষক নহে—পৃঃ ৫**

কালীবাবু ৫ম পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—"বৈদ্যগণের অনেক কুলজীগ্রন্থ আছে, তাহার একখানিও ব্রাহ্মণত্বের পরিপোষক নহে।" ইহার সবিস্তর উত্তর পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে। মহামহোপাধ্যায় ভরত-মল্লিকের চন্দ্রপ্রভা বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্বের জাজ্বল্যমান প্রমাণ, কিন্তু তাহা কালীবাবুর মোহতিমিরান্ধ নয়নে দৃষ্টি শক্তির উন্মেষ করিতে সমর্থ হয় নাই। বৈদ্যব্রাহ্মণ-সমিতির প্রতিষ্ঠাতৃগণ ও পৃষ্ঠপোষকগণ ঐ মহামহো-পাধ্যায়েরই অনুসরণ করিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে কেবল একটুকু প্রভেদ এই যে, মহামহোপাধ্যায় ভরতমল্লিক (মহারাজ রাজবল্লভের মত) রঘুনন্দনদিগের শাসনসিদ্ধ বৈশ্যত্ব একেবারে অগ্রাহ্য করিতে পারেন নাই, কিন্তু বৈদ্যব্রাহ্মণ-সমিতি কোন রঘুনন্দনকেই মানিতে প্রস্তুত নহেন, ঋষিপ্রণীত শাস্ত্র ও ভগবদুক্তি ব্যতীত রাগদ্বেষের বশীভূত কোন স্বার্থপর স্মার্ত্তকেই বৈদ্যব্রাহ্মণ-সমিতি তাহার ভাগ্যনিয়ামক বলিয়া গ্রাহ্য করে না। বৈদ্য-সমাজ চিরকালই ব্রাহ্মণ-সমাজের একটী অংশ, কে তাহাকে বৈশ্যবর্ণ বলে? রঘুনন্দন মস্ত পণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু তাহাতে বৈদ্যসমাজের কি? বৈদ্যসমাজে তদপেক্ষা অনেক 'মহা-মহাপণ্ডিত' জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। বৈদ্য-সমাজের মঙ্গলার্থ এই স্বজাতীয়

পণ্ডিতগণ যে সকল শাস্ত্রসিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, অথবা প্রকাশ করিতেছেন, তাহাই বৈদ্যগণের শিরোধার্য্য। স্বয়ং শাস্ত্ররূপী ভগবান্ যখন বলিতেছেন যে, **অম্বষ্ঠ জন্মতঃ ব্রাহ্মণ**, তখন (অম্বষ্ঠত্ব-বিশ্বাসী) ভরত বৈদ্যের বৈশ্যাচার ও শূদ্রাচার প্রত্যক্ষ করিয়া মহারাজ রাজবল্লভ অপেক্ষা যে শতগুণ দুঃখ অনুভব করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। বৈদ্য মুখ্য ব্রাহ্মণ, অম্বষ্ঠ নহে, এই বিশ্বাস যাঁহাদের আছে তাঁহাদের কত দুঃখ তাহা কে বলিবে ?

কুলচন্দ্রিকার যে জাল বচনগুলিকে কালীবাবু বৈশ্যত্বের পরিপোষক মনে করেন, তাহাও নিঃসংশয়ে ব্রাহ্মণত্বেরই পরিপোষক *। যদি কেহ বলে, কালীবাবুর **পবিত্র** বংশে যে সকল মহাত্মা প্রাচীন কালে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই ব্রাহ্মণ বলিয়া বিদিত ছিলেন, পরে তাঁহাদের সন্তানেরা ক্ষত্রিয় আচার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার পরে বৈশ্যাচার কুলাচার হইয়াছিল, এক্ষণে তাঁহারা শূদ্রাচারী হইয়াছেন, অতএব শূদ্রাচারই তাঁহাদের পালনীয়, তাঁহারা শূদ্র, তাহা হইলে কেমন বোধ হয় ? ঐ উক্তিই কি কালীবাবুর বংশের শূদ্রত্বে প্রমাণ হইবে ? যদি না হয়, তবে বৈশ্যত্বে বা ক্ষত্রিয়ত্বেই বা কিরূপে প্রমাণ হয় ? প্রকৃতিস্থ ব্যক্তিমাত্রই উহাকে কালীবাবুর বংশকে ব্রাহ্মণ বংশ বলিয়া জানিবে, কালীবাবু তাহা স্বীকার করুন, আর নাই করুন। তবে ১৩৪৭ খ্রীষ্টাব্দের কুলচন্দ্রিকা ১৬৭৫ খ্রীষ্টাব্দের চন্দ্রপ্রভা, বৈদ্যসম্প্রদায়কে ব্রাহ্মণবর্ণ বলিয়া বিদিত করিলেও, কালীবাবু তাহা অস্বীকার করেন কিরূপে ?

আমরা কালীবাবুর কথাতেই কালীবাবুর উত্তর দিলাম, অন্যথা

---

* সত্যে বৈদ্যাঃ পিতৃতুল্যা ত্রেতায়াঞ্চ তথা মতাঃ।
দ্বাপরে.......................................।
কণ্ঠহার-ভূমিকাধৃত কুলচন্দ্রিকাবচন।
কালীবাবু বলিয়াছেন, এই সংস্করণের কণ্ঠহার 'একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ'।

কুলচন্দ্রিকার বচন যে জাল, তাহা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ভরত যে দায়ে পড়িয়া অম্বষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহাও পূর্ব্বে বলিয়াছি। পাঠকের স্মরণার্থ পুনশ্চ সংক্ষেপে বলি। চায়ু, দুর্জ্জয় ও কণ্ঠহারের কুলপঞ্জীতে 'অম্বষ্ঠ' শব্দই নাই। কোন বৈশ্যার গর্ভে ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈদ্যের উৎপত্তি, এমন কোন কথাই ঐ সকল কুলপঞ্জিকাতে নাই। ইহা হইতেই বুঝা যায় রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ কুলজীতে যেমন ব্রাহ্মণের উৎপত্তি-কাহিনী দিবার প্রয়োজন হয় নাই, সেইরূপ বৈদ্যকুলজীতেও; (বৈদ্য মুখ্য ব্রাহ্মণ, বর্ণান্তর্গত কোন জাতি বিশেষ নহে, সকলের এরূপ জ্ঞান থাকায়) বৈদ্যোৎপত্তি নামক কোন অদ্ভুত অধ্যায় দেখা যায় না। কুলপঞ্জিকাকারদিগের যদি এরূপ জ্ঞান থাকিত যে, বৈদ্য মুখ্য ব্রাহ্মণ নহে; কিন্তু একটা মিশ্র জাতিবিশেষ, তাহা হইলে সকল কুলগ্রন্থেই তাহার উল্লেখ ও বর্ণনা থাকিত। ১৩৪৭ খ্রীষ্টাব্দের চতুর্ভুজ প্রণীত কুলচন্দ্রিকায় ঐরূপ বর্ণনা থাকিলে,অথবা অম্বষ্ঠেরা বৈশ্যবর্ণ, তাহাদের ক্রিয়াকর্ম্ম বৈশ্যবৎ এরূপ শাস্ত্রোক্তি বা শাস্ত্রমর্ম্ম বৈদ্যসমাজ কোন কালে বিদিত থাকিলে, ১৪০০ খৃষ্টাব্দের দুর্জ্জয়ে ও ১৬৫৩ খ্রীষ্টাব্দের কণ্ঠহারে তাহা নিশ্চয় থাকিত। ১৬৭৫ খ্রীষ্টাব্দে চন্দ্রপ্রভা গ্রন্থেও ভরত চতুর্ভুজের অনুসরণ করিতেন, নূতন একটা গল্পের অবতারণা করিতেন না। ভরতের গল্পে গালব মুনি নাই, জলকুম্ভশোভিতকক্ষা বৈশ্যকন্যা নাই, কুশপুত্তল নাই, ধন্বন্তরির ২৫টী কন্যাও নাই! চতুর্ভুজে এ সমস্তই আছে, কিন্তু কোন বৈশ্যকন্যাকে কোন ব্রাহ্মণ বিবাহ করিল না, অথচ একগোত্রীয়া কতকগুলি অজ্ঞাতবর্ণা সহোদরার গর্ভে দাশ, সেন, দত্ত, গুপ্ত প্রভৃতি পদবীধারী বৈদ্য বংশগুলি জন্মগ্রহণ করিলেন! এই সমস্ত পরস্পর 'মাস্ততো ভাই' বৈদ্যগণের জন্ম-কথাকে স্কন্দপুরাণের নাম দিয়া প্রামাণিক করিবার চেষ্টা হইয়াছে। এমন উৎপত্তিকাহিনী ভূ-ভারতে আর কোন জাতির নাই! আবার পরম আশ্চর্য্যের বিষয়, এই গল্প কথাগুলি স্কন্দ-

পুরাণেও নাই! কেনই বা থাকিবে? বাঙ্গালার বৈদ্যসম্প্রদায়ের জন্য কোন্ বেদব্যাসের এত মাথা ব্যথা? বস্তুতঃ, এই অনির্ব্বচনীয় বৈদ্যোৎপত্তিকাহিনী প্রকৃত স্কন্দবচন হইলে, প্রাচীনতম মহাত্মা চায়ু হইতে আরম্ভ করিয়া দুর্জ্জয়, কণ্ঠহার ও ভরত তাহাকে সাগ্রহে স্ব স্ব গ্রন্থে অন্তর্নিবিষ্ট করিতেন। মহামহোপাধ্যায় ভরত মল্লিক ১৪০০০+৩০০০=১৭০০০ সুললিত সংস্কৃত শ্লোকে বৈদ্যকুলের বর্ণনা করিয়াছেন। এই সম্মিলিত গ্রন্থদ্বয় প্রায় বাল্মীকির রামায়ণের ন্যায় সুবৃহৎ ও সুললিত। এই বিস্তীর্ণ গ্রন্থদ্বয়ে তিনি বৈদ্য-বংশাবলী বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু জাতীয় উৎপত্তিকাহিনী বর্ণনা করিবার সময়ে তাঁহার স্থানাভাব হইল, স্কন্দপুরাণের প্রামাণিক কথাগুলি সন্নিবেশিত করিবার বা স্কন্দপুরাণের নামটী লইবারও অবসর হইল না, ইহা আমরা বিশ্বাস করি না। সকল দিক দেখিয়া আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে এই যে, চতুর্ভুজের ঐ বিবরণ ভরত মল্লিকের পরে রচিত, এবং স্কন্দপুরাণের নাম দিয়া চতুর্ভুজের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত। খুব সম্ভব, ভরতের এক শত বৎসর পরে মহারাজ রাজবল্লভ পরের কথায় প্রবঞ্চিত হইয়া যখন আপনার অম্বষ্ঠত্ব ঢাক-ঢোল পিটিয়া প্রচার করিয়াছিলেন, এবং পূর্ব্ববঙ্গীয় বৈদ্যদিগের মধ্যে বৈশ্যবৎ উপনয়ন ও শৌচকর্ম্মের প্রবর্ত্তন করেন, তখন তিনিই এই কার্য্য করাইয়া থাকিবেন। মহারাজ রাজবল্লভ 'যাহা পাই যথা লাভ' জ্ঞানে এবং পতিত রাঢ়ের অনুকরণে ভ্রমক্রমে যাহা করিয়াছিলেন, তাহরিই বংশধর ধর্ম্মভূষণ কালীবাবু সেই অম্বষ্ঠত্ব ও বৈশ্যত্বকে জড়াইয়া ধরিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস, এই পুস্তকখানি ধীর ভাবে পাঠ করিলে যশস্বী মহারাজের অন্যান্য বংশধরদিগের ন্যায় আমাদের এই অজ্ঞান ভ্রাতাটীও আপনার ভ্রান্তি বুঝিতে পারিয়া বৈদ্য-ব্রাহ্মণ-সমিতির পৃষ্ঠপোষণ করিতে কালবিলম্ব করিবেন না। 'লোকোপহসিতাঃ শশ্বৎ বোধং যান্তি—'।

(৫) ধন্বন্তরিগোত্রীয় কালীবাবুর গোত্রকারক ধন্বন্তরি বৈশ্য !

বৈশ্যপ্রবোধনী বশিষ্ঠকে বৈশ্য বলিয়াছে, ইহা কালীবাবুর সহ্য হয় না। তিনি ধন্বন্তরিকেও ব্রাহ্মণ বলিতে চাহেন না। শ্রীযুক্ত কালীবাবু ধর্ম্মভূষণ, বিদ্বান্ তদুপরি প্রাচীন, তিনি যে ধন্বন্তরিকে বৈশ্য বলিবেন, ইহা আমাদের স্বপ্নের অগোচর। বৈশ্য পুস্তকের এক স্থানে (দ্বিতীয় সংস্করণ, ২১ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন—

"ক্ষীরোদমথনে বৈদ্যো দেবো ধন্বন্তরির্হ্যভূৎ।
বিভ্রৎ কমণ্ডলুং পূর্ণমমৃতেন সমুত্থিতঃ ॥—গরুড়পুরাণ।

বৈদ্যপ্রবোধনীর অনুবাদ—'সমুদ্রমন্থনকালে অমৃতপূর্ণ কমণ্ডলু হস্তে বৈদ্য ধন্বন্তরি দেব প্রাদুর্ভূত হইলেন।'

এই ধন্বন্তরি অযোনিসম্ভব, সমুদ্রগর্ভ হইতে সমুদ্ভূত। ভাগবতে তিনি বিষ্ণুর অংশ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন—

স বৈ ভগবতঃ সাক্ষাৎ বিষ্ণোরংশাংশসম্ভবঃ।
ধন্বন্তরিরিতি খ্যাত আয়ুর্ব্বেদদৃগিজ্যভাক্ ॥ ৮।৮।২৩

গরুড় পুরাণের উদ্ধৃত শ্লোকের বৈদ্য শব্দের অর্থ বিদ্বান্ বা চিকিৎসক যাহাই হউক, তদ্দ্বারা বঙ্গীয় বৈদ্যগণ যে ব্রাহ্মণ, তাহা কিসে প্রমাণ হইল? পুরাণ ও সাহিত্যে অনেক ধন্বন্তরির উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে কোন্ ধন্বন্তরি বৈদ্যদিগের মধ্যে গোত্র প্রবর্ত্তক তাহা স্থির করিবার উপায় নাই। 'ধন্বন্তরি' উপাধিরূপে ব্যবহৃত হইত। সুশ্রুত-সংহিতার বক্তা ধন্বন্তরি দিবোদাস ক্ষত্রিয় ছিলেন।'—২১ পৃঃ

ধন্বন্তরি সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না, কিন্তু তথাপি তিনি বৈশ্য! এ বিষয়ে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেন শর্ম্মা, এম্-এ মহাশয় তদীয় প্রতিবাদে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত করিয়া উদ্ধৃত করিতেছি—"আমরা বরাবরই বলিতেছি, বাঙ্গালায় যাঁহারা বৈশ্যজাতি বলিয়া পরিচিত, তাঁহারা কয়েক শত বৎসরের মধ্যে ঐরূপ পৃথক্ জাতিতে পরিণত হইয়াছেন। রামায়ণের যুগে তাঁহারা পৃথক্ জাতিতে পরিণত হন নাই, ব্রাহ্মণ জাতিরই অন্তর্গত ছিলেন। রঘুবংশের পাঠক

মাত্রই অবগত আছেন যে, বশিষ্ঠ অথর্ব্ববেদজ্ঞ ছিলেন এবং কালিদাস তাঁহাকে 'অথর্ব্বনিধি' বলিয়া বিশেষিত করিয়াছেন। সুতরাং উদ্ধৃত স্থলে 'বৈদ্য' শব্দ অথর্ব্ববেদে ও অথর্ব্ববেদান্তর্গত আয়ুর্ব্বেদে তাঁহার অভিজ্ঞতা সূচনা করিয়া চরকবচনানুসারে তাঁহাতে চরিতার্থতা লাভ করিয়াছে, বুঝা যায়। বাঙ্গালার বৈদ্যেরা স্বতন্ত্র জাতিতে পরিণত হওয়ার পূর্ব্বে ঐরূপ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহারা যে শ্রেণী বা সম্প্রদায়কে গঠিত করিয়াছিলেন, বশিষ্ঠও সেই শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। কালীবাবু বৈদ্য পুস্তকের ২৮ পৃষ্ঠায় স্বীকার করিয়াছেন, "ঋষিগণ যুগে যুগে সকল প্রকার শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া আসিয়াছেন, চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রণেতাও ঋষিগণই ছিলেন এবং ব্রাহ্মণগণই ঐ শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিতেন।" এই জন্য যখন বেদে দেখিতে পাই—

"ত্বাং গন্ধর্ব্বা অখনং স্ত্বামিন্দ্র ত্বাং বৃহস্পতিঃ।
সোম ত্বামোষধে রাজা বিদ্বান্ যক্ষ্মাদমুচ্যত॥"

তখন বুঝিতে পারি, ইন্দ্র, বৃহস্পতি ও চন্দ্র আদি বৈদ্য ছিলেন এবং চিকিৎসা করিবার জন্য ওষধি খনন করিতেন। 'বিদ্বান্' শব্দই এখানে বৈদ্যত্বের বাচক। ইন্দ্র 'বৈদ্য' ছিলেন শুনিয়া চমকাইলে চলিবে না। তাঁহার নিকটেই ত ভরদ্বাজ আয়ুর্ব্বেদ শিখিবার জন্য গিয়াছিলেন। সুরগুরু বৃহস্পতি ও অসুরগুরুর চিকিৎসা প্রণালী ও মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যার কথা ভারতে ও পুরাণে কথিত হইয়াছে। ইন্দ্র চিকিৎসা দ্বারা ব্রহ্মবাদিনী অপালার ত্বক্-দোষ দূর করিয়াছিলেন। এদিকে ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের ব্রহ্মখণ্ডে দেখা যায় ব্রহ্মা চতুর্ব্বেদ সৃষ্টি করিয়া তাহার অর্থ স্মরণ পূর্ব্বক আয়ুর্ব্বেদ সৃজন করিলেন ও এই পঞ্চম বেদ ভাস্করকে প্রদান করিলেন। ভাস্কর এই বেদ হইতে ভাস্করসংহিতা নামে সংহিতা প্রস্তুত করিয়া স্বীয় ষোড়শ শিষ্যকে শিক্ষাদান করিলেন। সূর্য্য প্রস্কন্নকে রোগমুক্ত করিয়াছিলেন। রোগী মাত্রেই আরোগ্য কামনায় সূর্য্যপূজা করিয়া

থাকে শাম্বও তাহাই করিয়াছিলেন। ময়ূর কবির কথাও লোকে প্রসিদ্ধ। এই ষোড়শ শিষ্যের নাম ও তাহাদিগের রচিত আয়ুর্ব্বেদ-গ্রন্থের নাম কুলার্ণব তন্ত্রের পঞ্চদশ উল্লাসে আছে। এই শিষ্যগণের মধ্যে চ্যবন, বুধ, জাবালি, পৈল, অগস্ত্য প্রভৃতি আছেন। এক্ষণে আমাদিগের জিজ্ঞাস্য এই যে অগস্ত্য, চ্যবন, বুধ প্রভৃতি মহর্ষিগণ বৈদ্যক গ্রন্থের অধ্যেতা, প্রণেতা ও অধ্যাপক সুতরাং 'বৈদ্য' ছিলেন ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি, তবে রামায়ণে বশিষ্ঠদেবকে ঐরূপ 'বৈদ্য' বিশেষণে বিশেষিত দেখিয়া তাঁহাদের সমশ্রেণীর জ্ঞান করিলে কি অপরাধ হয়? মহর্ষি অত্রি যে বৈদ্য ছিলেন তাহা হারীত সংহিতার পরিশিষ্টাধ্যায়ে লিখিত রহিয়াছে—

"অত্রিঃ কৃতযুগে **বৈদ্যঃ** দ্বাপরে সুশ্রুতো মতঃ।
কলৌ বাগ্‌ভটনামা চ গরিমাত্র প্রদর্শ্যতে (?)॥"

অত্রি সত্যযুগে, সুশ্রুত দ্বাপরে এবং বাগ্‌ভট কলিতে বৈদ্য। এই অত্রির পুত্র চন্দ্র। ইনি বৈদ্য ছিলেন, ইহা পূর্ব্বে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। প্রবোধনীতে শাস্ত্রের স্পষ্ট উক্তি ধরিয়া দেওয়া হইয়াছে, যথা—

"ওঁ চন্দ্রোঽমৃতময়ঃ শ্বেতো বিধু র্বিমলরূপবান্।
যজ্ঞরূপো যজ্ঞভাগী **বৈদ্যো** বিদ্যাবিশারদঃ॥"

এস্থলে 'বিদ্যাবিশারদঃ' হইতে 'বিদ্বান্' অর্থ পাওয়া যাইতেছে, সুতরাং 'বৈদ্য' শব্দ যে আয়ুর্ব্বেদোক্ত লক্ষণোপেত চিকিৎসককে বুঝাইতেছে তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না। সুপ্রসিদ্ধ ধন্বন্তরি এই চন্দ্রবংশীয়। এই চন্দ্রবংশীয় ব্রাহ্মণেরা অনেকে ক্ষত্রিয়বৃত্তি অবলম্বন করায় ব্রহ্মক্ষত্রিয় বা ক্ষত্রিয় বলিয়া বিদিত হইয়াছিলেন। চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়দের এইরূপেই উৎপত্তি। মূল চন্দ্রবংশীয় ব্রাহ্মণেরা বৈদ্য-ব্রাহ্মণ।

আয়ুর্ব্বেদ প্রচারের ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে প্রথমে মর্ত্ত্যলোকে

আয়ুর্ব্বেদের প্রচার ছিল না॥ চরকসংহিতার প্রারম্ভে লিখিত আছে "পৃথিবীতে রোগ সকল প্রাদুর্ভূত হইলে মানবগণের তপস্যা, ব্রত, অধ্যয়নাদির বিঘ্ন হইতে লাগিল দেখিয়া অঙ্গিরা, জমদগ্নি, বশিষ্ঠ; কশ্যপ, ভৃগু, আত্রেয়, গৌতম, সাঙ্খ্য, মার্কণ্ডেয়, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র, অগস্ত্য, অসিত, দেবল, গালব, কুশিক, বাদরায়ণ, কাত্যায়ন, মরীচি, শৌনক, মৈত্রেয়, গার্গ, শাণ্ডিল্য প্রভৃতি মহর্ষিগণ সমবেত হইয়া মন্ত্রণা-পূর্ব্বক ভরদ্বাজকে ইন্দ্রের নিকটে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার্থ প্রেরণ করিলেন। ভরদ্বাজ অচিরকাল মধ্যে উহা শিক্ষাপূর্ব্বক প্রত্যাগমন করিয়া উক্ত ঋষি-গণকে সমস্ত আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।"

এই সকল বিবরণ হইতে জানা যায় যে, তৎকালে লোকানুগ্রহার্থ আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করা ঋষিদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়াছিল, নতুবা তাঁহারা উহা শিখিতে যাইবেন কেন? সর্ব্বাত্মদর্শী ঋষিগণ লোকসকলের পীড়া দুঃখ নিবারণের জন্য স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়াই আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিতেন। অতএব প্রায় ঋষিমাত্রেই বৈদ্য হইতেন ও লোকানুগ্রহার্থ চিকিৎসা করিতেন। পরবর্ত্তী কালে বৈদ্য না হইয়া কেহ ঋষিপদবাচ্য হইতে পারিতেন না। প্রাচীনকালে দেবতাদের মধ্যে ও মনুষ্যদিগের মধ্যে, অর্থাৎ প্রাচীনতম কালের আর্য্যদিগের মধ্যে, যাঁহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী বলিয়া পরিগণিত হইতেন, তাঁহারা সকলেই আয়ুর্ব্বেদবিৎ বৈদ্য ছিলেন এবং তৎকালে বিজ্ঞানশ্রেষ্ঠ আয়ুর্ব্বেদের অভিজ্ঞতাই শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক ছিল। *

উদ্ধৃত চরকানুবাদ হইতে জানা যায় যে, বশিষ্ঠদেব ভরদ্বাজের নিকটে রীতিমত আয়ুর্ব্বেদ শিখিয়া বিদ্যাসমাপ্তিতে 'বৈদ্য' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কালীবাবু কি এখনও হাসিবেন? জাতিতত্ত্বের রচয়িতা বৈদ্যবিদ্বেষী শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ বিদ্যাবারিধি যে যে কথা বলিয়া বৈদ্য-

* শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন সেন শর্ম্মা প্রণীত 'বৈদ্যজাতির বৈশিষ্ট্য' দ্রষ্টব্য।

প্রবোধনীকে উপহাস করিয়াছিলেন, কালীচরণবাবুর পুস্তকেও সেই সেই কথা দেখিতেছি! স্বজাতিকে মিথ্যা গালি ও বিদ্রূপের বিষয়ীভূত হইতে দেখিয়া কোথায় তাহার প্রতিবাদ করিবেন, না তাহাই পুনরু-দ্গিরণ করিয়া স্বজাতিকে উপহাস করিতেছেন এবং বিদ্যাবারিধিকে প্রশংসাপত্র দিতেছেন! যে ব্যক্তি জাল বচন ও মিথ্যা কথা দ্বারা বঙ্গ-সমাজে বৈদ্যকে চণ্ডাল সদৃশ প্রতিলোমজাত অস্পৃশ্য শূদ্র বলিয়া গালি দিল, ধর্ম্মভূষণ মহাশয় তাঁহাকে স্মিতাননে বলিলেন, অনেক বিষয়েই তিনি তাঁহার সহিত একমত, তবে তিনি যেন একটু বেশী দূরে গিয়াছেন! দ্বিতীয় জ্ঞানাঞ্জন শলাকায় বিদ্যাবারিধির জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হইয়াছে, কিন্তু কালীবাবুর তাহাতেও চক্ষু খুলে নাই! বুদ্ধিমান্ বারিধি ক্রোধ ও বিদ্বেষের বশে গালি দিতেছিলেন, উচিত মত উত্তর পাইয়া নিরস্ত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সরলপ্রকৃতিক শিষ্যটী ধর্ম্ম-বিশ্বাসে 'জেহাদ' প্রচার করিয়াছেন তাঁহাকে বুঝায় কাহার সাধ্য?

কালীবাবু ২১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন "যেখানে যেখানে বৈদ্যশব্দের প্রয়োগ আছে, সর্ব্বত্রই যে বর্ত্তমান বঙ্গীয় বৈদ্যজাতিকে বুঝিতে হইবে ইহা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত সংস্কার"। কিন্তু বৈদ্যপ্রবোধনী ত এমন কথা কোথাও বলে নাই! জাতিতত্ত্বের অনুকরণে এই মিথ্যা অভিযোগ কি জন্য?

অতঃপর ধন্বন্তরি সম্বন্ধে বলিতেছি। ধন্বন্তরি শব্দের পূর্ব্বে বৈদ্য শব্দ থাকাতেই বুঝা যাইতেছে, এখানে 'বৈদ্য' শব্দের অর্থ চিকিৎসক। কালীচরণ বাবু নিজে ধন্বন্তরিগোত্রীয় এবং বিনায়ক বংশসম্ভূত। ভরত মল্লিক মহাশয় বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবতের ধন্বন্তরিকে অভিন্ন মনে করিয়াছেন। ধন্বন্তরি গোত্রের বিনায়ক প্রভৃতিকে তিনি ঐ ধন্বন্তরির বংশধর বলিয়া লিখিয়াছেন। গরুড় পুরাণের ধন্বন্তরিও যে বিষ্ণুপুরাণ এবং ভাগবতের ধন্বন্তরি হইতে অভিন্ন, তাহা ঐ ঐ পুস্তকের ধন্বন্তরিবর্ণনা পাঠ করিলেই বুঝা যায়। ভরতমল্লিক চন্দ্রপ্রভার ২২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—

ততো ধন্বন্তরি র্দেবঃ পীতাম্বরধরঃ স্বয়ম্।
বিভ্রৎ কমণ্ডলুং পূর্ণ্যমমৃতস্য সমুত্থিতঃ ॥—ইতি বিষ্ণুপুরাণম্
ধন্বন্তরিশ্চ ভগবান্ স্বয়মেব কীর্ত্তি-
র্নাম্না নৃণাং পুরুরুজাং রুজ মাশু হন্তি।
যজ্ঞে চ ভাগমমৃতায়ুরবাপ রুদ্ধ-
মায়ুষ্যবেদমনুশাস্ত্যবতীর্য্য লোকে ॥

ইত্যেতৎ পদ্যং, তথা—

অথোদধে র্মথ্যমানাৎ কাশ্যপৈরমৃতার্থিভিঃ।
উদতিষ্ঠন্ মহারাজ পুরুষঃ পরমাদ্ভুতঃ ॥
দীর্ঘপীবরদোর্দণ্ডঃ কম্বুগ্রীবোঽরুণেক্ষণঃ।
শ্যামল স্তরুণঃ স্রগ্বী সর্ব্বাভরণভূষিতঃ।
পীতবাসা মহোরস্কঃ সুমৃষ্টমণিকুণ্ডলঃ ॥
নীলকুঞ্চিতকেশান্তঃ শুভাদিঃ সিংহবিক্রমঃ।
অমৃতপূর্ণকলসং বিভ্রদ্বলয়ভূষিতঃ।
স বৈ ভগবতঃ সাক্ষাৎ বিষ্ণোরংশাংশসম্ভবঃ ॥
ধন্বন্তরি রিতি খ্যাত আয়ুর্ব্বেদদৃগিজ্যভাক্ ॥
ইতি সার্দ্ধপঞ্চচতুষ্কং শ্রীভাগবতীয়ম্।

বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবতের বর্ণনা হইতে ধন্বন্তরিকে দেবতা বলিয়া জানা যাইতেছে। অনন্তর প্রাচীন কুলাচার্য্যগণ যে এই দেবতাকেই ধন্বন্তরিবংশীয় বৈদ্যদিগের আদিপুরুষ বলিয়া বিবেচনা করেন, তাহা লিখিতেছেন—

এবঞ্চ কুলপঞ্জিকায়াং প্রাহুঃ প্রাঞ্চঃ, যথা—

সেনো দাশশ্চ গুপ্তশ্চ প্রধানাঃ লোকবিশ্রুতাঃ।
আদাবমীষাং বক্ষ্যামি ত্রয়াণাং কুললক্ষণম্ ॥

সেনো দাশশ্চ গুপ্তশ্চ সমানাঃ সৎকুলোদ্ভবাঃ।
ধন্বন্তরেঃ প্রধানত্বাৎ কুলং ধান্বন্তরং ব্রুবে ॥
সেনো বৈদ্যপ্রধানত্বাৎ জ্যেষ্ঠভ্রাতা ভিষক্‌কুলে।
তস্মাৎ অমুষ্য বক্ষ্যামি প্রথমং কুললক্ষণম্ ॥
অত্রাগ্রপশ্চাল্লিখনে মাৎসর্য্যং ন বিধীয়তাম্।
যতো মুনিপ্রণীতং হি সর্ব্বথা যুক্তমর্হতি ॥
ক্ষীরোদমথনে পূর্ব্বং ধৃত্বামৃতকমণ্ডলুম্।
যো ধন্বন্তরি-রুত্তস্থৌ তৎকুলং পূর্ব্বমুচ্যতে ॥

স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, বিষ্ণুপুরাণের, ভাগবতের, গরুড়পুরাণের এবং প্রাচীন বৈদ্যকুলাচার্য্যদিগের ধন্বন্তরি অভিন্ন। কারণ চারিজনেরই সমুদ্র-মন্থনে জন্ম এবং চারিজনেই অমৃতপূর্ণ কলস বা কমণ্ডলু হাতে করিয়া উত্থিত হইয়াছিলেন। বৈদ্যকুলপঞ্জিকাকারদিগের "যো ধন্বন্তরি-রুত্তস্থৌ তৎকুলং পূর্ব্বমুচ্যতে" এই উক্তি হইতেই বুঝা যায় যে, ধন্বন্তরিগোত্রীয় বিনায়ক প্রভৃতি বীজীপুরুষদিগকে ইঁহারা সমুদ্রমন্থনে অমৃতপূর্ণ কমণ্ডলু হস্তে উত্থিত ধন্বন্তরির বংশধর বলিয়া বিশ্বাস করেন। সমাজের সামাজিক-বর্গও তাহা বিশ্বাস করিতেন। অএতব দেবতার বংশে উৎপন্ন এই ধন্বন্তরিগোত্রীয় বৈদ্যগণ যে মূল গোত্রকর্ত্তার নামে পরিচিত মুখ্য ব্রাহ্মণ তাহা সামান্য বুদ্ধিতেও বুঝা যায়। কালীবাবু দিবোদাস ধন্বন্তরির ক্ষত্রিয়ত্ব সম্বন্ধে যে ভিত্তিহীন উক্তি করিয়াছেন, তাহা বশিষ্ঠের প্রসঙ্গে বলিয়াছি। দিবোদাসের প্রকৃত পরিচয় প্রসিদ্ধ 'বৈদ্যবর্ণ-বিনির্ণয়' গ্রন্থে উদ্ধৃত ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের বচনাবলীতে পাওয়া যায়। আমরা কিয়দংশ অধ্যাহার করিতেছি—

"মহাভারতে, হরিবংশের ২৯ অধ্যায়ে, গরুড় পুরাণে. বিষ্ণুপুরাণে ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে কাশীমাহাত্ম্যে ধন্বন্তরি সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে, তাহ অতি কৌতুহলজনক; বৃত্তান্তসম্বন্ধে ঐ সকল গ্রন্থ প্রায়ই তুল্য ও

একমত। তবে শেষোক্ত গ্রন্থের রচনা অপেক্ষাকৃত প্রাঞ্জল ও প্রসাদ-গুণ বিশিষ্ট, বিশেষতঃ ইহাতে জ্ঞাতব্য অনেক অর্থ সুপরিস্ফুট ব্যক্ত করিতেছে, অতএব তাহাই এস্থলে সাধারণের দর্শনার্থ উদ্ধার করিতেছি, বিজ্ঞ মহাশয়েরা অবলোকন করুন—

জনমেজয় উবাচ।

শ্রুতোঽয়ং বহুশো ধন্বন্তরিঃ ক্ষত্রকুলেঽভবৎ।
পূজিতশ্চাভবদ্ বিপ্রৈ র্নহ্যমূলা জনশ্রুতিঃ॥
পুরা জাতিবিভাগশ্চেন্নাসীৎ কস্মাৎ ইতি শ্রুতিঃ।
তন্মে ব্রূহি মহাভাগ ঘোরসংশয়ভঞ্জনম্॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

প্রজানাং মানবীয়ানাং ব্রহ্মাপত্যতয়া নৃপ।
ব্রাহ্মণত্বং পুনশ্চৈষাং জ্ঞানাচারবিভেদতঃ॥
বিভিন্নত্বমভূৎ কালে সর্ব্বলোকহিতং হি তৎ।
অথোৎপন্না পরস্মিন্ যো কালে পিতৃগণোদয়ম্।
বিবিৎসবঃ পরং জ্ঞানং লেভিরে মুনিসত্তমাঃ॥
তেষাং যদ্বচনং শ্রুত্যাঃ তদেবাত্র নিগদ্যতে।
সমাহিতমনা রাজন্ শৃণু গুহ্যতমং পরম্॥

*　　*　　*　　*

বিবর্ণবদনা দেবী মহাদেব মভাষত।
নেহ বৎস্যাম্যহং দেব নয় মাং স্বনিবেশনম্॥
অথ তাং দয়িতাং জ্ঞাত্বা কাশীবাসাভিলাষিণীম্।
ভূতেশঃ শ্লক্ষ্ণয়া বাচা প্রত্যুবাচাথ পার্ব্বতীম্॥

মহাদেব উবাচ।

ভাগঃ স্থানং ময়া দত্তং যথাপূর্ব্ব-প্রতিশ্রুতম্।
চিকিৎসা চাধিপত্যঞ্চ কাশ্যাং ধন্বন্তরেঃ স্বয়ম্॥

স কথং পুনরাদাস্তে দত্তং প্রাকৃতবৎ প্রিয়ে।
কৈলাসশিখরং রম্যং নয়ামি ত্বাং যদীচ্ছসি ॥

পার্ব্বত্যুবাচ।

ইত্যুক্তা পার্ব্বতী প্রাহ কথং নাথ কদাপি বা।
ত্রৈলোক্যদুর্ল্লভা চাসাবমরালয়সন্নিভা ॥
পুরী বারাণসী তস্মৈ চিকিৎসা চ গুরুক্রিয়া।
দত্তা তদ্‌ব্রূহি মেঽস্তু ত্বং মহৎ কৌতুহলং হি ম ॥

মহাদেব উবাচ।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি সর্ব্বমেতৎ সমাসতঃ।
যদা যস্মান্ময়া দত্তমম্বষ্ঠায় * চিকিৎসনম্ ॥
আধিপত্যঞ্চ দেশেঽস্মিন্ দেবানামপি বাঞ্ছিতে ॥
মথ্যমানেঽর্ণবে দেবি দেবাসুরগণৈঃ পুরা।
আবিরাসীৎ অয়ং দেবো ধন্বন্তরি রিহ শ্রিয়া ॥
প্রোবাচ চ হৃষীকেশমূর্ত্তিং মে বিশ্বপালনীম্।
ব্রূহি নাথ কিমর্থো মে সৃষ্টিঃ কিং সাধয়ামি তে ॥
অম্বষ্ঠোঽহং পিতঃ স্থানং যজ্ঞভাগং তথাদিশ।
বিনা তদবনীস্থানাং প্রতিষ্ঠা নহি বিদ্যতে ॥
এবমুক্ত স্তত স্তেন প্রত্যবোচমহং পুনঃ।
ন শক্তোঽস্মি যথার্হং তে সৎ কর্ত্তুং ভুবি সাম্প্রতম্ ॥
কুতো যজ্ঞবিভাগঃ প্রাগ্ যজ্ঞিয়ৈরমরৈরয়ম্।
দেবেষু বিনিযুক্তঞ্চ বিধিহোত্রং মহর্ষিভিঃ ॥
অর্ব্বাগ্ভূতোঽপি দেবানাং পুত্র ত্বমপি মে প্রিয়ঃ।
যজ্ঞশেষো ন শক্যস্তে ভাগঃ কর্ত্তুমথাধুনা ॥

* ইহা মনুক্ত অম্বষ্ঠজাতিবাচক নহে।

ব্রহ্ম বিপ্রকুলে তিষ্ঠান্নাচরন্ ব্রাহ্মণৈঃ সহ ।
কুরু কার্য্যং হি দেবানাং নৃণাঞ্চ কুরু রক্ষণম্ ॥
দ্বিতীয়ে দ্বাপরে জন্ম যদা তে সম্ভবিষ্যতি ।
তদা ভাগং যথাযোগ্যং স্থানং চাহং করোমি তে ॥
ইতি প্রতিশ্রবো ধন্বন্তরয়ে মৎকৃতঃ পুরা ।
স চ ধন্বন্তরির্জাতঃ কাশ্যাং দীর্ঘতপঃসুতঃ ॥
তস্মৈ দত্তায়ুষো বেদং মম দীর্ঘতপঃফলম্ ।
পুরীং বারাণসীঞ্চৈবাগচ্ছং হৈমবতং বনম্ ॥
সিসৃক্ষা মে পুনর্নাসীদ্ ধ্যাননির্মগ্নচেতসঃ ।
ত্বয়া তু বিশ্বমাত্রাহং পুনরেবংবিধঃ কৃতঃ ॥
প্রকৃতি ত্বং পরারাধ্যা প্রজাসু স্নেহবৎসলা ।
ত্বয়ৈব বিনিযুক্তোঽহং প্রজার্থে পরমেশ্বরি ॥
এবমুক্তা মহেশেন ধ্যানস্তিমিতলোচনা ।
ত্যক্ত্বা বারাণসীবাসমানসং পুনরব্রবীৎ ॥

পার্ব্বতী উবাচ ।

তিষ্ঠত্বেব মহাভাগো ধন্বন্তরিরিহৈব তৎ ।
যৎকৃতং ভবতা নাথ কঃ কুর্য্যাদ্বা তদন্যথা ॥

জনমেজয় উবাচ ।

জাতঃ ক্ষত্রকুলে দেবো ধন্বন্তরিরিতি শ্রুতঃ ।
ব্রাহ্মণত্বং কথং প্রাপ, বৈশ্যাগর্ভসমুদ্ভবঃ ॥
কথং বাম্বষ্ঠ ইত্যুক্তঃ, কুতো বেদ মধীতবান্ ।
সর্ব্বং তৎ কথয়াস্মাকং মহৎ কৌতূহলং হি নঃ ॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

আষ্টিষেণো হি কাশেয় স্তপসা মহতা নৃপ ।
ব্রাহ্মণ্যং লব্ধবান্ পূর্ব্বং তস্য দীর্ঘতপাঃ সুতঃ ॥

ধন্বন্তরিঃ সুতস্তস্য দীর্ঘস্য তপসঃ ফলম্ ।
ধরায়ামমৃতং যেনোপনীতং স্বেন জন্মনা ॥
অনিমাদিষু সংসিদ্ধি র্গর্ভস্থস্যাপি তস্য চ ।
আসীদ্ বিষ্ণুবরাদ্ ধন্বন্তরে রদ্ভুতকর্ম্মণঃ ॥
মানুষেণ শরীরেণ দেবত্বম্ প্রাপ দুর্লভম্ ।
কিং পুন র্ব্রাহ্মকং তেজো ব্রহ্ম যস্য হৃদি স্থিতম্ ॥
তথাপি লৌকিকাৎ ধর্ম্মাৎ ভরদ্বাজাদধীতবান্ ।
সাঙ্গাংস্তাংশ্চতুরো বেদানায়ুর্ব্বেদসমন্বিতান্ ॥
আয়ুর্ব্বেদঞ্চ মতিমান্ অষ্টধা সংবিভজ্য চ ।
অবাপ পরমাং খ্যাতিং প্রতিষ্ঠাঞ্চ গরীয়সীম্ ॥
মন্ত্রৈর্ব্রতৈ র্জপৈ র্হোমৈশ্চরুভি স্তং দ্বিজাতয়ঃ ।
যজন্তি দেববদ্ ধন্বন্তরিঞ্চামৃতসম্ভবম্ ॥
ধন্বনো রোগিণো রোগাং স্তরন্তি স্বপ্রভাবতঃ ।
তেন ধন্বন্তরিঃ খ্যাতো জগত্যাং সুমহাযশাঃ ॥
সোঽসৌ ধন্বন্তরিঃ খ্যাতো যথাম্বষ্ঠেতি সংজ্ঞয়া ।
তদহং কথয়িষ্যামি যথা মুনিগণোদিতম্ ॥
অম্বস্য মৃতকল্পস্য জনস্য স্থা স্থিতি র্যতঃ ।
সোঽম্বষ্ঠঃ কথিতো ধন্বন্তরিত্যেব সংজ্ঞয়া ॥
কেচিদ্বদন্ত্যম্বতুল্যং রোগে তিষ্ঠত্যসৌ যতঃ ।
পিতৃবচ্চেক্ষতে রুগ্নং তেনাম্বষ্ঠঃ স কীর্ত্তিতঃ ॥
অম্বেন জগতঃ কাশ্যাং স্থা স্থিতিশ্চাস্য যত্ততঃ ।
অম্বষ্ঠো কথিতো হ্যেষ ধন্বন্তরি রিদম্পরৈঃ ॥

* * * * *

জনমেজয় উবাচ ।

যদি ব্রাহ্মণপুত্রোঽসৌ ধন্বন্তরি রিহাভবৎ ।
কথং ক্ষত্র ইতি প্রোক্তঃ কাশিরাজঃ কথং নু সঃ

কথং বা ব্রাহ্মণৈঃ পুণ্যৈরুপজুষ্টঃ স কাশিরাট্।
বেদমন্ত্রগ্রহার্থং হি তন্মে ব্রূহি সমাসতঃ ॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

নাসীজ্জাতিবিভাগো হি পুরা রাজন্ যথাধুনা।
এক এব তদা বর্ণো ব্রাহ্মো ব্রহ্মসমুদ্ভবঃ ॥
ব্রাহ্মী তু ব্রহ্মণো ভাষা যয়া ব্রহ্ম নিগদ্যতে।
ব্রহ্মণা সৈব তস্যাসীদ্ গম্ভীরললিতোজ্জ্বলা ॥
আচারতো ন জাতিত্বং পৃথক্‌ত্বেঽপি পরস্পরম্।
তস্মাজ্জাতিঃ কথং তস্য নির্ণেয়া স্যাৎ যথাধুনা ॥
অধুনা জাতিবিজ্ঞৈ হি জাতিবিজ্ঞানতৎপরৈঃ।
মুনিভিঃ প্রাক্তনার্য্যাণাং জাতিরন্বিষ্যতে শুভা ॥
কেচিদ্বদন্তি তং বিপ্রং কেচিৎ ক্ষত্রমথাপরে।
অম্বষ্ঠঃ কথিতশ্চান্যৈ স সর্ব্বা স্তা ন নার্হতি ॥
ব্রাহ্মণো ব্রহ্মণো জ্ঞানাৎ ক্ষত্রো বীর্য্যাচ্চ দৈহিকাৎ
রাজা ভুবোঽধিকারাচ্চ সোঽম্বষ্ঠশ্চ চিকিৎসনাৎ ॥
ভিষত্যসৌ যতো রোগাং স্তেনাসৌ ভিষগুচ্যতে।
বিদ্যানাং স সমগ্রাণাং ধারণাৎ মৃতজীবনাৎ।
অথর্ব্বসহিতানাঞ্চ স বৈদ্য ইহি কথ্যতে ॥
কাশিরাট্ কথিতশ্চৈব স কাশিকুলরঞ্জনাৎ।
কেচিৎ বদন্তি কাশ্যাং স রাজাসীচ্ছিবসংশ্রয়াৎ।
চিকিৎসাজ্ঞানতঃ কাশীং লেভে যৎ পরমেশ্বরাৎ ॥
দিবোদাসশ্চ স প্রোক্তো স্বর্গদানং যতোঽর্হতি।
স্বর্গাদাভ্যাগতো যস্মাল্লোকসংস্থিতিহেতবে ॥
রমৃতেনোদয় স্তস্যামৃতং তস্য চ ভেষজম্।
তস্মায়াচার্য্যতে যোঽসাবমৃতাচার্য্য উচ্যতে ॥

ইত্যেব বহুনামানি প্রাপ ধন্বন্তরি র্নৃপঃ।
জগত্যনুপমা কীর্ত্তি তস্যাসীদ্রাজসত্তম॥
যতোঽস্য হি পিতুর্নাম দেবো দীর্ঘতপাঃ শ্রুতঃ।
তেন স ব্রাহ্মণত্বেন বিদিতো ধরণীতলে॥

ইত্যাদি (বৈদ্যবর্ণবিনির্ণয়, পৃঃ ৪৪৯—৪৫৪)

চন্দ্রবংশীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে অনেকে ক্ষত্র ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ক্ষত্রিয় হইয়াছিলেন, আবার ঐরূপ অনেক ক্ষত্রিয় পুনশ্চ ব্রাহ্মণবৃত্তি গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। কাশিরাজ দিবোদাস ধন্বন্তরি এইরূপ ব্রাহ্মণ রাজা ছিলেন, সুতরাং তদ্বংশীয়গণ ব্রাহ্মণরাজার বংশে জাত বলিয়া ব্রাহ্মণ বা ব্রহ্মক্ষত্রিয় নামে পরিচয় দিতে পারেন। এই ব্রহ্মক্ষত্রিয় শব্দ সেনরাজগণের তাম্রশাসনে ("স ব্রহ্মক্ষত্রিয়ানামজনি কুলশিরোদাম সামন্তসেনঃ") আছে। মধ্যযুগের মুলো প্রভৃতি এই ব্রহ্মক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ রাজাদের ক্ষত্রিয় আচার দেখিয়া উহা তাহাদের পাতিত্যজনক মনে করিয়াছিলেন, তাই 'বেদে ব্রহ্মাবৎ কার্য্যে ক্ষত্র ব্যবহার' বলিয়াছেন এবং বল্লাল পদ্মিনীর সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"শূদ্রকন্যা ব্রহ্মজায়া না লাগে অরত্নী" (অরত্নী=কুশণ্ডিকা) ইত্যাদি। যাহা হউক, ধন্বন্তরিগোত্রীয় বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকৃত হইলে, তন্মুহূর্ত্তেই তাঁহাদের সজাতিবর্গ সকলেই যে ব্রাহ্মণ তাহা সপ্রমাণ হইয়া যায়।

কালীবাবুর এক পংক্তির প্রতিবাদ করিতে দশ পৃষ্ঠা লিখিতে হইল। অভিজ্ঞ ব্যক্তি এক এক কথায় যাহা বুঝেন, অন্যকে তাহা বুঝাইতে অনেক অধিক বকিতে হয়। বৈদ্য-প্রবোধনী সংক্ষিপ্ত হওয়াতেই সত্যেন্দ্র বাবু ও কালীবাবুর উহা বোধগম্য হয় নাই।

(৬, বৈদ্যদিগের পাঁড়ে, মিশ্র, চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি উপাধি **'কাল্পনিক ও আনুমানিক'**—পৃঃ ৪০

বৈদ্যপুস্তকের ৪০ পৃষ্ঠায় কালীবাবু বলিতেছেন—

"পাঁড়ে, দোবে, ওঝা প্রভৃতি উপাধিগুলিও জাতিবাচক উপাধি নহে।"......

পুনশ্চ, "বৈদ্যকুলজি গ্রন্থে পাঁড়ে, দোবে ইত্যাদি কৌলিক উপাধি দেখা যায় না। ভরত মল্লিক চন্দ্র প্রভায় বৈদ্যের নিম্নলিখিত কৌলিক উপাধি লিখিয়াছেন, যথা—

'সেনো দাসশ্চ গুপ্তশ্চ দত্তো দেবঃ করস্তথা।
রাজসোমৌ নন্দিচন্দ্রৌ ধরকুণ্ডৌ চ রক্ষিতঃ।
রাঢ়ে বঙ্গে বরেন্দ্রে চ বৈদ্যা এতে ত্রয়োদশ॥

অর্থাৎ সেন, দাস, গুপ্ত, দত্ত ইত্যাদি তের ঘর বৈদ্য রাঢ়, বরেন্দ্র ও বঙ্গে বিদ্যমান।" অতঃপর বলিতেছেন যে, কবি কণ্ঠহার বিরচিত সদ্বৈদ্য কুলপঞ্জিকাতেও পাঁড়ে, দোবে প্রভৃতি কৌলিক উপাধি নাই। 'বৈদ্যপ্রবোধনীর কথিত পাঁড়ে, দোবে, ওঝা, **মিশ্র** ও ভট্টাচার্য্য উপাধি প্রাচীন কুলজি গ্রন্থ দ্বারা সমর্থিত হয় না।' ঐগুলি 'কাল্পনিক ও আধুনিক'।

এস্থলে এইটুকু মাত্র বক্তব্য যে, বৈদ্যপ্রবোধনী পাঁড়ে, দোবে, ওঝা, মিশ্র প্রভৃতি উপাধিগুলিকে কুত্রাপি সেন, দাশ, দত্ত প্রভৃতির ন্যায় **কৌলিক** উপাধি বলিয়া নির্দ্দেশ করে নাই। তবে কালীবাবু বৃথা এই আক্রমণ করেন কেন? প্রবোধনী যাহা বলে নাই, কোন বৈদ্য যাহা বলিবে না, বলিতে পারে না, তাহা কাটিবার উদ্দেশ্যে চন্দ্রপ্রভা হইতে বচন উদ্ধার করিয়া সেন, দাস, গুপ্ত, দত্ত ইত্যাদি বৈদ্যের কৌলিক উপাধি দেখাইয়া ঘটা করিবার প্রয়োজন কি? কণ্ঠহার ও অন্যান্য প্রাচীন কুলজি গ্রন্থের প্রামাণ্যই বা প্রয়োজন হইল কিসে? ইহা কি সাধারণ পাঠকের চক্ষে ধূলা দিয়া আঁধার সৃষ্টি করিবার জন্য নহে? বৈদ্যপ্রবোধনী যাহা বলিয়াছে, তাহা আমরা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি—

"বৈদ্যের পাঁড়ে, দোবে, ওঝা, মিশ্র প্রভৃতি উপাধির দৃষ্টান্ত বাঁকুড়া জিলায় তিলুড়ী প্রভৃতি গ্রামে, ঢাকার জপসা প্রভৃতি স্থানে এবং অন্যান্য অনেক স্থলে অদ্যাপি দেখা যায় (ইঁহাদের নাম ও ঠিকানা বৈদ্যব্রাহ্মণ সমিতির কার্য্যালয়ে ও বৈদ্যহিতৈষিণী পত্রিকায় দ্রষ্টব্য)। বৈদ্যকুলগ্রন্থে "শ্যামসেনায় মিশ্রায়" প্রভৃতি ব্রাহ্মণোচিত **মিশ্র ও চক্রবর্ত্তী** উপাধি অনেক স্থলে উল্লিখিত আছে। (প্রমাণ পরে দ্রষ্টব্য)। 'ভট্টাচার্য্য' উপাধিযুক্ত বৈদ্য বংশেরও পরিচয় সম্প্রতি পাওয়া গিয়াছে।"

পাঠক এক্ষণে দেখুন, কালীবাবু এই সরল সত্য কথার কিরূপ কূটতা ও শঠতাপূর্ণ সমালোচনা করিয়াছেন। প্রবোধনীর বক্তব্য এই যে, পাঁড়ে, দোবে, প্রভৃতি উপাধি বৈদ্যদিগের মধ্যে আজও চলিত রহিয়াছে, দেখা যাইতেছে। **'মিশ্র' ও 'চক্রবর্ত্তী' উপাধি ত কুলগ্রন্থেই বহু স্থানে উল্লিখিত আছে।** এই সকল উপাধির কোনটীই ভারতের কুত্রাপি অব্রাহ্মণে প্রযোজ্য হইতে দেখা যায় না। মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি সেদিনকার হাতে গড়া উপাধি যেমন ব্রাহ্মণকেই বুঝায়, অব্রাহ্মণকে বুঝায় না, তদ্রূপ **মিশ্র, চক্রবর্ত্তী, পাঁড়ে** প্রভৃতি উপাধিও ব্রাহ্মণকেই বুঝায়, ব্রাহ্মণেতর জাতিকে বুঝায় না। কালীবাবু ঐ ৪০ পৃষ্ঠাতেই কিছু উপরে লিখিয়াছেন, এই সকল উপাধি "প্রায়শঃ ব্রাহ্মণ বংশেই আবদ্ধ ছিল", আমরা বলি এই 'প্রায়শঃ' শব্দটী ব্যবহার করিবার কোন হেতুই নাই। কেবল মাত্র ব্রাহ্মণবংশেই এগুলি চিরকাল আবদ্ধ আছে। স্বীকার করিয়াও স্বীকার করিব না, ইহাই কালীবাবুর বৈদ্য পুস্তকের বৈশিষ্ট্য! কালীবাবু সমস্ত কুলজির সাক্ষ্য মানিয়া বলিতেছেন, বৈদ্যপ্রবোধনী-কথিত পাঁড়ে, দোবে, ওঝা, **মিশ্র**, ভট্টাচার্য্য উপাধি প্রাচীন কুলগ্রন্থ দ্বারা সমর্থিত হয় না। পূর্ব্বোদ্ধৃত প্রবোধনী-বাক্য পরীক্ষা করিলেই দেখা যাইবে যে, পাঁড়ে, দোবে প্রভৃতি উপাধিগুলি কুলগ্রন্থে

পাওয়া যায় একথা উহাতে লেখা হয় নাই। উহাদের মধ্যে কোন কোন উপাধি কোন কোন স্থানে অদ্যাপি প্রচলিত আছে এবং কোন কোন উপাধি, যথা মিশ্র ও চক্রবর্ত্তী, কুলজীতে উল্লিখিত আছে, ইহাই বলা হইয়াছে। কালীবাবু প্রবীণ উকিল কিনা, তাই সকলগুলিকে এক গাড়ে ফেলিয়া এবং **চক্রবর্ত্তী** উপাধিটীকে বাদ দিয়া বৈদ্য-প্রবোধনীর কথা মিথ্যা, উহা বিশ্বাস যোগ্য নহে, এইরূপ প্রচার করিতেছেন। মিশ্র ও চক্রবর্ত্তী উপাধি কুলজিতে আছে, ইহা প্রবোধনীর কথা; কিন্তু কালীবাবুর কথা উহা কুলজিতে নাই, উহা কাল্পনিক ও আধুনিক। পাঠক এক্ষণে নিম্নে উদ্ধৃত চন্দ্রপ্রভার প্রমাণ-গুলি দেখিয়া কালীবাবুর প্রতি যাহা ব্যবস্থা করা উচিত, তাহাই করুন।

চক্রবর্ত্তী উপাধি যথা—

(১) 'সুতঃ কৌতুকগুপ্তস্য পরমানন্দগুপ্তকঃ।
স শিলাগ্রামসংস্থায়ি **চক্রবর্ত্তি**-সুতাপতিঃ॥

(চন্দ্রপ্রভা, ৪২০ পৃষ্ঠা)

(২) গাঙ্গেয়িবিশ্বনাথস্য দৌহিত্রৌ **চক্রবর্ত্তিনঃ**।

(চন্দ্রপ্রভা, ঐ)

মিশ্র উপাধি যথা—

(৩) "নিরোলে শ্যামসেনায় **মিশ্রোস্য** চ কনীয়সী"

(৪) হরি**মিশ্রস্য** সেনস্য কন্যকাগর্ভসম্ভবৌ।

(চন্দ্রপ্রভা, ৪৩৫—৩৬ পৃঃ)

(৫) শ্যামদাসস্য **মিশ্রস্য** কন্যকা কটকস্থিতেঃ।

(কালীবাবুরই উদ্ধৃত চন্দ্রপ্রভা-বচন, বৈদ্য পৃঃ ৫০)

এতগুলি 'মিশ্র' ও 'চক্রবর্ত্তী' শব্দ জ্বল্‌-জ্বল্‌ করিতেছে, তথাপি এগুলি আধুনিক ও কাল্পনিক? পাঁড়ে উপাধির জন্য ১২৪-১২৫ পৃষ্ঠা দেখিতে অনুরোধ করিতেছি। তিলুড়ী গ্রামের বৈদ্যদিগের প্রাচীন দলিল পত্রা-

দিতেও পাঁড়ে উপাধি লিখিত রহিয়াছে। ভরতমল্লিক মহাশয় পঞ্চকোট সমাজের পাঁড়ে-উপাধিধারী এই সকল বৈদ্যের বিবরণ চন্দ্রপ্রভায় লেখেন নাই, এজন্যই ঐ গ্রন্থে পাঁড়ে-উপাধিধারী বৈদ্যদিগের উল্লেখ দেখা যায় না। পরন্তু ঐ বৈদ্যদিগের চিরন্তন পাঁড়ে উপাধি পশ্চিমের ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় ব্রাহ্মণোচিত পাণ্ডিত্য ও প্রসিদ্ধি প্রকাশ করিতেছে। যাহা হউক, 'মিশ্র' ও চক্রবর্ত্তী' উপাধি ত কুলজি গ্রন্থে রহিয়াছে,তবে বৈদ্যপ্রবোধনীর লেখকগণকে মিথ্যাবাদী বলিতে কালীবাবুর মাথা লজ্জায় হেঁট হয় না কেন? এরূপ দেখিলে মনে হয়, যিনি জানিয়া শু'নয়া বৈদ্যব্রাহ্মণ-সমিতির বিরুদ্ধে গালাগালি করিতেছেন, তিনি কি কখনও আমাদের সঙ্গে যোগদান করিবেন?

(৭) বৈদ্যগণ 'আবহমানকাল অম্বষ্ঠ'—পৃঃ ৪১

প্রবোধনীর ১২ পৃষ্ঠায় আছে—

"অদ্যাপি বহু স্থানেই বহু বৈদ্য 'বৈদ্যব্রাহ্মণ' বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়া থাকেন এবং অন্যান্য জাতিরা অনেক স্থলেই বৈদ্যগণকে "বদ্যিবামুন" বলেন।...এই সকল লোক-প্রসিদ্ধি অমূলক হইতে পারে না।" বৈদ্য-প্রবোধনীর এই উক্তিকে কালীবাবু উপহাস করিয়া বলিতেছেন—"অবশ্য এ লোক-প্রসিদ্ধি অমূলক হইতে পারে না, কিন্তু বৈদ্যগণ যে আবহমানকাল অম্বষ্ঠ বলিয়া পরিচয় দিয়া আসিতেছে, সে লোক-প্রসিদ্ধিও উড়ান যায় না।"

প্রসিদ্ধ বৈদ্যব্রাহ্মণ বা 'বদ্দিবামুন' নাম উড়াইবার জন্য 'আবহমান-কাল অম্বষ্ঠ' প্রসিদ্ধি খাড়া করা হইয়াছে! আবহমানকাল বৈদ্যব্রাহ্মণ প্রসিদ্ধি থাকিলে, আবার অম্বষ্ঠ প্রসিদ্ধি হয় কোথা হইতে? ইহাকেই বলে, "even though vanquished he can argue still"! বৈদ্য-ব্রাহ্মণ ইহাই চিরন্তন প্রসিদ্ধি; মধ্যে স্মার্ত্ত মতানুসারে কোন কোন বৈদ্য অম্বষ্ঠত্ব স্বীকার করিলেও জনসমাজ বৈদ্যের অম্বষ্ঠ-প্রসিদ্ধি হয় নাই।

আর যাঁহারা অম্বষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন বৈদ্যও কি বৈদ্যের চিরপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণত্বের বিরুদ্ধে বৈশ্যত্বের ধ্বজা উড়াইয়াছিলেন? এ কাণ্ডটী যে ধর্ম্মভূষণ কালীবাবুর ও তাঁহার বিদ্যাবাগীশ চেলারই অপূর্ব্ব কীর্ত্তি! ইহাতে ত প্রাচীন বৈদ্যপণ্ডিতদিগের কোন দাবী-দাওয়াই নাই।

কালীবাবু 'আবহমানকাল' প্রচলিত 'বৈদ্যব্রাহ্মণ' প্রসিদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 'অম্বষ্ঠ' প্রসিদ্ধির আবহমানত্বের দাবী করিয়াছেন। ইহা যে নিতান্ত অমূলক তাহা এক কথায় দেখান যাইতে পারে। 'বৈদ্য **ব্রাহ্মণ**' এই প্রসিদ্ধির সহিত 'বৈদ্য অম্বষ্ঠবর্ণ **বৈশ্য**' এই প্রসিদ্ধি কিরূপে থাকিতে পারে? একই জাতি ব্রাহ্মণও বটে, বৈশ্যও বটে, এমন কথা কেহ শুনিয়াছেন কি?

(৮) ১৫ দিন অশৌচই বৈশ্যত্বের প্রমাণ!

'বৈদ্য পুস্তকের ৪১ পৃষ্ঠায় কালীবাবু লিখিয়াছেন—

"বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণ হইলে সকল স্থানে সকল দেশেই ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিতেন এবং তদনুরূপ ব্যবহার করিতেন"।

আমরাও ত তাই বলি যে বৈদ্যগণ যখন বাঙ্গালার বাহিরে ভারতের সর্ব্বত্র ব্রাহ্মণ বলিয়াই পরিচয় দেন ও ব্রাহ্মণবৎ ব্যবহার করেন এবং বঙ্গেও বৈদ্যদিগের 'বৈদ্যব্রাহ্মণ' প্রসিদ্ধি রহিয়াছে, এবং আচার্য্যত্ব, গুরুবৃত্তি, প্রতিগ্রহ, অধ্যাপনা, ব্রাহ্মণোচিত উপাধি ও পদবী ধারণ এবং ক্বচিৎ দশাহ অশৌচ পর্য্যন্ত প্রচলিত রহিয়াছে, তখন ব্রাহ্মণ-প্রসিদ্ধি ও ব্রাহ্মণাচারের বাকী রহিল কি? যাহার পনের আনা তিন পাই ব্রাহ্মণের সঙ্গে মেলে, সে সমাজবিপ্লব বশতঃ এক পাই অমিলের জন্য 'অম্বষ্ঠবর্ণ বৈশ্য' বা 'পারিভাষিক বৈশ্য' হইয়া যাইবে, একথা নিতান্ত দুষ্টপ্রকৃতিক ব্যক্তি ব্যতীত কেহই বলিবে না। এইরূপ লোকদিগকে

কিছুতেই বুঝান যায় না। 'ন তু প্রতিনিবিষ্ট-দুষ্ট-জন-চিত্তমারাধয়েৎ',— ইহাদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করাও বিড়ম্বনা!

উকিল বাবুর লক্ষ্য বৈদ্যদিগের অব্রাহ্মণোচিত অশৌচের প্রতি। কিন্তু অশৌচকালের বিভিন্নতাটুকু স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণদের কারসাজিতেই হইয়াছে, ইহা আমরা পুনঃ পুনঃ বলিয়া আসিতেছি। ১৫ দিন হইতে ৩০ দিন যেরূপে হইয়াছিল, ১০ দিন হইতে ১৫ দিনও ঐভাবে হইয়াছিল। যেটী তর্কের বিষয়ীভূত তাহাকে হেতুরূপে কল্পনা করা উকিল বাবুর পক্ষে প্রশংসনীয় হয় নাই।

(৯) জাতিতত্ত্ব ও বৈদ্য।

সেনরাজগণ বৈদ্য ছিলেন না, ইহা অবৈদ্যের মুখেই শোভা পায়! যে দেশে প্রতি গৃহে ক্রিয়াকর্ম্মে কুলাচার্য্যগণ সমবেত হইয়া চিরকাল রাজা ও রাজদত্ত কৌলীন্যের আলোচনা করিতেন, যে দেশে ব্রাহ্মণদের ও কায়স্থদের বংশগত ধারাবাহিক ইতিহাস বর্ত্তমান, সেই দেশের দেশব্যাপী প্রসিদ্ধি এই যে কৌলীন্যস্রষ্টা সেনরাজগণ বঙ্গীয় বৈদ্যসম্প্রদায়ের সজাতি ছিলেন। ইহা মিথ্যা হইলে কুরুপাণ্ডবগণ কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, রামচন্দ্র অযোধ্যায় রাজত্ব করিতেন এবং রাবণ লঙ্কায় রাজা ছিলেন, এ সকল কথাও মিথ্যা হইবে। বস্তুতঃ যখন দেখিতে পাই, সেন-বংশের একটী শাখা সেদিন পর্য্যন্ত বিক্রমপুরে রাজত্ব করিয়াছেন, এবং তদ্বংশীয়গণ অদ্যাপি 'ছত্রপতি' বলিয়া তথায় সম্মানিত, যখন দেখি আদিশূর ও বল্লালবংশীয় বৈদ্যগণ অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছেন, যখন দেখি **বৈদ্যকুলজি গ্রন্থে** 'বল্লালসেননৃপতেস্তনুজাগর্ভসম্ভবঃ' প্রভৃতি উক্তি জাজ্জ্বল্যমান রহিয়াছে, যখন দেখি বৈদ্যদিগের মধ্যে পিতাপুত্র বল্লাল ও লক্ষ্মণের বিবাদের কথা স্মরণ করাইয়া অদ্যাপি বল্লালী ও লক্ষ্মণী এই দুইটী 'থাক্' বিদ্যমান রহিয়াছে, যখন দেখি ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য কুলাচার্য্যগণ প্রাচীনকাল হইতে সেন রাজগণকে বৈদ্য বলিয়া

বর্ণনা করিয়াছেন, তখন বঙ্গের শেষ রাজার জাতি সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ থাকে না। যখন দেখি প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকগণ সেনরাজগণকে 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন, এবং যখন দেখি বঙ্গীয় বৈদ্যগণও ব্রাহ্মণবর্ণই বটে, যখন দেখি সেনরাজগণের গোত্র ও পদবীধারী ব্যক্তি কেবলমাত্র বৈদ্য সমাজেই বর্ত্তমান, তখন আর তাঁহাদের জাতি সম্বন্ধে কোন সন্দেহই উঠিতে পারে না। তথাপি জাতি-তত্ত্ব-লেখক বৈদ্যবিদ্বেষী শ্যামাচরণ বিদ্যাবারিধি মহাশয় যখন বৈদ্যকে চণ্ডালবৎ অস্পৃশ্য বর্ণসঙ্কর বলিয়া গালি দিলেন এবং সেন-রাজগণকে কর্ণের বংশধর সাব্যস্ত করিলেন, তখন আমাদের রায়-বাহাদুর মহাশয় এই দুই কথার কোন প্রতিবাদ করিলেন না কেন? পাঠকগণ শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন যে কালীচরণ বাবু পণ্ডিত শ্যামাচরণের জাতিতত্ত্ব পাঠ করিয়া তাহার উচিতমত প্রতিবাদ করা দূরে থাকুক, তাঁহার শ্রীচরণেষু এইরূপ নিবেদন করিয়া পাঠাইয়াছিলেন—

"পূজনীয় শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ কবিরত্ন বিদ্যাবারিধি মহাশয় শ্রীচরণেষু—

আপনার 'জাতিতত্ত্ব' সম্বন্ধে আপনি **একটু** বেশী দূরে গিয়াছেন। আমার সিদ্ধান্ত এই—

১। বৈদ্যগণ অম্বষ্ঠবর্ণ ও দ্বিজাতি। একতর ব্রাহ্মণ নহে। ইত্যাদি। (দ্বিতীয় শলাকা দ্রষ্টব্য)

শত শত মুদ্রা ব্যয়ে যিনি স্বজাতীয়গণের প্রাণসমা সমিতির বিরুদ্ধে পুনঃ পুনঃ লেখনী চালনা করিতেছেন, তিনি বারিধির সোহাগ-সলিলে নিঃশব্দে ডুবিলেন! "এতে সৎপুরুষাঃ পরার্থঘটকাঃ—" নিজের স্বার্থ ও জাতিস্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া পরের জন্য নিজের পায়ে কুড়ুল মারিতে পারে এমন আর দ্বিতীয় কে আছে?

(১০) বোপদেব বৈদ্য নহেন!

সেনরাজগণের জাতিসম্বন্ধে যেরূপ অবিচার আরম্ভ হইয়াছে, দেশ-প্রসিদ্ধ প্রাচীন বৈদ্য পণ্ডিতগণ সম্বন্ধেও সেইরূপ অবিচার দেখা যাই-তেছে। বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বোপদেব ও জয়দেব যে বৈদ্য এসম্বন্ধে প্রাচীন ব্যক্তি মাত্রই একমত ছিলেন। বিদেশী পণ্ডিত উইল্‌সন্, কোল্‌ব্রুক্, জোন্‌স্ প্রভৃতি গবেষণার দ্বারা ও তদানীন্তন পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকটে শুনিয়া সেই সত্যেই উপনীত হইয়াছেন। কিন্তু আধুনিক জন-কয়েক (যাজন) ব্রাহ্মণ বৈদ্যের পাণ্ডিত্যগৌরব সহ্য করিতে না পারিয়া বলিতেছেন যে, বোপদেব জাতিতে বৈদ্য ছিলেন না। আমাদের স্বনাম-ধন্য রায়বাহাদুর কালীবাবুই প্রথম ও একমাত্র বৈদ্য যিনি তাঁহার বৈদ্য পুস্তকে ঐ বৈদ্যবিদ্বেষী (যাজন) ব্রাহ্মণদের সমর্থন করিয়াছেন। কালী বাবুর মতে বোপদেব বাঙ্গালীই নহেন। কালীবাবু বৈদ্যপ্রবোধনীকে উপহাস করিয়া লিখিয়াছেন—

"পরের লোক টানিয়া আনিয়া হাস্যাস্পদ হওয়ার সার্থকতা বুঝা যায় না!" (পৃঃ ৫০)।

এস্থলে বৈদ্যপ্রবোধনীর কথাগুলি তুলিয়া দেওয়া আবশ্যক। বৈদ্য-প্রবোধনী বলিতেছে—

"বোপদেব গোস্বামী তাঁহার গ্রন্থসমূহে কোথাও 'বিপ্রো বেদ-পদাস্পদম্' এবং 'ভিষক্' (যথা মুগ্ধবোধে), কোথাও বা স্পষ্টরূপেই 'বৈদ্য' বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছেন। তন্মধ্যে মুদ্রিত 'শতশ্লোকী' গ্রন্থের সুস্পষ্ট পরিচয় যথা—

'দেশানাং বরদাতটং বরমতঃ সার্থাভিধানং মহা-
স্থানং বেদপদাস্পদাগ্রজগণাগ্রণ্যঃ সহস্রং দ্বিজাঃ।
তত্রামীষু ধনেশকেশববিদৌ বৈদ্যৌ বরিষ্ঠৌ ক্রমাৎ
চক্রে শিষ্যসুতস্তয়োঃ কৃতিমিমাং শ্রীবোপদেবঃ কবিঃ।'

অর্থাৎ, সকল দেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান বরদা (করতোয়া) নদীর তটদেশে মহাস্থান নামক যে সার্থক-নাম জনপদ আছে, তথায় ব্রাহ্মণগণের অগ্রগণ্য সহস্র দ্বিজ বাস করেন। তাঁহাদের মধ্যে ধনেশ নামক শ্রেষ্ঠ বৈদ্যের শিষ্য এবং কেশব নামক শ্রেষ্ঠ বৈদ্যের পুত্র শ্রীবোপদেব কবি এই পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। এখানে বোপদেব ব্রাহ্মণগণের 'অগ্রণী' বলিয়া যে সহস্র দ্বিজের পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যেই ধনেশ ও কেশব নামক দুইজন শ্রেষ্ঠ বৈদ্য যথাক্রমে বোপদেবের গুরু ও পিতা। এইরূপে তিনি সমস্ত বৈদ্যসম্প্রদায়কে ব্রাহ্মণ সমাজের অগ্রণীরূপে পরিচিত করিতেছেন—ইহাই লক্ষ্য করিবার বিষয়।" ["দ্বিজেষু বৈদ্যাঃ শ্রেয়াংসঃ", 'তস্মাৎ বৈদ্য স্ত্রিজঃ স্মৃতঃ' ইত্যাদি ঋষি-বাক্যের সত্যতা বঙ্গীয় বৈদ্যসমাজে পরিস্ফুট ছিল]।

বৈদ্যপ্রবোধনীর ফুটনোট্ হইতে একটুকু উঠাইয়া দিতেছি। "স্কন্দ-পুরাণোক্ত করতোয়া স্তোত্রে করতোয়ার বরপ্রদা বা বরদা নাম উল্লিখিত আছে। করতোয়ার তীরবর্ত্তী 'মহাস্থান নামক প্রাচীন জনপদের ধ্বংসাবশেষ এখনও বগুড়া জেলায় বর্ত্তমান রহিয়াছে। পূর্ব্বে সেখানে বহু বৈদ্যব্রাহ্মণের অবস্থানের কথা এখনও প্রাচীনেরা বলিয়া থাকেন। 'ধন্বন্তরি-পীঠ', 'জীবক-কুণ্ড' প্রভৃতিও অদ্যাপি সেখানে বর্ত্তমান। এই সকল প্রমাণ দ্বারা বোপদেবের বাঙ্গালী বৈদ্যত্বই প্রমাণিত হয়। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বরও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। (বৈদ্যহিতৈষিণী ২৬ ও ২১৪ পৃষ্ঠা এবং অর্চ্চনা ১৩২১ সনের ১ম ও ২য় সংখ্যা দ্রষ্টব্য)।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মহাপণ্ডিত বোপদেব মুগ্ধবোধ রচনা করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি বঙ্গের গৌরবের বস্তু বলিয়া সমাদৃত। পরে তিনি দাক্ষিণাত্যে গমন করিয়া দেবগিরি-রাজের মন্ত্রী হেমাদ্রির সহিত বন্ধুত্বপাশে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। অনেকে এই তথ্য অবগত না

হইয়া বোপদেবকে দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণ মনে করেন। তাঁহারা একটু অনুসন্ধান করিলেই নিজেদের ভ্রম বুঝিতে পারিবেন। দেবগিরির নিকটে 'মহাস্থান' নামক কোন জনপদ নাই। কেহ কেহ 'মহাস্থানং' পদটীকে বিশেষণরূপে গ্রহণ করিয়া জনপদের নাম 'সার্থ' বলিতে চাহেন। শ্রীযুক্ত ভাণ্ডারকর এই কথা বলিয়াছেন। তদনুসারে শ্রীযুক্ত সখারাম গণেশ দেউস্কর মহাশয় ও পণ্ডিত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের ঘোরতর তর্কবিতর্ক হয়। অবশেষে শ্রীযুক্ত পণ্ডিতরাজ মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় মীমাংসা করেন যে বোপদেব বাঙ্গালী এবং বৈদ্য ছিলেন, মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন না। কালীবাবু এতদিন পরে সেই পুরাতন কথা তুলিয়া বলিতেছেন, দেবগিরির নিকটে 'ওয়ার্ধা' নদী আছে। আছে সত্য, কিন্তু তত্রত্য সাহিত্যে তাহার 'বরদা' বলিয়া প্রসিদ্ধ নাই; সেস্থানে 'সার্থ' বা 'মহাস্থান' নামে কোন জনপদও নাই। সেস্থানে সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণাগ্রণী বৈদ্য বাস করিতেন, এমন কথাও কেহ বলিতে পারে না। ঐ দেশে বা মহারাষ্ট্রে দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণ বলিয়া বোপদেবের কোনরূপ প্রসিদ্ধি নাই। তাহার গোস্বামী উপাধি ও নামের পূর্ব্বে শ্রী-শব্দ ব্যবহার দেখা যায়। দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণ নামের পূর্ব্বে শ্রী-শব্দ ব্যবহার করেন না, গোস্বামী উপাধিরও প্রচলন নাই। মহারাষ্ট্রে পিতাপুত্রের নামোল্লেখে যে বিশেষ পদ্ধতি বিদ্যমান দেখা যায়, পিতা কেশব ও পুত্র বোপদেবের নামোল্লেখে সে পদ্ধতিও অনুসৃত হয় নাই। কালীবাবু বলিয়াছেন, "বোপদেব যে গোস্বামী ছিলেন, তাহা স্বীকার্য্য", পুনশ্চ লিখিতেছেন "তিনি গোস্বামী উপাধিধারী বিপ্র (ব্রাহ্মণ) ছিলেন" এবং "সত্যবটে বঙ্গদেশে বৈদ্য ও কায়স্থ গোস্বামী আছে, কিন্তু ব্রাহ্মণেতর জাতিতে গোস্বামী-পদবী মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের সময় হইতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। বোপদেব অনেক পূর্ব্বেকার লোক ছিলেন। মহাপ্রভু ১৪৮৫ খৃঃ জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন।"

কালীবাবুর এই কথাগুলি নিতান্ত অজ্ঞতাপূর্ণ। ব্রাহ্মণেতর জাতিতে গোস্বামী-পদবী মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের সময় হইতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু বৈদ্য যে ব্রাহ্মণ বলিয়াই মহাপ্রভুর বহু পূর্ব্বেও গোস্বামী উপাধিধারী দেখিতে পাই; শ্রীখণ্ডের বৈদ্যদিগের 'ঠাকুর' ও ভাজনঘাটের বৈদ্যদিগের 'গোস্বামী' উপাধি আধুনিক কালের নহে। মহাপ্রভুর বহু পূর্ব্বেও ঐ উপাধি দুইটী প্রচলিত ছিল। সুতরাং চৈতন্যদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া বৈদ্য বোপদেবের গোস্বামী উপাধি থাকা অসম্ভব, এ যুক্তি একেবারেই ভ্রান্ত। দ্বিতীয়তঃ ঐ দেবগিরি বা তৎসন্নিহিত প্রদেশে যদি বোপদেব ব্যতীত আরও দুই চারি জন গোস্বামী দেখা যাইত, অথবা দেবগিরিতে বোপদেব প্রণীত মুগ্ধবোধাদি গ্রন্থের সমাদর দেখা যাইত, তাহা হইলেও মানিতে পারিতাম যে বোপদেব দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণ। কালীবাবুর সম্বলে কোন প্রমাণই নাই, কেবল আব্দার টুকু আছে। বাঙ্গালায় পাণিনির ব্যাকরণ অপেক্ষা সুখবোধ্য করিয়া বৈদ্যপণ্ডিতগণ যে সকল ব্যাকরণ রচনা করেন, তাহাদের সকলগুলিরই অদ্যাপি পঠন-পাঠনা হইয়া থাকে, যথা সংক্ষিপ্তসার, সুপদ্ম, মুগ্ধবোধ এবং বৈদ্যের রচিত পঞ্জীসমেত কলাপ। যে বাঙ্গালী পাণিনিকে ত্যাগ করিয়া এক দিনের জন্যও তাহার অভাব অনুভব করে নাই, সেই বাঙ্গালী নিজের এতগুলি উৎকৃষ্ট ব্যাকরণ থাকিতে, দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণ প্রণীত মুগ্ধবোধ বঙ্গে আমদানী করিবে কেন? এবং তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা সমাদৃত হইবে কেন? মহাত্মা কেশব সেন মহাশয়ের পিতামহ শ্রীযুক্ত রামকমল সেন মহাশয় যখন সংস্কৃত কলেজের প্রধান অধ্যক্ষ ছিলেন, তখন কয়েকজন ধূর্ত্তপ্রকৃতিক যাজন-ব্রাহ্মণ বৈদ্যদিগকে সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিতে দেওয়া হইবে না, এই মর্ম্মে এক আন্দোলন উত্থাপিত করায়, বৈদ্যছাত্র সংস্কৃত কলেজে পড়িতে না পাইলে, যাজন-ব্রাহ্মণ ছাত্রেরাও বৈদ্যপ্রণীত সাহিত্যদর্পণ,

বৈদ্যপ্রণীত মুগ্ধবোধ, বৈদ্যপ্রণীত সুপদ্ম, বৈদ্যপ্রণীত সংক্ষিপ্তসার' প্রভৃতি পড়িতে পাইবে না, এই সমুচিত প্রত্যুত্তর শুনিয়া নিরস্ত হয়। সেনরাজগণের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া বোপদেবের সময়েও বৈদ্যগণই বঙ্গের সাহিত্য ক্ষেত্রে অগ্রণী ছিলেন। ঐ সময়ে কাব্য, ব্যাকরণ, আয়ুর্ব্বেদ, স্মৃতি—সর্ব্ব বিষয়ে বাঙ্গালাদেশ ভারতের অগ্রণী ছিল। বাঙ্গালার সুপদ্ম, সংক্ষিপ্তসার ও কলাপের মত মুগ্ধবোধও বাঙ্গালার নিজস্ব সামগ্রী, উহা দেশান্তর হইতে আনীত হয় নাই। মুগ্ধবোধে বোপদেবের আত্মপরিচয় এইরূপ—

'বিদ্বদ্ধনেশ্বরছাত্রো ভিষক্‌কেশবনন্দনঃ।
বোপদেবশ্চকারেদং বিপ্রো বেদপদাস্পদম্‌॥'

ভিষক্‌ কেশবের পুত্র 'বেদপদাস্পদ' বিপ্র বোপদেব এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। বৈদ্যগণের চিরকালের ধারণা এই যে, তাঁহারা সাধারণ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণ এবং এই জন্যই 'বৈদ্য' শব্দদ্বারা আত্মপরিচয় দিতে গৌরব অনুভব করিতেন। 'বেদপদাস্পদ' শব্দটী উল্লিখিত দুইটী পরিচয়েই বিপ্র বা ব্রাহ্মণের বিশেষণ, উহার অর্থ 'বৈদ্য'। ইহা হইতেও বঙ্গপ্রসিদ্ধ বৈদ্য নামক বিপ্রশ্রেণীর বোধ জন্মে।

বাঙ্গালার দেশপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণ যাঁহাকে এ যাবৎ বৈদ্য বলিয়া জানেন, কালীবাবু নিজে বৈদ্য হইয়াও তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়া নিজের হইতে তাড়াইয়া পরের দলে ঠেলিয়া ফেলিতেছেন! এরূপ বিচিত্র ব্যবহার বৈদ্যের পক্ষে সম্ভব বলিয়াই মনে হয় না। মহামহোপাধ্যায় উপাধি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া অপ্রাসঙ্গিক ভাবে বৃত্তির কথা উত্থাপন পূর্ব্বক নানা অসম্বদ্ধ কথা বলায় আমাদের মনে যে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল, এখানেও সেই সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে। সেটী এই যে, এই অপূর্ব্ব পুস্তকখানি হয় ত কালীবাবুর লেখনীপ্রসূত নহে, ইহা তদীয় কোন মুরুব্বি যাজন-ব্রাহ্মণেরই লেখা, অথবা তদীয়

উপদেশ মত লেখা। সেই জন্যই বোপদেব গোস্বামী বৈদ্য নহেন, কবিরাজ জয়দেব গোস্বামী বৈদ্য নহেন, মহামহোপাধ্যায় উপাধি বা বৃত্তির প্রতি বৈদ্যের লোভ করা উচিত নহে, ইত্যাদি নানা অপূর্ব্ব তথ্য ও সদুপদেশ ইহাতে সন্নিবেশিত দেখিতে পাই আর মনে হয় 'দূষয়েৎ নো কথং বংশং ঘুণকীট ইবাধমঃ' ?

(১) জয়দেব বৈদ্য নহেন!

কালীবাবু ৪৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—"কবিরাজ পদবী দেখিয়া কোন কোন 'বৈদ্যব্রাহ্মণ' গীতগোবিন্দ-রচয়িতা জয়দেব গোস্বামীকে স্বশ্রেণীর মধ্যে টানিয়া আনিবার প্রয়াস পাইতেছেন।...গীতগোবিন্দের শেষে এরূপ আছে • অথ লক্ষ্মণসেননামনৃপতিসময়ে শ্রীজয়দেবস্য কবিরাজ-প্রতিষ্ঠা।...এখানে কবিরাজ চিকিৎসক কি বৈদ্যজাতির চিহ্নবোধক-রূপে ব্যবহৃত হয় নাই। কবিরাজ অর্থ কবিশ্রেষ্ঠ। তিনি গোস্বামী উপাধিধারী খাঁটী ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের বহু পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সেই সময় ব্রাহ্মণ ভিন্ন বৈদ্য কি কায়স্থের মধ্যে গোস্বামী উপাধি ছিল না।"

'গোস্বামী' লইয়া পুনশ্চ সেই কথা! আমরা ইহার উত্তর পূর্ব্বে দিয়াছি। 'কবিরাজ' শব্দের অর্থ 'পণ্ডিতরাজ' সত্য। কবিরাজ শব্দের অর্থ চিকিৎসক বা আয়ুর্ব্বেদজীবী, এরূপ কথা আমরা বলি না। কিন্তু 'কবিরাজ' শব্দ কেমন করিয়া বঙ্গীয় চিকিৎসক সম্প্রদায়কে বুঝাইতে আরম্ভ করিল, তাহার অনুসন্ধান কালীবাবু করিয়াছেন কি ?

সৌভাগ্যক্রমে কালীবাবু জয়দেবকে বোপদেবের মত মহারাষ্ট্রীয় বলেন নাই। তিনি যে বাঙ্গালী, এ বিষয়ে কালীবাবুর সন্দেহ নাই। কিন্তু বাঙ্গালী জয়দেব যে বৈদ্য-ব্রাহ্মণ নহেন, এ বিষয়ে তিনি কি প্রমাণ পাইয়াছেন ? প্রকৃত ব্যাপার এই যে, বৈদ্য জয়দেব গোস্বামী মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের সভাসদ্ ছিলেন এবং তাঁহার নিকট হইতে পাণ্ডিত্যসূচক

'কবিরাজ' উপাধি প্রাপ্ত হন। এই মহাসম্মানকর কবিরাজ উপাধিধারী বৈদ্যপণ্ডিতদিগের সংখ্যা কালে এত অধিক হইয়াছিল যে তখন 'কবিরাজ' বলিতে বৈদ্যদিগকেই বুঝাইত। বৈদ্যরাজ, পণ্ডিতরাজ, কবি-রাজ—তিনটী শব্দই একার্থক, কিন্তু বৈদ্যগণের মধ্যে বৈদ্য ও কবিরাজ এই দুইটী শব্দ এত বহুল ব্যবহৃত হইত যে, কালে 'কবিরাজ' শব্দ বৈদ্য-সম্প্রদায়েরই নিজস্ব হইয়া গিয়াছিল এবং বৈদ্যশব্দ ক্রমশঃ জাতিবোধক হইয়া পড়ায়, যে বৈদ্য চিকিৎসা করিতেন তাঁহাকে অর্থাৎ চিকিৎসককে বুঝাইতে কবিরাজ শব্দ ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হয়।* লক্ষ্মণ সেনের সময়ে যাহার খুসী সেই 'কবিরাজ' উপাধি ধারণ করিতে পারিত না। উহা বিশিষ্ট সম্মানের পরিচায়ক ছিল এবং বিশিষ্ট পাণ্ডিত্য না থাকিলে ঐ উপাধিলাভ ভাগ্যে ঘটিত না। প্রাচীন বৈদ্য পণ্ডিতগণ কিরূপে 'কবিরাজ' আখ্যাতি লাভ করিয়া ঐ শব্দটীকে ক্রমে ক্রমে স্ব স্ব বংশমধ্যে আবদ্ধ করিয়া ফেলেন তাহার কিঞ্চিৎ আভাস আমরা জয়দেবের উদাহরণে পাইতেছি। বাঙ্গালায় বৈদ্য সম্প্রদায় ব্যতীত কোন রাঢ়ী বা বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের 'কবিরাজ প্রতিষ্ঠা' যদি কালীবাবু দেখাইতে পারিতেন, তবে তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিবার প্রয়োজন হইত।

* ইহা হইতে ভাষাবিষয়ক একটী সূক্ষ্ম তত্ত্ব বুঝিতে পারা যায়। যখন 'কবিরাজ' শব্দ বঙ্গসমাজে বা বঙ্গভাষায় 'চিকিৎসক'কে না বুঝাইয়া পণ্ডিতকে বুঝাইত, সেই সময়ে 'বৈদ্য' শব্দ দ্বারাই চিকিৎসককে বুঝান হইত। 'বৈদ্য' শব্দ যখন চিকিৎসককে বুঝাইত, তখন বৈদ্য শব্দ নিশ্চিতই জাতিবাচক হয় নাই। (পশ্চিম ভারতে 'বৈদ্য' শব্দ জাতি-বাচক নহে; ইহা চিকিৎসককে বুঝায়, ঐ চিকিৎসকের জাতি নাম 'ব্রাহ্মণ')। যখন বৈদ্য শব্দ জাতিবাচক হয় নাই, তখন উহা চিকিৎসককে বুঝাইত. তখন চিকিৎসক, তাহার পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পুত্র ও আত্মীয়গণ আপনাদিগকে কোন্ জাতীয় বলিয়া পরিচয় দিতেন? অবশ্যই পশ্চিমের বৈদ্যগণের ন্যায় 'ব্রাহ্মণ' নামেই পরিচয় দিতেন, ইহাতে সংশয় নাই।

জয়দেবের 'কবিরাজ' উপাধি লইয়া টানাটানি কেন? আর পাঁচটা বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের ঐ উপাধি দেখাইলেই ত তিনি মোকদ্দমা জিতিতে পারেন।

এই জয়দেববংশীয় বিষ্ণুপদ শিরোমণির কন্যা গঙ্গাদেবীর সহিত শিবানন্দ সেন মহাশয়ের পুত্র কবিকর্ণপুরের বিবাহ হয়। ইহা হইতেই বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব এবং ব্রাহ্মণ জয়দেবের বৈদ্যত্ব সপ্রমাণ হয়। কবিরাজ উপাধি সম্বন্ধে ১৩৩-১৩৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(১২) "তস্মাদ্ বৈদ্যো দ্বিজঃ স্মৃতঃ"।—পৃষ্ঠা ৩২

'বৈদ্য' ৩০-৩১ পৃষ্ঠায় কালিবাবু লিখিতেছেন—

"বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব প্রদর্শন জন্য বৈদ্যপ্রবোধনী চরক-সংহিতা হইতে একটী বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন—

বিদ্যাসমাপ্তৌ ভিষজস্তৃতীয়া জাতিরুচ্যতে।
অশ্নুতে বৈদ্যশব্দং হি ন বৈদ্যঃ পূর্ব্বজন্মনা॥
বিদ্যাসমাপ্তৌ ব্রাহ্মং বা সত্ত্বমার্ষমথাপি বা।
ধ্রুবমাবিশতি জ্ঞানং তস্মাদ বৈদ্যস্ত্রিজঃ স্মৃতঃ॥

চরক সং, চিকিৎসিতস্থানম্, ১ম অঃ।

জ্ঞানং পাঠ নহে, জ্ঞানাৎ হইবে। প্রবোধনী অর্থ করিতেছেন—বিদ্যা সমাপ্তির পর ভিষক্ অর্থাৎ বৈদ্য শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের তৃতীয় জন্ম হয়, তখনই তাঁহারা 'বৈদ্য' উপাধি লাভ করেন, জন্মাবধি কাহারও সর্ব্ববিদ্যাবত্তাসূচক বৈদ্য নাম হইতে পারে না। বিদ্যা সমাপ্তি হইলে বৈদ্যের হৃদয়ে ব্রাহ্ম সত্ত্ব অথবা আর্ষ জ্ঞান বিকশিত হইয়া থাকে, এই জন্য ত্রিজ বলা হয়।

এই শ্লোকে প্রবোধনীর কথিত বৈদ্য শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের কথা বলা হয় নাই। ভিষক্ শব্দের শব্দের অর্থ বৈদ্য শ্রেণীর ব্রাহ্মণ কোথায় পাইলেন?"

পুনশ্চ ৩১-৩৩ পৃষ্ঠায়—

"এ পর্য্যন্ত আমরা 'তৃতীয়া জাতিরুচ্যতে' ও 'ত্রিজঃ স্মৃতঃ' পাঠ শুদ্ধ ধরিয়াই আলো-

চনা করিলাম।......হরিনাথ বিশারদ যে চরক সংহিতা দেবনাগর অক্ষরে কলিকাতা হইতে মুদ্রিত করিয়াছিলেন, তাহাতে এইরূপ পাঠ আছে—

বিদ্যা সমাপ্তৌ ভিষজো দ্বিতীয়া জাতিরুচ্যতে।

ধ্রুবমাবিশতি জ্ঞানাৎ তস্মাৎ বৈদ্যো দ্বিজঃ স্মৃতঃ॥ ইত্যাদি।

অনন্তর চরকের যে টীকা হরিনাথ বিশারদ চক্রপাণি দত্তের বলিয়া ছাপিয়াছেন, কালীবাবু তাহা উদ্ধৃত করিয়া স্বপক্ষ সমর্থন করিয়াছেন—

"বৈদ্যশব্দদ্বিজশব্দয়োঃ প্রবৃত্তিনিমিত্তমাহ বিদ্যেত্যাদি। তেন বিদ্যাযোগাৎ বৈদ্যত্বং তথা বিদ্যাসমাপ্তিলক্ষণজন্মনা দ্বিজত্বং ভবতীত্যুক্তম্।"

"......চক্রপাণি দত্ত যে দ্বিজ পাঠ ধরিয়াছেন, তাহাই ঠিক—ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। বোম্বাই সংস্করণেও দ্বিজ পাঠ আছে। অবিনাশচন্দ্র কবিরত্নের মুদ্রিত চরকে ত্রিজঃ পাঠ আছে.... .বৈদ্যপ্রবোধনী অবিনাশের পুস্তকে ত্রিজ শব্দ পাইয়া তাহার উপর তাহাদের (?) গবেষণা দাঁড় করাইয়াছেন।"

জ্ঞানাৎ স্থলে 'জ্ঞানং' মুদ্রিত করার জন্য বৈদ্যপ্রবোধনী ত্রুটি স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছে। কিন্তু বৈদ্যপ্রবোধনী যে অনুবাদ করিয়াছে, তাহা ত কালীবাবু উদ্ধৃত করিয়াছেন, তবে সেই অনুবাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই ত বুঝা যাইত, যে অনুবাদ ঠিক আছে, সুতরাং জ্ঞানাৎ স্থলে জ্ঞানং মুদ্রাকর প্রমাদ মাত্র! বাঙ্গালা ৎ ও ং লিখিতে একরূপ, এজন্য একটু অসাবধান হইলেই কম্পোজ করিতে ও প্রুফ দেখিতে ভুল হয়। কিন্তু কালীবাবুর 'বৈদ্য' পুস্তকের যে স্থানে দুটা সংস্কৃত কথা, সেই স্থলেই যে ভুল! আমরা এ সব কথা বলিতাম না। কিন্তু ধৃষ্টতার কাছে মুখমিষ্টতা চলে না, তাহাতে ধৃষ্টতা আরও বাড়িয়া যায়। বৈদ্য পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণে প্রথম পৃষ্ঠায় ফুটনোটে 'দেবকীনন্দনো' স্থলে 'দেবকীনন্দন' হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ ১৫৩ পৃষ্ঠায় 'বামুন' স্থলে 'বামন' পর্য্যন্ত দেখাইয়া দিতে গেলে পুস্তকের আকার

এক ফর্ম্মা বাড়িয়া যায় যে! প্রবোধনীর লেখা উদ্ধৃত করিতে গিয়া 'যন্ত্রৌষধী সমগ্মত' (বৈদ্য, পৃষ্ঠা ২৭) হইল কেন? এ সকল কদর্য্য ও অসহ্য ভুল জ্ঞানাৎ না অজ্ঞানাৎ? 'আত্মনো বিল্বমাত্রাণি পশ্যন্নপি ন পশ্যসি'?

উক্ত শ্লোকে 'ভিষক্' শব্দের অর্থ লইয়া যে আলোচনা করিয়াছেন, তদুত্তরে কালীবাবুকে এই পুস্তকের ২৫—৩১ পৃষ্ঠা দেখিতে পরামর্শ দিতেছি।

অতঃপর 'তৃতীয়া জাতিঃ' ও 'ত্রিজঃ' পাঠ অশুদ্ধ, ঐ স্থলে 'দ্বিতীয়া জাতিঃ' ও 'দ্বিজঃ' এই শুদ্ধ পাঠ হওয়া উচিত ইত্যাদি নানা কথা কালীবাবু বলিয়াছেন। বৈদ্যপ্রবোধনীকে খাট করিয়া নিজের বড়াই করাই কালীবাবুর উদ্দেশ্য! কালীবাবু বলিয়াছেন—"বৈদ্যপ্রবোধনী অবিনাশের পুস্তকে **ত্রিজ** শব্দ পাইয়া তাহার উপর তাহাদের (?) গবেষণা দাঁড় করাইয়াছেন।" অর্থাৎ 'অবিনাশ'ই বৈদ্যপ্রবোধনীর একমাত্র সম্বল এবং কেবল তাঁহার পুস্তকেই 'ত্রিজ' আছে! আমরা এ সকল কথার উত্তর দেওয়াও লজ্জাকর মনে করি। কিন্তু তথাপি কর্ত্তব্যের অনুরোধে এই হীনতা স্বীকার করিতে হইতেছে।

(১) 'তৃতীয়া জাতিঃ' ও 'ত্রিজঃ' পাঠ আচার্য্য গঙ্গাধরের স্বীয় তত্ত্বাবধানে মুদ্রিত চরকসংহিতায় জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে।

(২) উপেন্দ্রনাথ সেন ও দেবেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়দ্বয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত চরকেও 'তৃতীয়া জাতিঃ' ও 'ত্রিজঃ' পাঠ রহিয়াছে।

(৩) যাজন ব্রাহ্মণ কবিরাজ শ্রীসতীশচন্দ্র শর্ম্মা মহাশয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত চরকেও 'তৃতীয়া জাতিঃ' ও 'ত্রিজঃ' পাঠ রহিয়াছে।

(৪) বহুকাল পূর্ব্বে কায়স্থ কবিরাজ যশোদানন্দন সরকার মহাশয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত চরকেও 'ত্রিজাতিঃ' ও 'ত্রিজঃ' পাঠ রহিয়াছে।

কত বলিব? তবে যাজন-ব্রাহ্মণ হরিনাথ বিশারদ যে পাঠ কাটেন

নাই এবং চক্রপাণির টীকা নষ্ট করেন নাই তাহার প্রমাণ কি ? চরকের বোম্বাই সংস্করণে খুব সম্ভব বাঙ্গালার বিকৃত ও পরিবর্ত্তিত পাঠই ছাপা হইয়াছে সুতরাং উহা হরিনাথের মুদ্রিত চরকের ন্যায়ই অপ্রমাণ। চক্রপাণির টীকা বলিয়া যাহা দেওয়া হইয়াছে, বৈদ্য মহামহোপাধ্যায় চরক-চতুরানন চক্রপাণি তাহা কখনই লিখিতে পারেন না! কাল বাবু মূলের বিকৃত পাঠ ও বিকৃত টীকা তুলিয়া কেবল 'ইহাই ঠিক' বলিয়াছেন। এরূপ বলার হেতু কি ? বিকৃত মূল ও বিকৃত টীকার অনুবাদ করিলেন না কেন ? তাহা হইলেইত পাঠকেরা জুয়াচুরি ধরিয়া ফেলিত! বিকৃত মূলের এই অর্থ—

"বিদ্যা সমাপ্ত হইলে ভিষকের **দ্বিতীয় জন্ম** হইল বলা হয়। গর্ভ হইতে জন্মলাভ করিয়াই কেহ বৈদ্য হয় না। বিদ্যা সমাপ্ত হইলে বৈদ্যের হৃদয়ে ব্রাহ্ম-সত্ব বা আর্য-জ্ঞান প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই জন্য বৈদ্যকে **দ্বিজ** বলে"।

ইহার উপর টীকা অনাবশ্যক! বিদ্যার আরম্ভেই যে উপনীত বালক **দ্বিজ** সে বিদ্যার সমাপ্তিতে **দ্বিতীয় জন্ম** লাভ করিয়া **দ্বিজ** হয়, এ কেমন কথা ? পুনশ্চ বিদ্যা সমাপ্ত হইলে ব্রাহ্ম-সত্ব বা আর্য জ্ঞানের অধিকারী হইয়াও সে **দ্বিজ** হয়, ইহারই বা অর্থ কি ? একই কথা দুইবার কেন ? যে টীকা তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহার অর্থ এই—

"বৈদ্য, ও দ্বিজ শব্দ কেন প্রযুক্ত হয় তাহাই বুঝাইয়া দেওয়া হইতেছে। বিদ্যাযোগ হেতু বৈদ্যত্ব এবং **বিদ্যা সমাপ্তি হেতু দ্বিজত্ব**"! বিদ্যাসমাপ্তিতে যদি দ্বিজত্ব হয়, হবে অসমাপ্তবিদ্য বা অৰ্দ্ধসমাপ্তবিদ্য ব্রহ্মচারীরা শূদ্র ?' শাস্ত্র বলিতেছেন—

মাতুরগ্রেঽধিজননং দ্বিতীয়ং মৌঞ্জীবন্ধনে।
তৃতীয়ং যজ্ঞদীক্ষায়াং দ্বিজস্য শ্রুতিচোদনাৎ॥ মনু,২।১৬৯

অর্থাৎ মাতার গর্ভ হইতে প্রথম জন্ম, উপনয়ন কালে **দ্বিতীয়** জন্ম (উপনয়নের পর দ্বিজত্ব), পুনশ্চ জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞে দীক্ষা হইলে তৃতীয় জন্ম হয়, তখন ঐ দ্বিজ **ত্রিজত্ব** প্রাপ্ত হন।

এই শ্লোকের পরবর্ত্তী শ্লোক—

তত্র যদ্ ব্রহ্মজন্মাস্য মৌঞ্জীবন্ধনচিহ্নিতম্।
তত্রাস্য মাতা সাবিত্রী পিতাস্বাচার্য্য উচ্যতে॥

অর্থাৎ এই **তিন জন্মের** মধ্যে উপনয়ন সংস্কাররূপ যে দ্বিতীয় জন্ম তাহাতে গায়ত্রী মাতা এবং আচার্য্য পিতা।

তবে আয়ুর্ব্বেদের সমাপ্তিতে যে অলৌকিক ব্রাহ্ম-সত্ত্ব ও আর্য-জ্ঞান বিকাশের কথা রহিয়াছে, তদ্দ্বারা ব্রহ্মচারী, জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞে দীক্ষিতের ন্যায়, তৃতীয় জন্ম প্রাপ্ত হইয়া 'ত্রিজ' হয়, ইহাই ত সরল শাস্ত্রার্থ। **ঐস্থানে কিছুতেই 'দ্বিজ' পাঠ হইতে পারে না।** ঠিক ঐ কারণে 'বিদ্যাসমাপ্তৌ ভিষজঃ **তৃতীয়া জাতি** রুচ্যতে, এই পাঠই শুদ্ধ পাঠ। 'দ্বিতীয়া জাতিঃ' পাঠ নিতান্তই ভুল। বাঙ্গালী যাজন-ব্রাহ্মণ বৈদ্য-বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া, তাহার ত্রিজত্ব অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত উৎকর্ষ সহ্য করিতে না পারিয়া এই কাণ্ড করিয়াছে! কালীবাবু এমনই বুদ্ধিমান্ ও সংস্কৃতজ্ঞ যে ঐ বিকৃত পাঠকে শুদ্ধ ভাবিয়া প্রবোধনীকে পরিহাস করিতেছেন!

পাঠকের অবগতির জন্য কয়েকটী নিরপেক্ষ অনুবাদ তুলিয়া দিতেছি—

১। যশোদানন্দন সরকার (কায়স্থ) প্রণীত, বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত, চিকিৎসিত স্থান, ১ অ, ৪র্থ পাদ, ৮০—৮১ শ্লোক—

"শীলবান্, মতিমান্, যুক্তিজ্ঞ দ্বিজাতি (ব্রাহ্মণ) ও শাস্ত্রপারগ প্রাণাচার্য্য প্রাণীদিগের নিকটে গুরুবৎ পূজনীয়। **ব্রাহ্মণ দ্বিজাতি, কিন্তু কৃতবিদ্য বৈদ্য** ত্রিজাতি বলিয়া উল্লিখিত

হন। বৈদ্য পূর্ব্বজন্ম দ্বারা বৈদ্যনাম প্রাপ্ত হন না। উপবীত ধারণের পর **ব্রাহ্মণের দ্বিজাতি** নাম হয়, পরে বিদ্যাসমাপ্তি হইলে যখন তাঁহাতে চিকিৎসাজ্ঞান প্রভাবে ব্রাহ্ম বা আর্ষ সত্ত্ব অসংশয়িতরূপে আবিষ্ট হয়, **তখন তাঁহার ত্রিজ নাম** ঘটিয়া থাকে।"

২। কবিরাজ সতীশচন্দ্র শর্ম্মা কবিভূষণ (যাজন-ব্রাহ্মণ) কৃত চরকানুবাদ—

"সৎস্বভাব, মতিমান্, যুক্তিমান্, শাস্ত্রজ্ঞ এবং দ্বিজাতি প্রাণাচার্য্যকে মনুষ্যগণ গুরুবৎ পূজা করিবেন। ব্রাহ্মণ দ্বিজাতি বটে, কিন্তু বেদজ্ঞ বৈদ্য ত্রিজাতি। বৈদ্য এই নাম পূর্ব্বজন্ম দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। উপনয়ন সংস্কারের পর ব্রাহ্মণ দ্বিজাতি নাম গ্রহণ করেন, পরে যখন বেদ-অধ্যয়ন এবং চিকিৎসাজ্ঞান-প্রভাব দ্বারা ব্রাহ্ম বা আর্ষ সত্ত্ব অসংশয়িত রূপে তাহাতে আবিষ্ট হয়, তখন তিনি **ত্রিজ অর্থাৎ বৈদ্য নামে** অভিহিত হন।"

৩। দেবেন্দ্রনাথ সেন ও উপেন্দ্রনাথ সেন কর্ত্তৃক প্রকাশিত চরকসংহিতা তদীয় আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়াধ্যাপক প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক অনূদিত। ইহার প্রদত্ত পাঠে 'দ্বিজাতিঃ শাস্ত্রপারগঃ' স্থলে 'ত্রিজাতিঃ শাস্ত্রপারগঃ" আছে—এরূপ পাঠ হইলে ব্যাখ্যাও একটু পরিবর্ত্তিত করিতে হয়, ত্রিজাতি প্রাণাচার্য্য অর্থাৎ ভিষক্ সকলের পূজনীয়। ত্রিজাতি কেন বলা হইল? তাহাই পরবর্ত্তী শ্লোকগুলিতে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং অবশিষ্টাংশে উপরে প্রদত্ত অনুবাদের সহিত সম্পূর্ণ মিল আছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি 'দ্বিতীয়া জাতিঃ' ও 'দ্বিজঃ' পাঠ কতকগুলি দুষ্টপ্রকৃতিক লোকের কাণ্ড। উহারা 'ত্রিতীয়া জাতিঃ' ও 'ত্রিজঃ' পাঠ কাটিয়া ঐরূপ বসাইয়াছে, এবং চক্রপাণির টীকাও কাটিয়া পরিবর্ত্তিত করিয়াছে, কিন্তু সামঞ্জস্য করিতে পারে নাই। বস্তুতঃ যে

প্রথম উপনয়ন সংস্কারেই **দ্বিজ** হইয়াছে, সে আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যা সমাপ্ত করিয়া দ্বিতীয় জন্ম বা দ্বিজত্ব লাভ করিবে, এ কেমন কথা? বিদ্যা সমাপ্ত হইলে ব্রহ্মচারী ব্রাহ্ম বা আর্ষ সত্ত্বের অধিকারী হইয়া **ত্রিজই** হয় অর্থাৎ সাধারণ দ্বিজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয়। এই জন্যই 'ত্রিজ' প্রাণাচার্য্য দ্বিজগণের বন্দনীয়, গুরুবৎ উপাস্য, এই জন্যই বৈদ্য সাধারণ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এই জন্যই "দ্বিজেষুঃ বৈদ্যাঃ শ্রেয়াংসঃ।" কিন্তু কালী-বাবু বুঝিবেন কি? 'বিষণ্ড মোহঃ স্থগয়তি কথং মন্দভাগ্যাঃ করোতি?'

(১৩) দ্বিজেষু বৈদ্যাঃ শ্রেয়াংসঃ।

রক্তবস্ত্র দেখিলে জীববিশেষ যেমন আতঙ্কিত হয়, 'দ্বিজেষু বৈদ্যাঃ শ্রেয়াংসঃ' এই স্থলে বৈদ্য শব্দ দেখিয়াও অনেকে সেইরূপ আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া থাকে। তাহারা যদি বারেক বুঝিতে পারে যে এই 'বৈদ্যগণ' বর্ত্তমান যাজন-ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যব্রাহ্মণ উভয়েরই পূর্ব্বপুরুষ, তবে বোধ হয় তাহাদের উদ্বেগ কিছু কমে। আমরা মহাভারত ও মনুসংহিতার বচন পাশাপাশি করিয়া তুলিয়া দিতেছি—

মনুসংহিতা	মহাভারত
১।৯৬—৯৭	উদ্যোগ, ৩অঃ
ভূতানাং প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ	ভূতানাং প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ
প্রাণিনাং বুদ্ধিজীবিনঃ।	প্রাণিনাং বুদ্ধিজীবিনঃ।
বুদ্ধিমৎসু নরাঃ শ্রেষ্ঠাঃ	বুদ্ধিমৎসু নরাঃ শ্রেষ্ঠাঃ
নরেষু ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতাঃ॥	নরেষ্বপি দ্বিজাতয়ঃ॥
<u>ব্রাহ্মণেষু তু বিদ্বাংসঃ</u>	<u>দ্বিজেষু বৈদ্যাঃ শ্রেয়াংসঃ</u>
বিদ্বৎসু কৃতবুদ্ধয়ঃ।	বৈদ্যেষু কৃতবুদ্ধয়ঃ।
কৃতবুদ্ধিষু কর্ত্তারঃ	কৃতবুদ্ধিষু কর্ত্তারঃ
কর্ত্তৃষু ব্রহ্মবেদিনঃ॥	কর্ত্তৃষু ব্রহ্মবেদিনঃ॥

একটু মিলাইয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে "উদ্ধৃত দুইটী বাক্যে দ্বিজও ব্রাহ্মণ এক অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। ফলে "ব্রাহ্মণেষু বৈদ্যাঃ বা বিদ্বাংসঃ শ্রেয়াংসঃ" অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের মধ্যে যাঁহারা বৈদ্য বা বিদ্বান্ তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ, এইরূপ প্রতীতি হইতেছে। মহাভারত ও মনু একবাক্যে বলিয়াছেন, মানবগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ বা দ্বিজজাতি শ্রেষ্ঠ। যে ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদ পাঠ করে এবং বেদের প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম যাহার উপাসনীয় সেই ব্রাহ্মণ। কিন্তু যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণের উল্লেখ সকলের শেষে রহিয়াছে, তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহ নাই। সুতরাং এ স্থলে 'ব্রাহ্মণ' অর্থ বেদপর সাধারণ ব্রাহ্মণ। শাস্ত্রচর্চ্চা জ্ঞানাধিক্য বশতঃই সাধারণ আর্য্য বা দ্বিজ হইতে প্রথম বর্ণের উৎকর্ষ। কিন্তু বিদ্যা বেদেই অর্থাৎ ত্রয়ীতেই সীমাবদ্ধ নয়। বেদকে যেমন বিদ্যা বলা হয়, ঐরূপ নানাবিধ বিজ্ঞানকেও বিদ্যা শব্দ দ্বারা নির্দ্দিষ্ট করা হইয়া থাকে। এই জন্য কেহ বলেন 'ত্রয়ী বৈ বিদ্যা' কেহ বলেন বিদ্যা চার—'আন্বীক্ষিকী ত্রয়ী বার্ত্তা দণ্ডনীতিশ্চ শাশ্বতী। এতা বিদ্যাশ্চতস্রস্তু লোকসংস্থিতিহেতবঃ॥" কেহ বলেন বিদ্যা চতুর্দ্দশ, কাহারও মতে অষ্টাদশ, কেহ বলেন বিদ্যা অনন্ত। যতদূর সম্ভব সমস্ত বিদ্যাকে যে আয়ত্ত করিতে পারে সেই প্রকৃষ্ট বিদ্বান্—বিদ্যাসাগর—সকল বিদ্যার আধার—'বৈদ্য'। 'ব্রহ্ম'শব্দ হইতে ব্রাহ্মণ, 'বিদ্যা' শব্দ হইতে বৈদ্য। অতএব বেদ এবং তদতিরিক্ত আয়ুর্ব্বেদাদি বিবিধ বিজ্ঞানরাশি যে অধিগত করিয়াছে সেই 'বৈদ্য', সেই যথার্থ বিদ্বান্। দ্বিজের অবশ্য কর্ত্তব্য ধর্ম্ম বেদ পাঠ করা। সেই বেদ যে পাঠ করে, এবং যে পাঠ করায় সেই প্রথম বর্ণের দ্বিজ বা নরশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ। ইনি উপাধ্যায়াদির কার্য্য করিয়া থাকেন, কিন্তু এই সাধারণ ব্রাহ্মণগণ অপেক্ষা যাঁহাদের সর্ব্বতোমুখ বিদ্যাধিক্য দেখা যায়, সেই অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ব্রাহ্মণই 'বৈদ্য'। আয়ুর্ব্বেদেও

কথিত আছে, ঋগাদি বেদ অধ্যয়ন করিয়া পুনরুপনীত হইয়া আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিতে হয়। প্রাচীন ঋষিগণ আয়ুর্ব্বেদ-বিজ্ঞানে কৃতবিদ্য হইয়া তবে বৈদ্য নাম পাইয়াছিলেন। বশিষ্ঠ, ভরদ্বাজ, মুদ্গল প্রভৃতি মহর্ষিরা এইরূপেই বৈদ্য হইয়াছিলেন। লোকানুগ্রহ-সমর্থ এমন বিদ্যা আর নাই, ইহা জানিয়া পরদুঃখকাতর মহর্ষিরা নিখিল দর্শনশাস্ত্রের ভাণ্ডার আয়ুর্ব্বেদে প্রবেশ করিতে বিশেষ যত্ন করিতেন। প্রায় সকল মহর্ষিরাই এই জন্য বৈদ্য, এবং আদি বৈদ্যগণ সকলেই মহর্ষি ছিলেন। এই মহাসম্মানকর 'বৈদ্য' নাম যে বংশের বংশধরগণ ব্রাহ্মণশব্দ অপেক্ষা অধিকতর গৌরবজনক জানিয়া ধারণ করিয়া থাকেন, তাঁহারাই বৈদ্য-সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণ। ভরদ্বাজ যে সময়ে আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, সে সময়ে তিনি গৃহী। অতএব বৈদ্য হইবার পূর্ব্বে তাঁহার যে সন্তানগণ জন্মিয়াছিল, তাহারা বৈদ্যসম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণ হয় নাই। এই জন্য ভরদ্বাজ-গোত্রীয় ব্রাহ্মণদের মধ্যে বৈদ্যব্রাহ্মণ ও যাজন-ব্রাহ্মণ এই দুই শ্রেণী দেখা যায়, এবং এই দুই শ্রেণীই স্বগোত্রভাক্। বৈদ্য-সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক বহুক্ষেত্রে অবিধিক্রমে উৎপাদিত সন্তানেরাও (কেশেল ব্রাহ্মণদের মত) ব্রাহ্মণ হইত, কিন্তু পিতার বৈদ্যবৃত্তিতে বা বৈদ্যনামে অধিকারী হইত না। এই জন্যই সকল গোত্রের মধ্যে যাজন-ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় ও বৈদ্যব্রাহ্মণ সম্প্রদায় দেখা যায়। এই জন্যই সাধারণ ব্রাহ্মণের পক্ষে চিকিৎসা নিষিদ্ধ। চিকিৎসাবৃত্তি হীন বলিয়া এই নিষেধ নহে, ঐ ব্রাহ্মণেরাই হীন বলিয়া এই নিষেধ। এই জন্য অন্য ব্রাহ্মণের পাচিত ঔষধও সেবন করিতে নাই। সাধারণ ব্রাহ্মণই যখন অনধিকারী অন্য জাতির কথা কি? এই জন্য কালীবাবু বৈদ্য পুস্তকের ৫-৬ পৃষ্ঠায় যে শ্লোক তুলিয়াছেন, তাহা যথার্থই সত্য—

শুদ্ধবংশোদ্ভবৈর্বৈদ্যৈঃ কৃতং মাংসঞ্চ মোদকম্।
শুদ্ধং রসায়নং ভোজ্যং তদন্যৈর্ন কদাচন॥

অতঃ শূদ্রাদিভি র্বর্ণৈঃ পাচিতে খাদিতে সতি।
প্রায়শ্চিত্তীভবেচ্ছূদ্রো জাতিহীনো ভবেদ্দ্বিজঃ॥
বৈদ্যেন নহি যৎ পক্বং অভক্ষ্যং ব্যাধিবর্দ্ধনম্।
ইতি বিজ্ঞায় মতিমান্ বৈদ্যং পাকে নিযোজয়েৎ॥

বৈদ্যসম্প্রদায়ভুক্ত অর্থাৎ চিকিৎসাবৃত্তিক ব্রাহ্মণ দ্বারা পাচিত ঔষধই সকলে সেবন করিবে, অপর কাহারও পাচিত ঔষধ কদাপি সেবন করা উচিত নহে। শূদ্র, বৈশ্য, ক্ষত্রিয় সাধারণ ব্রাহ্মণ—কেহই এই ঔষধ পাকে অধিকারী নহে। ইহাদের পাচিত ঔষধ খাইলে শূদ্রেরও প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, ব্রাহ্মণের ত সাক্ষাৎ জাতিলোপ হইবে (ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যেরও জাতিলোপ হইবে)। বৈদ্যের দ্বারা যাহা পাচিত নয় তাহা অভক্ষ্য এবং ব্যাধির বৃদ্ধিকর, ইহা জানিয়া শাস্ত্রজ্ঞ-ব্যক্তি বৈদ্যকেই ঔষধ পাকে নিযুক্ত করিবে। [এ স্থলে বৈদ্য শব্দ দ্বারা বৈদ্যসম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণকেই বুঝান হইতেছে, অন্য কোন বর্ণ বা জাতির ঔষধ পাকে অধিকার ছিল না, তাহাও বলা হইতেছে। ইহা দ্বারা অম্বষ্ঠও ঔষধ পাকে অনধিকারী—জানা যাইতেছে।] ঐ সঙ্গেই আছে—"অন্যজাতিকৃতঃ পাকো হ্যস্পৃশ্য সর্ব্বজাতিভিঃ"। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, কালীবাবু শ্লোক তুলিয়াছেন কিন্তু উহার অর্থ বুঝিতে পারেন নাই!

যাহা হউক, বৈদ্যশব্দের মূল অর্থ 'সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ' হইলেও, উহা যে কালে ঐরূপ ব্রাহ্মণদের লইয়া গঠিত আয়ুর্ব্বেদবিৎ সম্প্রদায়কে বুঝাইতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। এই সম্প্রদায়ই ভারতের প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদবিৎ ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়। বঙ্গীয় বৈদ্যগণ তাঁহাদেরই ধারা। অতএব দ্বিজগণের মধ্যে বৈদ্যজাতি সর্ব্বপ্রধান, এরূপ অর্থ মনু ও বেদব্যাসের অভিপ্রেত না হইলেও, বাঙ্গালাদেশের সনাতন বৈদ্য সম্প্রদায়ের উহাতে গৌরব ও আনন্দ

অনুভব করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। তাঁহারা স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণদিগের কার্‌সাজিতে এবং নিজেদের অনন্যসাধারণ স্বাতন্ত্র্যের ফলে বৈদ্য-নামক সম্প্রদায় হইতে বৈদ্যজাতিতে পরিণত হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের সম্বন্ধে ঐরূপ অর্থ কিছু মাত্র অসঙ্গত হয় না। মুসলমান ও ইংরাজ রাজত্বে নানা সমাজিক বিপ্লবের পর হইতে পশ্চিম ভারতে যে কোন শ্রেণীর ব্রাহ্মণই আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন ক'রয়া চিকিৎসা করিতে পারে। আজকাল তাহাদের বৈদ্য ও অবৈদ্য শ্রেণীর মধ্যে বি াহাদি চলিতে আরম্ভ হইয়োছে, কিন্তু বৈদ্যকুলজ বৃদ্ধ সারস্বত ব্রাহ্মণগণ এখনও ইহা অগৌরবকর বলিয়া বিবেচনা করেন। বাঙ্গালার সারস্বত ধারা আপনাদিগকে অদ্যাবধি অপর শ্রেণীর সহিত মিশিতে দেয় নাই, এবং আজও তাহারাই একমাত্র সনাতন আয়ুর্ব্বেদাধিকারী সম্প্রদায় বলিয়া গণ্য আছেন। বঙ্গদেশে সেদিন পর্য্যন্ত অন্য শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিতে বা চিকিৎসা করিতে সাহস পায় নাই!

(১৪) ব্রাহ্মণের পক্ষে চিকিৎসাবৃত্তি অতি হেয়!

আমরা পূর্ব্বে একাধিকবার প্রমাণ প্রয়োগ সহকারে দেখাইয়াছি যে অধিকারী ব্রাহ্মণের পক্ষে চিকিৎসা কখনও নিন্দা বা হেয়তার কারণ ছিল না। উহা শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের বৃত্তি। কালীবাবু ও সত্যেন্দ্রবাবুর ধারণা ব্রাহ্মণ চিকিৎসক অত্যন্ত হেয়। তাঁহারা লিখিয়াছেন—

(১) "চিকিৎসক ব্রাহ্মণ ত **অতি হেয়**, মনু প্রভৃতি শাস্ত্র-কারগণ, তাহাদিগকে শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ করিতেও নিষেধ করিয়াছেন।" (বৈদ্য, পৃঃ ৬৬)

(২) যে সকল বৈদ্য ব্রাহ্মণ হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা কি তবে এই **হেয় চিকিৎসক ব্রাহ্মণ** হইতে প্রস্তুত আছেন?" (ঐ)

(৩) 'বৈদ্যগণ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হইলে তাঁহাদের চিকিৎসাবৃত্তি কোথা হইতে আসিল?" (বৈশ্য, ঐ)

(৪) "বৈদ্যগণের বৃত্তি যখন চিকিৎসা, তখন তাঁহারা শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ না হইয়া **অতি নীচ ব্রাহ্মণ** হইয়া পড়িবেন।" (ঐ)

(৫) "আমরা ব্রাহ্মণ হইলে ক্ষতি ভিন্ন লাভ নাই। (কিন্তু) ব্রাহ্মণগণের চিকিৎসাবৃত্তি কোনও শাস্ত্রে উক্ত হয় নাই। চিকিৎসা ব্যবসায় দ্বারা ব্রাহ্মণগণ হেয় হইয়া থাকেন, ইহাই শাস্ত্রকারগণের অভিপ্রায়। (বৈদ্য, ভূমিকা, ৵০)

সত্যেন্দ্রবাবু কালীবাবুর সমর্থক, সুতরাং তাঁহার ভিন্ন মত হইতে পারে না। তিনি লিখিয়াছেন—

(১) "বৈদ্যগণের ব্রাহ্মণত্ব সম্বন্ধে একটা গুরুতর আপত্তি এই যে তাহা হইলে তাঁহাদের অপাঙ্‌ক্তেয় শ্রেণীভুক্ত হইতে হইবে।" (বৈ০ প্রতি০ ৭৮ পৃঃ)

সত্যেন্দ্রবাবু জ্ঞানপাপী। চিকিৎসা ব্রাহ্মণের বৃত্তি ইহা তিনি স্বীকার করেন। ইহাতে কালীবাবুর দোষটুকু কাটান হইল, কিন্তু নিজের কথার সহিত এই স্বীকারোক্তির সামঞ্জস্য কেমন রক্ষা করিয়াছেন দেখুন—

(ক) "চিকিৎসা অম্বষ্ঠের জাতীয় বৃত্তি। কিন্তু ঐ বৃত্তি ব্রাহ্মণের পক্ষে নিন্দিত। ব্রাহ্মণ লোকহিতার্থে চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন ও চিকিৎসা কর্ম্ম সম্পাদন করিতে পারেন। কিন্তু ঐ বৃত্তি-জীবী হওয়া তাঁহার পক্ষে নিন্দিত।" [প্রথমে বলিলেন চিকিৎসাবৃত্তিই নিন্দিত, পরে বলিলেন জীবিকা না করিলে ঐ বৃত্তি নিন্দিত নহে পুনশ্চ বলিলেন বৃত্তি-জীবী হওয়া নিন্দিত। আচ্ছা অধ্যাপনা ত ব্রাহ্মণের একটী বৃত্তি? যদি কেহ বলেন "**অধ্যাপনা বৃত্তিই নিন্দিত**, পুনশ্চ জীবিকা না করিলে অধ্যাপনা বৃত্তি নিন্দিত নহে, কিন্তু অধ্যাপনাজীবী হওয়াই নিন্দিত' তাহা হইলে অধ্যাপনাবৃত্তিই নিন্দিত এই মিথ্যা কথা বলিয়া লাভ কি হয়? চিকিৎসা-বিক্রয় ত নিন্দিত, কিন্তু (অবিক্রীত)

চিকিৎসা কেন নিন্দিত হইবে? বৃত্তি শব্দের অর্থ 'স্বভাবজ কর্ম্ম'ও হয়, এবং 'অর্থকরী জীবিকা'ও হয়। প্রথম অর্থে চিকিৎসাও অধ্যাপনা নিন্দিত নহে, বরং অতীব প্রশংসনীয়, দ্বিতীয় অর্থে নিন্দনীয়। ইহা না বুঝিয়া সত্যেন্দ্রবাবু পুনশ্চ লিখিয়াছেন—"কোনও স্থানেই ত ব্রাহ্মণের পক্ষে চিকিৎসা বৃত্তির উল্লেখ নাই।" (পৃঃ ২৮১)

সত্যেন্দ্রবাবুর মতে চিকিৎসা সকল সময়েই পণ্য! কি আজকাল কি প্রাচীন কালে "চিকিৎসা কার্য্যের বিনিময়ে যাহা উপার্জ্জন করা যায় তাহাকে নিশ্চয়ই 'অযাচিত' মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা চলে না।' (পৃঃ ৮১) কিন্তু এস্থলে বৈশ্যজনোচিত বিনিময়-জ্ঞান হৃদয়ে জাগিয়া উঠে কেন? যে সকল বিদ্যাবাগীশেরা অহর্নিশ ব্যবসাঃ-কর্ম্মে ও লাভা-লাভের খতিয়ানে মগ্ন তাহাদের মধ্যে এই সব ভাব স্বতই জাগিয়া উঠে। তবে ত অধ্যাপনাবৃত্তিক (বৃত্তি এস্থলে জীবিকা নহে) ব্রাহ্মণ-গণও অহরহঃ 'বিনিময়' করিতেছে এবং অপাঙ্‌ক্তেয় হইতেছে! কি আপদ্ বলত? পুনশ্চ বলিতেছেন—"রোগী সন্তুষ্ট হইয়া যাহা দিতেন, তাহাই গ্রহণ করিতেন। এ কথা সত্য। কিন্তু তথাপি ত উহা বৃত্তি।" ৩৬ বৎসর গুরুর অন্নে প্রতিপালিত হইয়া শিষ্য যখন গুরুকে একটী হরিতকী দান করিয়া তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিত, তখন গুরু কর্তৃক ঐ হরিতকী গ্রহণ কিরূপে অর্থকরী জীবিকা বলিয়া গণ্য হইতে পারে তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য! এ সকল কথা সত্যেন্দ্রবাবুকে বহুবার বলিয়াছি এবং কাগজে লিখিয়াও পাঠাইয়াছি, কিন্তু তাহা কাগজেই লেখা আছে, মগজে ঢুকে নাই! শাস্ত্রের উপর ঐরূপ উৎপাত করিলে কাহারও পক্ষেই 'বিদ্যাদান' সম্ভব হইতে পারে না, সকলেই 'বিদ্যা-বিক্রয়ী' ও 'অপাংক্তেয়' হইয়া পড়েন সত্যেন্দ্রবাবুর কোথায় গোল, তাহা আমরা বুঝিয়াছি,—যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দান, প্রতিগ্রহ—এই ছয় ব্রাহ্মণবৃত্তি (ষট্‌বৃত্তি—

এস্থলে বৃত্তি স্বভাবজ কর্ম্ম ও অর্থকরী জীবিকা উভয়কেই বুঝাইতেছে)। ইহাদের মধ্যে তিনটী জীবিকা ('ষন্নাম্ তু কর্ম্মণাম্ অস্য ত্রীণি কর্ম্মাণি জীবিকা') অর্থাৎ জীবনোপায়। জীবনোপায় বলিলেই বৈশ্যোচিত 'ব্যবসায়' মনে করা উচিত নহে। জীবনধারণের উপায় বলিয়া অধ্যাপনা, যাজন ও প্রতিগ্রহ জীবিকা। ইচ্ছা হইলে ইহার প্রত্যেকটীকে পণ্যরূপে বিক্রয় করিয়া প্রভূত উপার্জ্জন সম্ভব। যে তাহা না করে সেই ঐ তিন জীবিকা বা বৃত্তি অবলম্বন করিয়াও 'ঋত', 'অমৃত' ('অমৃতং স্যাৎ অযাচিতম্') প্রভৃতি উপায়ে জীবন যাপন করিতে পারে। সত্যেন্দ্রবাবু ত মনুর ইংরাজি টীকা লিখিয়াছেন, তবে 'ব্রহ্মসত্রেণ জীবতি' নিজেই কিরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন দেখুন না? ব্রহ্মসত্রের অর্থ অধ্যাপনা বলিয়াও কিরূপে ঐ শ্রেষ্ঠ বৈদ্য ব্রাহ্মণকে বিদ্যা (ও চিকিৎসা) বিক্রেতা বলিতে পারেন?

জীবিকা বা বৃত্তি বলিলেই যে 'ব্যবসায়' বুঝায় না, তাহা একালের লোকে কালের গুণে বুঝিতে পারে না। সুতরাং সত্যেন্দ্রবাবুর অপরাধই বা কি? এই জন্যই তিনি লিখিতেছেন—

"রোগী সন্তুষ্ট হইয়া যাহা দিতেন তাহাই গ্রহণ করিতেন। একথা সত্য। কিন্তু তথাপি ত উহা বৃত্তি। যাজনবৃত্তিও ত ঐরূপই! কোনও পুরোহিত ত জবরদস্তি করিয়া দক্ষিণা আদায় করিতেন না (এখনও করেন না) তাই বলিয়া কি পুরোহিত যাজনবৃত্তিজীবী বলা হইবে না?" কেন বলা হইবে না? ব্রাহ্মণ মাত্রেই যাজনে অধিকারী এবং ধর্ম্মবুদ্ধিতে নির্লোভ যাজন প্রতিগ্রহেরই ন্যায় পবিত্র কর্ম্ম। বশিষ্ঠের মত সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ যজমানদিগের পৌরোহিত্য করিতেন, কিন্তু তাঁহারা যাজন**বৃত্তি-জীবী** ছিলেন না। যাজন সকল ব্রাহ্মণের সাধারণ স্বভাবজ কর্ম্ম। ব্রাহ্মণ বলিলেই অন্যান্য স্বাভাবিক ধর্ম্মের সহিত ঐ স্ব-ভাবটীও বুঝায়। এরূপ স্থলে যদি কোন ব্রাহ্মণকে লক্ষ্য করিয়া

অন্য কোন স্ব-ভাবজ কর্ম্মের উল্লেখ না করিয়া, কেবল 'যাজন' টুকুর পরেই 'বৃত্তি' জুড়িয়া দেওয়া যায়, তবে ঐ Special mention হইতে তাহাকে বহুযাজী বা যাজন-বিনিময়ে জীবিকা নির্ব্বাহকারী বলিয়া মনে হওয়া স্বাভাবিক। এরূপ অবস্থায় যদি তাহার পরে আবার একটী 'জীবী' সংযুক্ত করা যায়, তবে ত আর বুঝিতে বাকী থাকে না যে, ঐ ঠাকুরটীর কুটুম্বভরণের উপায় 'যাজন'! যে ভারতে ঋত, অমৃত প্রভৃতি নির্লোভ জীবনোপায়ের সহিত অসাধারণ ক্লেশসহিষ্ণুতা বিজড়িত হইয়া ব্রাহ্মণের মহিমা ঘোষণা করিয়াছে, যেখানে ধর্ম্মভাব নষ্ট হয় ও ক্রিয়া পণ্ড হয় বলিয়া বহুযাজিত্ব বা গ্রামযাজিত্বের নিন্দা করা হইয়াছে, লোভের উদয় হয় বলিয়া পুনঃ পুনঃ প্রতিগ্রহেরও নিন্দা রহিয়াছে এবং সাধারণ ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষেধ রহিয়াছে, সেখানে 'যাজন-বৃত্তি-জীবী' বলিলে ঐ যাজন বৃত্তি-জীবীরই নিন্দা হইবে, বশিষ্ঠ, শতানন্দ, ধৌম্য প্রভৃতি আদর্শ পুরোহিতগণকে বুঝাইবে না তাহাদের নিন্দাও হইবে না। কালীবাবু যাহা বুঝিতে পারেন নাই, সত্যেন্দ্রবাবুরও তাহাই বুঝিতে নিষেধ! কালীবাবু চিকিৎসকের নিন্দা সূচক শাস্ত্র কেমন তুলিয়াছেন দেখুন—

(ক) "বিপ্রো দৈবজ্ঞোপজীবী **বৈদ্যজীবী চিকিৎসকঃ**।
লাক্ষা-লোহাদি**ব্যাপারী** রসাদি**বিক্রয়ী** চ যঃ॥
স যাতি নাগবেষ্টঞ্চ নাগৈর্বেষ্টিত এব চ।
বসেৎ স্বলোমমানাব্দং তত্রৈব নাগদংশিতঃ॥

(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, ৩১ অ—৫৫—৫৬)

যে ব্রাহ্মণের দৈবজ্ঞবৃত্তি বা বৈদ্যবৃত্তি উপজীবিকা এবং যে ব্রাহ্মণ লাক্ষা লৌহ ও রসাদি বিক্রয়কারী সে নাগবেষ্ট নামক নরকে নাগগণ কর্ত্তৃক বেষ্টিত ও দংশিত হইয়া নিজ লোম পরিমিত বৎসর বাস করে।" (বৈদ্য, পৃঃ ৬৮)

উপরের কথাগুলি নিজে Antic অক্ষরে বড় বড় করিয়া ছাপাইয়াছেন অথচ নিজেই ঐ সকল শব্দের অর্থ কি তাহা বুঝেন নাই! 'লাক্ষা'-লৌহ-**ব্যাপারী'** এবং 'রসাদি-**বিক্রয়ী'** এই দুইটী পদে 'ব্যাপারী' ও 'বিক্রয়ী' শব্দও তাঁহাকে চৈতন্য দান করে নাই! এখানে যে বৈশ্যধর্ম্মা বাণিজ্যপর ব্রাহ্মণদের সহিত চিকিৎসা-পুণ্য-'বিক্রেতার'ই কথা হইতেছে, তাহা মূলের **'বৈদ্যজীবী** চিকিৎসকঃ' ও কালীবাবুর অনুবাদ ('যে ব্রাহ্মণের বৈদ্যবৃত্তি উপজীবিকা') হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। সুতরাং এও যে অন্যান্য বৈশ্যধর্ম্মা ব্রাহ্মণদের সহিত অপাংক্তেয় বিবেচিত হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? সুতরাং পরবর্ত্তী বাক্যে কালীবাবুর সিদ্ধান্তেই আশ্চর্য্য হইতে হয়। কালীবাবু বলিতেছেন—

"ব্রাহ্মণের চিকিৎসা বৃত্তি সমস্ত শাস্ত্রে নিন্দিত। চিকিৎসাজীবী ব্রাহ্মণ পতিত ও অপাংক্তেয়। কোন শাস্ত্রেই ব্রাহ্মণের চিকিৎসা বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট হয় নাই।"

কালীবাবুর প্রদত্ত আর একটী প্রমাণ পাঠকগণের উপভোগার্থ উদ্ধৃত করিতেছি—

"নক্ষত্র-তিথি-বক্তারো **ভিষক্‌শাস্ত্রোপজীবিনঃ**।

*   *   *   *   *   *

*   *   *   শ্রাদ্ধে বর্জ্জ্যাঃ প্রযত্নতঃ॥—(সৌর পুরাণ, ১৯অ)

এস্থলেও দেখুন, 'ভিষক্‌' বলা হয় নাই, 'ভিষকের যে শাস্ত্র, তাহার দ্বারা যে উপজীবিকা করে' বলা হইয়াছে। এস্থলে কালীবাবু যে সকল কথা তারাচিহ্ন দ্বারা বিলুপ্ত রাখিয়াছেন, তদ্দারা বৈশ্যধর্ম্মা 'ব্যবসাদার' ব্রাহ্মণদিগকেই বুঝাইতেছে। 'নক্ষত্রতিথিবক্তারঃ' পদটীও পূর্ব্ব প্রমাণের দৈবজ্ঞোপজীবীর সামিল! জ্যোতিষ বেদাঙ্গ; সুতরাং জ্যোতিষের জ্ঞান

ব্রাহ্মণের পক্ষে নিন্দনীয় হইতেই পারে না, কিন্তু যে ব্রাহ্মণ ঐ জ্ঞানকে পণ্যরূপে ব্যবহার করে, এস্থলে তাহারই নিন্দা করা হইয়াছে।

কালীবাবুর শেষ প্রমাণ—

"আবিক শ্চিত্রকারশ্চ বৈদ্যো নক্ষত্রপাঠকঃ।

চতুর্ব্বিপ্রা ন পূজ্যন্তে বৃহস্পতিসমা যদি॥ (৩৭৮, অত্রি সং)

কালীবাবুই অর্থ করিয়াছেন—"অজাজীবী অর্থাৎ মেষব্যবসায়ী, **চিত্রকর** (চিত্রব্যবসায়ী), **চিকিৎসা-ব্যবসায়ী**, নক্ষত্র-**জীবী** এই চতুর্ব্বিধ বিপ্র বৃহস্পতিতুল্য পণ্ডিত হইলেও পূজনীয় নহে। "এস্থলে যে ব্যবসাদার ব্রাহ্মণদের নিন্দা হইয়াছে, এবং তাহাদের সহিত উল্লিখিত ঐ বৈদ্য যে 'চিকিৎসাব্যবসায়ী, তাহা কালীবাবু নিজের মুখেই বলিতেছেন, কিন্তু দুর্দ্দৈব এমনই প্রবল যে বিশুদ্ধ চিকিৎসাকেও এই সকল নিন্দায় বিষয়ীভূত মনে করিতেছেন!

সত্যেন্দ্রবাবুকে এ সকল বিষয় বহুবার বলিয়াছি। তিনি পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিয়াছেন, বলিয়াছেন তাহার বুঝিতে একটু দেরী হয়। উত্তর লিখিয়াও দিয়াছি, তথাপি তিনি বুঝেন নাই। সুতরাং এস্থলে একটু বিশদভাবে লিখিব।

যাজন, অধ্যাপনা ও প্রতিগ্রহ ব্রাহ্মণের এই তিনটী জীবিকা। কিন্তু তাই বলিয়া যে যাজন বিক্রয় করে সে যেমন 'যাজনজীবী', যে ধর্ম্মবুদ্ধিতে যাজন করে (বিক্রয় করে না) সেও তদ্রূপ 'যাজনজীবী' ইহা কেহই বলিবে না। ফলতঃ যাজনজীবী বলিলে যাজনবিক্রয়ীকেই বুঝাইবে। অধ্যাপনা ব্রাহ্মণমাত্রের জীবিকা, তাই বলিয়া ব্রাহ্মণমাত্রেই অধ্যাপনা-জীবী নহেন। যিনি অধ্যাপনাকে পণ্যরূপে বিক্রয় করেন, তিনিই অধ্যাপনাজীবী বা ভৃতকাধ্যাপক। চিকিৎসা পক্ষেও ঐরূপ। চিকিৎসা যে বিক্রয় করে সেই চিকিৎসাজীবী। যে তাহা করে না, তাহার জীবন-

ধারণ কিসে হয়, সত্যেন্দ্রবাবু কিছুতেই বুঝিতে পারেন না। আমরা বলি—

(১) উঞ্ছ-শিল বা ক্ষেত্রপতিত শস্যকণা ও মঞ্জরী আহরণ দ্বারা জীবিকা হয়, হউক।

(২) অমৃত বা অযাচিতদ্বারা হয়, হউক।

(৩) মৃত বা ভিক্ষা দ্বারা হয়, হউক।

(৪) প্রমৃত বা কৃষিদ্বারা হয়, হউক।

(৫৩৬) অনিষিদ্ধ দ্রব্যে বাণিজ্য ও কুসীদগ্রহণ দ্বারা হয়, হউক। তথাপি দাস্যবৃত্তি যেন না করিতে হয়। দাস্যবৃত্তি লোককে কুক্কুরবৎ পরপদলেহী করিয়া তুলে, তাহার মনুষ্যত্বই বিলুপ্ত হয়, ব্রাহ্মণত্বের কথা কি? অর্থক্রীত অধ্যাপক (ভৃতকাধ্যাপক) ভৃত্যস্বভাব হইয়া পড়ে, এজন্যও উহা নিন্দিত। ব্রাহ্মণগৃহীর জীবিকা সম্বন্ধে মনু বলিয়াছেন—

ঋতমুঞ্ছশিলং জ্ঞেয়ম্ অমৃতং স্যাৎ অযাচিতম্
মৃতং তু যাচিতং ভৈক্ষ্যং প্রমৃতং কর্ষণং স্মৃতম্॥
সত্যানৃতং তু বাণিজ্যং তেন চৈবাপি জীব্যতে।
সেবা শ্ববৃত্তি রাখ্যাতা তস্মাত্তাং পরিবর্জ্জয়েৎ॥

(মনু, ৪।৫-৬)

আর একটু পরিষ্কার করিয়া বলি। বৃত্তি শব্দের অর্থ স্বভাবজ কর্ম্ম। জীবনধারণ শব্দের অর্থই কর্ম্মপরম্পরা। কর্ম্ম ব্যতীত জীবনধারণ কল্পনাই হয় না। ব্রাহ্মণাদির যেগুলি স্বভাবজ কর্ম্ম, তন্মধ্যে অধ্যয়নাদি তিনটীর দ্বারা কুটুম্ব ভরণ হয় না। অধ্যাপনাদির দ্বারা সমাজের কল্যাণসাধন করিলে সমাজও তাঁহাকে উপবাসে মরিতে দেয় না, অযাচিতভাবে সাহায্য আসে। ভিক্ষা দ্বারাও দিনপাত হয়। লোকহিতৈষণার দ্বারা প্রবৃত্ত হইয়া শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণেরা জগতে জ্ঞান ও ধর্ম্মবৃদ্ধির জন্য সর্ব্বদাই আত্মাকে উৎসর্গ করিয়া রাখিয়াছেন। ব্রহ্মচারীরা

অধ্যয়ন করে, গুরুর জন্য ভিক্ষা করে। এই ভিক্ষার দ্বারা জীবিকার পথ সর্ব্বদাই উন্মুক্ত এবং ইহাতে কিছুমাত্র পাপ নাই। বৈদ্যেরও ঐরূপে দিন চলিয়া যাইত। সত্যেন্দ্রবাবু কেন ইহা বুঝেন না? বৈদ্যকে সকল বিষয়ে এবং অধিকন্তু আয়ুর্ব্বেদে অধ্যাপনা করিতে হইত, তাহার শিষ্যের অভাব ছিল না, সমাজও রোগভয়ে সতত তাহার শরণাপন্ন। সুতরাং তাঁহাকে ব্রহ্মচারীর দ্বারা ভিক্ষাও করাইতে হইত না। অযাচিত উপায়েই সমস্ত নির্ব্বাহ হইয়া যাইত।

অপিচ, ষট্‌কর্ম্মৈকো ভবত্যেষাং ত্রিভিরন্যঃ প্রবর্ত্ততে।
দ্বাভ্যামেক শ্চতুর্থস্তু ব্রহ্মসত্রেণ জীবতি॥ মনু, ৪ ৯

(১) গৃহস্থের বহু পোষ্য থাকিলে পূর্ব্বোক্ত ছয় উপায়েই কুটুম্বভরণ করিতে পারিবে। (২) তদপেক্ষা অল্পপোষ্য গৃহস্থ অধ্যাপনা, যাজন ও প্রতিগ্রহ দ্বারা। (৩) এই তিনের মধ্যে প্রতিগ্রহ নিকৃষ্ট, সুতরাং সম্ভব হইলে অপর দুইটীর দ্বারা—অথবা (৪) কেবলমাত্র অধ্যাপনা দ্বারাই জীবিকা করিবে। (সত্যেন্দ্রবাবু 'জীবিকা' শুনিয়া ভয় পাইবেন না)। এই চতুর্থ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ সর্ব্বজনপূজ্য।

মেধাতিথি (কুসীদের উল্লেখ না করিয়া) এবং উঞ্ছ ও শিলকে পৃথক্ পৃথক্ লইয়া) বলেন— (১) বহুপোষ্য গৃহস্থ উঞ্ছ, শিল, অযাচিত, যাচিত, কৃষি, বাণিজ্য—এই ছয় কর্ম্মে ষট্‌কর্ম্মা হইয়া কুটুম্বপোষণ করিবে। ইহা প্রথম শ্রেণী। ইহাদের মধ্যে কৃষি-বাণিজ্য ত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট ৪ টীর মধ্যে তিনটী দ্বারা জীবিকা করিলে তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া গণ্য হইবে। ইহা দ্বিতীয় শ্রেণী। উঞ্ছ, শিল, অযাচিত ও যাচিত—ইহাদের মধ্যে যাচিতটি ত্যাগ কয়িয়া তন্মধ্যে দুইটী দ্বারা কুটুম্ব পালন করিলে তৃতীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ হইবে। কিন্তু যাঁহারা অযাচিতকেও পরিত্যাগ করিয়া কেবল মাত্র উঞ্ছ বা শিল দ্বারা জীবিকা করেন, তাঁহারাই চতুর্থ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ইহারা

অগ্নিতুল্য পবিত্র এবং পংক্তিপাবন। (মেধাতিথি বলেন, অযাচিত = অধ্যাপনা, যাজন ও প্রতিগ্রহ)।

একটু নিরীক্ষণ করিলেই বুঝা যাইবে যে প্রথম শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণও জীবিকার জন্য কৃষি-বাণিজ্য করিতে বাধ্য হইতেন। কিন্তু এই কৃষি-বাণিজ্য নিজে করিতেন না, লোক দ্বারা করাইতেন। ক্ষেত্রের কর্ষণ, বীজ বপন ইত্যাদি এবং উদ্বৃত্ত শস্য-বিক্রয় লোকদ্বারা করাইলে ততদূর দোষের হইত না। ইহা সহজ অবস্থার কথা। আপৎকালে নিজেই বৈশ্য সাজিতে হইত। যাহা হউক, ইঁহারাও নিষিদ্ধ পণ্যে ব্যবসায় না করিলে পতিত বা অপাংক্তেয় বিবেচিত হইতেন না। অবশিষ্ট তিন শ্রেণীও ভাল ব্রাহ্মণ—উঁহাদের মধ্যে ক্রমিক উৎকর্ষ। যাহারা চাকরিজীবী অর্থাৎ অর্থক্রীত দাস—তাহাদের গণনাই করা হইল না!

অতএব প্রাচীন বৈদ্যগণ ভূতদয়ার্থ চিকিৎসা করিতেন বলিয়া তাঁহাদের যে না খাইয়া মরিতে হইত, ইহা যেন সত্যেন্দ্রবাবু বা কালীবাবু না ভাবেন। অবশ্য উঞ্ছ-শিল-ভিক্ষা এ সকল খুব প্রাচীন যুগের কথা। কালসহকারে উঞ্ছ, শিল বা ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা অসম্ভব হইলেও **অধ্যাপনা, যাজন ও প্রতিগ্রহের পথে অযাচিত অর্থাগমই** তাঁহাদের কুটুম্ব-ভরণের পক্ষে যথেষ্ট হইত। অযাচিত দানেই ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের স্বচ্ছন্দে চলিয়া যায়। মেধাতিথি স্পষ্টই বলিয়াছেন,এই তিন উপায়ে যে ধনাগম হয়, তাহা **অযাচিত** অর্থাৎ তাহা যাচ্ঞাই নহে, সুতরাং ইহা যে বিক্রয় নহে তাহা সুস্পষ্ট। অতএব অধ্যাপনা, যাজন ও প্রতিগ্রহ, এই তিন কর্মের উপর নির্ভর করিয়া যাহারা থাকে তাহাদিগকে যাজনবিক্রয়ী অর্থে যাজন-জীবী বলা যায় না, অধ্যাপনাবিক্রয়ী অর্থে অধ্যাপনাজীবী বলা চলে না।

বৈদ্যের চিকিৎসাপক্ষেও ঐরূপ বুঝিতে হইবে। অতএব চিকিৎসা-বৃত্তিক ব্রাহ্মণ বলিলেই চিকিৎসাবিক্রয়ীকে বুঝাইবে না। সুতরাং শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ও চিকিৎসাবৃত্তিক ব্রাহ্মণ পরস্পর বিরুদ্ধার্থক শব্দ নহে। 'চিকিৎসক ব্রাহ্মণ' বলিলেই পাতিত্য, অপাংক্তেয়ত্ব, হেয়তা ও নিন্দার চিত্র মনে উদিত হওয়া উচিত নহে।

মনু ও অন্যান্য স্মৃতিতে উক্ত অপাংক্তেয় ব্রাহ্মণদিগের তালিকা পরীক্ষা করিলেই বুঝা যাইবে যে, আকৃতিগত, প্রকৃতিগত ও নীতিগত দোষ দেখিয়াই মহর্ষিরা পাংক্তেয়ত্ব-অপাংক্তেয়ত্ব এবং দানের পাত্রত্ব-অপাত্রত্ব বিচার করিতেন। ত্যাগ ও সংযম যাঁহাদের আদর্শ, তাঁহারা সেই আদর্শ চ্যুত হইলে সমাজ তাহাদিগকে ক্ষমা করিত না। মনু বলিতেছেন—

' যে স্তেন-পতিত-ক্লীবা যে চ নাস্তিকবৃত্তয়ঃ।
তান্ হব্যকব্যয়ো র্বিপ্রান্ অনর্হান্ মনুরব্রবীৎ ॥
জটিলং চানধীয়ানং দুর্ব্বলং কিতবং তথা।
যাজয়ন্তি চ যে পূগান্ তান্‌চ শ্রাদ্ধে ন ভোজয়েৎ ॥
চিকিৎসকান্ দেবলকান্ মাংসবিক্রয়িণস্তথা।
বিপণেন চ জীবন্তো বর্জ্জ্যাঃ স্যুঃ হব্যকব্যয়োঃ ॥
*　　*　　*　　*　　*
ভৃতকাধ্যাপকো যশ্চ ভৃতকাধ্যাপিত স্তথা।
শূদ্রশিষ্যো গুরুশ্চৈব বাগ্‌দুষ্টঃ কুণ্ডগোলকৌ ॥
হস্তি-গোঽশ্বোষ্ট্রদমকো নক্ষত্রৈ র্যশ্চ জীবতি।
পক্ষিণাং পোষকো যশ্চ যুদ্ধাচার্য্য স্তথৈব চ ॥
কৃষিজীবী শ্লীপদী চ সদ্ভি র্নিন্দিত এব চ ॥
এতান্ **বিগর্হিতাচারান্** অপাংক্তেয়ান্ দ্বিজাধমান্।
দ্বিজাতিপ্রবরো বিদ্বান্ উভয়ত্র বিবর্জ্জয়েৎ ॥"

[অনেক শ্লোক বাদ দেওয়া গেল। তথাপি এই বাক্যগুলি হইতেই বুঝা যাইবে যে যাহারা স্বহস্তে ক্রয়-বিক্রয় আরম্ভ করিয়াছে, স্বহস্তে কৃষি করে, শূদ্রের যাজক, অর্থ লইয়া অধ্যাপনা করে, অর্থ লইয়া যাজন বা দেবসেবা করে, বহু ব্যক্তির যাজন করে, চিকিৎসা বিক্রয় করে ইত্যাদি তাহাদিগকে শ্রাদ্ধে ও দৈবকার্য্যে বর্জ্জন করিবে। যে শ্লোকে 'চিকিৎসকান্' শব্দ রহিয়াছে, সেই শ্লোকের অপর সকলেই দোকানদার বা ব্যবসাদার। অতএব 'চিকিৎসক' শব্দ বিশুদ্ধ চিকিৎসাপরকে বুঝাইতেছে, এরূপ মনে করা উচিত নহে। সত্যেন্দ্রবাবুও বলিয়াছেন, "**ব্রাহ্মণ লোকহিতার্থে** চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন ও **চিকিৎসাকর্ম্ম সম্পাদন করিতে পারেন, কিন্তু ঐ বৃত্তিজীবী হওয়া তাঁহার পক্ষে নিন্দিত।**" (পৃঃ ৭৮) আমরাও ত ঐ কথাই বলি। সুতরাং মনুর 'চিকিৎসকান্' বেশ বুঝা যাইতেছে। মহাত্মা রামানুজও প্রাচীন পণ্ডিতদের নিকটে যেমন শাস্ত্র-ব্যাখ্যা শুনিয়াছিলেন, তাহার অনুসরণ করিয়াই বলিয়াছেন, শাস্ত্রে মনুবাক্যের ন্যায় যে যে স্থানে চিকিৎসক নিন্দা আছে, তাহা শাস্ত্রানভিজ্ঞ ধনলোভী চিকিৎসককে লক্ষ্য করিয়া (যথা, মনু, ৯।২৮৪ 'মিথ্যাপ্রচরতাং চিকিৎসকানাম্'। মিথ্যা প্রচরতাং দুশ্চিকিৎসাং কুর্ব্বতাম্) অথবা চিকিৎসাবিক্রয়ীকে লক্ষ্য করিয়া (যথা. মনু, ৩।১৫২ এবং ৪।২১২, ৪।২২০ 'পূয়ং চিকিৎসকস্যান্নমি'ত্যাদি)। আয়ুর্ব্বেদের প্রামাণ্যেও তাহাই বুঝা যায়। সত্যেন্দ্রবাবুও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। ইহা বৈদ্য ব্রাহ্মণ-সমিতির 'নূতন' গবেষণা নহে।

অন্য দিক্ হইতে দেখিলে, যাজন অধ্যাপনা-প্রতিগ্রহ এই তিনটীই ব্রাহ্মণের অযাচিত জীবিকা। চিকিৎসা বৈদ্যব্রাহ্মণের ৭ম বৃত্তি। উহা যদি যাজনের মধ্যে ধরা যায়, তবেই উহা অযাচিত জীবিকারূপে গ্রাহ্য হইতে পারে, নচেৎ উহা অযাচিত জীবিকাও নহে—উহা বিশিষ্ট পরোপকার

সঙ্গত নহে। মধ্যবর্ত্তী যুগে দুই একটী বৈশ্যাচারের পূর্ব্বে সকল বৈদ্যেরই যে সর্ব্বদা ব্রাহ্মণাচার ছিল এবং সমস্ত বৈদ্যই যে ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রখ্যাত ছিলেন, তাহা তাঁহাদের কুলজী ও অন্যান্য গ্রন্থে তাম্রশাসনে এবং পূর্ব্বোক্ত রাজা গণেশের অনুজ্ঞালিপিতে স্পষ্টই লিখিত রহিয়াছে। সুতরাং **বিপ্রাচারই আমাদের যথার্থ কুলাচার।**

কুলাচার সম্বন্ধে প্রায়ই শুনা যায়—

"যেনাস্য পিতরো যাতাঃ যেন যাতাঃ পিতামহাঃ।
তেন যায়াৎ সতাং মার্গং তেন গচ্ছন্ ন রিষ্যতে॥"

মনু ৪।১৭৮

ইহার যথার্থ ব্যাখ্যা এই—"পিত', পিতামহ প্রভৃতি যে পথে গমন করিয়াছেন, **তাহা যদি সৎপথ হয়—তবে** সে পথে গমন করিলে কোন দোষ হয় না।" (প্রবোধনী) বৈদ্যের বৈশ্যাচার (শূদ্রাচারের মত) যখন কদাচার বলিয়াই প্রমাণিত হইতেছে, তখন পিতা পিতামহ তাহা পালন করিলেও তাহার পরিবর্ত্তনে কোন অনিষ্টের আশঙ্কা নাই।" (প্রবোধনী)

কালীবাবু বলিতেছেন, শাস্ত্রের বহুবিধ অর্থ সম্ভব হইলে, পিতৃ-পিতামহগণের অনুষ্ঠিত আচার অনুষ্ঠান করিবে। তাহা করিলে অধর্ম্ম করা হইবে না অর্থাৎ পাপভাগী হইতে হইবে না। ইহার মধ্যে কোন যদি নাই। **পিতা-পিতামহ যে পথে চলিয়াছেন তাহাই সৎপথ।**" (বৈদ্য, পৃঃ ১১৪)

কালীবাবু বলেন, শাস্ত্রের বহুবিধ অর্থ সম্ভব হইলে, বহুপ্রকারের আচারই যদি তুল্যভাবে শাস্ত্রীয় বলিয়া বিবেচিত হয়, তবে যেটী পিত্রাদির অনুসৃত সেইটীই অনুসরণীয়। ইহাতে আমাদের কো" মত-বিরোধ নাই। যথা—

চূড়াকরণ সম্বন্ধে মনু বলিয়াছেন—

চূড়াকর্ম্ম দ্বিজাতীনাং সর্ব্বেষামেব ধর্ম্মতঃ।
প্রথমেঽব্দে তৃতীয়ে বা কর্ত্তব্যং শ্রুতিচোদনাৎ॥

প্রথম বা তৃতীয় বৎসরে চূড়াকরণ হইবে। মনুরই দুইটী মত। বৃহস্পতি বলিয়াছেন—

তৃতীয়েঽব্দে শিশোর্গর্ভাজ্জন্মতো বা বিশেষতঃ।
পঞ্চমে সপ্তমে বাপি ক্রিয়াঃ পুংসোঽপি বা সমম্॥

এস্থানে তৃতীয়, পঞ্চম বা সপ্তম বৎসরের কথা রহিয়াছে।

নারদ বলিতেছেন—

জন্মতস্তু তৃতীয়েঽব্দে শ্রেষ্ঠমিচ্ছন্তি পণ্ডিতাঃ।
পঞ্চমে সপ্তমে বাঽপি জন্মতো মধ্যমং ভবেৎ॥
অধমঃ গর্ভতঃ স্যাত্তু নবমৈকাদশেঽপি বা॥

এখানে নবম ও একাদশ বর্ষ পাওয়া গেল।

প্রয়োগপারিজাতে আছে—

আদ্যেঽব্দে কুর্ব্বতে কেচিৎ পঞ্চমেঽব্দে দ্বিতীয়কে।
উপনীত্যা সহৈবেতি **বিকল্পা কুলধর্ম্মতঃ**॥

চূড়াকরণ উপনয়নের সঙ্গেও (কুলাচার অনুসারে) হয়।

এজন্য হরিহর-ভাষ্যে লিখিত হইয়াছে—

'যস্য কুলে সাংবৎসরিকস্য চূড়াকর্ম্ম ক্রিয়তে তস্য সাংবৎসরিকস্য, যস্য তৃতীয়েঽব্দে তস্য তদা ইতি ব্যবস্থা। যস্য কুলে নাস্তি নিয়মঃ তস্য যদৃচ্ছয়া বিকল্পঃ।'

শাস্ত্র বহু পথ নির্দ্দেশ করিলে পিত্রাদির অনুসৃত পথই শ্রেয়ঃ। কিন্তু শাস্ত্র যেখানে একটী পথ নির্দ্দেশ করে, সে স্থলে অন্য পথকে পাপের পথ বলিতেই হইবে। যথা উপনয়নের পূর্ব্বে চূড়াকরণ কর্ত্তব্য। উপনয়নের

পরে চূড়াকরণ অশাস্ত্রীয়। সেইরূপ বৈশ্যগণের ব্রাহ্মণাচারই একমাত্র অনুসরণীয় আচার। এপক্ষে বিকল্প সম্ভাবনাই নাই। অতএব কোন বংশে শূদ্রাচার বা বৈশ্যাচার দেখা গেলে তাহা তৎক্ষণাৎ সংশোধন করিয়া ফেলাই উচিত।

কালীবাবু মেধাতিথির টীকাটীই দেখুন না। মেধাতিথি লিখিতেছেন— "যদি পিতৃপিতামহাদিভিঃ কৈশ্চিৎ কথঞ্চিৎ অধর্ম্ম আচরিতপূর্ব্বঃ স ন আশ্রয়ণীয় ইতি সতাং মার্গমিত্যাহুঃ।" এখানে যে 'যদি' জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে! অর্থাৎ পিতৃপিতামহাদি পূর্ব্বপুরুষগণ কর্তৃক যদি কোন অধর্ম্ম অনুশীলিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে (পূর্ব্বপুরুষের আচার বলিয়াই) যে উহা আশ্রয় করিয়া চলিতে হইবে, শাস্ত্রবিধান এরূপ নহে। এই জন্যই শ্লোকমধ্যে মনু 'সতাং মার্গম্' এই স্পষ্ট উক্তি করিয়াছেন। যাঁহারা শাস্ত্র মানিয়া চলেন, তাঁহারাই সৎ। অতএব ঐ আচার যদি সজ্জনগণের অনুসৃত হয়, অর্থাৎ শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট মার্গ হয়, তবেই উহা তদ্বংশীয়গণের অনুসরণীয় হইতে পারে। আর একজন টীকাকার, তাঁহার নাম রাঘবানন্দ, তিনি বলিয়াছেন—"তেন পিত্রাদিকৃত-মদ্যপান মাতুলকন্যা-পরিণয়াদিষু ন অতিপ্রসঙ্গঃ" অর্থাৎ সতাং 'মার্গম্' বলায় পিতৃপিতামহাদি যদি মদ্যপান কি মাতুলকন্যা-বিবাহ, কি ঐরূপ অপর কোন অশাস্ত্রীয় কার্য্য চালাইয়া গিয়া থাকেন, তাহা হইলে পূর্ব্বপুরুষেরা করিতেন বলিয়াই মদ্যপানাদি অসৎ কার্য্যগুলি তদ্বংশীয়দিগের করা উচিত নয়।

এক্ষণে কালীবাবুকে পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করি, শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট বহু পথ সম্মুখে থাকিলে উহাদের মধ্যে যেটী বংশে চলিয়া আসিতেছে দেখা যাইবে, সেইটীরই অনুসরণ শ্রেয়ঃ; কিন্তু শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট একটী আচার সম্মুখে থাকিলে এবং বংশে সেটী চলিত না থাকিলে গৃহী কি করিবে? অথবা ঐ শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট আচারের পরিবর্ত্তে একটী

ভীষণ কদাচার তাহার স্থানে বর্তমান থাকিলে কি করা উচিত ?

অতএব বহু শাস্ত্রীয় পথ সম্মুখে থাকিলে, বা "শাস্ত্রের বহুবিধ অর্থ সম্ভব হইলে" ইত্যাদি বলিয়া ধোঁকা দিবার চেষ্টা করিয়া কালীবাবু ভাল কাজ করেন নাই।

কালীবাবুর গ্রন্থের সমালোচনা শেষ হইল। এক্ষনে আমি সমালোচনের দায়িত্বপূর্ণ আসন হইতে নামিয়া আসিতেছি। কালীবাবুর প্রতি ব্যক্তিগতভাবে আমার কোন দুষ্টবুদ্ধি নাই। তিনি বর্ষীয়ান, বিদ্বান্, যশস্বী। তাঁহার সহিত মৈত্রী শ্লাঘার বিষয়। যদি সৌভাগ্য হয় ভগবান্ অবশ্যই আমাদের মিলিত করিবেন। আর এত কথার পরও যদি আমাদের বিচ্ছেদ জাগিয়া থাকে, তবে আমার অপেক্ষা অধিক দুঃখ বোধ হয় কেহই পাইবেন না।

মোহবজ্র

বৈদ্যপ্রতিবোধনীর পরিচয়

'বৈদ্য-প্রতিবোধনী'কে 'বৈদ্য' পুস্তকের অভিনব সংস্করণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। উহাতে বৈদ্য-পুস্তকের প্রায় সকল কথাই সমর্থিত হইয়াছে। কালীবাবু যখন নিজের নির্ব্বুদ্ধিতার ফলে চারিদিক হইতে আক্রান্ত হইয়া বিপদ গণিতেছিলেন, তখন অকুতোভয় ('সত্যে নাস্তি ভয়ং ক্বচিৎ') সত্যেন্দ্রনাথ তাঁহার সাহায্যার্থ অগ্রসর হইয়াছিলেন। ইহাতে 'বৈদ্য-লেখক যে পরম সান্ত্বনা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা 'বৈদ্যপ্রতিবোধনী' এই নামেই অভিব্যক্ত হইয়াছে। বৈদ্যপুস্তকের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান পাইতে হইলেও এই পুস্তকখানি পাঠ করিতে হয়, এজন্যও ইহার নাম 'বৈদ্য-প্রতিবোধনী'।

বস্তু-সংক্ষেপ

সত্যেন্দ্রবাবুর পুস্তকের সার মর্ম্ম এই—

(১) অম্বষ্ঠজাতি শাস্ত্র অনুসারে বৈশ্যবর্ণ (পৃঃ ৪-৩৭)।

(২) বঙ্গীয় বৈদ্যসম্প্রদায় ও অম্বষ্ঠজাতি অভিন্ন (পৃঃ ৩৮-৪৯)।

সত্যেন্দ্রবাবুর লেখনীনিঃসৃত হইলেও এই দুইটী অভিমতের কোনটীই সত্য নহে। দুইটীই যে সম্পূর্ণ ভিত্তিশূন্য ও মিথ্যা তাহা মোহ-মুদ্গরের 'অম্বষ্ঠজননী ও অম্বষ্ঠের বর্ণ' ও 'বৈদ্য অম্বষ্ঠ নহে' এই দুইটী অধ্যায়ে সুপ্রকাশ হইয়াছে। স্বপ্ন-প্রাসাদের প্রত্যেক ইষ্টকখানিই যেমন স্বপ্নময় অবাস্তবের উপর স্থাপিত, বিরোধীদের মূল কথাটা মিথ্যা হওয়ায়, তৎসম্পর্কিত, সকল কথাই তদ্রূপ মিথ্যা হইতেছে। 'বৈদ্য ব্রাহ্মণ' এই অধ্যায়ে বঙ্গীয় বৈদ্যগণ যে মুখ্য ব্রাহ্মণ তাহা বিশদ-

ভাবে দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে। নিশীথ রাত্রিতে স্থানুকে ভূত মনে করিয়া লোকে যেমন মিথ্যা ভয়ে অভিভূত হয়, তদ্রূপ চিকিৎসাবৃত্তি আমরা (বৈশ্য অম্বষ্ঠগণ) 'ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিলে সমাজে হেয় হইয়া পড়িব, এই অমূলক ভয়ে গুরুশিষ্য উভয়েই একেবারে অভিভূত! এই মিথ্যা ভয় দূর করিবার জন্য আমরা বিস্তৃতভাবে এ বিষয়ের আলোচনা করিয়াছি।

পঞ্চম অধ্যায়ে উভয়ের খুঁটিনাটী সমস্ত আপত্তি ও সন্দেহের পুনশ্চ সুমীমাংসা করিয়াছি। এই অংশে যে সমস্ত বিষয়ের এখনও আলোচনা হয় নাই, সেইগুলিই আলোচিত হইবে।

সত্যেন্দ্রবাবুর ব্যবহার

সত্যেন্দ্র বাবুর সহিত আমার বিংশতি বৎসরের অধিক কালের পরিচয়। আমরা পরস্পরকে অনেক কথা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিয়া বলিতে পারি। কিন্তু সমস্ত বৈদ্যব্রাহ্মণগণকে লক্ষ্য করিয়া অভদ্র উক্তি করা কতদূর প্রশংসনীয়, তাহা তিনিই ভাবিয়া দেখিবেন। বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্ব সম্বন্ধে তিনি আমার সহিত বহুবার কথাবার্ত্তা কহিয়াছেন। মধ্যে মধ্যে পত্রদ্বারা উত্তর চাহিয়া পাঠাইতেন। আমিও সেই সেই বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইতাম। ঐ প্রবন্ধগুলি অনেক সময়ে ফেরৎ দিতে বলিলে বলিতেন, দিব, চিন্তা নাই, সযত্নে রাখিয়াছি। কিন্তু কিছু কাল পরে জানাইতেন, 'হারাইয়া গিয়াছে। যে সময়ে স্বজাতিকে বৈশ্য বানাইবার পুস্তক লিখিতেছেন, সেই সময়ে একদিন তাঁহার বাসা-বাটীতে গমন করি, কিছু কথাবার্ত্তাও হয়। তখন ভ্রমেও জানিতাম না যে আমার অজ্ঞাতসারে সেই কথাগুলি বিকৃত করিয়া ছাপাইয়া দেওয়া হইবে। ইহার পরে একখানি পত্র লিখিয়াছিলাম,' তাহাও আমার বিনা অনুমতিতে ছাপান হইয়াছে! পুস্তকের মুদ্রনকালের মধ্যে ৪।৫ সপ্তাহ অন্তর সত্যেন্দ্র

বাবুর সহিত দেখা হইত, জিজ্ঞাসা করিতাম বই বাহির হইবার কত দেরী, বলিতেন বেশী নয়। এইরূপে কয়েক মাস কাটিল, একদিনও বলেন নাই যে, আপনার পত্রখানি ছাপিব মনে করিতেছি বা ছাপাইয়া ফেলিয়াছি! ভূমিকায় আমি আছি, গ্রন্থশেষেও আমি পরিশিষ্টের মধ্যে আছি, বন্ধুবর আমাকে অনুক্ষণ মনে রাখিয়াছেন, বরাবর দেখাও হইয়াছে, কিন্তু কখনও ঘুণাক্ষরে একথা প্রকাশ করেন নাই! আমার সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা ঠিক হইল কিনা জানিবার জন্য একবার শুনাইয়া লওয়াও কি উচিত ছিল না? এই লুকোচুরি বন্ধুত্বের উপযুক্ত হয় নাই। বন্ধুবর আমাকে বৈদ্যব্রাহ্মণ সমিতির 'প্রধান 'নিয়ামক' বলিয়া লিখিয়াছেন, ইহাতেও সাধারণকে প্রবঞ্চিত করা হইয়াছে, কারণ 'প্রধান নিয়ামক' বলিতে লোকে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গণনাথ অথবা বৈদ্যরত্ন শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথকেই বুঝিবে।

"ঘটং ভিত্বা পটং ছিত্বা কৃত্বা রাসভ-রোহণম্। যেন কোন প্রকারেণ প্রসিদ্ধঃ পুরুষো ভবেৎ॥"—বন্ধুবর সমগ্র বৈদ্য সমাজে সুপ্রসিদ্ধ হইবার যে সহজ উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা কালীবাবুর অনুরূপ। বৈদ্যব্রাহ্মণ-সমিতির সভ্য হইলে কয় জন তাঁহাকে চিনিবে, কিন্তু বিরোধিতা করিলে একেবারে অমরত্ব, কারণ 'কীর্ত্তি র্যস্য স জীবতি'! সুতরাং এই সহজ পন্থাই তাঁহার আদরণীয় হইয়াছে।

সত্যেন্দ্র বাবুর উপজীব্য কুল্লূক। কুল্লূক ব্যতীত অন্য টীকা তাঁহার মনঃপূত হয় না। সমধর্ম্মা লোকদের এমনই একটা পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ দেখা যায়! তিনি আচার্য্য গঙ্গাধরকে তুচ্ছ করিয়াছেন, বিদ্বদ্বরেণ্য পিতৃব্য মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ দ্বারকানাথের অভিমত মানিতে প্রস্তুত নহেন, তাঁহাদের নামের 'দোহাই' পর্য্যন্ত অকিঞ্চিৎকর। 'ঐ সকল দোহাইএর কোন মূল্য নাই', ইহা তাঁহার নিজের কথা। বিদ্যাসাগর মহাশয় বর্ণপরিচয় দ্বিতীয় ভাগে 'মৃণ্ময়' লিখিয়া-

ছিলেন, তাহা 'মৃন্ময়' হইবে, একথা অনেকেই বাল্যকাল হইতে অবগত আছেন, এখনকার দ্বিতীয় ভাগে উহা নাইও, কিন্তু প্রবোধনীর সমালোচনা করিতে গিয়া বৃদ্ধ বিদ্যাসাগরকেও তিনি 'কাইৎ' করিয়াছেন! জিগীষা এমনই বস্তু, জগৎ জানুক যে সত্যেন্দ্র বাবুই ঐ ভুলটীর প্রথম আবিষ্কর্ত্তা!! এই ব্যর্থ আত্মম্ভরিতা কি প্রশংসনীয়?

পিতৃব্য মহামহোপাধ্যায় দ্বারকানাথ ও পিতৃব্য-পুত্র বৈদ্যরত্ন শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথের প্রতি সত্যেন্দ্র বাবুর কেমন একটা সহজ শত্রুতা বুদ্ধি তাঁহার পুস্তকের প্রতি ছত্রে প্রকাশ পাইয়াছে। নিতান্ত সাবধানতা অবলম্বন করিলেও তিনি তাহা গোপন করিতে পারেন নাই। পিতৃব্য-পুত্র বৈদ্যব্রাহ্মণ-সমিতির সভাপতি হইলেন, এ যে নিতান্তই অসহ্য! বৈদ্যরত্ন মহাশয় কুল্লুকের অভদ্রোচিত কথার প্রতিবাদে বলিয়াছিলেন, 'এরূপ বেয়াদবি অমার্জ্জনীয়', কুল্লূকভক্ত সত্যেন্দ্রনাথের তাহা সহ্য হয় নাই, তিনি লিখিলেন, 'বৈদ্যরত্ন মহাশয়ের ঐ মন্তব্য সুরুচির ও পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক হয় নাই'। যে কুল্লূক মূর্দ্ধাভিষিক্তকে বাদ দিয়া অম্বষ্ঠকে লক্ষ্য করিয়া সচ্ছন্দে বলিতে পারে "অনুলোম-প্রতিলোম-জাতীনাম্ অম্বষ্ঠ-করণ-ক্ষত্তৃ-প্রভৃতীনাম্। তেষাং বিজাতীয়মৈথুন-সম্ভববত্ত্বেন খরতুরগীয়সম্পর্কাৎ জাতাশ্বতরবৎ জাত্যন্তরত্বাৎ বর্ণশব্দেন অগ্রহণাৎ পৃথক্ প্রশ্নঃ"—তাহাকে 'বে-আদব' বা অভদ্র মাত্র বলিলে তাহার 'শ্লীলতাবর্জ্জিত নীচ ব্যবহারের সাধুবাদ করা হয়! যে কুল্লূক অম্বষ্ঠজননীকে কামপত্নী ও অম্বষ্ঠকে বর্ণসঙ্কর ও বর্ণহীন বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই, তাঁহাকে কোন ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিই ক্ষমা করিতে পারেন না; কিন্তু সত্যেন্দ্র বাবুর উহা গায়ে লাগিয়াছে তিনি কুল্লূককে সমর্থন করিয়া বলিতেছেন, "বৈদ্যরত্ন মহাশয়ের ঐ মন্তব্য সুরুচির ও পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক হয় নাই।" (পৃঃ ৭)। হয়ত কোন নিগূঢ় কারণে

কুল্লুকের গালিবাক্যে সত্যেন্দ্র বাবুর অচলা রুচি থাকিতে পারে; কিন্তু "এই পুস্তক প্রকাশ সম্বন্ধে তিনি (বৈদ্যরত্ন) আমাকে **একাধিকবার** নিষেধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে উপস্থাপিত প্রমাণ প্রয়োগাদির কোনরূপ খণ্ডন করিতে পারেন নাই। বলা বাহুল্য পুস্তক প্রকাশের বিরুদ্ধে তিনি যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, তাহা আমার নিকট **গ্রাহ্য** করিয়া বিবেচিত হয় নাই।" (বৈদ্য-প্রতি, পৃঃ ।৵০) জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি এই কথাগুলি কি হৃদয়গ্রাহী!

বৈদ্য ও বৈদ্যপ্রতিবোধনী

সত্যেন্দ্রবাবুর বৈদ্যপ্রতিবোধনী সাধ্বী রমণীর ন্যায় কালীবাবুর বৈদ্যের পদাঙ্কানুসারিণী—

(১) তিনি কালীবাবুর কোন কথায় প্রতিবাদ করেন নাই।

(২) যাহা কিছু বলিয়াছেন, তাহা কালীবাবুকে সমর্থন করিবার উদ্দেশ্যেই।

৩) কালীবাবুর যে যে রন্ধ্র অরক্ষিত, সত্যেন্দ্রবাবু অসত্যের আশ্রয়ে তাহা সুরক্ষিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ফলে রন্ধ্রগুলি আরও বিস্ফারিত হইয়া পড়িয়াছে! কয়েকটী দেখাই—

(১) অম্বষ্ঠ অংশতঃ ব্রাহ্মণ অংশতঃ বৈশ্য!

সত্যেন্দ্রবাবু বলিতেছেন—"মনু উগ্রকে ক্ষতশূদ্রবপুঃ বলিলেন—অর্থ তাহার শরীর অংশতঃ ক্ষত্রিয় ও অংশত শূদ্র। তুল্য ন্যায়ে অম্বষ্ঠের শরীরও অংশতঃ ব্রাহ্মণ এবং অংশতঃ বৈশ্য।" (বৈদ্য-প্রতি, পৃষ্ঠা ১১) অর্থাৎ যেন আধখানা মানুষ আর অন্য আধখানা মাছ! অর্থাৎ কুল্লুক যাহা বলিয়াছেন, তাহাই ঠিক। এই মতে অম্বষ্ঠ কোন বর্ণমধ্যে পড়ে না, না অশ্ব, না গর্দ্দভ—অশ্বতরবৎ! ব্রাহ্মণ ও বৈশ্য যে এক আর্য্য জাতির দুইটী শ্রেণী মাত্র, তাহা বুঝিবার ক্ষমতাও বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের

নাই। মনু বলিতেছেন, উগ্র 'ক্ষত্রিয়+শূদ্র' হইতে উদ্ভূত (ক্ষত্রশূদ্রাভ্যাম্ বপুঃ শরীরম্ যস্য=ক্ষত্রশূদ্রবপুঃ)। সত্যেন্দ্রবাবু বলিতেছেন, উগ্র অংশতঃ ক্ষত্রিয় ও অংশতঃ শূদ্র!

(২) কৌটিল্যের রায়

"কৌটিল্য (চাণক্য) মৌর্য্যবংশীয় মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার অর্থশাস্ত্র ধর্ম্মশাস্ত্র নহে, ব্যবহারশাস্ত্র। উভয় শাস্ত্রেই চাণক্যের অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল; তাহা সর্ব্ববাদী সম্মত! তিনি ধর্ম্মশাস্ত্র ও ব্যবহারশাস্ত্র এই দুইএর একযোগে পূর্ব্বোক্ত 'রায়' দিয়াছেন। শাস্ত্রার্থ আর কত পরিষ্কার হইতে পারে?" (বৈশ্যপ্রতি—পৃঃ ১৫)

এই কৌটিল্য ব্যবহার-শাস্ত্রে অনন্তর পুত্র সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, সত্যেন্দ্রবাবু তাহা তুলিয়া দিয়াছেন—

"ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বিশাম্ অনন্তরাঃ পুত্রাঃ **সবর্ণাঃ**" (পৃঃ ১৪) সত্যেন্দ্র বাবুই বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন, "ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের 'অনন্তর' পুত্রগণ **নিশ্চয় সবর্ণ**। সত্যেন্দ্রবাবু যাহা লিখিয়াছেন, তাহা অবিকল উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। এতদ্বারা পাঠক স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছেন যে, কৌটিল্যের মতে 'মূর্দ্ধাভিষিক্ত **ব্রাহ্মণ**, 'মাহিষ্য' **ক্ষত্রিয়** এবং শূদ্রাপুত্র'করণ' **বৈশ্য**। তবে কেন সত্যেন্দ্রবাবু ঐ ১৪শ পৃষ্ঠাতেই বলিতেছেন?—

"মূর্দ্ধাভিষিক্তের ব্রাহ্মণত্ব খ্যাপন তাহার **প্রশংসামাত্র**। অর্থাৎ তিনি ব্রাহ্মণের অতি **নিকটবর্ত্তী—প্রায় ব্রাহ্মণ**। কিন্তু তাঁহার সংস্কার মনুবচনানুসারে (১০।১৪) ক্ষত্রিয়ের ন্যায় হইবে। ইহাই হইল সামঞ্জস্য।"

সত্যেন্দ্রবাবুর সামঞ্জস্য করিবার ক্ষমতা অতুলনীয়, অত্যাশ্চর্য্য 'ভৌতিকের অতি নিকটবর্ত্তী'—প্রায় ভৌতিক। কিন্তু লোকে এইরূপ

সামঞ্জস্য শুনিলে আতঙ্কে অস্থির হয় এবং পলাইয়া প্রাণরক্ষা করিবার চেষ্টা করে! পাঠক ব্যাপারটী বুঝিয়া দেখুন—

মূর্দ্ধাভিষিক্ত 'পিতার সবর্ণ' = ব্রাহ্মণ = ব্রাহ্মণের নিকটবর্ত্তী = অব্রাহ্মণ = ক্ষত্রিয় = অসবর্ণ (অর্থাৎ **সবর্ণ = অসবর্ণ**) !

অম্বষ্ঠসম্বন্ধে কৌটিল্য কি বলিয়াছেন ?

'একান্তরাঃ অসবর্ণাঃ'—'একান্তর পুত্রগণ (ও দ্ব্যন্তর পুত্রগণ) পিতার সবর্ণ নহে।' (বৈশ্যপ্রতি, পৃষ্ঠা ১৪ ও ১৫)

সত্যেন্দ্রবাবুর ন্যায় অনুসারে ইহার অর্থ এইরূপ হইতেছে—

অম্বষ্ঠ পিতার অসবর্ণ = ন (সবর্ণ) = ন (অসবর্ণ) = **সবর্ণ**!

পুনশ্চ বলিতেছেন—

"আমি অম্বষ্ঠকে বৈশ্য বলিতেছি—কেবল কৌটিল্যের মতানুসারে নহে, সর্ব্বশাস্ত্রের মতানুসারে" (পৃঃ ৯১)। সর্ব্বশাস্ত্রের মতানুসারে কেমন তাহা পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে। কৌটিল্যের মতানুসারে (অম্বষ্ঠ পক্ষে) 'অসবর্ণ' শব্দের অর্থ অসবর্ণ, কিন্তু (মূর্দ্ধাভিষিক্ত পক্ষে) সবর্ণ শব্দের অর্থও 'অসবর্ণ' !! ইহাও একরূপ ভোজ বা ভৌতিক ব্যাপার! কিন্তু সবর্ণার সন্তান 'সবর্ণ' না 'অসবর্ণ' ? এবং কি অর্থে ?

(৩) বিবাহ-ব্যাপারেরই উচ্ছেদ হয় !

কালীবাবু ঋষিদের 'সত্যসংকল্প ও তপঃপ্রভাবের' অবতারণা করিয়া শাস্ত্রীয় বিধি-ব্যবস্থার মূলোচ্ছেদ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সত্যেন্দ্রবাবুও তাঁহার অনুকরণে বলিতেছেন—

"অনন্তরসন্তানের ভাগ্যের হ্রাস-বৃদ্ধির সহিত একান্তরগণের বিশেষ কোনও সম্বন্ধ নাই। অতএব ঐরূপ দৃষ্টান্ত দ্বারা একান্তরজগণের বিচলিত হওয়া উচিত নহে। বিশেষতঃ মুনি-ঋষিগণের কথায় সবই হইতে পারে।" (পৃঃ ৩১) "অতএব তাঁহারা যে আইন বিধিবদ্ধ

করিয়া গিয়াছেন, তাহাই আমাদের পক্ষে শাস্ত্র। কোথায় তাঁহারা কে কি ব্যভিচার করিয়াছেন তাহা আমাদের দ্রষ্টব্য নহে।" (পৃঃ ৩১) অর্থাৎ ব্রাহ্মণ কর্তৃক ক্ষত্রিয়কন্যা বা বৈশ্যকন্যা বিবাহের কোন আইন নাই, সেরূপ বিবাহ ব্যভিচার, সেগুলি শাস্ত্রোক্ত বিধিসিদ্ধ ব্যাপার নহে! ঐ সঙ্গে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণকন্যা বিবাহের বিধানও ব্যভিচার এবং ব্রাহ্মণ কন্যার গর্ভে ব্রাহ্মণ পুত্রের জন্মও ব্যভিচারের ফল মাত্র!! পুনশ্চ বলিতেছেন—"শিক্ষক মহাশয়গণও বলিয়া থাকেন—'Do what I say, don't do what I do'—আমি যাহা বলি তাহাই কর, আমি যাহা করি (কখনও কখনও) তাহা করিও না"—কি উপদেশ!! তবে কি মুনি-ঋষিরা অসবর্ণ বিবাহের বিধান দেন নাই? যদি না দিয়া থাকেন, তবে সবর্ণ বিবাহের উপদেশও দেন নাই!! আর মুনিঋষিরা যখন বিবাহের বিধান না দিয়াও সবর্ণাকে ও অসবর্ণাকে সমান ভাবেই বিবাহ করিতেন. তখন তাহার কোনটাই না করিয়া 'আইবুড়ো' জীবন যাপন করাই সাধু ব্যবহার! তবে বিবাহ প্রথা উচ্ছেদেরই বা ভয় কেন? বন্ধুবর কেন বলিতেছেন, 'মুনিগণের আচরণই একান্ততঃ আমাদের গ্রাহ্য হইলে বিবাহ ব্যাপারেরই উচ্ছেদ করিতে হয়—সবর্ণা অসবর্ণা ত দূরাপাস্ত। কারণ অতি প্রথমে ত বিবাহ বন্ধন ছিল না।" (পৃঃ ৩১)

মুনিগণ স্মৃতিশাস্ত্রে যে বিধিব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহার বিরোধী আচারণই ব্যভিচার, অনুযায়ী আচরণ ব্যভিচার নহে। মুনিগণ অসবর্ণ বিবাহের বিধান দিয়াছেন, অসবর্ণ বিবাহ নিজেরাও করিয়াছেন—তবে এ বক্তৃতার উদ্দেশ্য কি? অতি প্রাচীনকালে বিবাহ-বিধি ছিল না সত্য, তখন মুনিগণ ও অমুনিগণ সকলেই স্বেচ্ছায় যে কোন রমণীতে সঙ্গত হইত, কিন্তু শাস্ত্র কি তাহার অনুসরণ করিতে শিক্ষা দেয়? সুপ্রাচীন যুগে বিবাহ প্রথা না থাকিলে কি হইল,

পরবর্ত্তী বৈদিক যুগে যে সভ্যতার সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাতে দেখা যায় ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের পরেই গার্হস্থ্যাশ্রম। স্নাতক পত্নী গ্রহণ করিয়া গৃহী হইতেন। কিরূপ বিবাহ প্রশস্ত, কিরূপ বিবাহ অপ্রশস্ত, তখনকার শাস্ত্রে তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। বিবাহ বৈদিক সংস্কার, তাহার মন্ত্রগুলি বৈদিক মন্ত্র, তবে বেদ যাহা বলিতেছে, বেদানুবাদিনী স্মৃতি যাহার ব্যবস্থা দিতেছে, যে সংস্কার ঋষিগণের দ্বারাই সমাজের কল্যাণের জন্য প্রবর্ত্তিত, ও স্বীকৃত তাহার মূলোচ্ছেদ কিরূপে হয়, এবং কাহাদের আদর্শে হয়? এই সকল সমালোচনা পাঠ করিয়া মনে হয়, 'অব্যাপারেষু ব্যাপারম্' ইত্যাদি।

(৫) ক্ষাত্রির কথা

সত্যেন্দ্রবাবু বলিয়াছেন পাণিনির 'ক্ষত্রাৎ ঘঃ' সূত্র হইতে জানা যায় যে ক্ষত্রিয়ার গর্ভজাত পুত্রই 'ক্ষত্রিয়', কিন্তু শূদ্র বা বৈশ্য ভার্য্যার গর্ভজাত পুত্রকে ক্ষত্রিয় বলা যায় না, ক্ষাত্রি বলা যায়। ইহা টীকাকারেরা বলিয়াছেন। "এতদ্বারা ইঙ্গিত পাওয়া গেল যে, ঐ ঐ সন্তান ক্ষত্রিয়বর্ণ নহে।" (পৃঃ ১৫)

'ক্ষাত্রি' শব্দ সবর্ণা-গর্ভজাত ক্ষত্রিয় জাতিকে না বুঝাইতে পারে, কিন্তু ইহা দ্বারা ক্ষত্রিয়ের অনন্তরপুত্র ক্ষত্রিয়বর্ণ নহে, ইহা কিরূপে বুঝাইল? পাণিনি বলিয়াছেন, ক্ষত্রিয়ের সবর্ণা স্ত্রীর গর্ভে যাহারা জন্মে তাহাদিগকেই 'ক্ষত্রিয়' বলা হয়, অসবর্ণা স্ত্রীর গর্ভজাত মাহিষ্য ও উগ্রকে এক কথায় 'ক্ষাত্রি' বলে। 'ক্ষাত্রি' কি একটা বর্ণের নাম? দ্বিজা গর্ভজাত মাহিষ্যও 'ক্ষাত্রি' শূদ্রাগর্ভজাত উগ্রও 'ক্ষাত্রি'। ইহার দ্বারা সপ্রমাণ হইল যে, বর্ণে সাম্য নাই, এমন দুইটী জাতিকে ঐ শব্দ দ্বারা বুঝান হইতেছে, অর্থাৎ ক্ষাত্রি শব্দের বর্ণ-বাচকত্ব একেবারেই নাই। যে মাহিষ্যকে 'ক্ষাত্রি' বলিতেছ, তাহাকে যদি 'ক্ষত্রিয়বর্ণ' বলিতে বাধা

থাকে, তবে ঠিক সেই কারণে তাহাকে 'বৈশ্যবর্ণ'ও বলিতে পার না !! ক্ষত্রিয় যদি পৃথক্ বস্তু হয়, বৈশ্যও তবে পৃথক্ বস্তু—তাহা হইলে ক্ষাত্রির গতি কি হয় ? সে কোন্ বর্ণের মধ্যে গিয়া আশ্রয় লয় বল ত ? বস্তুতঃ হিন্দু সমাজের অসংখ্য জাতিনাম থাকা সত্ত্বেও যেমন তাহারা একটী না একটী বর্ণের মধ্যে পড়ে, তদ্রূপ মাহিষ্য ও উগ্রের এই একটী joint নাম থাকায় মাহিষ্য ক্ষত্রিয়বর্ণ নহে, ইহা সপ্রমাণ করিবার পক্ষে কিছুই সুবিধা হইল না। মূর্দ্ধাভিষিক্ত নাম সত্ত্বেও তাহার বর্ণ নাম আটকাইতেছে কি ? তবে মাহিষ্য নাম থাকিলেও আটকাইবে না, 'ক্ষাত্রি' থাকিলেও আটকাইবে না। 'ক্ষাত্রি' নামে তুইটী ও 'ক্ষত্রিয়' একটী, এই তিনটী পৃথক্ জাতি, তন্মধ্যে একটী (উগ্র) শূদ্রবর্ণ, এবং অপর তুইটা (ক্ষত্রিয় ও মাহিষ্য) ক্ষত্রিয়বর্ণ।

(৩) নাটকের কথা

অভিজ্ঞানশকুন্তলে তুষ্মন্ত শকুন্তলাকে দেখিয়া মনে মনে চিন্তা করিয়াছিলেন, 'কিমিয়ং কথস্য অসবর্ণাক্ষত্রসম্ভবা স্যাৎ' ? এইটী লক্ষ্য করিয়া সত্যেন্দ্রবাবু লিখিতেছেন—"অসবর্ণা (ক্ষত্রিয়াদি) স্ত্রীর গর্ভজাত হইলে সে সন্তান মাতার সবর্ণ (অর্থাৎ ক্ষত্রিয়াদি) হইবে, তাহা হইলেই ত তুষ্মন্তের বিবাহ্যা হইতে পারে, এই অভিপ্রায়।" (বৈশ্য প্রতি—পৃং ১৬) এস্থলে সত্যেন্দ্রবাবু নিজের অভিপ্রায়কেই কবির বা তুষ্মন্তের অভিপ্রায় বলিয়া চালাইয়াছেন !

আমরা বিষ্ণুপুরাণে তুই জন মহর্ষি কণ্ব পাই। উভয়েই চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়, উভয়েই কাণ্বায়ন ব্রাহ্মণদিগের ধারাপ্রবর্ত্তক। "যতঃ কাণ্বায়নাঃ দ্বিজাঃ বভূবুঃ" বিষ্ণুপুরাণে এই উভয় কণ্বেরই মেধাতিথি নামে পুত্র উল্লিখিত হইয়াছে। কেহ কেহ শকুন্তলার পালক পিতা কণ্বকে ইহাদের অন্যতম বলিয়া মনে করেন, কারণ বংশতালিকা অনুসারে একজন 'চক্রবর্ত্তী

'ভরতের' পিতা দুষ্মন্তের সমকালীন ও পিতৃব্যস্থানীয়। কিন্তু এরূপ অনুমানে বিঘ্ন আছে—

১। রাজা জানিতেন, মহর্ষি কণ্ব নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, শাশ্বত ব্রহ্মচর্য্যে অবস্থিত, তাঁহার পুত্রাদি থাকা অসম্ভব। ইহা অভিজ্ঞান-শকুন্তল ও মহাভারত উভয়ত্রই বলা হইয়াছে। কিন্তু ব্রাহ্মণত্বপ্রাপ্ত ক্ষত্রিয় কণ্বের মেধাতিথি নামে পুত্র ছিল।

২। পিতৃব্যের কন্যার আতিথ্য স্বীকার করিতে গিয়া তাহার সহিত প্রেম করা অস্বাভাবিক।

৩। নাটকোক্ত কণ্বের পরিচয়ে 'তত্রভবান্ কাশ্যপঃ', এইরূপ দেখিতে পাই। ইনি কাশ্যপগোত্রীয়।

সুতরাং এই কণ্ব যে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত (চন্দ্রবংশীয়) ক্ষত্রিয় কণ্ব নহেন, তাহা বুঝা গেল। ইনি অপর কোন ব্যক্তি, এবং ইহার কোন **ক্ষত্রিয় দায়াদ** নাই।

শকুন্তলার মহর্ষি কণ্ব কাশ্যপগোত্রীয় ব্রাহ্মণ, এবং অকৃতদার, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী। আশ্রম প্রবেশ কালে রাজার ইহা জানা ছিল। "ভগবান্ কাশ্যপঃ শাশ্বতে ব্রহ্মণি স্থিতঃ ইতি প্রকাশঃ। ইয়ং চ সখী তদাত্মজা ইতি কথমেতৎ"—রাজা আপনা হইতেই সখীদিগকে শকুন্তলার সম্বন্ধে এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন।

অতএব যখন কণ্ব আশ্রমে নাই জানিয়া দুষ্মন্ত তদীয় কন্যার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অগ্রসর হইলেন, তখনই তাঁহার মনে হইয়াছিল, এটী মহর্ষির কেমন কন্যা? পালিতা না ব্রতভঙ্গে উৎপাদিতা? **অকৃতদার কণ্বের বিবাহ-কল্পনা একান্ত অস্বাভাবিক,** সুতরাং ব্রতভঙ্গে তাঁহার দ্বারাই দাসী প্রভৃতি কোন অসবর্ণ ক্ষেত্রে অবৈধভাবে উৎপাদিত, অথবা অন্যবর্ণের কন্যা কিন্তু তাঁহার দ্বারা পালিতা ইহা ভিন্ন অন্যরূপ অনুমান করিবার কোন উপায়

ছিল না। এই দুই উপায়ে উৎপাদিত শকুন্তলা জন্মতঃ ব্রাহ্মণবর্ণা না হওয়ায় দুষ্মন্তের গ্রহণযোগ্যা হইতে পারে। [রাজার এই দুই অনুমানই বহুলাংশে সত্য হইয়াছিল, কারণ সে এক ঋষি কর্তৃক অবৈধ ভাবেই উৎপাদিত এবং কণ্বের দ্বারা পালিত!] অতএব সত্যেন্দ্রবাবু যে লিখিয়াছেন, 'কিমিয়ং কণ্বস্য অসবর্ণক্ষেত্র-সম্ভবা স্যাৎ' অর্থাৎ (কণ্বের) অসবর্ণা (ক্ষত্রিয়াদি) স্ত্রীর গর্ভজাত হইলে, সে সন্তান মাতার সবর্ণ (অর্থাৎ ক্ষত্রিয়াদি) হইবে, তাহা হইলেই দুষ্মন্তের বিবাহ্যা হইতে পারে"—এ কথা নিতান্তই অসম্ভব। চির-ব্রহ্মচারী মহর্ষির দার-পরিগ্রহ হয় নাই, ইহা রাজার বিলক্ষণ জানা ছিল। রাজধানীর নিকটে অত বড় মহর্ষি ব্রহ্মচর্য্য ভাঙ্গিয়া গৃহস্থ হইলে তাহা নিশ্চয় রাজার কাণে যাইত। চুপে চুপে ব্রাহ্মণ-কন্যা বিবাহ করিলেও তাহা রাজার অজ্ঞাত থাকিত না, তা ক্ষত্রিয়কন্যার কথা কি? কোন রাজকন্যাকে বিবাহ করিলে সেই বিবাহে দুষ্মন্ত নিমন্ত্রণ খাইয়া আসিতেন নিশ্চয়, এবং হয়ত শ্বশুর-জামাই এর মত একটা সম্পর্কও জন্মিত, সুতরাং ঐ সন্দেহের অবকাশই থাকিত না!! পাণ্ডিত্য প্রশংসনীয়, কিন্তু পাণ্ডিত্য ফলান প্রশংসনীয় নহে। আর বিনা কারণে পরের কথার অন্যায়রূপ প্রতিবাদ সর্ব্বথা নিন্দার্হ।

(৬) অম্বষ্ঠের ব্যুৎপত্তি

অম্বষ্ঠ সম্বন্ধে সত্যেন্দ্রবাবু বলিয়াছেন—"ঐ (শব্দের) ব্যুৎপত্তি অম্ব শব্দ হইতে নিষ্পন্ন হইতে পারে, অম্বা শব্দ হইতেও নিষ্পন্ন হইতে পারে।" (পৃঃ ৬৯) অম্বা শব্দ হইতে নিষ্পন্ন হইতে পারিলেও তাহা সমীচীন কিরূপে? ভানুজি দীক্ষিত যূথিকা অর্থে 'অম্বষ্ঠা' শব্দ 'অম্বা' হইতে নিষ্পন্ন করিয়াছেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ-বৈশ্যাপ্রভব সন্তান অর্থে অম্বষ্ঠ শব্দ 'অম্বা' হইতে নিষ্পন্ন করিলেন না কেন? অম্বষ্ঠ বৈশ্যবর্ণ হইলে,

এ পক্ষে 'অম্বা ইব তিষ্ঠতি' আরও অক্লেশে বলিতে পারিতেন, এবং তাহাই তাঁহার বলা উচিত হইত। প্রাচীনতম টীকাকার ক্ষীরস্বামী যূথিকা বা অম্বষ্ঠাকে লক্ষ্য করিয়া 'অম্বে তিষ্ঠতি' বলিয়াছেন, উহার কোন সদর্থ হয় না বলিয়াই ভানুজি উহা গ্রহণ না করিয়া 'অম্বা ইব তিষ্ঠতি' বলিয়াছেন। এই ভানুজি অম্বষ্ঠের বেলা অম্বার কথা না তুলিয়া 'অম্বে তিষ্ঠতি' বলায় এস্থলে অম্বা শব্দের ব্যবহার অনুচিত মনে করিয়াছিলেন নিশ্চয়। এই জন্য প্রবোধনী বলিয়াছে—"বৈয়াকরণ-কেশরী ভানুদীক্ষিত অম্বশব্দের অর্থ পিতা ও বেদ এইরূপ বলিয়াই অম্বষ্ঠ পদের ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন।"

সত্যেন্দ্রবাবু বলিতেছেন—"ভানুজি পিতা ও বেদ এইরূপ কোনও অর্থের উল্লেখ করেন নাই। কেবল বলিয়াছেন—"অম্বে তিষ্ঠতি ইতি। অম্ব শব্দ কোন্ অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন তাহা বলেন নাই।"

আমরা ভানুজির সমস্ত বাক্যটী উদ্ধার করিতেছি, পাঠক বিচার করিবেন—

"**অম্বষ্ঠা**—"অম্বেব মাতেব তিষ্ঠতি। সুপিস্থঃ ইতিকঃ। অম্বাম্ব—ইতি ষত্বম্। ঙ্যাপোঃ ইতি হ্রস্বঃ। অম্বে তিষ্ঠতি—ইতি স্বামী। অম্বষ্ঠো দেশভেদেঽপি বিপ্রাদ্বৈশ্যাসুতেঽপি চ। অম্বষ্ঠাপাম্ললোণ্যাং স্যাৎ পাঠাযূথিকয়োরপি ইতি বিশ্বমেদিন্যৌ।

অম্বষ্ঠ—"অম্বে তিষ্ঠতি। সুপিস্থঃ ইতিকঃ। অম্বাম্ব—ইতি ষত্বম্। অম্বষ্ঠো দেশভেদেঽপি বিপ্রাদ্বৈশ্যাসুতেঽপি চ। অম্বষ্ঠাম্ল্যাম্ললোণ্যাং স্যাৎ পাঠাযূথিকয়োরপি। ইতি বিশ্বঃ (মেদিনী)।

অম্বা শব্দের অর্থ মাতা। যে মাতার ন্যায় হিতকারিণী তাহাকে 'অম্বষ্ঠা' বলা চলে। 'অম্ব' শব্দের অর্থ কি?

বাঙ্গালী নহেন, এমন একজন শ্রেষ্ঠ আভিধানিকের প্রমাণ দিতেছি—

অম্ব:—1. A father—2.—Sound ; the Veda —3. One who sounds—ম্বং 1. The eye—2 Water,

অতএব পুংলিঙ্গ হইলে পিতা, বেদ ও শব্দকারী ব্যক্তি এই তিন অর্থ হইতেছে, ক্লীবলিঙ্গ হইলে চক্ষু ও জল এই দুই অর্থ।

অতএব ভানুজি অম্বষ্ঠকে লক্ষ্য করিয়া 'অম্বে তিষ্ঠতি' বলিলে অম্ব শব্দের কি অর্থ বুঝায়? পিতাতে অর্থাৎ পিতৃবর্গে অথবা বেদে (আয়ুর্ব্বেদে) অবস্থিতি ভিন্ন আর কি অর্থে অম্বষ্ঠকে 'অম্বে তিষ্ঠতি' বলা যাইতে পারে? আমরা বলি, "অম্ব ইব পিতা ইব তিষ্ঠতি' এইরূপ বলিলে যাহা বুঝায় 'অম্বে তিষ্ঠতি' বলায় তদপেক্ষা স্ফুটতর অর্থ প্রকাশ পাইয়াছে। 'অম্বষ্ঠা' স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ। তাহার ব্যুৎপত্তিতে 'অম্বা ইব তিষ্ঠতি' বলা চলে। কিন্তু পুংলিঙ্গ অম্বষ্ঠকে '**অম্বা** ইব তিষ্ঠতি' কিরূপে বলিবে? এই জন্যই ভানুজি তাহা বলেন নাই। 'অম্বায়াং মাতৃকুলে তিষ্ঠতি' ইহাও বলিতে পারেন নাই, কারণ উহা শাস্ত্রানু-মোদিত নহে। অপিচ যখন মূর্দ্ধাভিষিক্ত, অম্বষ্ঠ, মাহিষ্য, পারশব, উগ্র, করণ সকলেই সত্যেন্দ্রবাবুর মতে মাতৃবর্ণ, তখন ইহাদের সকলের নামই 'অম্বষ্ঠ'। জ্যেষ্ঠ মূর্দ্ধাভিষিক্তের অম্বষ্ঠ নাম না হওয়া বোধ হয় অম্বষ্ঠেরই দুর্ভাগ্যের ফল!

সত্যেন্দ্রবাবু ত্র্যম্বক শব্দের দুইটী অর্থ দিয়াছেন, কিন্তু 'ত্রয়াণাম্ (ভুবনানাং) অম্বকঃ (পিতা)' এই সহজ অর্থটী দিলেন না কেন? যাহা হউক, ভানুজী যে অম্বষ্ঠশব্দের ব্যুৎপত্তিতে বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক 'অম্ব' শব্দটী ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা বুঝা যাইতেছে এবং ঐ 'অম্ব' শব্দে 'পিতা' ও 'বেদ' এই দুই অর্থের প্রতিই তাহার লক্ষ্য ছিল। সে জন্য বিশেষ করিয়া কোনও অর্থ নির্দ্দেশ করেন নাই।

(৭) ভৃগু-সংহিতা

(৭) ভৃগুসংহিতার প্রমাণটীও বেশ উপভোগ্য। সত্যেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন—

"প্রসিদ্ধ জ্যোতিষগ্রন্থ 'ভৃগু-সংহিতায়' বৈদ্যজাতীয় ব্যক্তিগণকে অম্বষ্ঠকুলসম্ভূত বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায়।" ইহা মিথ্যা কথা। সত্যেন্দ্রবাবুর কথার অর্থ এই যে, সকল বৈদ্যজাতীয় ব্যক্তিই 'অম্বষ্ঠ কুলসম্ভূত, বলিয়া বর্ণিত আছে। ইহা অসম্ভব বলিয়াই মিথ্যা। যে মুহূর্ত্তে কোন বৈদ্য জন্মিতেছে, সেই মুহূর্ত্তে ধরাধামে বা আর্য্যাবর্ত্তে অন্য কাহারও জন্ম হইবার যো নাই! কারণ জন্মিলে সেও অম্বষ্ঠবর্ণ হইয়া যাইবে! বৈদ্যদিগের জন্মমুহূর্ত্তটী বিধাতার কাছে রিজার্ভ করা আছে, আর কেহ সে সময়ে জন্মিতে পারিবে না! সত্যেন্দ্রবাবুর কথা শুনুন— "বৈদ্যব্রাহ্মণ-সমিতির বর্ত্তমান সভাপতি কবিরাজ যোগীন্দ্রনাথ সেন মহাশয় ভৃগুসংহিতা আলোচনা করিয়া তাঁহাকে অম্বষ্ঠকুলসম্ভূতরূপে বর্ণিত পাইয়াছেন।" ইহা মিথ্যা। যাহারা কোষ্ঠী প্রস্তুত করান, কোষ্ঠী-কারক জ্যোতিষী তাহাদের জাতিনাম জানিয়া অমুকবর্ণের বা অমুক জাতির অমুকের কোষ্ঠী হইতেছে এরূপ লেখে। বৈদ্যরত্ন যোগীন্দ্রনাথ সেনকে বৈদ্য জানিয়া জ্যোতিষী মহাশয়, 'অম্বষ্ঠকুলসম্ভূত' নিজে বসাইয়া থাকিবেন। ভৃগুসংহিতায় 'সূতবংশসম্ভূত', 'মাহিষ্যবংশসম্ভূত', 'মাগধ-বংশসম্ভূত', বৈদেহকবংশসম্ভূত', মূর্দ্ধাবসিক্তসম্ভূত', ইত্যাদি লেখা থাকে না! সত্যেন্দ্রবাবুর এই আবিষ্কারটী যে একটী বলবৎ প্রমাণ, তাহা দেখাইবার জন্য তিনি লিখিতেছেন—

"আমিও যে কয়েকজন বৈদ্যের কোষ্ঠী ভৃগুসংহিতার সহিত মিলাইয়াছি, তাহাতে কোথাও 'বা' 'বৈদ্যবংশে জন্ম', কোথাও বা 'প্রশংসিতে কুলে জন্ম অম্বষ্ঠেতি চ বিশ্রুতে'—এইরূপই পাইয়াছি।"

এ সমস্তই জ্যোতিষীর লেখা ; ভৃগুসংহিতায় ইহা থাকিতে পারে না। এই সকল মিথ্যা কথা লিখিয়া সত্যেন্দ্রবাবু প্রমাণ করিতে চাহেন যে, বৈদ্য ও অম্বষ্ঠ অভিন্ন! জাতিতত্ত্ব লেখকের মত জ্যোতিষীর হাতে সত্যেন্দ্রবাবুর মত ব্যক্তি কোষ্ঠী নির্ম্মাণের ভার দিলে, সে 'পারিভাষিক বৈশ্য', 'সঙ্কর', 'বর্ণসঙ্কর', প্রভৃতি ঢুকাইয়াও যজমানকে খুসী করিতে পারে! আমরা ভৃগুসংহিতার প্রমাণের একটী বিপরীত নিদর্শন দিতেছি। শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন শর্ম্মা সরস্বতী মহোদয়ের যে বিস্তীর্ণ জন্মপত্রী ভৃগুসংহিতা অনুসারে নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহাতে জ্বলন্ত অক্ষরে 'বিপ্রকুলে' জন্ম লেখা রহিয়াছে! ইহার উত্তর কি? মহামহোপাধ্যায় গণনাথ ও বৈদ্যরত্ন যোগীন্দ্রনাথ উভয়েই শক্তিগোত্রের 'সেন'। সত্যেন্দ্রবাবুর কথিত ভৃগুসংহিতার সংবাদ সত্য বলিয়া মানিলেও এক গোত্রের সন্তানগণ, কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ অম্বষ্ঠ,লেখা থাকায় অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণবর্ণ ইহাই ত সপ্রমাণ হইল, অম্বষ্ঠ বৈশ্যবর্ণ হইল কি? ভৃগুসংহিতা কি সত্যেন্দ্রবাবুর পরিচিত কোন বৈদ্যকে বৈশ্য বা সঙ্কর বলিয়াছে? যদি না বলিয়া থাকে, তবে আমাদের প্রদত্ত প্রমাণের বলে তিনিও ত ব্রাহ্মণ হইলেন! মহাভারতের যুযুৎসুকে যদি 'করণঃ ইব' বলিয়া 'করণঃ' বলা যায়, তবে ব্যবসায়-বুদ্ধিসম্পন্ন সত্যেন্দ্রবন্ধু চিকিৎসা-বিক্রেতা বৈদ্যকেও 'অম্বষ্ঠ ইব' অম্বষ্ঠ বলা যাইতে পারে!

(৮) অভিধানের প্রমাণ

বৈদ্য ও বৈদ্যপ্রতিবোধনীতে আর একটী মজার ব্যাপার আছে। কালীবাবু লিখিয়াছেন— 'মান্দ্রাজ,বোম্বাই প্রভৃতি দেশে যে অম্বষ্ঠ-জাতির অস্তিত্ব ছিল, তাহা ঐ সকল দেশের **প্রাচীন** অভিধান দ্বারা প্রমাণীকৃত হয় (!)—

(১) মান্দ্রাজ প্রদেশের সংস্কৃত বৈজয়ন্তী কোষে আছে, 'ব্রাহ্মণাৎ রাজ্ঞী সুতে (?) মূর্দ্ধাবসিক্তকম্। বৈশ্যাম্বষ্ঠং—'

(২) বোম্বে প্রদেশের চিন্তামণি অভিধানে আছে,—'ক্ষত্রিয়ায়াং দ্বিজান্মুর্দ্ধাবসিক্তো বিট্‌স্ত্রিয়াং পুনঃ অম্বষ্ঠো—'

(৩) নানার্থার্ণবসঙ্ক্ষেপ নামক অভিধানে অম্বষ্ঠের অর্থ—'বৈশ্যায়াম্ ব্রাহ্মণাজ্জাতে'। (বৈদ্য, পৃষ্ঠা ১০১)

এইরূপে তত্তদ্দেশীয় কয়েকখানি সংস্কৃত অভিধানে অম্বষ্ঠ শব্দ ও তাহার অর্থ প্রদত্ত আছে, ইহা দেখাইয়াই সিদ্ধান্ত করিতেছেন—

"ইহা দ্বারা স্পষ্ট দেখা যায় যে ঐ সকল দেশে একদিন অম্বষ্ঠ জাতির বিদ্যমানতা ছিল।"—(বৈদ্য,ঐ)

আমরা বলি যেরূপ অকাট্য প্রমাণ খাড়া করা হইয়াছে, তাঁহাতে ঐ সকল দেশে অম্বষ্ঠ নিশ্চয় ছিল বলিতে হইবে! বিলাতে, জার্ম্মাণে, ফ্রান্সে, আমেরিকায় ও রুশিয়ায় পর্য্যন্ত অম্বষ্ঠগণের বিদ্যমানতা ছিল, কারণ ঐ সকল দেশেও যে সকল প্রাচীন বা আধুনিক সংস্কৃত অভিধান রচিত হইয়াছে, তাহাতেও 'অম্বষ্ঠ' শব্দ আছে এবং তাহার অর্থও দেওয়া আছে। শুধু অম্বষ্ঠ নয়, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—আচণ্ডাল হিন্দুসমাজ ঐ সকল দেশে নিশ্চয় ছিল বা আছে। মান্দ্রাজ, বোম্বাই এবং য়ুরোপের ও আমেরিকার দেশগুলিতে হিন্দুদের দেব, দেবী, অপ্সরা, কিন্নরী, দৈত্য, দানব পথে ঘাটে নাচিয়া কুঁদিয়া বেড়াইত, কালীবাবু তাহাও অভিধানের সাহায্যে 'স্পষ্ট' বুঝিতে পারিয়াছেন, আর এ সকল কথা লুকান থাকিবে না!

অম্বষ্ঠেরা যদি ছিল, তবে তারা গেল কোথা?, একথা কেহ জিজ্ঞাসা করিলে তাহার সহজ উত্তর পড়িয়া রহিয়াছে—'কোন কারণে ঐ ঐ দেশে অম্বষ্ঠ জাতি লোপ পাইয়াছে, অথবা অন্য জাতি সহ মিশিয়া গিয়াছে!" (বৈদ্য, ঐ)

এখন কালীচরণাশ্রিত আস্তিক ও ধর্ম্মনিষ্ঠ সত্যেন্দ্রবাবু কি বলিতেছেন দেখা যাউক—

"বৈদ্যব্রাহ্মণগণ প্রশ্ন করেন যে বৈদ্য যদি অম্বষ্ঠ নামক একটা পৃথক্ জাতিই হয়, তবে বাংলাদেশ ভিন্ন অন্য কোথাও ঐ জাতির অস্তিত্ব নাই কেন? ইহার উত্তরে বলিতে পারা যায় যে, অম্বষ্ঠ জাতি ক্রমশঃ অন্য জাতির সহিত মিশিয়া গিয়াছে।" (বৈ০ প্রতি০ পৃঃ ৪৭)

পুনশ্চ—"বর্ত্তমানে কেবল বাংলা দেশেই বৈদ্য বলিয়া একটী স্বতন্ত্র জাতি আছে। তাহার যত পশ্চিমে যাওয়া যায় বৈদ্যজাতি ততই ব্রাহ্মণের নিকটবর্ত্তী হইয়া অবশেষে পাঞ্জাবাদি দেশে উভয় জাতি অভিন্ন হইয়াছে। এবং বাংলাদেশ হইতে যত পূর্ব্বে যাওয়া যায় বৈদ্য-জাতি ততই শূদ্রের নিকটবর্ত্তী হইয়া অবশেষে শ্রীহট্টাদি দেশে শূদ্রের সহিত প্রায় অভিন্ন হইয়া গিয়াছে।" (বৈদ্যপ্রতি, পৃঃ ৪৮)

সত্যেন্দ্রবাবু বলিতে চাহেন যে বাঙ্গালাই বৈদ্যসম্প্রদায়ের ডিপো। এই ডিপোতে তাহাদের যে বৈশ্যাচার দেখা যায়, তাহাই তাহাদের প্রকৃত আচার। তাহারা পশ্চিমে গিয়া ব্রাহ্মণদের জাতি মারিয়াছে এবং পূর্ব্বে গিয়া নিজেদের জাতি দিয়াছে, পরন্তু রাঢ়ের এমন মহিমা যে মনুর সময় হইতে সেই আচার পচে নাই, বৈদ্যের হাঁড়ীতে তাহা অবিকল রাখা ঢাকা আছে! বিদ্যাবাগীশ মহাশয় বুঝাইতেছেন, "একই ভ্রাতৃ-শব্দ কোনও ভাষায় Frater, কোনও ভাষায় Brother, সেইরূপ একই বৈদ্যজাতি কোথায় ব্রাহ্মণাচার, কোথাও বৈশ্যাচার কোথাও শূদ্রাচার!

কি কঠিন গবেষণা! একই বায়ু কখন উর্দ্ধগতি, কখন অধোগতি! কিন্তু অম্বষ্ঠের পক্ষে কোন্ আচার তাহার শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট সদাচার? সত্যেন্দ্রবাবু বলিতেছেন—

"ইহাদের মধ্যে যে আচার শাস্ত্রানুমোদিত তাহাই প্রশংসিত; অন্য অশাস্ত্রীয় আচারের অনুকরণে ঐ শাস্ত্রীয় আচার কখনও পরিত্যাজ্য হইতে পারে না" (বৈদ্যপ্রতি—ঐ)

আমরাও বলি 'তথাস্তু'। ঐ শাস্ত্রীয় আচারই অবলম্বনীয়। মন্বাদি শাস্ত্র কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি পাঞ্জাব সন্নিহিত দেশের আচারকেই চিরকাল সদাচার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

সরস্বতীদৃশদ্বত্যো র্দেবনদ্যো র্যদন্তরম্।
তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে॥
তস্মিন্ দেশে য আচারঃ পারংপর্য্যক্রমাগতঃ।
বর্ণানাং সান্তরালানাং স সদাচার উচ্যতে॥
কুরুক্ষেত্রং চ মৎস্যাশ্চ পঞ্চালাঃ শূরসেনকাঃ।
এষ ব্রহ্মর্ষি দেশো বৈ ব্রহ্মাবর্ত্তাদনন্তরঃ॥
এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাৎ অগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ॥

—মনু, ২।১৭-২০

ব্রহ্মাবর্ত্তে চারিবর্ণের এবং বর্ণান্তর্ব্বর্ত্তী জাতিনিচয়ের যে আচার দৃষ্ট হয় তাহাই সদাচার। তথাকার আদর্শে অন্যান্য দেশের সকল জাতি স্ব স্ব পালনীয় আচার শিক্ষা করিবে। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, পশ্চিম ভারতীয় আচারই উৎকৃষ্ট এবং তথা হইতে যতই পূর্ব্ব, আচারও ক্রমশঃ ততই অবনত। ইহা শাস্ত্রসিদ্ধ এবং প্রত্যক্ষদৃষ্ট। শাস্ত্রানুসারে বাঙ্গালাদেশে এত কদাচার যে এ স্থানে বাস করাই নিষিদ্ধ। ইহা বর্জ্জনীয় দেশ। সত্যেন্দ্রবাবুর মতে এই বৌদ্ধ ও তান্ত্রিক অনাচার-প্লাবিত বঙ্গদেশের আচারই আদর্শ! বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের স্বদেশ-প্রীতি এমন প্রবল যে শাস্ত্রাদেশ তুচ্ছ করিয়া, অত্রত্য পতিত বৈদ্যদের বৈশ্যাচারই তাঁহার নিকটে আদর্শ! সত্যেন্দ্রবাবু পশ্চিমের বৈদ্যদিগের ব্রাহ্মণাচারে দোষ ধরিয়া বলিতেছেন—

"যত পশ্চিমে যাওয়া যায়, বৈদ্যজাতি ততই ব্রাহ্মণের নিকটবর্ত্তী হইয়া অবশেষে পাঞ্জাবাদি দেশে উভয়জাতি

অভিন্ন হইয়া গিয়াছে।” এ কথা অতীব সত্য। কিন্তু সত্যেন্দ্রবাবু যে মনে করিতেছেন বৈদ্যের বৈশ্যাচারই খাঁটী আচার এবং পশ্চিমে তাহা খারাপ হইয়া ক্রমশঃ ব্রাহ্মণাচারে পরিণত হইয়াছে, এবং ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য এইরূপেই সে দেশে অভিন্ন হইয়া গিয়াছে, ইহা নিতান্ত মতিচ্ছন্নতার লক্ষণ। বৈদ্য চিরকালই ব্রাহ্মণ এবং তাহার ব্রাহ্মণাচার অদ্যাপি পবিত্রাচার পশ্চিমদেশীয়দের মধ্যে সুরক্ষিত আছে। বৈদ্য সে স্থানে ব্রাহ্মণ, এবং সে migrate করিয়া যতই পূর্ব্বে আসিয়াছে, ততই পতিত হইয়াছে, রাঢ়ে বৈশ্যবৎ, বঙ্গে শূদ্রবৎ, এবং শ্রীহট্টাদি স্থানে “শূদ্রের সহিত প্রায় অভিন্ন হইয়াছে”।

এই একটী দৃষ্টান্ত হইতে সত্যেন্দ্রবাবুর যে বিচার বুদ্ধি ও পর্য্যবেক্ষণ-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় তাহাতে তাঁহাকে কিছুতেই প্রকৃতিস্থ বলিয়া মনে করা যায় না। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেন শর্ম্মা, এম্-এ মহাশয় এইরূপ লিখিয়াছেন—“তাঁহার গ্রন্থের ৪৪ পৃষ্ঠায় পাদ-টীকায় সত্যেন্দ্রবাবু বলিতেছেন, ‘অম্বষ্ঠানাং চিকিৎসিতম্’ এই বাক্যে অম্বষ্ঠদিগের অর্থ ‘কেবল অম্বষ্ঠদিগের’ অর্থাৎ ভারতে কেবল অম্বষ্ঠেরাই চিকিৎসক, অম্বষ্ঠ ভিন্ন আর কোনও চিকিৎসক নাই। অথচ সত্যেন্দ্রবাবুর মতে “অম্বষ্ঠেরা বৈশ্য”! তবে কি বাঙ্গালার বাহিরের বৈশ্যাচারী অম্বষ্ঠগণ সকলের চক্ষে ধূলি দিয়া ব্রাহ্মণ হইয়া গেলেন? এই জুয়াচুরির কোনরূপ স্মৃতিও রহিল না?” * চিকিৎসক-ব্রাহ্মণ হইয়া তাহারা অপাংক্তেয়, হেয় ও জঘন্য বিবেচিত হইল না? একজনও বৈশ্যাচারী বাকী রহিল না ‘বংশে দিতে বাতি’? এই বৈশ্যগণ অবশ্যই ব্রাহ্মণ-পুরোহিতদের সাহায্যেই শ্রাদ্ধ বিবাহ প্রভৃতি অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিত? তবে নিখিল ব্রাহ্মণ সমাজের অনুমতি লইয়া তাহারা ব্রাহ্মণ হইয়াছিল, না বিদ্রোহ করিয়া? ব্রাহ্মণেরা সর্ব্বত্র এই বর্ণ

---

* ঈষৎ পরিবর্ত্তিত।

পরিবর্ত্তনে অনুমতি দিলেন? আর ঐ অম্বষ্ঠগণই বা কিরূপ? তাহাদের কি 'যেনাস্য পিতরো যাতাঃ' শ্লোকটী কাহারও মনে পড়ে নাই? তাহাদের মধ্যে কি একজনও ধর্ম্মভূষণ বা বিদ্যাবাগীশ ছিলেন না, যে তাহাদের কাছা ধরিয়া বৈশ্যত্বের খোঁটায় টানিয়া বাঁধিয়া রাখেন? কালীচরণবাবু যাহা করিতেছেন, তাহার মার্জ্জনা আছে, কিন্তু বিদ্যাবাগীশ মহাশয় যে এমন রাবিশের সৃষ্টি করিতে পারেন, তাহাত জানা ছিল না!

বৈদ্যপ্রতিবোধনীতে সত্যেন্দ্রবাবু একটী মাত্র সত্য কথা লিখিয়াছেন, তাহা দ্বিজাতি মাত্রেরই শালগ্রাম স্পর্শের অধিকার সম্বন্ধে। এই উপলক্ষ্যে সত্যেন্দ্রবাবু (৬২-৬৪ পৃষ্ঠায়) যাহা বলিয়াছেন, তাহা যথার্থ। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য স্বহস্তে শালগ্রাম ও প্রতিমাপূজার অধিকারী। কিন্তু তিনি যে প্রমাণগুলি দিয়াছেন, সেগুলি তদীয় গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার প্রায় ৪ মাস পূর্ব্বে বৈদ্যহিতৈষিণীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। ঐ প্রমাণগুলি এ পর্য্যন্ত অন্য কোন পণ্ডিত কোন পুস্তকে ব্যবহার করেন নাই। কিন্তু হিতৈষিণীর প্রমাণগুলির সদ্ব্যবহার করিবার সময়ে একটু কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা কি এতই অসম্ভব হইয়াছিল? না, এ বিষয়ে হিতৈষিণীর ঋণ স্বীকার করিলে তিনি 'খাট' হইয়া যাইতেন?

(৯) বর্ণসঙ্করের ব্যাখ্যা

সত্যেন্দ্রবাবু বর্ণসঙ্করের অর্থ সম্বন্ধে অদ্ভুত গবেষণা করিয়াছেন। তাঁহার মতে অম্বষ্ঠ বর্ণসঙ্কর নহে, কিন্তু সঙ্কর বটে! কুলকণ্টকের মনে এইরূপেই যেটুকু সান্ত্বনা আসে! সত্যেন্দ্রবাবুর মতে সঙ্কর শব্দের 'দুই বর্ণে উৎপন্ন' ও 'বর্ণসঙ্কর' এই দুই অর্থ স্বীকার করিলে যখনই কেহ অম্বষ্ঠকে সঙ্কীর্ণজাতি বা সঙ্কর বলিয়া গালি দিবে, তখনই মনকে বলিব, হাঁ আমরা সঙ্কর বটে; কিন্তু বর্ণসঙ্কর ত নয়! আর যদি কেহ 'বর্ণসঙ্কর' বলে, অমনি পায়ে ধরিয়া বলিব, বঁধু হে আমার কথাটা শুন,

ঐ 'বর্ণ'টা ত্যাগ কর, ওটা শুনিলে 'অন্তর দগ্ধ হইয়া যায়', বর্ণটুকু বাদে যতবার ইচ্ছা হয় 'সঙ্কর' বল, আমরা সঙ্কীর্ণজাতি, তা সঙ্কর বলিবে বৈ কি ? কিন্তু ভাই আমরা বর্ণসঙ্কর নই, এইটুকু মনে রেখ।

কুল্লূক মনুর ১০।২৪ শ্লোকে 'বর্ণসঙ্কর' শব্দের ব্যাখ্যায় অনুলোমজাত মূর্দ্ধাভিষিক্ত, অম্বষ্ঠ প্রভৃতিকে 'বর্ণসঙ্কর' বলিয়াছেন' ১।২ শ্লোকে 'অশ্বতরবৎ বর্ণবাহ্য সঙ্কীর্ণ জাতি' বলিয়াছেন, কিন্তু ভক্ত কি গুরুকে অমান্য করিতে পারে ? সুতরাং সে সম্বন্ধে কোন কথাই নাই !

(১০) যেনাস্য পিতরো যাতাঃ

যেনাস্য পিতরো যাতা যেন যাতাঃ পিতামহাঃ।
তেন যায়াৎ সতাং মার্গং তেন গচ্ছন্ ন রিষ্যতে ॥

ইহার ব্যাখ্যায় কালীবাবু যে কীর্ত্তি করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। সত্যেন্দ্রবাবু আরও কীর্ত্তিমান্। তিনি বলিতেছেন—'সদসৎ সংশয়ের স্থলে পিতৃপিতামহাদি পূর্ব্বপুরুষ কর্ত্তৃক আচরিত পন্থাই অনুসরণীয়' (পৃঃ ৯৮)। সত্যেন্দ্রবাবু শাস্ত্রের কোন অপেক্ষাই রাখিলেন না। কি করা যায়, কোন্‌টা ভাল, এইরূপ সংশয় হইলে, যাহা চলিয়া আসিতেছে, তাহাই চক্ষু বুজিয়া করিয়া যাইবে ! সত্যেন্দ্রবাবু যদি বলিতেন, শাস্ত্র যুগপৎ দুই তিনটা পথ দেখাইয়া দিলে, তাহাদের মধ্যে কোন্ পথ আশ্রয়ণীয় এই সংশয়ে পূর্ব্বপুরুষের অনুসৃত পথ শাস্ত্রানুমোদিত হইলে, তাহাতেই চলিবে, তাহা হইলে সত্যের মর্য্যাদা সম্পূর্ণ রক্ষা পাইত। কিন্তু 'সত্যে নাস্তি ভয়ং ক্বচিৎ'—সত্যেন্দ্রবাবুর সত্যনাশের আশঙ্কা নাই !

পুস্তিকা বাড়িয়া যাইতেছে। অর্থাভাবে এইস্থানেই বিদায় গ্রহণ করিতেছি। এখনও অনেক বলিবার আছে। সে সকল কথা মোহবজ্রের পৃথক্ সংস্করণে পুনশ্চ বলিব।

পরিশিষ্ট

(১) প্রক্ষিপ্ত বাক্যে আস্থাই আস্তিকতা!

চতুর্ণামেব বর্ণানাম্ আগমঃ পুরুষর্ষভ।
অতোঽন্যেত্বতিরিক্তা যে তে বৈ সঙ্করজাঃ স্মৃতাঃ॥
ক্ষত্রিয়াতিরথাম্বষ্ঠা উগ্রা বৈদেহকা স্তথা।
স্বপাকাঃ পুক্কসা স্তেনা নিষাদাঃ সূতমাগধাঃ॥
অয়োগাঃ করণাঃ ব্রাত্যা শ্চাণ্ডালাশ্চ নরাধিপ।
এতে চতুর্ভ্যো বর্ণেভ্যো জায়ন্তে বৈ পরস্পরাৎ॥

মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ২৯৭ অধ্যায়

ইহা মহাভারত হইতে উদ্ধৃত!

এস্থলে চারিটী বর্ণের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া তৎসংযোগজ সঙ্কীর্ণ জাতিদিগের উল্লেখ করা হইয়াছে, যথা—ক্ষত্রিয়, অতিরথ, অম্বষ্ঠ উগ্র, বৈদেহক, শ্বপাক, পুক্কস, স্তেন, নিষাদ, সূত, মাগধ, অযোগ, করণ ব্রাত্য ও চণ্ডাল। কিন্তু দ্রষ্টব্য এই যে—

(১) চারি বর্ণের অনুলোম-প্রতিলোম মিশ্রণে ১২ দ্বাদশ জাতির অধিক হয় না, কিন্তু এস্থলে ১৫টী জাতি দেখা যাইতেছে!

(২) ইহা মহাভারতের উক্তি। মহাভারত ব্যাসের লেখা। কিন্তু ইহা ব্যাসসংহিতার উক্তির সহিত মিলে না!

(৩) অনুলোমজ পুত্রদিগকে সঙ্কীর্ণজাতি বলা হইয়াছে!

(৪) দ্বাদশবিধ অনুলোম-প্রতিলোমজ জাতির মধ্যে অনেকের নাম (যথা, মাহিষ্য, মূর্দ্ধাভিষিক্ত) এখানে বলা হয় নাই! তদতিরিক্ত অনুলোমজ ও প্রতিলোমজ জাতির সংযোগে উৎপন্ন কয়েকটী নূতন জাতির নাম (পুক্কস, স্তেন) এস্থানে উল্লেখ দেখা যায়!

(৫) 'ক্ষত্রিয়' এই তালিকার মধ্যে কেন? কালীসিংহের ও বর্দ্ধমানের অনুবাদ হইতে কিছুই বুঝা যায় না।

অতএব এই বাক্যটী জাল। এইরূপ অনেক জাল বাক্য মহাভারত ও পুরাণের মধ্যে আছে। নিতান্ত নির্ব্বোধ ব্যক্তি ব্যতীত এরূপ বচনকে ব্যাসদেবের বচন বলিয়া মানিতে পারেন না। সুতরাং কোন শাস্ত্রবাক্যকে বিশেষ কারণ বশতঃ প্রক্ষিপ্ত বলিলেই নাস্তিক হয় না, প্রক্ষিপ্ত বাক্য ও খাঁটী বাক্যকে চিনিয়া লইবার ক্ষমতা না থাকিলে নির্ব্বোধ, এবং ক্ষমতা সত্বেও ইচ্ছাপূর্ব্বক চিনিবার চেষ্টা না করিলেই তাহাকে নাস্তিক বলা যাইতে পারে। কারণ প্রকৃত শাস্ত্রবাক্যের প্রামাণ্য অস্বীকার করা যেমন গুরুতর অপরাধ, অশাস্ত্রীয় বাক্যকে শাস্ত্রীয় জ্ঞান করিয়া শাস্ত্রের বিরুদ্ধাচরণ করাও তেমনই গুরুতর অপরাধ।

(২) যাজন-ব্রাহ্মণদের অশাস্ত্রীয় ব্যবহার

ভট্টপল্লীর পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য প্রায় বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে ঊনবিংশতি সংহিতার যে অনুবাদ প্রকাশ করেন তাহার অন্যায্যতা এই গ্রন্থমধ্যে দেখান হইয়াছে। এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা অম্বষ্ঠকে লক্ষ্য করিয়া নানারূপ গালাগালি করিয়া থাকেন। কালীবাবু ও সত্যেন্দ্রবাবু এই সকলের বিরুদ্ধে কখন কিছু বলিয়াছেন, না লিখিয়াছেন? বৈদ্যকে উপনয়ন দিয়াও যখন এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা গায়ত্রী দেয় না, ওঙ্কার উচ্চারণে বাধা দেয়, শূদ্রের মত আমান্নে শ্রাদ্ধ করায়, পক্কান্নে ভোগ দিতে দেয় না, শালগ্রাম স্পর্শ করিতে দেয় না, স্ত্রীলোকদিগকে 'দেবী' বলিতে নিষেধ করে, তখন এ সকল ব্যবহার দেখিয়া কালীবাবু ও সত্যেন্দ্রবাবু চুপ করিয়া থাকেন কেন, 'শ্রীচরণেষু' মাথা ঠেকাইয়া পড়িয়া থাকেন কেন? এই সকল ব্যবহার

কি শাস্ত্রসঙ্গত ব্যবহার ? আর বৈদ্যব্রাহ্মণ-সমিতির ব্যবস্থা ও উপদেশ অশাস্ত্রীয় ? তাই উঠিয়া পড়িয়া বৈদ্যব্রাহ্মণ সমিতির বিরুদ্ধে লগুড় উত্তোলন করিয়াছেন ?

(৩) যাজন-ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যব্রাহ্মণের মধ্যে কে কাহার নমস্য ?

ব্রাহ্মণ অন্যবর্ণের নমস্য। কিন্তু ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেও উচ্চ-নীচ আছে, পিতৃস্থানীয় ও পুত্রস্থানীয় আছে, অধ্যাপক ও অধ্যাপ্যস্থানীয় আছে। 'দ্বিজেষু বৈদ্যাঃ শ্রেয়াংসঃ' শুনিয়া যাহারা চটে এবং বৈদ্যশব্দের অর্থে বেদজ্ঞ সিদ্ধান্ত করিয়া চিকিৎসককে সম্মান দিতে চায় না, যাহারা "তস্মাৎ বৈদ্যঃ ত্রিজঃ স্মৃত" দেখিয়াও বৈদ্যের সম্মুখে মস্তক নত করিতে চায় না, তাহারা শাস্ত্রের স্পষ্ট বাক্যও অমান্য করে—

"গুরুবৎ ভাবয়েৎ রোগী বৈদ্যং তস্য নমস্ক্রিয়াম্।
মুনয়ো যদি গৃহ্ণন্তি তে গুরুবৎ দীর্ঘরোগিণঃ ॥"

চরক অন্যত্রও বলিয়াছেন—

"শীলবান্ মতিমান্ যুক্তস্ত্রিজাতিঃ শাস্ত্রপারগঃ।
প্রাণিভির্গুরুবৎ পূজ্যঃ প্রাণাচার্য্যঃ স হি স্মৃতঃ ॥"

বৈদ্য সাধারণ ব্রাহ্মণদিগেরও গুরুস্থানীয়, অন্য বর্ণের গুরু ত বটেই। সুতরাং বাঙ্গালার যাজন ব্রাহ্মণগণ বৈদ্যের নমস্য নহেন, বৈদ্যই নমস্য। কিন্তু এইটুকু স্মরণ রাখিতে হইবে যে পেট হইতে পড়িয়াই কেহ বৈদ্য বা ত্রিজ হয় না, চিকিৎসা বিদ্যা সমাপ্ত করিয়াই হয়। যাহারা বৈদ্যবংশে জন্মিয়াই অহঙ্কারে মত্ত হয়, তাহারা জাতি-ব্রাহ্মণদেরই ন্যায় অপরাধী।

(৪) যাজন-ব্রাহ্মণদিগের মত কি ?

বৈদ্য ও বৈদ্যপ্রতিবোধনীর মতে বৈদ্য সামাজিক মর্য্যাদায় ক্ষত্রিয়ের উপরে কিন্তু ব্রাহ্মণের নীচে। এমন উন্নত সামাজিক গৌরব যাহার

তাহাকে ব্রাহ্মণগণ পদে পদে শূদ্রবৎ লাঞ্ছিত করে কেন ? শূদ্রের উপরে বৈশ্য, বৈশ্যের উপরে ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়ের উপরে যদি বৈদ্য—তবে এই বৈদ্যকে সুবিধা পাইলে—

(১) উপবীতসূত্র কোমরে রাখিতে বলা হয় কেন ?

(২) আমান্নে শ্রাদ্ধ করান হয় কেন ?

(৩) আমান্নে ভোগ দেওয়ান হয় কেন ?

(৪) পূজা ও বিবাহাদি মন্ত্রে ওঙ্কার উচ্চারণ করিতে দেওয়া হয় না কেন ?

(৫) গায়ত্রী ঠিক মত শিখান হয় না কেন ?

(৬) সন্ধ্যা ঠিক মত শিখান হয় না কেন ?

(৭) শালগ্রাম স্পর্শ করিতে নাই বলা হয় কেন ?

(৮) দ্বিজের নিকটে অনাচারী শূদ্রের ন্যায় অভোজ্যান্ন কেন ?

(৯) স্বশ্রেণীর স্ত্রীলোকদিগকে দেবী বলিতে দেওয়া হয় না কেন ?

(১০) দ্বিজ প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করিলে হিংসার উদ্রেক হয় কেন ?

যাজন-ব্রাহ্মণগণ এই 'কেন' গুলির উত্তর দান করিলে কালীবাবু সুখী হইবেন। যে জাতির সামাজিক প্রতিষ্ঠা ক্ষত্রিয়ের উপরে, যে ব্রাহ্মণবৎ সম্মানের পাত্র, তাহার প্রতি পুরোহিত-শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ শূদ্রবৎ ব্যবহার করিতে পারিয়াছিলেন কিরূপে এবং কেনই বা সে প্রয়োজন হইয়াছিল ? ব্রাহ্মণের নীচে ইহাদের সামাজিক আসন হইলে প্রাচীন বৈদ্যগণের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঘটিত কি ? অত্যাচার হইতে আক্রোশ, আক্রোশ হইতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতে সমবর্ণত্ব অনুমান হয়।

(৫) বৈদ্য হইতে সাধারণ ব্রাহ্মণদিগের উৎপত্তি—

এ সম্বন্ধে ২৭৩—২৭৬ পৃষ্ঠা এবং ৩০৬—৩১০ পৃষ্ঠা দেখিতে অনুরোধ করি। **ত্রিজদিগের** বংশে জন্মিয়া যাহারা বৈগুণ্যবশতঃ আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়নে অধিকারী হইত না, তাহারা **দ্বিজ বা সাধারণ ব্রাহ্মণ** বলিয়া গণ্য হইত। * তদ্বিত্তাবৃত্ত ও তদ্বিত্তকুলজগণের মধ্যে আয়ুর্ব্বেদ অনুশীলনের রীতি আবদ্ধ থাকায় পুরুষপরম্পরাক্রমে অদ্যাপি যাঁহারা বৈদ্যবৃত্তি করিতেছেন, তাঁহারা ঐ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণবংশের সর্ব্বগুণালঙ্কৃত শ্রেষ্ঠ ধারা। বস্তুতঃ বৈদ্যকশাস্ত্র কতকগুলি বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ বংশে আবদ্ধ হইয়া যাইবার পরে সাধারণ ব্রাহ্মণ হইতে বৈদ্যবংশের উৎপত্তি যতটা অসম্ভব, (কারণ সাধারণ ব্রাহ্মণ আয়ুর্ব্বেদে অনধিকারী) বৈদ্যব্রাহ্মণ হইতে সাধারণ ব্রাহ্মণের উৎপত্তি ততটা স্বাভাবিক, কারণ বৈদ্যবংশজাত পুত্র আয়ুর্ব্বেদস্বামী না হইতে পারিলে বৈদ্যের নাম-গৌরব পাইত না, এবং তদবস্থায় তাহাকে সাধারণ দ্বিজত্বের গণ্ডীতেই আবদ্ধ থাকিতে হইত!

নবদ্বীপের কথা।

(৬) **ব্রাহ্মণপণ্ডিতের অধঃপতন**—কোন যাজনব্রাহ্মণ 'জাতিতত্ত্ব' নামক পুস্তকে বৈদ্যকে বর্ণসঙ্কর ও অস্পৃশ্য শূদ্র বলিয়াছেন। নবদ্বীপের যাজনব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা একবাক্যে ঐ পুস্তকের প্রশংসা করিয়াছেন। আবার বৈদ্য কালীবাবু ও সত্যেন্দ্রবাবু বৈদ্যকে 'অম্বষ্ঠবর্ণ বৈশ্য' বা 'পারিভাষিক বৈশ্য' বলিয়া যে যে পুস্তক লিখিয়াছেন, পূর্ব্বোক্ত পণ্ডিতবর্গ তাহারও প্রশংসা করিয়াছেন! এরূপ কেন হইল? 'অস্পৃশ্য শূদ্র' ও 'অম্বষ্ঠবর্ণ বৈশ্য' কি এক অভিন্ন বস্তু? পৃথিবীর দশম আশ্চর্য্য বস্তু কাহারও দেখিবার আকাঙ্ক্ষা হইলে আমরা

* 'ন বৈদ্যঃ পূর্ব্বজন্মনা'—বৈদ্য বলিয়া কোন জাতি নাই, বৈদ্যের গৃহে জন্মিলেই বৈদ্য হয় না।

নবদ্বীপের এই দিগ্বিদিক্-জ্ঞানশূন্য পণ্ডিতমণ্ডলীকে নিরীক্ষণ করিতে অনুরোধ করি। পাঠক এই মত বিরোধটা ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখুন—

(১) 'জাতিতত্ত্ব' মতে বৈদ্য **'শূদ্রধর্ম্মা'**।	× কালীবাবু ও সত্যেন্দ্রবাবুর মতে **'বৈশ্যধর্ম্মা'**।
(২) 'জাতিতত্ত্ব' মতে বৈদ্য ও অম্বষ্ঠ **'এক নহে'**।	× কালীবাবু ও সত্যেন্দ্রবাবুর মতে **'এক'**।
(৩) 'জাতিতত্ত্ব' মতে বৈদ্যের উপনয়ন-সংস্কার **'নাই'**।	× কালীবাবু ও সত্যেন্দ্রবাবুর মতে **'আছে'**।
(৪) 'জাতিতত্ত্ব' মতে বৈদ্য **'বৈদ্য'** বলিয়াই পরিচয় দেয়।	× কালীবাবু ও সত্যেন্দ্রবাবুর মতে **'অম্বষ্ঠ'** বলিয়া পরিচয় দেয়।
(৫) 'জাতিতত্ত্ব' মতে বৈদ্য প্রতিলোমজাত **"বর্ণসঙ্কর'**।	× কালীবাবু ও সত্যেন্দ্রবাবুর মতে বৈদ্য **'ব্রাহ্মণের নীচে ও ক্ষত্রিয়ের উপরে'**।

সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে এবংবিধ অসামঞ্জস্য সত্ত্বেও প্রবোধনীর সমালোচনা করিতে জাতিতত্ত্ব যে যে অদ্ভুত কথা বলিয়াছে, কালীবাবু ও সত্যেন্দ্র-বাবুরও পনের আনা সেই কথা! নবদ্বীপের ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা উভয় পুস্তক দেখিয়াই উল্লসিত হইয়াছেন! তাঁহারা উভয় পুস্তকেরই মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছেন! তাঁহাদের এই অদ্ভুত ব্যবহারের জন্য প্রশ্ন করিলে নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যা-নাথ তর্কবাগীশ মহাশয় মুখপাত্ররূপে কি লিখিয়াছেন * দেখুন—

(১) "জাতিতত্ত্বে ও বৈদ্যপুস্তকে পরস্পর **অনেক অসামঞ্জস্য থাকিলেও কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই।**"—ইহার উপর টীকা অনাবশ্যক!

(২) "ঐ **সিদ্ধান্ত** (বৈদ্যপুস্তকের সিদ্ধান্ত) **দেখিয়া**

---

* এই পত্রখানি দান্‌রা-সম্পাদক শ্রীবিপিনচন্দ্র দাশশর্ম্মা মহাশয়ের নিকটে আছে।

আমি কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হই নাই। আমি আমার সামান্য বুদ্ধিতে যে সিদ্ধান্ত স্থির করিয়াছি, সেই সিদ্ধান্তেই আমি উপনীত (?) আছি।"

অথচ পণ্ডিত মহাশয় কালীবাবুকে যে প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, তাহাতে এইরূপ মুদ্রিত আছে—"রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত কালীচরণ সেন ধর্ম্মভূষণ মহোদয় প্রণীত **বৈদ্য নামক পুস্তকখানি পাঠ করিয়া** এবং সেন মহাশয়ের সংস্কৃত শাস্ত্রে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তির পরিচয় পাইয়া অত্যন্ত প্রীত হইলাম।" (বৈদ্য. ২য় সং ১২৫ পৃঃ)

পুনশ্চ—"অনেক বৈদ্য সন্তান......কুহকে অন্ধ হইয়া পুরুষ-পরম্পরা অনুষ্ঠিত পথ পরিত্যাগে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এক্ষণে **সেন মহাশয়ের পুস্তিকা দ্বারায়** (?) **ঐ সকল অন্ধের চক্ষুরুন্মীলিত** (?) হইলে তাহাদের ধর্ম্ম রক্ষা হইবে এবং দেশেরও মহোপকার সাধিত হইবে।" (ঐ)

পুনশ্চ—"সেন মহাশয় যে সকল যুক্তি, তর্ক ও প্রমাণের উদ্ভব করিয়াছেন, **তাহাতে ভ্রম প্রমাদ নাই।**" (ঐ)

পুনশ্চ—"যাহা হউক, আমাদের মতে বৈদ্যজাতীয় (?) যে ব্রাহ্মণ নহে অর্থাৎ বৈশ্যবর্ণ, ইহাতে অনুমাত্র (?) সংশয় নাই।" ইত্যাদি (ঐ)

এই অপূর্ব্ব প্রশংসাপত্রে সহি করিয়াছেন নবদ্বীপের মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ এবং রামকণ্ঠ, ক্ষিতিকণ্ঠ, রাজেন্দ্রনাথ, ত্রিপথনাথ ও শশাঙ্ক! ভাষার কথা আর বলিলাম না!

সামাজিকবর্গ এই ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তি কয়টীকে চিনিয়া রাখুন।

(৭) **ভট্টপল্লী**—কালীবাবু আরও একখানি পাঁতি সংগ্রহ করিয়া নিজ পুস্তকের ১২৬—১২৭ পৃষ্ঠায় স্থান দিয়াছেন, তাহাতেও ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের শোচনীয় অধঃপতনের পরিচয় পাওয়া যায়। এই সকল লোকের পক্ষে সংসারে কোন কার্য্যই অসাধ্য নয়!

অতঃপর ভট্টপল্লীর পঞ্চানন আছেন, কমলকৃষ্ণ আছেন, অন্নদাচরণ আছেন, আর আছেন কয়েকজন বৈদ্যকুলের রত্ন যাঁহারা কালীবাবুর সঙ্গে লালকে নীল এবং নীলকে লাল দেখেন !

এই সকল প্রশংসাপত্র-লেখকেরা যদি যথার্থই সমাজের উপকার করিতে চাহেন তবে মোহমুদ্গর পাঠ করিয়া নিজ নিজ মোহের নিবৃত্তি করিয়া সমাজকে সুস্থ করিবেন

(৮) **নবদ্বীপের** পরাজিত পণ্ডিতদের আর একটী কথা—"সৃষ্টির **প্রথম হইতে** গুণ-কর্ম্মানুসারে যাঁহারা ব্রাহ্মণ হইয়াছেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণই থাকিবেন, এবং যাঁহারা অব্রাহ্মণ হইয়াছেন তাঁহারা অব্রাহ্মণই থাকিবেন।" ব্রাহ্মণত্বের কেমন কায়েমি ব্যবস্থা দেখুন ! "বর্ণানাং প্রবিভাগশ্চ ত্রেতায়াং পরিকল্পিতঃ" বায়ুপুরাণের এই উক্তি মিথ্যা হইয়া গেল ! শৌনক, কণ্ব, বিশ্বামিত্র প্রভৃতি ক্ষত্রিয় হইতে চাতুর্ব্বর্ণ্য-প্রবৃত্তি, নূতন নূতন ব্রাহ্মণবংশধারার প্রবর্ত্তন এবং ব্রাহ্মণদের ব্রাত্যত্ব ও শূদ্রত্ব প্রাপ্তির কথা ইঁহারা শুনেন নাই !

(৯) **যে সম্প্রদায়ে** বৈশ্যের স্বভাবজ গুণকর্ম্ম কিছুমাত্র দেখা যায় না, সে সম্প্রদায় কখন বৈশ্যজাতির মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না। বৈদ্যবিদ্বেষী পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধিও বলিয়াছেন **"দ্বাপর যুগ হইতে বৈদ্যের বিপ্র-বৃত্তি দেখা যায় না।"** কে দেখিতে গেল ? এতদ্দ্বারা বৈদ্যের বিপ্র-বৃত্তিই শাস্ত্রানুমোদিত স্বীকার করা হইল ! এই বৃত্তি আজও বর্ত্তমান রহিয়াছে। যাহা কিছু পরিবর্ত্তন তাহা পুরোহিত শ্রেণীর অত্যাচারে (তাহাদের হাতে যে টুকু সেই টুকুতেই) হইয়াছে, এতদ্ব্যতীত অধ্যাপনাদি ব্রাহ্মণবৃত্তি, গুরুবৃত্তি, ব্রাহ্মণোচিত উপাধি ইত্যাদি সমস্তই বৈদ্যদিগের আছে।

(১০) **নবদ্বীপের** পণ্ডিত কামাখ্যানাথের আর একটু কথা

এই—"আমার কোন পক্ষেই **জেদ নাই** যে বৈদ্য ব্রাহ্মণ হইলে তাহাকে অব্রাহ্মণ করিতেই হইবে, এবং বৈদ্য অব্রাহ্মণ হইলে তাহাকে ব্রাহ্মণ করিতেই হইবে।...নানাস্থানে নানাপ্রকার বৈদ্য ব স করেন। তাঁহাদের মধ্যে কোন্ বৈদ্য কোন্ জাতির অন্তর্গত, ইহা অপরের সন্দেহ হই'ত পারে, কিন্তু তাঁহাদের মনে কোনও সন্দেহই ন ই।...**যে সকল ব্রাহ্মণ** চিকিৎসাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন পুরুষপরম্পরায় দশাহাশৌচাদি ব্যবহার দেখিয়া (?) ব্রাহ্মণ মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত হইবেন। **যে সকল অম্বষ্ঠ**—চিকিৎসাবৃত্তি অবলম্বন করিয়'ছেন, তাঁহারা পুরুষপরম্পায় পঞ্চদশাহাশৌচাদি ব্যবহার দেখিয়া (?) অম্বষ্ঠ বৈশ্য মধ্যেই অন্তভুক্ত হইবেন। **যে সকল শূদ্র** চিকিৎসাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারা পুরুষপরম্পরায় মাসাশৌচাদি ব্যবহার দেখিয়া (?) শূদ্রমধ্যেই অন্তর্ভুক্ত হইবেন।

পণ্ডিত মহাশয় জানেন না যে, বাঙ্গালার বৈদ্যসমাজ কুলজির সাক্ষ্যে সকলেই এক জাতি। সুতরাং আবহমানকাল ব্রাহ্মণাচারী বৈদ্যেরা ব্রাহ্মণ, বৈশ্যাচারীরা বৈশ্য এবং শূদ্রাচারীরা শূদ্র এরূপ বলিবার উপায় নাই! বৈশ্য ও শূদ্র চিকিৎসায় অধিকারী, ইহা একটা সংবাদ বটে! অবৈদ্যের ঔষধ কুত্রাপি কাহারও সেব্য নহে। সুতরাং সারা ভারতে যাহাদের ঔষধ সেব্য তাহারা একজাতি। অতএব উত্তরভারতের, পশ্চিম-ভারতের ও দক্ষিণভারতের ব্রাহ্মণ বৈদ্যগণ ও বাঙ্গালার বৈদ্যগণ একজাতি। সুতরাং বঙ্গীয় বৈদ্যগণ মূলতঃ ব্রাহ্মণ। ইহারা অশৌচাদি কয়েকটী আচারে হীন হইয়া পড়িয়াছেন বটে, কিন্তু সেই জন্যই ত সংস্কারের অত্যাবশ্যকতা ও অপরিহার্য্যতা! পণ্ডিত মহাশয় মুখে বলেন, কাহারও সংস্কারে বাধা দিবার জেদ নাই, কিন্তু সেই জেদ ষোল আনা বিদ্যমান এবং তাহা প্রতি কথায় প্রকাশ! পণ্ডিত মহাশয়ের অভিপ্রায় এই, পশ্চিমের

ব্রাহ্মণাচারী বৈশ্যেরা ব্রাহ্মণ, রাঢ়ের বৈশ্যাচারী বৈশ্যেরা অম্বষ্ঠ, তদ্ব্যতীত মাসাশৌচী বৈদ্যেরা শূদ্র! ইহারা যেমন আছে তেমনই থাকুক। এই 'Divide and Rule' Policy মন্দ নয়! বাঙ্গালার বৈদ্যদিগকে কিছুকাল পরে বৈশ্যত্ব ও শূদ্রত্বের অপরাধে চিকিৎসায় অনধিকারী প্রকাশ করিতে পারিলেই বাঙ্গালার চিকিৎসা-ক্ষেত্র যাজন-ব্রাহ্মণদের হস্তগত হইয়া পড়িবে, ছেলেদের জন্য আর চাকুরি খুঁজিয়া বেড়াইতে হইবে না—ইহা যে পণ্ডিতমহাশয়দের মনের মধ্যে লুক্কায়িত নাই, তাহা কে বলিবে? তর্কবাগীশ মহাশয়ের ন্যায় অনেক বাগীশ-পুরোহিত নিরুপবীত বৈদ্যকে 'সেন গুপ্ত', 'দাস গুপ্ত' বলিয়া মন্ত্রপাঠ করায় এবং ত্রিশ দিন অশৌচ পালন করাইয়া লয়। তাহারা বলুক তাহাদের মতে ঐ বৈদ্যগণ কোন্ বর্ণীয়? শূদ্রবর্ণীয় হইলে নামের শেষে 'গুপ্ত' ব্যবহার হয় কিরূপে? এবং বৈশ্য হইলে ত্রিশ দিন অশৌচই বা হয় কিরূপে?

(১১) **ব্রহ্মা মূর্দ্ধাভিষিক্তশ্চ ইত্যাদি**—কালীবাবু বলেন, এই শ্লোকে কাহার কিরূপ সংস্কার হইবে, বা কাহার কোন্ বর্ণ তাহা বলা হয় নাই, কাহার কিরূপ গৌরব তাহাই বলা হইয়াছে। কিন্তু 'অমী পঞ্চ' বলিয়া যাহারা সামাজিক গৌরবের কথা আলোচনা করিতেছিল, তাহারা মাহিষ্যকে ভুলিল কেন? মাহিষ্য কি দ্বিজ নহে? তাহার কি দ্বিজ-গৌরবে কোন দাবী-দাওয়া নাই? (দ্বিতীয় শলাকা ১০৪-১০৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

(১২) **এই হারীতবচন** কোন মুদ্রিত পুঁথিতে নাই। তথাপি যদি উহা শাস্ত্রবাক্য হয়, তবে ঐ শ্লোকে গৌরবের ক্রম দেখান হইয়াছে, **বর্ণের ক্রম রক্ষা করা হয় নাই, এ কথা কালীবাবুকে কে বলিল**? কালীবাবু ও সত্যেন্দ্রবাবু যখন এই বাক্যটাকে শাস্ত্রবাক্য বলিয়া মানিতে প্রস্তুত, তখন বৈদ্যবর্ণ-বিনির্ণয়,

বৈদ্যপুরাবৃত্ত, বৈদ্যজাতির ইতিহাস প্রভৃতি গ্রন্থে "বৈদ্যেষু হি নৃপঃ শ্রেষ্ঠস্তপরে তস্য শাসনাৎ। বিপ্রান্তে বৈদ্যতাং যান্তি রোগদুঃখপ্রণাশকাঃ। তে সর্ব্বে ভিষজঃ প্রোক্তা আয়ুর্ব্বেদেষু দীক্ষিতাঃ। তেষাং বৃত্তিস্তু বিজ্ঞেয়া চিকিৎসাধ্যাপনাদিকা।" (প্রবোধনী, পৃঃ ৪) এবং 'সর্ব্ববেদেষু নিষ্ণাতঃ সর্ব্ববিদ্যাবিশারদঃ। চিকিৎসাকুশলশ্চৈব স বৈদ্যশ্চাভিধীয়তে।" (প্রবোধনী পৃষ্ঠা ৬) উশনার বাক্য বলিয়া উদ্ধৃত এই বচন দুইটীর প্রামাণ্যও (প্রচলিত উশনাতে নাই বলিয়া) অস্বীকার করিতে পারেন না। কিন্তু যে উশনা আয়ুর্ব্বেদাভিজ্ঞ বৈদ্যের সম্বন্ধে এই সকল কথা বলিয়াছেন, তিনিই অম্বষ্ঠ সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন দেখুন –

বৈশ্যায়াং বিধিনা বিপ্রাজ্জাতোঽম্বষ্ঠ উচ্যতে।
কৃষ্যাজীবো ভবেত্তস্য তথৈবাগ্নেয়নর্ত্তকঃ ॥
ধ্বজবিশ্রাবকা বাপি অ(হ্য)ম্বষ্ঠাঃ শস্ত্রজীবিনঃ।

(মোহমুদ্গর, পৃঃ ১৪৩)

বিপ্রকর্ত্তৃক বিবাহিতা বৈশ্যকন্যাতে অম্বষ্ঠের জন্ম হয়, কিন্তু উশনায় এই অম্বষ্ঠের চিকিৎসাবৃত্তি বিহিত হয় নাই। যাহা হউক, একই ঋষি আয়ুর্ব্বেদাভিজ্ঞ বৈদ্য ও অম্বষ্ঠকে দুইটী পৃথক্ বস্তু বলিয়া বর্ণনা করায় এবং তাহাদের পৃথক্ বৃত্তি নির্দ্দেশ করায়, বৈদ্য মাত্রেই অম্বষ্ঠ নহে, ইহা সপ্রমাণ হয়।

(১৩) **প্রেতের সন্তান**।—কোন যাজন-ব্রাহ্মণ একদা বৈদ্যব্রাহ্মণসমিতির প্রতিভাবান্ কর্ম্মী শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ সেন শর্ম্মা (কাষ্টমস্ এপ্রেসার্) মহাশয়কে বলেন, "আপনারা প্রেতের সন্তান, আপনাদের পৌরোহিত্য আর করিব না। দশাহ অশৌচ পালন করিয়া একাদশাহে শ্রাদ্ধ করায় আপনাদের পূর্ব্বপুরুষেরা প্রেতত্ব হইতে মুক্ত হন নাই।" শ্রীযুক্ত বিধুবাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা বল্লাল-লক্ষ্মণ-কলহের ফলে অশৌচান্ত প্রথা উল্টাইয়া

ফেলিলে তখন ত আপনাদের শাস্ত্রজ্ঞ পূর্ব্বপুরুষেরা কোন আপত্তি করেন নাই! পরে রাজবল্লভের সময়ে আর একবার ঐরূপ পরিবর্ত্তন হইলে তখনও 'প্রেতের সন্তান'দের পৌরোহিত্য করিতে আপত্তি হয় নাই! আপনারা ত চিরকালই বৈদ্যদিগকে যজাইয়া আসিতেছেন, তবে আজ এত রাগ কেন? ব্রাহ্মণাচার গ্রহণ করিতেছি বলিয়া? চিরকাল যখন করিয়া আসিয়াছেন, এখনও করিতে হইবে।" অন্যান্য কথার পর ঠাকুর মহাশয় আর আপত্তি করিতে পারিলেন না, বরং বিধুবাবুর শাস্ত্রযুক্তির প্রশংসা করিতে লাগিলেন! বস্তুতঃ জাজ্বল্যমান শাস্ত্রও ইহাদের মোহকলুষ নয়নে স্বতঃ প্রতিভাত হয় না, ইহাই দুঃখ!

(১৪) **সে কালে কি পণ্ডিত ছিল না?**—অনেকে বলেন সে কালে কি পণ্ডিত ছিল না? তাহারা কেহ ব্রাহ্মণত্ব জাহির করিলেন না, আর আজ বৈদ্যব্রাহ্মণসমিতির মহামহোপাধ্যায় ও বৈদ্যরত্ন, গীতাচার্য্য ও শাস্ত্রী শাস্ত্র বুঝিল? ইহার উত্তর আমরা মোহমুদ্গরের ১—৩ পৃষ্ঠায় দিয়াছি। মধ্যযুগে একদা বাঙ্গালায় সত্যই পণ্ডিত দুর্লভ ছিল। মুসলমান আক্রমণের ফলে শাস্ত্র-দেবমন্দির-ব্রাহ্মণ একেবারে বিপর্য্যস্ত হইয়াছিল। প্রায় দুইশত বৎসর বাঙ্গালার অবস্থা এরূপ শোচনীয় হইয়াছিল যে অধ্যেতব্য বহু বিষয় এ দেশে গ্রন্থাভাবে অধ্যাপনাই হইত না। ঐ সময়ে উপবীতশূন্য বৈদ্যগণ উপবীতশূন্যই রহিয়া গেলেন! পণ্ডিত বৈদ্যেরা কেনই বা উপবীত ত্যাগ করিয়া ছিলেন, এবং কেনই বা ব্রাত্যত্ব ঘুচাইবার জন্য পুনর্ব্বার অবিলম্বে উপবীত গ্রহণ করিলেন না? আর পণ্ডিত পুরোহিতেরাও যজমানদিগের ব্রাত্যত্ব দূরীকরণে কেনই বা উপদেশ দেন নাই? পুরোহিতেরা ঐ ব্রাত্যদিগকেই 'যথাপূর্ব্বং তথাপরং' যজাইতে লাগিলেন, একি ভীষণ কথা! রাঢ়ের উপবীতী বৈদ্যেরাও এমন অধঃপাতে গিয়াছিলেন যে আমাদের শ্রাদ্ধ ও

ভোগ দিতেন, ওঙ্কার না বলাইয়া 'নমঃ' পাঠ বলাইলেও কি হইল, কিছু বুঝিতেন না। বৈদ্যসমাজে পণ্ডিত থাকিলে যাজন-ব্রাহ্মণেরা বৈদ্যদিগকে কোমরে পৈতা পরিবার উপদেশ দিবার সাহস করে কিরূপে ? পণ্ডিত থাকিলে কুশণ্ডিকা না হইয়া বিবাহ হয় কিরূপে ? উভয় পক্ষেই পণ্ডিত নাই বলিয়াই ত ? নারায়ণশিলা স্পর্শ করিয়া ফেলিলে পুরোহিতের ভ্রুকুটীই বা হয় কেন, এবং যজমান নীরবে স্বহস্তে পঞ্চগব্য স্নানের আয়োজনই বা করেন কেন ? শাস্ত্রজ্ঞানের অভাববশতঃই এই সমস্ত হয়। কুলীন ব্রাহ্মণদের দুরবস্থার চিত্র স্মরণ হইলে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তি ও যথার্থ পাণ্ডিত্য যে নিতান্ত দুর্লভ ছিল, তাহা বুঝা যায়। যে বৈদ্যগণ চিরকাল এত অত্যাচার সহ্য করিয়াছেন যাঁহারা ধর্ম্মের আমূল ধ্বংস ও আত্মাবমাননা বরণ করিয়া পঞ্চদশ দিন বা ত্রিশ দিন অশৌচ ও ব্রাত্যত্ব সহ্য করিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহারা যে অত্যাচারীর নিকটে "দ্বাপরে ক্ষত্রবৎ প্রোক্তাঃ" ও "কলৌ বৈশ্যোপমা হি তে" বা 'বৃষলত্বং গতাঃ' ইত্যাদি জালশাস্ত্র বাক্য ও তাহাদের দোহাই শুনিয়া ১৫ দিন ও ত্রিশ দিন অশৌচ পালনেও রাজি হইবেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? রাজা গণেশের নিকটে আবেদন পত্র ও তাঁহার আদেশ পত্র এতদুভয় বৈদ্যের সমাজিক আচার বিপ্লবের কাল নির্দ্দেশ করিতেছে।

(১৩) '**পূয়ং চিকিৎসকস্যান্নম্**'—ইহা যে চিকিৎসা-বিক্রয়ীকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। অপিচ বাঙ্গালায় যাজনব্রাহ্মণেরা চিকিৎসাবৃত্তি গ্রহণ করিয়াও যখন পতিত, অপাংক্তেয় ও অভোজ্যান্ন না হইয়া বরং উন্নীত, পংক্তিপাবন ও ভোজ্যান্ন বলিয়া গণ্য হইতেছেন, এবং সমগ্র ভারতেও যখন চিকিৎসক-ব্রাহ্মণদের অন্ন ঘৃণিত বলিয়া বর্জ্জনীয় না হইয়া সমাদরে গ্রহণীয় বলিয়াই বিবেচিত হয়, তখন বৈদ্যেরা ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকৃত হইলে

সমাজে আরও হীন হইয়া পড়িবেন, কালীবাবু ও সত্যবাবুর এইরূপ আশঙ্কা নিতান্তই অমূলক! এখন প্রায় সকল ব্রাহ্মণই বিদ্যাবিক্রয়ী বাঙ্গালার মুখোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ চিকিৎসায় অনধিকারী হইয়াও বেশ দস্তুর মত চিকিৎসা বিক্রয় আরম্ভ করিয়াছেন। বৈশ্যমানী কালীবাবু ও সত্যেন্দ্রবাবু অকুণ্ঠিত চিত্তে তাঁহাদিগকে প্রণাম করেন এবং তাঁহাদের প্রসাদ প্রাপ্ত হন এবং শ্রাদ্ধেও তাঁহাদিগকে 'সুপাংক্তেয়' বলিয়া নিমন্ত্রণ করেন!

(১৬) বাচস্পত্য—শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস কবিরাজ বাচস্পতি মহাশয় সত্যেন্দ্রবাবুকে ও কালীবাবুকে যে প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, আমাকেও তদ্রূপ বা তাহা হইতে উৎকৃষ্টতর প্রশংসাপত্র দিয়াছিলেন।* আমরা তাহা হিতৈষিণী-পত্রিকায় ছাপাইয়া দিয়াছি। পাঠক তাহা পাঠ করিলেই বুঝিবেন, কবিরাজ মহাশয়ের মতের কোন মূল্য নাই। নবদ্বীপের পণ্ডিতবর্গ যদি এক মুখে 'জাতিতত্ত্ব' ও 'বৈদ্যে'র প্রশংসা করিতে পারে, তবে কবিরাজ মহাশয় এক মুখে আমার ও সত্যেন্দ্রবাবুর—আদার ও কাঁচকলার—কটুকষায় কাব্য-রস 'চর্ব্বণ' করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে কেন না পারিবেন?

(১৭) সত্যের সত্যপ্রিয়তা—সত্যেন্দ্রবাবু নিজের পুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, এই আন্দোলনের পূর্ব্বে বৈদ্যোচিত 'গুপ্ত' উপাধি তাঁহাদের বংশে প্রচলিত ছিল এবং আন্দোলনের ফলেই তাঁহারা 'গুপ্ত' উপাধির ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন! এতৎপ্রসঙ্গে পণ্ডিতপ্রবর শ্রীদ্বারকানাথ কাব্য-ব্যাকরণ-তর্কতীর্থ মহাশয় এইরূপ লিখিয়াছেন—"নিজের মুখে চুণ কালী দিয়া জগৎকে দেখাইয়া বেড়াইতে এই বিদ্যাবাগীশ

* আমার লেখা পড়িয়া তিনি মুগ্ধ, আমরা তাঁহার মাথার মণি, অহংকার বস্তু ইত্যাদি কত কি লিখিয়াছেন।

মহাশয়কেই প্রথম দেখিলাম। ইহা কি সত্য যে এই আন্দোলনের পূর্ব্বে কোন বৈদ্য বৈশ্যোচিত গুপ্ত উপাধি ব্যবহার করিতেন এবং পরে—ছাড়িয়াছেন? সেন-দাশ প্রভৃতির ন্যায় মূলপুরুষের নামানুসারে 'গুপ্ত'ও বৈদ্যের একটী উপাধি আছে। যাঁহারা গুপ্তের বংশে জন্মলাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারাই 'গুপ্ত' উপাধি লিখিতেন, এবং এখনও উহা ত্যাগ করেন নাই। বৈশ্যত্বজ্ঞাপক 'গুপ্ত' উপাধি পূর্ব্বে কোন বৈদ্য ধারণ করিতেন না, অর্থাৎ পূর্ব্বের বৈদ্যেরা কেহ 'সেনগুপ্ত', 'দাশগুপ্ত' ইত্যাদিরূপে গুপ্তসহকারে সেনাদি উপাধি ব্যবহার করিতেন না। অজ্ঞতাপ্রণোদিত হইয়া আধুনিক অজ্ঞেরাই * উহা ব্যবহার করিতেন। বৈদ্যের লিখিত সংস্কৃত গ্রন্থকারদিগের উপাধিগুলি দেখুন—মহামহোপাধ্যায় বিজয়রক্ষিত 'রক্ষিত' লিখিয়াছেন উহাতে 'গুপ্ত' যোগ করিয়া 'রক্ষিত গুপ্ত' লেখেন নাই। ঐরূপ নিদানকর্ত্তা মাধবকর 'করগুপ্ত' লেখেন নাই, শুদ্ধ 'কর' লিখিয়াছেন। কাতন্ত্রপরিশিষ্ট প্রণেতা মহামহোপাধ্যায় শ্রীপতি দত্ত 'দত্ত', 'দত্তগুপ্ত' নহেন; চক্রপাণি—'দত্ত', জুমর—'নন্দী', ভরতমল্লিক—'সেন'! কেহই বৈশ্যত্বসূচক 'গুপ্ত' উপাধি ব্যবহার করেন নাই। কুলজিতে দাশেরা সব 'দাশ', সেনেরা সব 'সেন—'এ যুগেও সি-আর-দাশ, এস্-আর-দাশ প্রভৃতি কেবল 'দাশ' পদবীই ব্যবহার করিতেন, তাঁহাদের পুরুষ-পরম্পরাক্রমে ঐরূপ 'গুপ্ত' শূন্য 'দাশ' উপাধিই প্রচলিত আছে। এই সকল অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে বিদ্যাবাগীশ মহাশয় কখনও ঐরূপ মিথ্যা কথার প্রচার করিয়া স্বজাতির শিরে ঘোল ঢালিবার সুব্যবস্থা করিতেন না!" (হিতৈষিণী' মাঘ, ৫ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা)।

---

* যথা বহুক্ষেত্রে দাশেরা প্রথমে 'দাস' লিখিলেন, পরে 'দাসগুপ্ত' হইলেন, শেষে 'দাস' বলিতে লজ্জা বোধ হওয়ায় 'গুপ্ত' হইলেন!

১৮) 'অম্বষ্ঠ' কি অম্বষ্ঠদেশবাসী বলিয়া ?—

বৈদ্যপ্রবোধনীতে অম্বষ্ঠ শব্দের তিনটি অর্থ স্বীকার করিয়া প্রথম অর্থটী 'অম্বষ্ঠদেশ ও তদ্দেশবাসী' বলা হইয়াছে, যথা—

সৌবীরাঃ সৈন্ধবাঃ হূণাঃ শাল্যাঃ শাকলবাসিনঃ।
মদ্রারামা **স্তথাম্বষ্ঠাঃ** পারসীকাদয়স্তথা॥
আসাং পিবন্তি সলিলং বসন্তি সরিতাং সদা।
সমীপতো মহাভাগ হৃষ্ট-পুষ্ট-জনাকুলাঃ॥

(বিষ্ণুপুরাণ, ৩ কাণ্ড, ২ অংশ)

অপিচ—

তান্ দশার্ণান্ স জিত্বা চ প্রতস্থে পাণ্ডুনন্দনঃ।
শিবীং স্ত্রিগর্ত্তান্ **অম্বষ্ঠান্** মালবান্ পঞ্চ কর্পটান্॥

(মহা, সভা, ৫১ অ, ১৫)

অতএব দ্রাবিড়ী ব্রাহ্মণ, কনৌজিয়া ব্রাহ্মণ, মৈথিল ব্রাহ্মণ ইত্যাদির ন্যায় অম্বষ্ঠ দেশবাসী বৈদ্য ব্রাহ্মণগণ আপনাদিগকে 'অম্বষ্ঠ-ব্রাহ্মণ' বলিয়া পরিচয় দিতে পারেন। সুতরাং 'অম্বষ্ঠ' সংজ্ঞাদ্বারা পরিচয় দিলেই তাঁহাদিগকে মনূক্ত ব্রাহ্মণবৈশ্যা-প্রভব অম্বষ্ঠ মনে করা নিতান্ত অন্যায় হইবে।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে প্রাচীন বৈদ্যেরা আপনাদিগকে 'বৈদ্য' বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, অম্বষ্ঠ বলিয়া পরিচয় দেন নাই। মহাত্মা শিবদাস সেন তাঁহার প্রণীত চরকটীকায় ৩০ অধ্যায়ে 'কৈশ্চায়-মধ্যেতব্যঃ' ইত্যাদি প্রবন্ধের ব্যাখ্যাস্থলে 'বস্তুতস্তু ব্রহ্মমুখোদ্ভবত্বেন বেদজাতত্বাৎ **বৈদ্যানাম্, অম্বষ্ঠ-দেশস্থায়িত্বাৎ অম্বষ্ঠ ইতি সংজ্ঞা**। যদাহ শঙ্খঃ—"বেদাজ্জাতো হি বৈদ্যঃ

স্যাৎ অম্বষ্ঠো ব্রহ্মবক্ত্রজঃ। অম্বষ্ঠদেশস্থায়িত্বাৎ অম্বষ্ঠসংজ্ঞকঃ স্মৃতঃ।”*
শিবদাস সেন প্রায় ৫০০ পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বের লোক। তিনি বৈদ্যকে ভূতপূর্ব্ব অম্বষ্ঠ-দেশবাসী বলিয়া ‘অম্বষ্ঠ’ বলিয়াছেন। কিন্তু ‘অম্বষ্ঠানাং চিকিৎসিতম্’ এই মনুবচনের সহিত পার্থক্য করিতে পারেন নাই। উহা স্মার্ত্ত প্রভাবের দোষে। কিন্তু মহর্ষি শঙ্খ ‘ব্রহ্মবক্ত্রজঃ’ শব্দের দ্বারা অম্বষ্ঠদেশবাসী অম্বষ্ঠ বৈদ্যের ব্রাহ্মণত্বই ঘোষণা করিয়াছেন। কালক্রমে পণ্ডিতগণ দুই অম্বষ্ঠে গোল করিয়া বাঙ্গালার বৈদ্যব্রাহ্মণজাতির কপাল পুড়াইয়াছেন। সূর্য্যবংশ ও চন্দ্রবংশের প্রবর্ত্তয়িতা মনুষ্যদ্বয়কে পণ্ডিতেরাই যখন আকাশের সূর্য্য ও চন্দ্রের সহিত অভিন্ন সাব্যস্ত করিতে পারেন, তখন অম্বষ্ঠদেশবাসী অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণকে অম্বষ্ঠজাতীয় মনে করা কিছুই বিচিত্র নহে! স্মার্ত্তদিগের মধ্যে এই ভুল একবার ঢুকিলে তাহা বিলুপ্ত করা দুষ্কর হইয়াছিল। বৈদ্য চাযু, দুর্জ্জয় ও কণ্ঠহার প্রণীত ৭০০, ৫০০ ও ৩০০ বৎসরের পুরাতন কুলপঞ্জীগুলিতে অম্বষ্ঠ শব্দ নাই, বৈদ্য শব্দ রহিয়াছে। তাহার কারণ, এই কুলজীগুলি অম্বষ্ঠ-জাতির কুলজী নহে, বৈদ্যবংশীয় ব্রাহ্মণদের কুলজী। ইহাদিগের মধ্যে ‘বৈদ্য’ ও ‘ভিষক্’ নামই সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইয়াছে।

পরবর্ত্তীকালে (ষোড়শ শতাব্দীতে) মুরারি গুপ্তের ‘চৈতন্যচরিত’ গ্রন্থে অম্বষ্ঠ শব্দ দেখিয়া কালীবাবু যাহা লিখিয়াছেন তাহা এই— “১৫০৩ খৃষ্টাব্দে তিনি সংস্কৃত ভাষায় চৈতন্যচরিত নামে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি নিজকে ও অন্যান্য বৈদ্যভক্তকে **অম্বষ্ঠ** বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।” (বৈদ্যপরিশিষ্ট, পৃঃ ছ)

পাঠক মহাত্মা শিবদাস সেনের ধৃত শঙ্খবচন অনুসারে সহজেই বুঝিতে

* কবিরাজ শ্রীদ্বারকানাথ কাব্যব্যাকরণতীর্থ কর্ত্তৃক লিখিত বৈদ্যপ্রতিবোধনী-সমালোচনা, হিতৈষিণী ১৩৩৫ ফাল্গুন সংখ্যা। কবিরাজ মহাশয় এই টীকা দিদৃক্ষুকে দেখাইতে পারেন।

পারিতেছেন যে 'কান্যকুব্জ' ও 'সপ্তশতী' হইতে পার্থক্য সূচনার্থই পণ্ডিত মুরারি গুপ্ত নিজেকে ও বৈদ্যগণকে 'অম্বষ্ঠ' বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন। তারপর বৈদ্যগণ কুল্লূক-রঘুনন্দনাদির মুখে তাঁহারা মনূক্ত 'অম্বষ্ঠ' ইহা শুনিয়া এবং তাঁহাদের ব্যাখ্যানুসারেই শাস্ত্রমর্ম্মে 'সুপণ্ডিত' হইয়া আপনাদিগকে অম্বষ্ঠ জাতি বলিয়া পরিচয় দিয়া ছলেন, এরূপ অনুমান করাও বোধ হয় অন্যায় হয় না! মুরারিগুপ্তের দেড়শত বৎসর পরে মহামহোপাধ্যায় ভরতমল্লিকও 'অম্বষ্ঠ' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, ইহা আমরা বলিয়াছি। স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণ আয়ুর্ব্বেদে পণ্ডিত ছিলেন না, আয়ুর্ব্বেদে যে 'অম্বষ্ঠ' শব্দই নাই, মুখ্য ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যে যে শ্রেষ্ঠ চিকিৎসায় অনধিকারী, এ সকল কথা স্মার্ত্ত পণ্ডিতেরা জানিতেন না, আবার বৈদ্যপণ্ডিতগণের মধ্যে যথার্থ স্মৃতিজ্ঞান কিছুমাত্র ছিল না বলিয়া এইরূপ গোলযোগ ঘটিত। স্মার্ত্তেরা মনে করিতেন 'অম্বষ্ঠানাং চিকিৎসিতম্' বৈদ্যকে লক্ষ্য করিয়া, 'পূয়ং চিকিৎসকস্যান্নম্' ও বৈদ্যকে লক্ষ্য করিয়া, কারণ "তে নিন্দিতৈ র্বর্ত্তয়েয়ুঃ" অর্থাৎ চিকিৎসাকে শাস্ত্রেই নিন্দিত দ্বিজকর্ম্ম বলা হইয়াছে। বৈদ্যগণও মনে করিতেন, তা হবে, পণ্ডিত মহাশয়েরা কি মিথ্যা বলিবার লোক! এইরূপে স্মার্ত্ত ও বৈদ্যগণের মধ্যে—'বৈদ্যগণ জাতিতে অম্বষ্ঠ' এই বিশ্বাস ধীরে ধীরে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। তথাপি সাধারণ বৈদ্যগণ উহা গ্রহণ করেন নাই। বঙ্গের জনসাধারণ উহাতে আস্থা স্থাপন করে নাই। কুলজী গ্রন্থ সম্পর্কে আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে চায়ু, দুর্জ্জয় ও কণ্ঠহারে অম্বষ্ঠ শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই, তাহার কোনরূপ উৎপত্তি-কাহিনীও বিবৃত হয় নাই। আমরা ইহাও বলিয়াছি যে চতুর্ভুজের অম্বষ্ঠোৎপত্তি-কাহিনী জাল, কারণ উহা প্রকৃত হইলে, ভরতের উহা জানা থাকিত এবং চন্দ্রপ্রভায় তিনি অন্যরূপ কথার অবতারণা করিতেন না। মহামহোপাধ্যায় ভরতমল্লিক কুল্লূকাদি বিদ্বিষ্ট টীকাকারদের অভিমতের

অনুসরণ করেন নাই, করিলে বৈদ্যকে **জন্মতঃ বৈশ্য** বলিয়া স্বীকার করিতেন, বৈদ্য সত্যযুগে ব্রাহ্মণ এবং ত্রেতাতেও ব্রাহ্মণ ছিল, পরে ক্রমে অধঃপতিত হইয়া বৈশ্য হইয়াছে এরূপ লিখিতেন না, শাস্ত্রানুসারে বৈদ্য সর্ব্ববর্ণের পূজনীয়, বর্ণোত্তম অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, এমন কথাও বলিতেন না।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন শর্ম্মা সরস্বতী, বৈদ্যাবতংস, এম্‌-এ, বৈদ্যব্রাহ্মণ-সমিতির বর্ত্তমান সভাপতি * মহাশয় বলেন যে, চন্দ্রপ্রভার যে অংশে রঘুনন্দন ও বাচস্পতি কর্ত্তৃক আরোপিত শূদ্রত্ব আলোচিত হইয়াছে, তাহা জাল। যিনি প্রথম অধ্যায়ে বৈদ্যকে 'বর্ণোত্তম' ও 'সর্ব্ববর্ণের পূজনীয়' বলিয়াছেন, তিনি কখনই পরবর্ত্তী অধ্যায়ে রঘুনন্দন ও বাচস্পতির কথিত শূদ্রত্বকে আলোচনার যোগ্য বিবেচনা করিতে পারেন না। বিশেষতঃ 'সেনো দাসশ্চ' ইত্যাদি অংশ অনর্থক দুইবার করিয়া সন্নিবেশিত হইয়াছে। মহাপণ্ডিত ভরতমল্লিক মূঢ়ের মত একই কথা দুইবার বলিয়া চলিলেন, ইহা নিতান্ত বিমূঢ়মতি ব্যক্তি ভিন্ন অপর কেহ বলিবে না। মহামহোপাধ্যায় বলেন, শব্দকল্পদ্রুমের প্রথম সংস্করণে ভরতমল্লিকের নাম নাই, দ্বিতীয় সংস্করণে আছে। এতদ্দৃষ্টে অনুমান হয়, যে শব্দকল্পদ্রুমের প্রথম সংস্করণে বৈদ্যবিদ্বেষী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ বৈদ্যসম্বন্ধে যে সকল মনগড়া কথা বিষ্ণু, হারীত, শঙ্খ, পরাশর* প্রভৃতি ঋষিদের নামে চালাইয়া গিয়াছিলেন, সেইগুলি চন্দ্রপ্রভার সম্পাদন-

* গ্রন্থের প্রারম্ভকালে শ্রীযুক্ত বৈদ্যরত্ন যোগীন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, এম্‌ এ, মহাশয় সভাপতি ছিলেন। গ্রন্থের অবসানকালে মহামহোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

*এই সকল অসম্ভব কথা অদ্বিতীয় শাব্দিক মহাপণ্ডিত ভরতমল্লিক কখনও বলিতে পারেন না।

কার্য্যের ভারপ্রাপ্ত যাজনব্রাহ্মণ চন্দ্রপ্রভায় অন্তর্নিবিষ্ট করিলে, শব্দ-কল্পদ্রুমের দ্বিতীয় সংস্করণে ঐ সমস্ত জঘন্য রচনা ভরতমল্লিকের নামে পুনঃ সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল !

বস্তুতঃ প্রথম অধ্যায়ে ভরতমল্লিক একবার মাত্র অম্বষ্ঠ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, এবং বোধ হয় একশত বার বৈদ্য ও ভিষক্ শব্দ ব্যবহার করিয়া বৈদ্যকে **সর্ব্ববর্ণের পূজনীয় ও বর্ণোত্তম** বলিয়াছেন। এতদবস্থায় এই 'অম্বষ্ঠ' শব্দ মহর্ষি শব্দের প্রদর্শিত পথে (বা রোগীর নিকটে পিতৃবৎ অবস্থান করেন বলিয়া- অম্বষ্ঠ, এইভাবে) বলা হইয়াছে মনে করা উচিত, এবং ব্রাহ্মণের যে উৎপত্তি বৈদ্যেরও সেই উৎপত্তি হওয়ায়, 'বৈদ্যোৎপত্তি' নামক অধ্যায় সন্নিবেশের কোনই প্রয়োজন অনুমান করা যায় না। অঙ্গদেশে বৈদ্যোৎপত্তির ইতিহাস না থাকিলে বঙ্গেই বা কিরূপে থাকে ? এজন্য 'বৈদ্যোৎপত্তি-কথনম্' এই শিরোনামে ব্রাহ্মণের বৈশ্যকন্যা বিবাহ, তদ্‌গর্ভে অম্বষ্ঠের উৎপত্তি, সত্যে তাহার পিতৃতুল্যতা বা ব্রাহ্মণত্ব, ত্রেতাতেও ব্রাহ্মণত্ব, দ্বাপরে বৈশ্যত্ব, কলিতেও বৈশ্যত্ব, ইহা জাল বচনাবলীর সাহায্যে লোককে বুঝাইবার চেষ্টা এবং ঐ জল বচনসিদ্ধ বৈশ্যত্বকেও খণ্ডিত করিয়া রঘুনন্দন ও বাচস্পতি মিশ্রের বলাৎকৃত শূদ্রত্ব অবনত স্কন্ধে স্বীকার এবং একই জিনিষের অনর্থক দ্বিরুক্তি—এ সকল দেখিয়া এই সমগ্র অধ্যায়টী লিপিকৌশলহীন চন্দ্রপ্রভা-সম্পাদকেরই কৌশল বলিয়া মনে হয়। মহামহোপাধ্যায় ভরতমল্লিক যে প্রতিগ্রহ করিতেন, ইহা তাঁহার বংশে সুবিদিত। যাঁহারা এখনও বৈদ্য ব্রাহ্মণ-সমিতিতে যোগদান করেন নাই, এমন লোকেও এই প্রতিগ্রহের কথা সত্য বলিয়া জানেন। অব্রাহ্মণ বলিয়া জ্ঞান থাকিলে, মহামহোপাধ্যায় প্রতিগ্রাহী হইয়া দাতার ও নিজের অনন্ত নরক বাসের উপায় সৃষ্টি করিতেন না।

(১৯) **'দৈবকীনন্দনো দাশঃ'**—এতৎসম্বন্ধে কালীবাবু পরিশিষ্টে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার উত্তর এই পুস্তকে ১।৶০ পৃষ্ঠার মূলে ও ফুটনোটে দেওয়া হইয়াছে। কালীবাবু চন্দ্রপ্রভা খুলিয়া দেখিবেন, মৌদ্‌গল্য গোত্রের সকলেই 'দাশ' এবং কোন উড়িয়া বামুনকে 'দাশ' শব্দের বাণানটা জিজ্ঞাসা করিয়া লইবেন। 'প্রতিগ্রহ নাহি করে', 'কৃষ্ণদাস দ্বিজবর' প্রভৃতি সম্বন্ধে **'মহামোহবজ্রের'** পৃথক্ সংস্করণে আলোচিত হইবে।

(২০) **'অম্বষ্ঠঃ ব্রহ্মপুত্রকঃ** ও **'অম্বষ্ঠ কোন্ বর্ণ** (?)'—কালীবাবু 'বৈদ্য' পুস্তকের প্রারম্ভেই বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ বৈদ্য পণ্ডিতমণ্ডলীর নাম লইয়া যে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছেন, তাহা আমরা মোহমুদ্গরের ৮৩—৮৬ পৃষ্ঠায় ও অন্যত্র ধরাইয়া দিয়াছি। ঐ প্রসঙ্গে মহামহোপাধ্যায় ভরতমল্লিকের নাম লইয়া তিনি অম্লানবদনে বলিয়াছেন, বৈদ্যগণ 'ব্রাহ্মণের **স্বজাতি**' হইলে ভরতমল্লিকের ন্যায় প্রগাঢ় পণ্ডিত ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দে স্বরচিত ভট্টিকাব্যের টীকার প্রারম্ভে **অম্বষ্ঠ** বলিয়া পরিচয় দিতেন না! ইহার অর্থ কি? এ স্থলে 'ব্রাহ্মণ' ও 'স্বজাতি' শব্দ কি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে? 'রাঢ়ীয়' বা 'বারেন্দ্র' প্রভৃতি শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরাই 'ব্রাহ্মণ' এবং ঐ সকল শ্রেণীর না হইলেই অব্রাহ্মণ, এমন কথা মুখে আনেন কেন? বৈদ্য যে জন্মতঃ ব্রাহ্মণ তাহা অম্বষ্ঠমানী ভরতও চন্দ্রপ্রভায় মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন। উকিল বাবু বঙ্গের রাঢ়ী-বারেন্দ্রাদি শ্রেণীকেই 'ব্রাহ্মণ' নামটী দিয়া, বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণের 'স্বজাতি' নহে; অতএব ব্রাহ্মণের 'বিজাতি', অতএব অব্রাহ্মণ, এইরূপ ধোঁকার সৃষ্টি করিয়াছেন! ইহার কারণ বৈদ্যগণের 'অম্বষ্ঠ' নাম! আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, (বৈদ্যগণ অম্বষ্ঠ হইলেও) 'অম্বষ্ঠ' নাম আছে বলিয়াই অর্থাৎ সবর্ণাজ্জাত ব্রাহ্মণ-শ্রেণীর সজাতি নহে বলিয়াই যদি ব্রাহ্মণবর্ণ হইতে বাধা থাকে, তাহা হইলে বৈশ্যের

স্বজাতি নহে বলিয়া বৈশ্যবর্ণীয়ও হইবে না! তবে অম্বষ্ঠগণ এবং কেবল অম্বষ্ঠ কেন, হিন্দুসমাজের সমস্ত জাতিগুলিই এক একটী জাতি-নাম আছে বলিয়া কোন ও বর্ণ মধ্যে স্থান পাইবে না। তবে ত শাস্ত্র তাহাদের পক্ষে অর্থহীন এবং ধর্ম্মাচরণ অসম্ভব! উকিল বাবু অন্যত্র বলিয়াছেন, "তিনি (ভরত) চন্দ্রপ্রভা নামক কুলপঞ্জিকায় বৈদ্যগণকে **পুনঃ পুনঃ** অম্বষ্ঠসংজ্ঞায় আখ্যাত করিয়াছেন"। এই 'পুনঃ পুনঃ' শব্দের দ্বারাও ধোকার সৃষ্টি করা হইয়াছে! এ বিষয়ে ৫০—৫১ পৃষ্ঠায় বিশেষ ভাবে বলা হইয়াছে। ভরত শত শত বার, (শত শত কেন, বোধ হয় সহস্র বার) বৈদ্য ও ভিষক্ শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু 'অম্বষ্ঠ' শব্দ মাত্র দ্বাদশ বার প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাও প্রায় সবগুলিই অম্বষ্ঠের উৎপত্তি প্রসঙ্গে! সুতরাং উকিল বাবুর কথা উকিল বাবুর মতই হইয়াছে!

ভরতমল্লিকের 'বেদাজ্জাতো হি বৈদ্যঃ স্যাৎ' এই অংশমাত্র প্রবোধনীতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে বলিয়া কালীবাবু প্রবোধনীকারকে কিরূপ তিরস্কার করিয়াছেন, দেখুন—

"বৈদ্যপ্রবোধিনী (?)-কার 'বেদাৎ জাতঃ হি বৈদ্যঃ স্যাৎ'—এই পর্য্যন্ত উদ্ধৃত করিয়া আসিয়াছেন বাকি অংশ উদ্ধৃত করিতে কেন বিরত হইয়াছেন, তাহা সুধীগণ বিবেচনা করিবেন। বৈদ্য-অম্বষ্ঠ যে এক জাতি নহে তাহা প্রতিপন্ন করিতে গিয়া 'অম্বষ্ঠা ব্রহ্মপুত্রকঃ' অংশ বাদ দিয়াছেন।" কালীবাবুর অভিপ্রায় এই যে অবশিষ্ট অংশে 'অম্বষ্ঠ' শব্দ আছে এবং তাহা হইতে ঋষি শব্দের মতেও 'বৈদ্য' এবং 'অম্বষ্ঠ' যে একার্থক বা এক বস্তুর বাচক, ইহা স্পষ্ট জানা যায়, কিন্তু প্রবোধনীকার তাহা গোপন করিয়া জুয়াচুরি করিয়াছেন! জগৎসংসারকে লোকে আপনার মতোই দেখে বটে!

আপাতদৃষ্টিতে স্থূলদর্শী লোকের মনে কালীবাবুর কথাই অকাট্য

সত্য বলিয়া মনে হইবে, স্থূলদৃষ্টি সত্যেন্দ্রবাবুও তাহাই ভাবিয়াছেন, বন্ধু যাজন-ব্রাহ্মণগণ এবং কালীবাবুর পরপ্রত্যয়নেয়-বুদ্ধি আত্মীয়গণও ঐরূপ ভাবিয়াছেন। বস্তুতঃ সংক্ষিপ্তকায় প্রবোধনীতে ঐ অংশ দেওয়া হয় নাই, পাঠকবর্গকে ঐ ধোকার হাত হইতে বাঁচাইবার জন্যই! এক্ষণে কালীবাবু যখন ধর্ম্মভূষণ হইয়াও সেই কথা তুলিয়া ধর্ম্মদূষণে অগ্রসর হইয়াছেন, তখন আমাদিগকে সকল কথাই বিশদভাবে আলোচনা করিতে হইতেছে।

* সকলেই জানেন, 'অম্বষ্ঠ' বলিলেই ব্রাহ্মণবৈশ্যা-প্রভব অম্বষ্ঠ-জাতিকে বুঝাইবে এমন কোন কথা নাই। প্রবোধনীতে একথা বলা হইয়াছে। ধন্বন্তরির 'অম্বষ্ঠ' উপাধির অর্থ কি তাহাও এই পুস্তকে ২৮৩ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে। অম্বষ্ঠ বলিলে অম্বষ্ঠ-দেশবাসীকেও বুঝায়। 'বেদাজ্জাতো হি বৈদ্যঃ স্যাৎ অম্বষ্ঠঃ ব্রহ্মপুত্রকঃ' এখানেও 'অম্বষ্ঠ' শব্দের অর্থ 'অম্বষ্ঠ-দেশবাসী' এবং 'ব্রহ্মপুত্রক' অর্থে 'ব্রাহ্মণ, 'বৈশ্যার গর্ভে ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক উৎপাদিত পুত্র' নহে। হয় ত এই কথা বলিতেছি বলিয়া কালীবাবু হাসিতেছেন এবং সত্যেন্দ্রবাবু কাসিতেছেন এবং আমার বইখানি হয়ত ছুড়িয়াই ফেলেন! কিন্তু শঙ্খের সম্পূর্ণ বচনটী এই—

"বেদাৎ জাতঃ হি বৈদ্যঃ স্যাৎ অম্বষ্ঠঃ ব্রহ্মবক্ত্রজঃ।
অম্বষ্ঠদেশস্থায়িত্বাৎ অম্বষ্ঠসংজ্ঞকঃ স্মৃতঃ॥"—শঙ্খঃ

---

* "অম্বষ্ঠ-দেশবাসী ব্রাহ্মণগণ পূর্ব্বে মৈথিল ব্রাহ্মণাদির ন্যায় সসম্মানে 'অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ' নামে অভিহিত হইতেন। তাঁহারাই পরে সরস্বতী নদী তীরে বাস করিয়া 'সারস্বত' এবং সিন্ধুতীরে বাসের জন্য 'সৈন্ধব' নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে দাশ, দত্ত, চন্দ্র প্রভৃতি (বঙ্গীয় বৈদ্যদিগের) উপাধি এবং বৈদ্য নামক শ্রেণী-বিভাগ এখনও বর্ত্তমান আছে।"—প্রবোধনী, পৃঃ ২৬। এত কথা বলা সত্ত্বেও একস্থান একটু সংক্ষেপ করা হইয়াছে বলিয়াই কালীবাবু ভ্রমে পড়িয়াছেন!

('বেদাৎ জাতঃ'=আয়ুর্ব্বেদে তৃতীয় বার জাত অর্থাৎ ত্রিজ। 'ব্রহ্মবক্ত্রজঃ'=ব্রহ্মার মুখ হইতে জাত অর্থাৎ মুখ্য ব্রাহ্মণ।)

শ্লোকের অর্থ—[আয়ুর্ব্বেদে যাহাদের তৃতীয় জন্ম হয় তাহারাই বিদ্যাসমাপ্তিতে 'বৈদ্য' নামে বিদিত হয় (অন্যে এ নাম প্রাপ্ত হয় না)। কেবল মাত্র ব্রহ্মমুখজাত অম্বষ্ঠনামা মুখ্য ব্রাহ্মণগণ, যাহাদিগের এই 'অম্বষ্ঠ' নাম অম্বষ্ঠ-দেশে বাস হেতু, (ব্রাহ্মণ-বৈশ্যাপ্রভব 'অম্বষ্ঠ'-জাতি বলিয়া নহে), তাহারাই আয়ুর্ব্বেদ-বিদ্যকুলজ সনাতন বৈদ্যবংশীয় ব্রাহ্মণবলিয়া আয়ুর্ব্বেদে তৃতীয় জন্ম লাভে অধিকারী।

মোহবজ্র বৃথাই বজ্র নাম ধারণ করে না! নিখিল বঙ্গবাসী নিখিল জগৎবাসী দেখুন, বঙ্গের প্রাচীন বৈদ্যবংশকে কেন প্রাচীনেরা বৈদ্যই বলিয়াছেন 'অম্বষ্ঠজাতি' বলেন নাই। তাঁহাদের 'অম্বষ্ঠ' নাম জন্মভূমির পরিচায়ক মাত্র ছিল। জাতি-পরিচয়ে উহা ব্যবহার্য্য নহে। মৈথিল, কান্য-কুব্জীয়, গৌড় বা উৎকল ব্রাহ্মণগণ আপনাদের জাতি-পরিচয়ে 'ব্রাহ্মণ' শব্দই ব্যবহার করেন, মৈথিল, কান্যকুব্জ, গৌড়, উৎকল প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করেন না। কিন্তু মৈথিলাদি ব্রাহ্মণের ন্যায় অম্বষ্ঠদেশীয় ব্রাহ্মণের অম্বষ্ঠ শব্দটী সমাজে শ্রুতিগোচব হওয়াতেই ঐ হতভাগ্য-দিগের কপাল পুড়িয়াছিল। এ দেশীয় স্মার্ত্তেরা তাহাদিগের

---

* আমরা পূর্ব্বে 'ব্রহ্মা মূর্দ্ধাভিষিক্তশ্চ বৈদ্যঃ ক্ষত্রবিশাবপি। অমী পঞ্চ দ্বিজাঃ এষাং যথাপূর্ব্বঞ্চ গৌরবম্॥'' এই শ্লোকের আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু ইহাতে মন্বাদি-কথিত অম্বষ্ঠজাতির সামাজিক প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে সমাজের সিদ্ধান্ত দেখিতে পাই। শ্লোকোক্ত জাতিগুলি সকলেই সদাচারী দ্বিজ। তাহাদের মধ্যে অম্বষ্ঠের স্থান ক্ষত্রিয়ের উপরে। বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়েরও উপরে যাহার স্থান সে যে ব্রাহ্মণ, ইহাতে কালীবাবু ও সত্যেন্দ্রবাবুর সন্দেহ হইতে পারে, আর কাহারও হইবে না। কিন্তু এই ব্রাহ্মণ অম্বষ্ঠ তৃতীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ এবং নিন্দিত চিকিৎসায় রত। শঙ্খোক্ত শ্লোকে অম্বষ্ঠ-দেশবাসী বলিয়া যাহাদিগকে অম্বষ্ঠ বলা হইয়াছে তাহারা শ্লোকোক্ত 'ব্রহ্মা'র মধ্যে প্রথম শ্রেণীতেই আসীন আছেন (কারণ তাঁহারা 'ব্রহ্মবক্ত্রজ')।

চিকিৎসা-বৃত্তি দেখিয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে অম্বষ্ঠ নাম শুনিয়া তাহাদিগকে মনুকথিত অম্বষ্ঠজাতি বলিয়া ভ্রম করিয়াছিলেন, এবং ক্রমে অব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণোচিত ধর্ম্ম-কর্ম্ম ও সামাজিক সম্মান এবং তাঁহাদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা যতই অসহ্য বোধ হইয়াছিল, স্মার্ত্ত অত্যাচার ততই প্রবল হইয়াছিল [এ সকল কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে]।

আমরা যে শঙ্খ-বচন তুলিয়াছি, তাহা **মহাত্মা শিবদাস সেন প্রণীত প্রাচীন চরক-টীকা হইতে।** বহু বৎসর পূর্ব্বে কায়স্থ ও যাজনব্রাহ্মণগণ একযোগে ঐ টীকাটী মুদ্রিত করিয়াছিলেন, সুতরাং উহাতে বৈদ্যব্রাহ্মণদের কোন সংস্রব না থাকায় কালীবাবুর ও সত্যেন্দ্রবাবুর পক্ষীয় সকলেরই বিশ্বাস-যোগ্য। কালীবাবু উহা সংগ্রহ করিতে না পারিলে, আমরা প্রকাশ্য সভায় উহা সকলকে দেখাইতে প্রস্তুত আছি।

ঐ শ্লোকটী মহামহোপাধ্যায় ভরতমল্লিকেরও সম্পূর্ণ জানা ছিল কি না আমরা বলিতে পারি না। তিনি এক পঙক্তি মাত্র তুলিয়াছেন এবং স্মার্ত্তদের আরোপিত কথার প্রতিবাদ করিতে না পারিয়া যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেই স্বজাতিকে তৃতীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন এবং সেই জন্য "সত্যে বৈদ্যাঃ **পিতুঃ** তুল্যাঃ ত্রেতায়াঞ্চ চ তথৈব চ" বলিয়া মনকে সান্ত্বনা দিয়াছেন! প্রথম অধ্যায়ে বর্ণোত্তম' ও 'সকলের মাননীয়' বলিয়া এবং 'বৈদ্যোৎপত্তি' নামক পরবর্ত্তী অধ্যায়েও 'পিতৃবত্ত্বাৎ দ্বিজত্বম্' কহিয়া, (সামাজিক বিপ্লব বশতঃ নিজেদের প্রত্যক্ষ হীনাচারকে একেবারে উড়াইয়া দিতে না পারিয়া) "সত্যে পিতুস্তুল্যাঃ" ইত্যাদি কথায় রঘুনন্দনাদির পাতিত্যসূচক বাক্যের সম্মুখে মস্তক অবনত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন (পৃঃ ৬১—৬৩ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু তাঁহার নিজোক্তি 'কলৌ বৈশ্যোপমাঃ' পর্য্যন্তই কারণ বৈদ্যদিগের বৈশ্যোচিত ব্যবহার তিনি প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন এবং শূদ্রোচিত ব্যবহারে তথাকথিত শাস্ত্রেরও অনুমোদন পান নাই।

শিবদাস বলিতেছেন, বৈদ্য 'ব্রহ্মবক্তুজ' মুখ্য ব্রাহ্মণ এবং অম্বষ্ঠদেশে বাস করিত বলিয়াই তাহার নামে অম্বষ্ঠ বিশেষণও শুনা যায়। মনূক্ত 'অম্বষ্ঠানাম্ চিকিৎসিতম্' তাঁহার জানা ছিল। তিনি মাত্র তাহা দেখিয়াই উভয় অম্বষ্ঠকে অপৃথক্ ভাবিয়াছিলেন।* কিন্তু ইহা তাঁহার ভ্রম। ফলতঃ ভ্রম হউক, আর নাই হউক, বৈদ্য যে ব্রাহ্মণবর্ণীয়, তাহাতে তাঁহার সন্দেহ নাই। শূদ্রকে পঞ্চম বর্ণ বলিয়া বৈদ্যকেও 'বর্ণ' নাম দিয়াছেন; তাহাতে বুঝা যায় 'বর্ণ'শব্দ জাতি অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। কারণ পঞ্চম বর্ণ নাই। ইহা মধ্যযুগের কবিরাজ মহাশয়-দিগের স্মৃতিশাস্ত্রে অদ্ভুত অজ্ঞতার নিদর্শন! মহাপণ্ডিত ভরতের চন্দ্র-প্রভাস্থ বচনগুলি পরীক্ষা করিলেও ইহা বুঝা যাইবে।

এক্ষণে আমরা ব্রহ্মপুরাণের বলিয়া বিদিত—

"বেদেভ্যশ্চ সমুৎপন্ন স্ততো বৈদ্য ইতি স্মৃতঃ।
তিষ্ঠত্যম্বাকুলে জাতঃ তস্মাৎ অম্বষ্ঠ উচ্যতে॥" (বৈদ্য, পৃঃ ৯)

এই শ্লোকটীর একটা অর্থ বুঝিতে পারি। প্রথম পংক্তির অর্থ অবিকল শঙ্খ-বচনের ন্যায়। 'বেদাৎ জাতঃ হি বৈদ্যঃ স্যাৎ'—যে বিশেষ বিশেষ বংশে পুত্রদের আয়ুর্ব্বেদে তৃতীয় জন্ম হয়, তাহারাই বেদ-বিদ্যার আধিক্য বশতঃ 'বৈদ্য' নামে বিদিত। দ্বিতীয় পঙক্তিতে 'অম্বাকূলে' * হইলে বেশ অর্থ হয়। অম্বানদী-তীরে যে জনপদ তাহার নাম অম্বষ্ঠ, অম্বাতীরবাসী জনগণও অম্বষ্ঠ। 'অম্ব' শব্দের অর্থ জল বৈদিক 'অম্বি'

* হয় ত ইহারা প্রথম শ্রেণীর অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ দ্বারা বৈশ্যকন্যাতে উৎপাদিত বলিয়া পিতৃবৃত্তিতে ও নামে অধিকারী হইয়াছিল, যদিও তাহাদের পক্ষে ঐ বৃত্তি নিম্নমুখী।

* 'অম্বাকুলে' প্রথমতঃ 'অম্বাকূলে' হইয়া পরে 'অম্বাকোলে'র ভিতর দিয়া 'অম্বাক্রোড়ে' হইয়া সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণদের মুখে বিরাজ করিত! তাহার পরে গালব-উপাখ্যানের সৃষ্টি হয়!

শব্দের অর্থও জল। 'অম্ব' অর্থ জল, ইহাও ৩৪০ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে। অম্ব শব্দের উত্তর অর্শ-আদিত্বাৎ অচ্ ও স্ত্রিয়াম্ টাপ্ করিলে 'অম্বা' শব্দে নদী অর্থ হয় (যথা, অম্বুমতী) : অথবা কাশী, বিশালা, অযোধ্যা, উজ্জয়িনী, কৌশাম্বী ইত্যাদির ন্যায় 'অম্বা' যদি কোন নগরীর নাম হয়, তাহা হইলে ('কুলং জনপদে গৃহে') কুলশব্দের জনপদ অর্থ গ্রহণ করিয়া 'অম্বাকুলে' না বলা যায় এমন নয়। অথবা অম্ব' বা অম্বষ্ঠনামক জনপদে যাহারা থাকে তাহারাই অম্বষ্ঠ। এই জন্য অম্বষ্ঠনামক ক্ষত্রিয়গণ কুরু-পাণ্ডব সমরে যুদ্ধ করিতেছেন দেখিতে পাই। Alexanderএর সময়েও সেই অম্বষ্ঠদেশের সত্তা দেখা গিয়াছে। অম্বষ্ঠদেশবাসী বলিয়া তত্রত্য বৈশ্যব্রাহ্মণদিগকেও অম্বষ্ঠ বলা হয়। শত সহস্র বৎসর অতীত হইল এবং গ্রীক্, শক, হূন, ও মুসলমান আক্রমণে তক্ষশিলা-গান্ধার প্রভৃতি হিন্দুরাজ্যের ন্যায় অম্বষ্ঠ দেশ ধরিত্রীর পৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইলে, কালে 'অম্বষ্ঠ' শব্দের একটীমাত্র অর্থ শব্দার্থবিৎ পণ্ডিতগণ অবগত ছিলেন। এই জন্য মহাপণ্ডিত ভরতমল্লিকও নিজজাতিকে ব্রাহ্মণ-বৈশ্যাপ্রভব অম্বষ্ঠজাতি মনে করিয়া ভুল করিয়াছিলেন। কালীবাবু ও সত্যেন্দ্রবাবুর কথা আর কি বলিব ?

অতঃপর মহামহোপাধ্যায় ৺দ্বারকানাথ কবিরত্ন মহাশয়কে লইয়া কালীবাবু কিরূপ মিথ্যার জাল রচনা করিয়াছেন তাহা দেখাইব। কবিরত্ন মহাশয় ৩৫ বৎসর পূর্ব্বে 'অম্বষ্ঠ কোন্ বর্ণ' নামে একখানি পুস্তক রচনা করেন, তাহাতে তিনি—

(১) বৈদ্যকে ব্রাহ্মণবর্ণ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

(২) বৈশ্যত্ববাচক গুপ্ত উপাধি ব্যবহার করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

(৩) শর্ম্মান্ত নামে ক্রিয়া-কর্ম্ম করিতে পরামর্শ দিয়াছেন।

এই পুস্তকখানি কালীবাবুর দেখা থাকিলে তিনি কবিরত্ন মহাশয় সম্বন্ধে অসংখ্য অলীক কথা বলিতে কিছুতেই সাহসী হইতেন না।

কালীবাবুর প্রথম কথা এই—"১২৮৪ সনে কলিকাতা ভবানীপুরে যে অম্বষ্ঠসাম্মিলনী সভা স্থাপিত হয়, ঐ সভা হইতে প্রকাশিত অম্বষ্ঠদীপিকা গ্রন্থে বৈদ্যগণ অম্বষ্ঠ এবং তাঁহাদের অশৌচ পঞ্চদশ দিন ব্যাপী, ইহা স্পষ্ট লিখিত আছে।" (বৈদ্য, ২য় সং ; ১৪—১৫)।

ইহা উকিলের সাজান কথা। অম্বষ্ঠসম্মিলনী সভা ব্রাহ্মণত্ববিশ্বাসী বৈদ্যগণ কর্ত্তৃকই ৫৩ বৎসর পূর্ব্বে স্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু তখন কাল অনুকুল না হওয়ায় দশাহ অশৌচ প্রভৃতি ব্রাহ্মণাচারে প্রচলনের কথা হয় নাই। বিভিন্ন সমাজের হীনাচার বা আচারপার্থক্য দূর করিয়া নিখিল বৈদ্যসমাজকে একাচারবিশিষ্ট করিতে পারিলেই অনেক লাভ হইবে মনে করিয়া তদানীন্তন স্বজাতিবৎসল বৈদ্যপণ্ডিতগণ পঞ্চদশ দিন অশৌচের অনুসরণই সমীচীন মনে করিয়াছিলেন এবং সেন, কর, দত্ত প্রভৃতি উপাধিধারী অন্যজাতীয় লোক হইতে স্বজাতির পার্থক্য সূচনার্থই পঞ্চদশাহাশৌচের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া বৈশ্যত্ববাচক গুপ্ত উপাধি চালাইবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাই বলিয়া—তাঁহারা যে অম্বষ্ঠকে **জন্মতঃ** বৈশ্যবর্ণ মনে করিয়াছিলেন, তাহা নহে। অম্বষ্ঠসম্মিলনী বা তদীয় কোন সভ্য অম্বষ্ঠকে বৈশ্য বলিয়া স্বীকার করে নাই, অম্বষ্ঠদীপিকাও অম্বষ্ঠকে বৈশ্য বলে নাই। সকলেই স্বীকার করিতেন যে, বিপ্লব বশতঃই বৈশ্যাচার ও অন্যান্য কদাচার বৈদ্য সমাজে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। আমাদের দুঃখ হয় যে কালীবাবু স্বজাতির সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া পদে পদে ব্যবহারজীবি-সুলভ অসত্যপ্রিয়তা ও চতুরতার আশ্রয় গ্রহণ করেন। কালীবাবু কি অম্বষ্ঠ-

দীপিকা গ্রন্থ দেখিয়াছেন? তাহা হইতে একটী বাক্য উঠাইয়া আমাদিগকে দেখাইলেন না কেন যে অম্বষ্ঠদীপিকার মতে অম্বষ্ঠগণ বৈশ্যবর্ণীয়? তাহা ত সম্ভব নয়, সেই জন্য কেবল ধোঁকার সৃষ্টি! ধোঁকা দিয়াই মোকদ্দমা জিতিব, ইহাই কালীবাবুর রীতি! সেই উদ্দেশ্যে অম্বষ্ঠ-বৈশ্যগণ কর্ত্তৃকই 'অম্বষ্ঠসম্মিলনী' সভা স্থাপিত করা হইল এবং তাঁহাদের দ্বারা বলাইলেন, **"আমরা বৈশ্য—১৫ দিন অশৌচই আমাদের সদাচার"**! এক্ষণে আবার কি চাতুরী করিয়া উহাতে মহামহোপাধ্যায় কবিরত্ন মহাশয়কে আনিয়া ঢুকাইতেছেন, দেখুন—

"ঐ সভার সভ্যগণ মধ্যে অনেক গণ্য-মান্য শাস্ত্রজ্ঞ অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন পণ্ডিত ছিলেন।" (পৃঃ ১৫) অতঃপর নাম ধরিয়া বলিতেছেন, মহামহোপাধ্যায় ৺দ্বারকানাথ কবিরত্ন মহাশয় এবং মদীয় পিতৃতুল্য পূজনীয় কবিরাজ পঞ্চানন রায় মহাশয় ও গৌরীনাথ সেন মহাশয় ঐ সম্মিলনীতে ছিলেন। ইঁহারা সকলেই বৈদ্যকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানিতেন এবং ব্রাহ্মণ্যের আলোচনা দ্বারা সমাজে ব্রাহ্মণ্যবুদ্ধির জাগরণের জন্যই সকলের চেষ্টা ছিল। তবে কালিবাবু উল্টা কথা বলেন কেন?

মহামহোপাধ্যায় প্রণীত 'অম্বষ্ঠ কোন্ বর্ণ' পুস্তকখানি কালীবাবুর দেখিবার সৌভাগ্য হয় নাই, এ কথা তিনি বৈদ্য-পরিশিষ্টে ১৮ পৃষ্ঠায় ফুটনোটে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তথাপি বিনা প্রমাণে মোকদ্দমা চালাইয়া চালাইয়া হাত এমনই পাকিয়া গিয়াছে যে, এ ক্ষেত্রে কণ্ডূয়ন সংবরণ করা দুষ্কর হইল! কালীবাবু বলিতেছেন - "অম্বষ্ঠসম্মিলনীর প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল যে বৈদ্যগণ অম্বষ্ঠবর্ণ (বৈশ্যবর্ণান্তর্গত) ও তাহাদের অশৌচ ১৫ দিন এবং জাত্যুক্ত উপাধি গুপ্ত" (বৈদ্য-পরিশিষ্ট, পৃঃ ১০৮)

ইহা নিতান্ত জঘন্য কথা। অনন্তর শ্লেষ করিয়া ওকালতি চালে বলিতেছেন।—

"(মহামহোপাধ্যায়) যদি (বৈদ্যকে) ব্রাহ্মণবর্ণ বলিয়া **বিশ্বাস** করিতেন ও পুস্তিকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহা হইলে এইরূপ সভায় বিনা বাক্যব্যয়ে কিরূপে যোগ দিয়াছিলেন এবং আজীবন ১৫ দিন অশৌচ কেন পালন করিতেন?" (পৃঃ ১০৮)

পুনশ্চ—' এই বিশ্বাসের মূল্য কত তাহা পাঠকগণ বিচার করিবেন। তিনি নাকি নামান্তে—'গুপ্ত' লিখিতেন না। ইহা বিশেষ কিছু আশ্চর্য্যজনক নহে, অনেকেই লিখেন না, কিন্তু ধর্ম্মকার্য্যে সর্ব্বদাই সকলে জাত্যুক্ত গুপ্ত উপাধি ব্যবহার করিয়া থাকেন।" (পৃঃ ১০৮—১০৯)।

সত্যেন্দ্রবাবুও সত্যের আধার। তাই নিবেদনের ⁄০ পৃষ্ঠায় পিতৃব্যদেবের পুস্তক লিখিবার উদ্দেশ্য কি তাহা ব্যক্ত করিতেছেন—

"ঐ পুস্তিকার মূল উদ্দেশ্য ছিল বৈদ্য ও কায়স্থের পারস্পরিক শ্রেষ্ঠত্ব বিচার।" (পৃঃ ⁄০)

হায়, হায়! যে পুস্তকে কুত্রাপি বৈদ্য-কায়স্থ বিষয়ক কোন কথার নামগন্ধও নাই, 'উপযুক্ত ভ্রাতুষ্পুত্র' তাহাকেই পুস্তকের মূল উদ্দেশ্য বলিয়া ব্যক্ত করিলেন! আমরা জানি উহা বৈদ্যের সন্ন্যাসাধিকার সম্বন্ধে লিখিত। শ্রীমৎ পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামী (পূর্ব্বনাম শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন) সন্নাস গ্রহণ করিলে তদানীন্তন ব্রাহ্মণ সমাজ বৈদ্যের সন্ন্যাসে অধিকার আছে কি না, ইহা লইয়া ঘোরতর তর্ক উঠান। তাহার মীমাংসার জন্যই বৈদ্যের পক্ষ হইতে মহামহোপাধ্যায় ঐ পুস্তকখানি লিখিয়াছিলেন। তিনি সুপরিস্ফুট ভাষায় ঐ গ্রন্থ লিখিবার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন—বিরোধী পক্ষ বলিতেছেন, ব্রাহ্মণের সন্ন্যাসে অধিকার আছে, এবং বৈদ্যগণ (বর্ত্তমানে

যে আচারেই অবস্থিত হউন। শাস্ত্রানুসারে ব্রাহ্মণ; সুতরাং বিরোধী-দিগের কথাতেই বৈদ্যদের সন্ন্যাসে অধিকার রহিয়াছে। অতঃপর বৈদ্যগণ যে ব্রাহ্মণ তাহা (মনূক্ত অম্বষ্ঠজাতিত্ব স্বীকার করিয়াও) সপ্রমাণ করিয়াছেন। এই পুস্তক কেহ দেখিবার ইচ্ছা করিলে আমার নিকটে দেখিতে পাইবেন। এস্থলে কেবল গ্রন্থের আরম্ভ ও শেষ হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া পুস্তকের মর্ম্ম জ্ঞাপন করিতেছি—

[প্রারম্ভ]—"ঢাকা বিক্রমপুরের অনেক পণ্ডিত-মহাশয়দিগের মধ্যে এক গুরুতর বিচার উপস্থিত হইয়াছে। কেহ বলেন সন্ন্যাসাশ্রম কেবল ব্রাহ্মণের গ্রাহ্য, অপর পক্ষ বলেন, দ্বিজাতিমাত্রই সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিতে পারিবেন।

"এ সম্বন্ধে উভয় পক্ষ হইতে বিস্তর প্রমাণ-প্রয়োগ নিদর্শিত হইয়াছে। শাস্ত্রার্থেও মত-ভেদ হইয়াছে, সে সকল কথা লেখা আমার উদ্দেশ্য নহে, সুতরাং আমি তাহা লিখিতে প্রবৃত্ত হই নাই।

"শুনিতে পাই যে যাঁহারা বলিয়াছেন কেবল ব্রাহ্মণেরই সন্ন্যাসাশ্রমে অধিকার, তাঁহাদের প্রতি অম্বষ্ঠশ্রেণীর অনেক লোক অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। * তাঁহারা কি অভিপ্রায়ে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন বলিতে পারি না, যদি শাস্ত্রার্থ যথার্থ হয় নাই বলিয়া অসন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, † তাহাতে আমার আপত্তি নাই। কিন্তু এরূপ শুনিতে পাই যে কাহারও মনে এরূপ সংস্কার যে ব্রাহ্মণ মাত্রের সন্ন্যাসাশ্রমে অধিকার বলিলে অম্বষ্ঠের সন্ন্যাস অধিকার থাকে না, অথচ এ

* কবিরাজ মহাশয় বলিতেছেন, অম্বষ্ঠ যখন ব্রাহ্মণবর্ণ তখন এই অসন্তোষ কেন হয়?

† কেবল ব্রাহ্মণেই সন্ন্যাস করিবে, অথবা ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য অর্থাৎ শূদ্র বাদে সকলেই করিবে—এই দুই প্রকার শাস্ত্রার্থেই সন্তোষ বা অসন্তোষ প্রকাশ করিবার অধিকার সকলেরই আছে।

সন্ন্যাসী চিরকাল দেখা যাইতেছে। এখন নূতন ব্যবস্থা দ্বারা তাঁহাদের চিরপ্রসিদ্ধ সন্ন্যাসাধিকার নষ্ট হইতেছে, এইমাত্র বিরক্তির কারণ। ফলতঃ ব্রাহ্মণ মাত্রের অধিকার বলিলে যে অম্বষ্ঠেরও সন্ন্যাস অধিকারের কোন ব্যাঘাত হইল না, তাহাতে তাঁহারা মনোযোগ করেন না। **ব্রাহ্মণ মাত্রের অধিকার বলিলে যে কেবল রাঢ়ীয় শ্রেণীর বা বারেন্দ্র শ্রেণীর অধিকার হইল তাহা নহে, ব্রাহ্মণ-বর্ণ-সাধারণেরই অধিকার হইল।**

"এস্থলে জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, ব্রাহ্মণ-সাধারণের অধিকার হইলে অম্বষ্ঠের অধিকার হয় কিরূপে? এজন্য **অম্বষ্ঠ কোন্ বর্ণ**, তাহার মীমাংসা করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা অম্বষ্ঠকে অতিরিক্ত বর্ণ মনে করেন, তাঁহাদের পূর্ব্বোক্ত ভ্রমমূলক অসন্তোষ হইতে পারে, **বস্তুতঃ অম্বষ্ঠ অতিরিক্ত বর্ণ নয়, ব্রাহ্মণবর্ণ।**" (পৃঃ ১—২)

এই বলিয়া বিবিধ শাস্ত্রপ্রমাণ ও যুক্তি দ্বারা মহামহোপাধ্যায় অম্বষ্ঠের ব্রাহ্মণত্ব প্রমাণ করিয়াছেন। সে সমস্ত কথা মোহমুদ্গরে অম্বষ্ঠের ব্রাহ্মণ-বর্ণত্ব প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, যথা ঔরস ও শৌদ্র পুত্রের কথা, যুতকীকরণ মন্ত্রের কথা, ব্রাহ্মণত্বসূচক সুপরিস্ফুট শাস্ত্রবাক্যের কথা ইত্যাদি। প্রসঙ্গতঃ একটা কথা বলি। বিবাহমন্ত্র-সংস্কৃতা ক্ষত্রিয়-কন্যা ও বৈশ্য-কন্যা ব্রাহ্মণের ভার্য্যা হইলে যদি ব্রাহ্মণী হইয়া যায়, তবে মনু কেন বলিয়াছেন, '**অসবর্ণাস্তু** সম্পূজ্যাঃ প্রত্যুত্থানাভিবাদনৈঃ'? কেন বিষ্ণুসংহিতায় মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও অম্বষ্ঠকে দায়ভাগস্থলে ক্ষত্রিয়া-পুত্র, বৈশ্যা-পুত্র প্রভৃতি বলা হইয়াছে? কেনই বা সবর্ণা হইতে 'অনন্তরা', 'একান্তরা' বলিয়া প্রভেদ করা হইয়াছে, ইহার উত্তর মহামহোপাধ্যায় বলিয়াছেন—

"ঋষিদের এই রীতি যে কোন বিশেষ প্রয়োজন থাকিলে (পরবর্ত্তী কালের **সাম্য** সত্ত্বেও) **পূর্ব্বধর্ম্ম মাত্র অবলম্বন করিয়াও নির্দ্দেশ করিয়া** থাকেন। যেমন আয়ুর্ব্বেদীয় চরকসংহিতায় বলিয়াছেন—

'অতুল্যগোত্রস্য রজঃক্ষয়ান্তে
রহো বিসৃষ্টং মিথুনীকৃতস্য॥" ইত্যাদি।

এস্থলে স্ত্রীর অতুল্যগোত্র পুরুষ বলিয়াছেন। কিন্তু এ সকল গর্ভোৎপাদন কালের কথা। **তখন পুরুষ স্ত্রী হইতে ভিন্ন গোত্র নহে; বিবাহের পর স্ত্রী-পুরুষ এক গোত্রই হইয়া থাকে। এ স্থলে বিবাহের পূর্ব্ব-ধর্ম্ম 'অতুল্য-গোত্রস্য' বিশেষণ দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। 'অতুল্য গোত্র' বলিতে বিবাহের পূর্ব্বে যে অতুল্য-গোত্র ছিল,** তাহারই গ্রহণ করিয়াছেন।

'অপর প্রমাণ এই, ব্যাস বলিয়াছেন—

কুমারীসম্ভবস্ত্বেক **সগোত্রায়াং** দ্বিতীয়কঃ।
ব্রাহ্মণ্যাং শূদ্রজাতশ্চ চাণ্ডাল স্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ॥

এ স্থলে 'সগোত্রা' বলিতে যে বিবাহের পূর্ব্বে (জন্মতঃ) সগোত্রা ছিল, তাহাকে বুঝা যাইবে। বিবাহের পর সকল স্ত্রীই সগোত্রা হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাতে জাত সন্তান চণ্ডাল হয় না।" (অম্বষ্ঠ কোন্ বর্ণ, পৃঃ ১১)

পাঠক মহামহোপাধ্যায়ের নিম্নলিখিত কথাগুলিও দেখুন—

[অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ বর্ণ]

(১) "মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও অম্বষ্ঠ যে ব্রাহ্মণ বর্ণ, সে বিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।"—কোন্ বর্ণ', পৃঃ ২১।

['গুপ্ত' শব্দ আধুনিক—উহা ব্যবহার্য্য নহে।]

(২) "দুঃখের বিষয় এই যে, বৈদ্য মহাশয়দের মধ্যে অনেকেই নামে গুপ্ত শব্দের প্রয়োগ কর্ত্তব্য মনে করিয়াছেন। মৌলিক সেন, দাশ ইত্যাদি প্রয়োগ একেবারে লোপ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। প্রাচীন পণ্ডিতগণ * দাশাদি শব্দের প্রয়োগে লজ্জিত বা ভীত হইতেন না। এ দেশের ব্রাহ্মণদিগের দাশাদি উপাধিযুক্ত নাম পূর্ব্বে ছিল; সুতরাং চক্রপাণি দত্ত, শ্রীপতি দত্ত, শঙ্কর সেন, অনন্ত সেন, প্রজাপতি দাশ, বিজয় রক্ষিত প্রভৃতি তাঁহাদের মৌলিক উপাধিই লিখিয়াছিলেন, গুপ্ত লেখেন নাই। দেব কি শর্ম্মা ইহা লেখাও আবশ্যক বোধ করেন নাই। কারণ তখন ব্রাহ্মণ ভিন্ন এদেশে অন্য কোন জাতি সংস্কৃত চর্চ্চা করিত না।" (পৃঃ ২১)

(৩) "বস্তুতঃ অম্বষ্ঠের নামান্তে গুপ্ত শব্দ কদাচ প্রযোজ্য হইতে পারে না। কারণ উহা বৈশ্যের নামান্তেই প্রযোজ্য, ব্রাহ্মণবর্ণের নয়।" (পৃঃ ২২)

"অনেক অম্বষ্ঠগণ—শর্ম্মা দেবশ্চ বিপ্রস্য বর্ম্মা ত্রাতা চ ভূভুজঃ। গুপ্তদাসান্তকং নাম প্রশস্তং বৈশ্যশূদ্রয়োঃ॥" এই বচনানুসারে 'দেব' শব্দান্ত নামই করিয়া থাকেন। ইহাতে পুরোহিত ব্রাহ্মণগণও অসন্তুষ্ট হন না; তাঁহাদের নামও শাস্ত্র সম্মত হয়। কারণ পুরোহিতগণ বুঝেন যে ইহাদের স্ত্রীগণের নামান্তে যখন 'দেবী' শব্দের প্রয়োগ সর্ব্ববাদি সম্মত, তখন পুরুষের দেবান্ত নামে কোন দোষ হইতে পারে না। ফল কথা, ব্রাহ্মণের দেবান্ত বা শর্ম্মান্ত নাম উভয়ই তুল্য।" (পৃঃ ২২)

মহামহোপাধ্যায়, বলিতেছেন—"এদেশীয় অম্বষ্ঠগণের ব্রাহ্মণবৎ উপনয়নাদি সংস্কার হইয়া থাকে। কেবল নামটী যথাশাস্ত্র হয় না।

গুপ্ত বলা ত উচিতই নয়। যদি দেবশর্ম্মা বলিতে কাহারও **অন্যথা আপত্তি** থাকে, তবে কেবল দেবশব্দান্ত নামের উল্লেখে ক্রিয়াকলাপ করিলেই যথেষ্ট হয় ” (‘অম্বষ্ঠ কোন্ বর্ণ’, পৃঃ ২৩)

প্রাচীন কালে বৈদ্যগণ ‘দেব’ ব্যবহার করিতেন এবং ব্রাহ্মণগণও তাঁহাদিগকে ‘দেব’ বলিয়া আখ্যাত করিতেন, যথা, হলায়ুধ ব্রাহ্মণ-সর্ব্বস্বে —

“যস্মৈ যৌবনশেষযোগ্যমখিলক্ষ্মাপালনারায়ণঃ।
শ্রীমাল্লক্ষ্মণসেন**দেবনৃপতি**র্ধর্ম্মাধিকারং দদৌ॥”

এই প্রসঙ্গে মোহমুদ্গর পৃঃ ১০৪, (ঐ) অংশ দ্রষ্টব্য।

‘অম্বষ্ঠ কোন্ বর্ণে’র **উপসংহার** :—

“অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণের শ্রেণী বিশেষ মাত্র, অন্য কোন বর্ণ নহে। তাঁহাদের নামান্তে শর্ম্মা অথবা দেব শব্দের প্রয়োগ করা উচিত। গুপ্ত শব্দের প্রয়োগ অকর্ত্তব্য।

“ব্রাহ্মণ মাত্রেরই যদি সন্ন্যাসে অধিকার থাকে, তবে অম্বষ্ঠেরও আছে। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সন্ন্যাসে অধিকার থাকুক কি না থাকুক, তাহাতে অম্বষ্ঠের কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই।” (পৃঃ ২৫)

‘অম্বষ্ঠ কোন্ বর্ণ’ পুস্তকের সারাংশ পাঠ করিয়া মহামহোপাধ্যায়ের উপদেশ আপনারা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছেন। অতএব কালীবাবু সত্যেন্দ্রবাবুর কথায় প্রবঞ্চিত না হইয়া, বাচস্পতি মহাশয়ের লোক্‌সানের খতিয়ানে দৃক্‌পাত না করিয়া নিখিল বৈদ্য সমাজ ঋষিকল্প গঙ্গাধর ও দ্বারকানাথের প্রদর্শিত পথে কর্ত্তব্যের অভিমুখে অগ্রসর হউন। কালীবাবু ও সত্যেন্দ্রবাবু দেখুন বৈদ্যব্রাহ্মণ-সমিতি আজ কোন নূতন কথা বলিতেছে না, লাঞ্ছিতা অবমানিতা জাতি-জননীর হৃদয়ের

চিরন্তন ব্যথাকেই অভিব্যক্তি দান করিতেছে। কোন্ হতভাগ্য বৈদ্য-সন্তান জননীর কাতরতায় উপেক্ষা প্রদর্শন করিবে ?

শেষ কথা

গ্রন্থ সমাপ্ত হইল। এই দুঃখবহুল কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া সংযম ও সাবধানতার অভাবে যদি কোথাও অন্যায় ভাষা প্রয়োগ করিয়া থাকি, ভ্রাতৃগণ তাহা ক্ষমা করিবেন। বিরোধী ভ্রাতৃগণের কৃত অসহ্য মাতৃনিন্দা সর্ব্বত্র যদি ধীরভাবে সহ্য করিতে না পারিয়া থাকি, তবে তজ্জন্য আমি নিশ্চিতই দোষী। কিন্তু জননী বিচার করিবেন। ভ্রাতৃবিরোধ আমার আদৌ বাঞ্ছনীয় নহে। আসুন সকলে মাতৃবন্দনা করিয়া পরস্পরকে আলিঙ্গন করি—

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু জাতিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥"

এবং পিতৃগণ আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমরা একমনা হই—

'ওম্॥সহ না ববতু সহ নৌ ভুনক্তু সহ বীর্য্যং করবাবহৈ। তেজস্বি না বধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ॥ ওম্॥'

সমাপ্ত।

ভ্রম সংশোধন

১। গ্রন্থ মধ্যে স্বর্গত কবিরাজ হরিনাথ বিশারদ মহাশয়কে ব্রাহ্মণ বলা হইয়াছে, কিন্তু তিনি কায়স্থ।

২। 'সর্ব্ববর্ণেষু তুল্যাসু পত্নীষক্ষতযোনিষু' ইত্যাদি শ্লোকের গঙ্গাধরকৃত অর্থকেই প্রবোধনী যথার্থ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কালীবাবু ও সত্যেন্দ্রবাবুর তাহা অসহ্য। তাহাদের নানা অন্যায় কথার আমি প্রতিবাদ করিয়াছি। কিন্তু এই শ্লোক এবং পরবর্ত্তী শ্লোকের পণ্ডিতপ্রবর দ্বারকানাথকৃত চমৎকার আলোচনা বৈদ্যহিতৈষিণী, ১৩৩৫, ফাল্গুন সংখ্যা ও পরবর্ত্তী সংখ্যায় পাইবেন।